

# বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গল্প

সম্পাদিত  
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ :

ব্রথযাত্রা : ১৩৭১

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭২/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-১

প্রচ্ছদ :

পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রফ. সংশোধন

রবি বসু

মুদ্রাকর :

গোপাল ঘোষ

শ্রীকৃষ্ণ প্রেস

৬ শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৬

## এই সংকলন বিষয়ে

ইচ্ছে ছিলো, বছরদিনের ইচ্ছে, পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক গল্প নিয়ে এক সংকলনগ্রন্থ বের করবো। বছর দুই আগে ও-বাংলার কবিতা নিয়ে একটি সংকলন তৈরি করেছিলুম। এবছর তার পরিবর্তিত ও প্রামাণ্য দ্বিতীয় সংস্করণও বের হয়ে গেছে। গল্পের ব্যাপারে তরুণ লেখক হাসান আজিজুল হক এবং বিশেষ করে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আমায় প্রভূত সাহায্য করেছেন। বই-পত্র, গল্পের কপি পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন অতি তরুণ কবি দাউদ হায়দার। দীর্ঘদিন ধরে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, বেছে তাদের মোটামুটি একটি গ্রন্থাকৃতি দিয়েছিলুম।

সহসা স্মসময়-দুঃসময়-মেশা এক ঝড়ে সীমান্তের কাঁটাতার উপড়ে গেল। এক ভাষার দুই বাংলাদেশের গল্প একত্র রাখার বাসনা প্রবল হয়ে উঠলো তখনই। গ্রন্থের সব কটি গল্পের মধ্যেই যে সাম্প্রতিক বাংলাদেশ প্রতীক হয়ে আছে, তা বলবো না এবং তেমন একটি বিস্তৃত সমসাময়িকতাকে বন্দী করে তুলে ধরার পরিকল্পনাও আমার নয়—কিছুর মধ্যে আছে এখন বাস্তবের সময়ের নির্ভরযোগ্য ছবি। আর কিছুর মধ্যে আছে মানুষের আবহমান ভালোবাসার কথা। এই নিয়ে দুই বাংলার, এক বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গল্পের বই। ইচ্ছে ছিলো, একটি ব্যাপক খণ্ডে একে ধরে ফেলতে পারবো। নানা কারণেই তা সম্ভব হলো না শেষ পর্যন্ত। অনেকের রচনাই চেয়ে কাছে রেখেছিলুম, অনেককেই বলে ঠেংখেছিলুম তাঁদের গল্প এই সংকলনে যাচ্ছে। অনিবার্য কারণে, দু খণ্ডে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের গল্পসমূহ প্রকাশ করতে হচ্ছে। স্তূতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি খণ্ডকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ করতে গিয়ে তাঁদের অনেকের রচনাই পরবর্তী খণ্ডের জগ্রে হাতে রেখেছি। আশা করি, বাংলাদেশের গল্পলেখকগণের কাছ থেকে এই মার্জনাটুকু আমি পাবো।

সংকলন করার কাজে বিশেষ কোনো নিয়ম বা নীতি আমি মেনে চলতে শিখিনি। তবে, যাদের রচনা কোনো-না-কোনো সময়ে

আমার কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছে, এই বিস্তৃত সংকলনগ্রন্থের দুই-  
থণ্ডে তাঁরা প্রায় সকলেই আছেন। ওপার বাংলাদেশ থেকে যে সা-  
বিখ্যাত লেখক-অধ্যাপক সাম্প্রতিক দুর্ধোগ মাথায় নিয়ে এপানে  
আসতে পেবেছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই বিস্তৃত আলোচনার পর  
বিশেষত, তাঁদের দিককার গল্পসংগ্রহ, নির্দিষ্ট করেছি। তবু, ভুলভ্রান্তি  
থাকা স্বাভাবিক। বিশেষত দুই বাংলার তরুণ-অতিতরুণ গল্পকার-  
ক্ষেত্রে। কিন্তু সে বিষয়েও আমি মোটামুটি উন্মুক্ত চোখ নিয়ে আছি  
তরুণ রচনার অগ্নি আমাদের মতন তারুণ্যবর্জিত মাহুষকে খু-  
বডোভাবেই স্পর্শ কবে থাকে

সবশেষে, প্রকাশক শ্রীব্রজকিশোর মণ্ডলকে এ ধরনের এক  
বিপুলায়তন এবং অপরিহার্য একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্তে সাধুবা  
জানাই। নমস্কার জানাই তাঁদের, যাঁরা এই গ্রন্থের পরিকল্পনামা-  
অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ইতি—

শক্তি চট্টোপাধ্যায়



আবহমানের বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি-



## গল্প-সূচী

- সোনার ঠাকুর মাটির পা ॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ১  
দোমর ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩  
আত্মজ্ঞা ও একটি করবী গাছ ॥ হাসান আজিজুল হক ২৯  
মল্লিকা বাহার ॥ কমলকুমার মজুমদার ৩৮  
সরল সংসার ॥ জ্যোতিশ্রকাশ দত্ত ৫০  
দুই রাজি ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ৬১  
জলছলছল ॥ মাহবুব সাদিক ৮৫  
গুহা ॥ আবু কায়সার ৯২  
লাইনের ধারে ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১০৭  
মনসা মাগো ॥ মাহমুদুল হক ১২১  
বিনিত্ত রাজি, সোনালী পিপাসা ও একটি নাবীমুখ ॥ মুহম্মদ সিরাজ ১৩৭  
শহীদের মা ॥ সমরেশ বসু ১৪৩  
দিনকাল ॥ রমাপদ চৌধুরী ১৬৪  
পরাজিত খেলোয়াড় ॥ আহমদ বুলবুল ইসলাম ১৭৮  
সত্যশব ॥ শাহ নূর খান ১৮৩  
বেহুলার ভেলা ॥ মতি নন্দী ১৮৮  
পরী ॥ শ্রামল গঙ্গোপাধ্যায় ২১৩  
বিজিতের বংশধর ॥ শাকের চৌধুরী ২২২  
চন্দনে মৃগপদচিহ্ন ॥ সাজ্জাদ কাদির ২২৮  
বান্দা ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ ২৩৭  
আজীবন শীতকাল ॥ কায়েস আহমেদ ২৪৫  
মহাপৃথিবী ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৯  
নোনাঙ্গল ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ২৬১  
দিনমান ছায়াছবি ॥ মাজহাফল ইসলাম ২৭২  
একটি মৃত্যুর জন্ম ॥ রবিউল আলম ২৮০  
বিপ্রতীপ ॥ শেখ আতাউর রহমান ২৮৮

সৌদামিনী মালো ॥ শওকত ওসমান	২২
ভালোবাসা ॥ আবু মহম্মদ আবহুলাহ	৩০৫
সহবাস ॥ বরেন গন্ডোপাধ্যায়	৩১২
নইলে চাবুক ॥ শাস্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩
আলমারি ॥ গৌরকিশোর ঘোষ	৩
মাছ ॥ হাসান হাফিজুর রহমান	৩
বৃষ্টি ॥ আলাউদ্দিন আল আজাদ	৬
পুঁইশাক ॥ আতোয়ার রহমান	৩৬৮
একটি তুলসী গাছের কাহিনী ॥ সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	৩৮২
জিবরাইলের ডানা ॥ শাহেদ আলী	৩৯০
বাঙলা দেশ ॥ মিহির মুখোপাধ্যায়	৪০৬
আগুন জ্বালাবার গল্প ॥ অতীন বন্দোপাধ্যায়	৪২
মাহমুদের গল্প ॥ শওকত আলী	৪৩
বলার আছে ॥ রমানাথ রায়	৪৫
উষেগ ॥ শেখর বসু	৪৫
মধ্যবিত্ত ॥ আসাদ চৌধুরী	৪৬
দুজন মাহুয ও তিনটি গরু ॥ আবু জাফর সামসুদ্দিন	৪৬
সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ॥ আলমগীর রহমান	৪৭
শোণিতে শতধা ॥ জুলফিকার মতিন	৪১

র সেইখানেই স্থির হয়ে বসেন। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায়। তাঁর বাড়ির কাছে। সেখানে তিনি কেবল খাদি তৈরি করেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে করেন টিনের কাজ। টিন কেটে লঠন, ল্যাম্প, কুপি। তার সঙ্গে যোগ দেয় লোহার কাজ। মাঙলের ফাল, দা, কাটারি, ছুরি। কাণ্ডে কোদাল। কাঠের কাজও সঙ্গেই চলে।

“তৈরি করা তত কঠিন নয়, বিক্রি করা যত কঠিন। হাতে হাতে পাঠাতুম, ধরে দরে ছাড়তুম। ঘর থেকেই লোকমানের কড়ি জোগাতে হতো। বাবা ক্রমেন পৃষ্ঠপোষক। স্বদেশী যুগে উনিও রকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিস্তর টাকা লাভ দিয়েছিলেন।” দাদা বলেন।

“আমার মনে আছে তোমার আশ্রমের লঠন আমি রোহনপুরের হাতে গেমেলুম। তোমার সঙ্গেও দেখা হয় তার কিছুদিন বাদে। তুমি তখন সত্যাগ্রহ করে বেড়াচ্ছ। বেআইনী হন তৈরি। তোমাকে গ্রেপ্তার করতে বলেছিল, করিনি। তুমিও আমাকে বিব্রত করবে না বলে অল্পত্র ধরা পড়েছিলে!” কবেকার সব কথা মনে পড়ে আমার।

“গ্রেপ্তার হলে তোর হাতে না হওয়াই ভালো। আমার তখন অর্জুনবিষাদ। তোরও তাই। ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের সংগ্রাম যেন তোর সঙ্গে আমার সংগ্রাম না হয়।” বদনদা আর একবার হেসে ওঠেন। হা হা হা হা হা!

“হাঁ, তোমার ট্রায়াল হতো আমারও ট্রায়াল। তোমার ভাগ্যে হুন অল্প জায়গায় পাওয়া গেল। আমারও ভাগ্যে বলতে পারি।” আসলে হুন নয়, নোনা মাটি।

যারো কতকক্ষণ স্বাধীচারণের পর বদনদা হঠাৎ চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলেন, “কিন্তু এত কাণ্ড করে শেষটায় কী লাভ হলো রে! সেসব অঞ্চল তো এখন পাকিস্তানে।”

বুজনেই চুপ করে থাকি। মোটর ততক্ষণে চোরঙ্গী দিয়ে ছুটেছে।

“হা হা হা হা হা! তুই না আমাকে বলেছিলি স্বাধীনতার দিন যে, আমাদের নতুন রাজত্ব দুশো বছর টিকবে। বাইশ বছর যেতে এ কী দেখছি! চতুর্দিকে স্কাটল। চতুর্দিকে ভাঙন। যেন মোগল রাজত্বের শেষ দশা। যে রেটে জল ঢুকছে ‘হাছ ডুবতে কতক্ষণ! জোর দশ বছর।’ বদনদার গলা কাঁপে।

“ও কী বলছ, বদনদা!” আমি গুর নৈরাশ্র সঙ্গ করতে পারিনে।

“মা, না, হাসির কথা নয়। আমি বড়ো দুঃখেই হাসছি রে। গাঙ্গীকে খুন করে মরণ গাওয়া হচ্ছে ইনিয়ে বিনিয়ে। একজনও বিশ্বাস করে না যে এ স্বাধীনতা

মিলিটারি ডিভি আৰ কেউ রক্ষা করতে পারে। অথচ বাপু বেঁচে থাকলে স্বেচ্ছাশ্রম করত যে মিলিটারি নয়, তিনিই পারতেন রক্ষা করতে।” বর্ষ আর্দ্রকর্ষে বলেন।

আমরা ফিরছিলুম গান্ধী শতবার্ষিকী সভায় যোগ দিয়ে। বদনদার কলকাতার উদ্দেশ্যেও তাই। প্রবীণ গান্ধীবাদীরা দেশের নানা স্থান থেকে এসেছেন। দেশের লোক চলে যাচ্ছে তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। তাঁরা মূলতঃ অর্জুনের মতো অসহায় দর্শক। দস্যুদের বিরুদ্ধে গান্ধীব তুলবেন যে, গান্ধী তাঁদের চেয়ে ভারী।

“মস্ত ভুল করেছি বিয়ে করে।” বদনদা হারানো খেই হাতে নিয়ে বলে “বাপুর বারণ ছিল, স্বরাজ না হওয়াতক বিয়ে করো না। তার মানে কি? যে, স্বরাজ হতে না হতেই বিয়ে করতে পারো? তোর সঙ্গে শেষ দেখার পর চট করে বিয়ে করে ফেলি। মেয়েটি আমার জন্তে পার্বতীর মতো তপস্বী করছিল। আমার দরকার ছিল আশ্রমের জন্তে একজন লেডী ডাক্তার। বিয়ের পরেও অসিদ্ধার করা যাচ্ছিলুম, কিন্তু বিনতাকে তার মাতৃস্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হতো না। অধর্ম হতো। তেমনি স্নহুকেও জন্মলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অসঙ্গত হতো। স্নহু, স্নবিনয়, আমাদের একমাত্র সন্তান। কলকাতায় ওব ওম পড়ার একটা কিনারা করে দিতে পারিস?”

ভাগ্যিস গাড়ীর ড্রাইভার ছিল হিন্দুস্থানী নইলে শুনে কী মনে করত।

“বিয়ে করে তুমি ভুল করেছ, কেন ভাবছ? ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য, এই রকম তো শাস্ত্রে লেখে। বয়সটা অবশ্য বানপ্রস্থের। ‘ভুল’ বলছ সেইজন্তেই?” আমি চাই

“সেটাও একটা কথা বইকি। কিন্তু সেইজন্তেই নয়। বিয়ে যতদিন করি ততদিন দেশের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কারো ভবিষ্যৎ ভাবিনি। বিয়ের পরে বাপু হা অবধি ছেলের ভবিষ্যৎই ভেবেছি। দেশের ভবিষ্যৎ নয়। তোর কাছে গোপন্য কী কী হবে, ছেলেকেই আমি আশ্রমের ট্রাষ্টি করে যেতে চেয়েছিলুম। আশ্রমই আমারি ব্যক্তিগত অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তা বোধ হয় জানিস।” বর্ষ খুলে বলেন।

“ভালোই তো। স্নহুরও একটা জীবিকা জোটে।” আমি মন্তব্য করি।

“স্নহু কী বলে শুনবি? বলে আশ্রমে ওর বিশ্বাস নেই। অহিংসাতেও ওর মতে মহাত্মা তাঁর কাজ বা তা চুকিয়ে দিয়ে গেছেন, আর কারো জন্তে বাধ রেখে যাননি।” বদনদা কাঁদো কাঁদো ভাবে বলেন।

কি ? তা হলে স্নহুর ভবিষ্যৎ কোন্ পথে ?” আমি জিজ্ঞাসু হই ।  
, চাকরি। বিয়ে। গতানুগতিক পথে। নয়তো ছাত্র-রাজনীতি, তার  
নিজস্ব, তার থেকে নকশালপন্থী। তোরা পাঁচজনে ওকে সং পরামর্শ  
যে একদিন বোমা ছুঁড়বে না তাই বা কী করে জানব ? হিংসায় উন্নত  
হ কি - ছনিয়ার বার ?” বদনদা আমাব হাতে হাত রেখে থর থর  
ব।

। ডুই ।

কুকুর বিন্দি আমাকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে আসে। বদনদাকে দেখে  
ব পা তুলে সম্বর্ধনা জানায়।

ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, “আমারও এ রকম একটি পাহাড়ী  
হ। একটুও হিংস্র নয় !”

আমার বোনটিকে দেখছিলেন কেন ?” দাদা আসন নিয়ে বলেন।

ন অনেকদিন বাদে বাপের বাড়ী গেছেন। থাকলে কত খুশি হতেন  
দেখে !” এর পর আমি তাঁকে চা অফার করি।

‘না’ বলব না। আশ্রম থেকে ও পাপ বিদায় করতে পারিনি। আমার  
নৈন সাত আট কাপ খায়। লেডি ডাক্তার কিনা, চাক্সা হওয়া চাই। তবে  
মান চাতাল করে তুলেছে। এখন ও কলকাতায় এসে চায়ের দোকানে  
ট্রেস আড্ডা দেবে তো। চা বাগানের কুলীর রক্ত চুষবে।” দাদা বিমর্ষ

কে কত বিদেশী মুদ্রা আসে খবর রাখো, বদনদা ? অত বড়ো একটা  
মুদ্রা এই কি তোমার মনের ইচ্ছা।”

বিদেশী মুদ্রাই তোরা বুঝিস। সুনতে পাই বাদর চালান দিয়েও বিদেশী  
মুদ্রা। এর একটা নৈতিক দিক আছে সেটা কেউ দেখবে না। দেখবে  
ভৌতিক দিকটাই। অমনি করেই নাকি দেশ ধনবান হবে, বলবান হবে।”  
বদনদা বলেন।

বদনদা চেলে দিই। বিস্কুট এগিয়ে দিই।

বিস্কুট ! কেন, মুড়ি ষরে নেই ? আচার প্রফুল্লচন্দ্র মুড়ি খেতেন ও

খাওয়াতেন। খেয়েছিস ওঁর সঙ্গে আত্মাইতে। মনে নেই?” দাদা হেসে  
দেন।

“কিন্তু বিস্কুট তো এখন আমরা তৈরী করছি।” আমি আবার তর্ক বললাম।

“মদও তো আজকাল আমরাই চোলাই করছি। মৈসুরে আঙুর ফলছে,  
গরিব দেশবাসীকে বিস্কুট ধরিয়ে ওদের মাথা খাওয়া কি পাপ নয়? এর পা  
ধরাব তো? একবার যদি ও রসের স্বাদ পায় তবে বন্ধো-পুসাগর হবে মদ্যো-  
পুসাগর শুধে ফেলবে অগস্ত্য ঋষির বংশধর আমাদের তুমার্ত দেশবাসী।” দাদা  
ওঠেন।

মুড়িও ছিল বাড়িতে। দাদা বিস্কুট ঠেলে দিয়ে মুড়ি নিয়ে বসেন। বলে  
সবচেয়ে ভাল লাগে মোটা চালের ভাত, তারপরেই মুড়ি। পেটও ভরে মন

আমরা দুজনে ছাদে যাই। আরাম কেদারা নিয়ে বসি। দিকে দিকে  
চাবতলা বাড়ি। সাততলা আটতলাও দেখা যায়। দাদা চোখ বুজে  
তোরা করছিস কী? এ যে সোনার ঠাকুর মাটির পা।”

কথাটা এককালে আইরিশ কবি জর্জ রাসেলের বইয়ে পড়েছি  
ছদ্মনাম এ. ই.। দাদা মনে পড়িয়ে দিলেন।

“তোদের সভ্যতা, তোদের সংস্কৃতি, তোদের রাষ্ট্র, তোদের সমাজ  
বছরে সোনার ঠাকুরের আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু পা ছুটি তো মাটির। সে  
আর সেই কৃষক। তাদের না আছে পুঁজি না আছে জমি। গ্রামে গেলে  
চড়া স্বদে কর্জ করছে, যেটুকু আছে সেটুকুও বিক্রিয়ে যাচ্ছে। ধনী আরো  
গরীব আরো গরীব হচ্ছে। সোনার ঠাকুর একদিন দেখবেন খেঁটা বনি  
আর বইতে পারছে না। এমন মাথাভারি ব্যবস্থা কেউ কি পারে বইতে  
হবে জানিস? না আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে?” দাদা আমাকে হেসে  
পেয়ে ভয় দেখান।

“সেইজন্তেই তো সোসিয়ালিজমের কথা উঠেছে।” আমি কাটান দিইনি।

“ওঁর মানে কী রজত? আমার অল্পবিছায় এই বৃষ্টি যে রাষ্ট্রই হবে স  
মালিক, যেমন সমস্ত অস্ত্রের মালিক। এক হাতে অস্ত্রের মনোপলি আর অ  
অর্থের মনোপলি নিয়ে রাষ্ট্রই হবে হীরের ঠাকুর। কিন্তু মাটির পা তো না  
তেমন হয়ে যাবে। না পাথরের পা হয়ে যাবে?” বদনদা সংশয়ের স্বরে সার্ব

“কে জানে? আমরা তো হাতে কলমে পরখ করে দেখিনি।”

কাটাই।



“আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলে যে অস্ত্র ও অর্থ কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তার চেয়ে সর্বাধিক বিবেচনাকরণ শ্রেয়। কিন্তু সে যে কতদিনে হবে কেমন করে হবে তা আমার জ্ঞানগম্য নয়। মহাত্মা বৈচে থাকলে তিনিই আলো দিতেন। তাঁর অভাব প্রত্যেকদিনই অনুভব করছি। বরং আরো বেশী করে।” দাদা বিলাপ করেন।

“কেন, তিনিই কি বলে যাননি আত্মদীপো ভব?” আমি সান্ত্বনা দিতে যাই।

“আত্মদীপ হতে চাইলেও পারছি কোথায়?” দাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, “এই ছাখ না কালের হাওয়া আমার আশ্রমেও বইছে। কর্মীরা ধর্মবচনের লুকুম দিচ্ছে। ভাগচাষীরাও রায়তি স্বত্ব দাবি করছে, না দিলে জমি জবরদখল করবে। আমার কি সহানুভূতি নেই? কিন্তু আমি হলুম প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। মজুরি বা মাইনে বাড়ালে বাড়তি দাম খন্দের দেবে না, অগত্যা সরকারের কাছেই হাত পাততে হবে। তা কি পারি কখনো? আর জমিতে ভাগচাষীর রায়তী স্বত্ব স্বীকার করার পর ও জমি আর আশ্রমের থাকে না। তা হলে আশ্রমের চলে কী করে?”

“তা হলে তুমি এক কাজ কর, বদনদা। ওদের সবাইকে পার্টনার করে নাও। ওরা জাহুক যে আশ্রমটা ওদেরি।” আমি পরামর্শ দিই।

“ও কথা যে কখনো মাথায় আসেনি তা নয় রজত। কিন্তু দক্ষ কর্মীরা যে যেখানে ছুপয়সা বেশী পাবে সেখানেই চলে যাবে। এই ওদের রীতি। অদক্ষ কর্মীদের স্থিতিও কি সুনিশ্চিত? স্বাধীনতার পূর্বে যাদের পেয়েছি তারা আমাকে ছাড়েনি। স্থখে দুঃখে আমার সঙ্গেই থেকেছে। তাদের অনেকেই মৃত। অনেকে আবার পাকিস্তানে চলে গেছে। নতুন লোক নিয়ে ভাঙা হাট চালিয়ে যাচ্ছে রে। এরা কী অংশীদার হতে চায় না অংশীদারি পেলে টিকবে?” বদনদা মাথায় হাত দেন।

ভাবনার কথা বইকি। আমি চুপ করে থাকি। কিছুদিন আগে আরেক বন্ধুর আশ্রম দেখতে গিয়ে দুঃখিত হয়েছিলুম। হাতীশালে হাতী আছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক আছে, লস্কর আছে। তবু রাজপুরী খাঁ খাঁ করছে। ঘুমন্ত পুরী। কারণ বন্ধুটি নেই।

এ কাহিনী শুনে বদনদা বলেন, “একে একে নিবিছে দেউটি। আমিই বা আর কদিন? আমার পরে আমার আশ্রমও ঘুমন্ত পুরী হবে। তাতে প্রাণসঞ্চার করবে কে? বিনতা আমার সহধর্মিণী। ওরই লে এ ভার বহন করার কথা। কিন্তু ও কী বলে শুনবি?”

আমি কান পেতে রই। বিল্ডি আমার পায়ের কাছে শুয়ে।

“বিনতা বলে তোমরা এটার নাম রেখেছ সত্যগ্রহাশ্রম। এটা তো সেবাশ্রম নয় যে আমিও চালাতে পারব। সত্যগ্রহাশ্রম করেছ সাবরমতীর অল্পকরণে। সেখানকার নিয়ম ছিল শান্তির সময় সংগঠন, সংগ্রামের সময় সত্যগ্রহ। এখানকার নিয়মও যদি তাই হয় তবে একদিন না একদিন সত্যগ্রহের ডাক আসতে পারে। তুমি থাকলে সত্যগ্রহে নামতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু আমি কি তা পারি, আমার হাতে সব সময়ই একরাশ প্রস্থতি ও শিশু। শুনলি তো, আমার নামকরণেই আমি জন্ম। তখন কি ছাই জানতুম যে সত্যগ্রহের পাট উঠে যাবে?” বদনদা আক্ষেপ করেন।

“সত্যি উঠে গেছে নাকি?” আমি প্রশ্ন করি।

“মেকি সত্যগ্রহ এখানে ওখানে হচ্ছে। যারা করছে তারা কেউ গান্ধীবাদী নয়। খাঁটি সত্যগ্রহ এখন খাঁটি গব্য যুতের চেয়েও দুর্লভ।” বদনদা হাসেন। কিন্তু হা হা হা করেন না। করলে হয়তো হাহাকারের মতো শোনাতে।

আরো কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে আমরা দুজনে ছাদ থেকে নেমে আসি। নৈশ ভোজনের সময় হয়েছিল। আমি বদনদার জন্তেও রাখতে বলে দিয়েছিলুম। কিন্তু তাঁর অল্পমতি নিইনি। এবার অল্পমতি চাই।

“সে কি। আমি যে আমার শালীপতির অতিথি। ওঁরা যে আমার জন্তে অল্পমতি বসে থাকবেন। ঐ্যা করেছ কী রজত।” তিনি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করেন।

“সেই মহাপ্রসাদ সেবা এটা তারই একটা অক্ষম অল্পকরণ বদনদা। তোমার যেটুকু ইচ্ছা খেয়ো। ওঁদের ওখানকার জন্তে পেটে জায়গা রেখে দিয়ো।” আমি প্রস্তাব করি।

“না, না, তা কি হয়? তোর সঙ্গে বাইশ বছর বাদে খাচ্ছি। পেট ভরেই পাব। ওরা কিছু মনে করবে না।” তিনি ঠাণ্ডা হন।

## । ভিন।

আহার করতে বসে বদনদা কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন। আশ্চর্য প্রার্থনা। কখনো কারো মুখে ও রকম প্রার্থনা শুনিনি। ঠিক যেন খুঁটানদের গ্রেস বিকোর মীট। আমিও মনে মনে উচ্চারণ করি। মুখ ফুটে বলতে চক্ষুজঙ্ঘা।

“এই যে দুটি খেতে পাচ্ছি এর জন্ত আমি কৃতজ্ঞ। এই বা ক’জন পাচ্ছে? এই বা কদিন পাব? আমার অন্নদাতাদের যেন আমি না ভুলি। যেন ওদের শ্রমের মূল্য দিই ওদেরই মতো শ্রমে আর স্বেদে। আর ওদের যেন সেবা করি অহেতুক শ্রেমে?”

বদনদার ওই প্রার্থনা কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তা জানিনে। হয়তো ঈশ্বরের হয়তো মানবের। হয়তো ওটা প্রার্থনাই নয়, একটা সংকল্পবাক্য। অভিভূত হয়ে শুনি। তারপর আহার শুরু হলে জিজ্ঞাসা করি, “এটা কি খৃষ্টানদের মতো। গ্রেস বিফোর মীট?”

“যা বলেছিল। আমাদের হিন্দুদের প্রথা হচ্ছে ভগবানকে অর্পণ করে প্রসাদ সেবা করা। ওদের প্রথা হচ্ছে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাওয়া। আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে খাই। কিন্তু কাকে? ঈশ্বরকে? না ভাই তাঁকে নয়। তিনি তো ঐশ্বর্যময়। আমার ঐশ্বর্যে কাজ কী। আমি চিনি দরিত্রনারায়ণকে। ভূখা নারায়ণকে। নাক্সা নাবায়ণকে। যিনি লাঙল ধরে মাঠে মাঠে ফসল ফলান। যিনি তাঁত ধরে ঘরে ঘরে লজ্জা নিবারণ করেন।” বদনদা যেন তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন।

আমি এটা প্রত্যাশা করিনি। বলি, “বেশ তো, কিন্তু এর মানে কী? এই বা ক’দিন পাব?”

“ছাথ, রজত, আমার এ প্রার্থনা আজকের নয়। এটা আমি অন্তর থেকে পাই পঞ্চাশের মনস্তরের সময়। তখন আমি জেলে নয়, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। চোখের সামনে দেখি হাজার হাজার মহাপ্রাণী না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। আমিই বা কে যে ছ’বেলা ছ’মুঠো অবধারিতরূপে দিনের পর দিন পাব? মনস্তরটা কীভাবে হলো তোর মনে আছে নিশ্চয়। কলকাতার ব্যবসায়ী আর সরকারের ঠিকাদার গায়ে গায়ে লোক পাঠিয়ে যে-কোনো দামে চাল কিনে আনে। চাল তো নয়, মুখের গ্রাস। কেনা তো নয়, কাগজের নোট ধরিয়ে দিয়ে লুট। দেখে আমার গা জ্বলে যায়। জীবনে অমন কনফিডেন্স ট্রিক দেখিনি। সেদিন থেকেই আমার মন উঠে গেছে তোদের এই সভ্যতার উপর থেকে। শুধু ইংরেজ রাজত্বের উপর থেকেই নয়। এটা একটা কনফিডেন্স ট্রিক। এই যে টাকা দিয়ে চাল কেনা। যা তোরা প্রতিদিন করছিল। কেন, শ্রম দিয়ে কিনিসনে কেন? স্বেদ দিয়ে কিনিসনে কেন? শ্রেম দিয়ে প্রতিদান হিসেবে নিসনে কেন!” বলতে বলতে দাদা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

আমি কেমন করে তাঁকে বোঝাব যে টাকা পয়সার উদ্ভব হয়েছে বিনিময়ের সুবিধার জন্তে। তাতে সকলেরই সুবিধা। চাষীদের কি কিছু কম? ওই একটিবার ওরা ঠকেছিল। পরে ওরাও চালাক হয়ে গেছে।

বদনদা খেতে খেতে বলেন, “হুনিয়া জুড়ে যে ইনফ্লেশন চলেছে তার থেকে চাষীরও কিছু ফায়দা হচ্ছে, তা ঠিক। কিন্তু ওই কনফিডেন্স ট্রিক আবার মন্থস্তর ডেকে আনবে। আর সেবারকার মতো গ্রামের লোকরাই লাখে লাখে মরবে। এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, রজত। আমি কেন পাপের ভাগী হতে যাই? আমি চাই সময় থাকতে এর প্রতিবিধান। কিন্তু কার কাছে গেলে প্রতিবিধান হবে? সকলেই তো পাপের ভাগী। এই কনফিডেন্স ট্রিক থেকে সকলেই লাভবান হচ্ছে। কেউ কম, কেউ বেশী। তা সত্ত্বেও আমি জানি এ খেলা চিরকাল চলতে পারে না। এর কুফল ফলবেই।” দাদা ওয়ানিং দেন।

আদি খ্রীষ্টানদের মতো তিনি ব্যাকুলভাবে বলেন, “যাও খেটে খাও। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাও। মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা ফিরে পাও।”

এরপরে দাদা আবার হা হা হা হা করে হেসে ওঠেন। বলেন, “নিজের ছেলেকেই বোঝাতে পারলাম না। যে আমার নিজের হাতে গড়া। আমার সহকর্মীদের একজনও যদি শুনত আমার কথা! সকলেই বোঝে টাকা, আরো টাকা। মজুরি আরও বাড়াও। মাইনে আরও বাড়াও। আমার কি ছাই নাসিকের মতো একটা ছাপাখানা আছে যে যত খুশি ছেপে বিলিয়ে দেব? আর মেকী দৌলতের লহর বয়ে যাবে? অসত্যমেব জয়তে। হা হা হা হা! তবে এবার তোদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি রজত। লোকে এবার পড়ে পড়ে মরবে না। মারবে ও মরবে। বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ যা হবার তা হবে।” দাদার দু’চোখ জ্বলতে থাকে। তারপর আবার স্নিগ্ধ হয়।

“দেশকে তুমি অহিংস রাখতে পারবে না?” আমি অশাস্ত বোধ করি।

“আমি কেন, স্বয়ং মহাদেবও পারবেন না।” তারপর কী ভেবে বলেন, “কে জানে পারতুম হয়তো। যদি ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ না করতুম। বেশীদিনের জন্তে নয় যদিও!”

“ব্রহ্মচর্য! ব্রহ্মচর্য দিয়ে কখনো বিপ্লব রুপতে পারা যায়!” আমি তো অবাক। বদনদার কি ভীমরতি হয়েছে? বাহান্তরের আর কত দেরি?

“অহিংসা দিয়ে পারা যায়, যদি অহিংসার সঙ্গে থাকে ব্রহ্মচর্য। তেমন দু’চারজন সাধক এখনো রয়েছেন। সেইজন্তেই তো আশা হয় যে আমরা সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারব। কিন্তু তাঁরাই বা আর ক’দিন? আমাদের জেনারেশনটাই ঝরে

যাচ্ছে। একে একে নিবিছে দেউটি।” বদনদা করুণ স্বরে বলেন। বিলাপের মতো শোনায়।

নীরবে আহারপর্ব সারা হয়। একজনের বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক করে কী হবে?

আমি অস্ত্র প্রসঙ্গ পাড়তে গেলে বদনদা আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, “রুশ বিপ্লবের সময় অভিজাত ঘরের অন্ধনাদের দেখা গেল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে। একটুকরো হীরের বিনিময়ে একটুকরো রুটির সন্ধানে। তা হলেই বুঝতে পারছিস কোনটার চেয়ে কোনটার মূল্য বেশী? তোদের মূল্যবোধ যদি এখন থেকেই শোধরাত তাহলে বিপ্লব কোনোদিন ঘটতই না! বিপ্লবকে অহিংসা দিয়ে রোধ করার প্রসঙ্গ উঠত না।”

তর্ক করব না বলে মুখ বুজে থাকি! দাদা বলে যান, “তা ছাড়া সবাই তো একরকম সূনিশ্চিত যে, অহিংসার যুগ ফুরিয়েছে! তার আর কোনো ভূমিকা নেই ইতিহাসে। তাই যদি হয়, তবে বিপ্লবের দিন অহিংসার কাছে অত বড়ো একটা প্রত্যাশা কেন? সে প্রত্যাশা পূরণ করবেই বা কে, যদি বহুকালের ও বহুজনের প্রস্তুতি না থাকে?”

দাদা একটা লবঙ্গ মুখে দিয়ে বলেন, “মাটির পা ছুটি গলে গেলে সোনার ঠাকুরটি টলে পড়বেন, এর মধ্যে এমন এক ভবিষ্যত্যা আছে যে আমরা ক’জন অহিংসক এর খণ্ডন করতে পারিনে। তা বলে কি আমাদের কোনো কর্তব্য নেই। আমরা সাক্ষীগোপাল?”

আমারও তো সেই একই জিজ্ঞাসা। “আমরাও কি সাক্ষীগোপাল?”

দাদা বাল্যকালে ফিরে যান। বলেন, “ক্যাসাবিয়াঙ্কার কাহিনী মনে পড়ে তোর?”

“The boy stood on the burning deck”—আমি আবৃত্তি করতে শুরু করি।

“আমিও সেইরকম একটা জলস্ত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। জাহাজের গায়ে গোলা পড়ছে। জাহাজের প্রতি অঙ্গে আঙুন। জাহাজ ডুববে। অবধারিত মরণ। সকলেই পালাচ্ছে। আমাকেও বলছে পালাতে। আমি কিন্তু আমার পদতলভূমি থেকে ভ্রষ্ট হব না। একচুলও নড়ব না। বাপুজীর আদেশ, আমাকে স্বহানে স্থির থাকতে হবে। ক্যাসাবিয়াঙ্কাকে যখন বলা হয়, তোমার পিতা নিহত, বেঁচে থাকলে আদেশ ফিরিয়ে নিতেন, সে তা বিশ্বাস করে না। বলে, পিতার আদেশ আমাকে এইখানে দাঁড়িয়ে

থাকতে হবে। ইঁ, আমাকেও এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বাপুজীর আঞ্জা।”  
দাদা দুই হাতে দুই চোখ মোছেন।

“তার মানে কি ভূগোলের বিশেষ একটি স্থানে?” আমি প্রশ্ন করি।

“তার মানে, জীবনের বিশেষ একটি পোজিশনে। আমরা বরাবরই গঠনের ও  
সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। শান্তির সময় পাটাতন পরিষ্কার করি, সংগ্রামের সময়  
আগুনের সঙ্গে মোকাবিলা করি। দন্ধ হবার ভাগ্য থেকে তো কেউ আমাদের  
বক্ষিত করতে পারে না। ওই দন্ধ হওয়াটাই আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা।”

বদনদার বদনে অপূর্ব আভা।



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

‘হুনিয়ার সবচেয়ে তাঙ্কব চিঞ্জ—বুঝেছ, এই শুয়ার।’ —রেল ইন্সপিনের বাইরে, নোংরা একফালি মাঠের ভেতরে, একটা মাদী শুয়ার কতগুলো ছানাপোনা নিয়ে ঘোং ঘোং করছিল, সেই দিকে তাকিয়ে—বী চোখটা কুঁচকে আলতোভাবে কথাটা বলেছিল লোকটা।

তা—মাহুঘটাকে দেখলে কেমন যেন গা শিরশির করে, একটু ভক্তি-টঙ্কিও হতে চায়। সাদায় কালোয় মাথার চুল, সাদার ভাগটাই বেশি। মোটা মোটা ভুরু দুটোও পাক ধরা, তার নীচে একজোড়া জলজলে চোখ। মুখে খানিক এবড়োথেবড়ো সাদা দাড়ি দেখলেই বোঝা যায়, দাড়িটা নিয়মিত রাখে না—খেয়ালমতো কামিয়ে ফেলে মধ্যে মধ্যে। নাকের বাঁ-দিকে একটা শুকনো কাটার দাগ—মনে হয় সাঁওতালী তাঁর কিংবা বল্লমের ঘা লেগেছিল কোনোকালে।

প্লাটফর্মের বেকিতে গা এলিয়ে, পায়ের কাছে গামছার পুঁটুলিটা রেখে, আধঘণ্টা লেট লোক্যাল ট্রেনটার জন্তে অপেক্ষা করতে করতে, একটু দূরের শুয়ারগুলোকে দেখে, বী চোখটা একটু কুঁচকে লোকটা বলেছিল : ‘হ’, যা বলছি। হুনিয়ার সব চেয়ে তাঙ্কব চিঞ্জ হল এই শুয়ার।’

পাশে বসে ভক্তিমানের মতো শুনছিল জন দুই চাবী গেরস্ত। কয়েক হাত দূরে স্টকেস পেতে বসে আমিও শুনছিলুম, কারণ আধঘণ্টা লেট হয়ে যে ট্রেনটা আসছে তাতে আমাকেও যেতে হবে। সামনের ফাঁকা রেলের লাইন, মাথার ওপর রাখাচুড়োর পাতায় হালকা বাতাসের শব্দ, ওদিকের সাইডিঙে খান তিনেক কালো কালো পুরোনো ওয়াগন, মালগুদামের টিনের চালে চোখ ধাঁধানো খানিক রোদের ঝিলিক আর থেকে থেকে কাকের ডাক আমার সারা শরীরে একটা ক্লাস্ত ঝিমুনি

নিয়ে আসছিল। লোকটার ভরাট আর ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজে আমি নড়ে চড়ে বসলুম।

ভক্তি সঙ্গেও একজন চাষী অবাক হল একটু।

‘এত জীব থাকতে শুয়ার সব চাইতে তাজ্জব হল কেন?’

‘কখনো সন্দরবনের তন্নাটে যাওয়া হয়েছে?’

‘আজ্ঞে না।’

‘নদীগুলো যেখানে রাক্সে হয়ে সাগরে পড়ে—সে-সব মোহানার খবর জানা আছে কিছ?’

‘আজ্ঞে জানব কি করে? যাইনি তো কখনো।’

‘সেই সব নোনা গাঙের ভেতর চর জাগল। এলোপাথাড়ি গাছ-গাছলাও গজালো খানিকটা। কিন্তু মাহুষ গিয়ে থাকতে পারে না। একে তো নোনা—তার ওপর জোয়ারের সময় সব ডুবে যায়, কিলবিল করে সাপ—একটা পানবোড়া একবার ঠুকে দিলে তো শিবের অসাম্যি।’

‘আজ্ঞে সে তো বটেই।’

‘তখন সে চরে সবচেয়ে আগে কে যায় বলোদিকি?’

‘জানি নে।’

‘যায় শুয়ার।’ —লোকটা এবার একটু হাসল, কুঁচকে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল বাঁ চোখটা।

‘কোথেকে যায়?’

‘অত্র চর থেকে, ডাঙা থেকে।’

‘কী করে যায়?’

‘কেন—সাঁতরে!’

‘ওই গহীন গাঙ?’

‘গহীন গাঙ বইকি। বাঘের অবধি সাহসে কুলোয় না—কিন্তু থাকে বলে শুয়ারের গৌ। ওদের সাঁতরাতে দেখেছ কখনো? ঠিক কুকুরের মতো জলের ওপর নাকটা তুলে তুর তুর করে পেরিয়ে যায় দু-এক মাইল।’

‘তা চরে গিয়ে কী করে শুয়ার?’—আর একজন চাষী একটা বিড়ি ধরাতে গিয়েও ভুলে গেল : ‘সেখানে তো কচু-কন্দ নেই, খায় কী?’

‘কেন—কাঁকড়া।’

‘কাঁকড়া?’ —এবার দুটি শ্রোতাই চমকালো এবং সেই সঙ্গে আমিও।



‘বললুম না—হুনিয়ায় অমন আজব চীজ আর নেই? নোনা জলের অ্যাঁই বড়ো বড়ো কাঁকড়া দেখেছ তো? শুয়ার সেগুলো ধরে কড়মড় করে চিবিয়ে খায়।’

‘শুয়ার কাঁকড়া খায়?’ একজন তখনো অবিখাসী।

‘তেমন তেমন হলে বাঘে ধান খায় শোনোনি?’

‘তা হলে পেটের চিন্তা নেই?’

‘এক্কেবারে না। আর জোয়ারের জল এসে চর ডুবে গেলে কাঁ করে জানো? বুনো গাছ জাপটে ধরে—মানুষের মতো নোজা হয়ে, জলের ওপর নাক ভাসিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।’

‘খুবই তাজ্জব বলতে হবে তা হলে।’ প্রথম চাষীটি একটু হাঁ করে চেয়ে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল: ‘আপনি এত সব জানলেন কাঁ করে?’

‘খুলনা জেলার লোক না আমি?’—এইবারে লোকটি বিষণ্ণ হল একটু: ‘চোখেই তো দেখা এ-সব। কিন্তু পাকিস্তান হয়েই—’ একটা ছোট নিখাস পড়ল: ‘চারদিকে বানের কথা বলছিলে না তোমরা? তাই শুয়ারগুলোকে মনে পড়ছিল আমার।’

বান-বান-বান। গ্রাম ডুবছে, শহর ডুবছে, মানুষ ডুবছে, ফসল ডুবছে। ঘেন রসাতলে যেতে বসেছে গোটা দেশটাই। সেই যন্ত্রণা আর হুঁতাবনা সব কাঁটি মুখেই ছড়িয়ে পড়ল এখন, বেলা এগারোটার সময়েও—রাধাচূড়োর হালকা ছায়াটার তলায় ঘেন একটুকরো বিষণ্ণ অঙ্ককার নামল।

মনে হল, গোটা তিনেক নিখাস পড়ল একসঙ্গে। চূপ করে কাটল কয়েক সেকেন্ড। যে চাষীটি তখন থেকে বিড়িটা হাতে নিয়ে বসেছিল, সে এবার সেটা এগিয়ে দিলে লোকটির দিকে। আমি দূরের চোখ-ধাধানো ফরোগেটেড্ টিনের চালটার দিকে তাকিয়ে থেকেও দেশলাইয়ের আওয়াজ পেলুম, বুঝতে পারলুম ওরা তিনজনেই তিনটে বিড়ি ধরিয়েছে।

আমাকে ওরা চোখ দিয়ে দেখেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু মন দিয়ে কেউ দেখছিল না। ওরা দূরের হৃন্দরবনে ছিল, নোনা গাঙের দেশে ছিল, ওরা গহীন গাঙে সাঁতার কাটতে দেখেছিল বুনো শুয়ারকে, কড়মড় করে এই বড়ো বড়ো কাঁকড়া খেতে দেখেছিল। আমি সেখানে কেউ নই। ও-সব আমার দেখবার কথা নয়।

একটু সময় কেটে গিয়েছিল, তবু ওদের একজন মনে করে আগের কথারই জের টানল। এই সব সাধারণ মানুষের ঘেমন করে বলা উচিত, তেমনি বোকা-বোকা

ভঙ্গিতে বললে, 'তা বটে, শুয়োরের কথা মনে পড়ে যায় বইকি। মাহুষ যদি শুয়োর হত, তা হলে অমন করে বানের তোড়ে তলিয়ে যেত না, নাক উঁচু করে সাঁতরাতে সাঁতরাতে যেখানে হোক পাড়ি দিত।'

'কিংবা'—যে লোকটাকে দেখলে গা-টা একটু শিউরে শিউরে ওঠে, সাধারণ গৈয়ো মাহুষের কেমন যেন ভক্তি করতে ইচ্ছে যায়, কথা বলতে বলতে যার বাঁ চোখটা কুঁচকে যায় বার বার, একটু মোটা আর ভাঙা যার গলার আওয়াজ, সেই খুলনা জেলার মাহুষটা আবার বললে, 'কিংবা হাতের কাছে দু'চারটে বুনো শুয়োর পেলে বেঁচেও যেত কেউ কেউ।'

'বুনো শুয়োর পেলে? সে আবার কি রকম কথা?'

সে আবার কি রকম কথা—আমিও এটা জিজ্ঞেস করতে পারতুম। কারণ—এই সেদিন—উত্তর বাংলাব বস্তার সময় আমিও তো ছিলাম এক বন্ধুর বাড়িতে। শেষ রাতে জল এল, হুড়মুড় করে তলিয়ে গেল টিনের ঘর—কে যে কোথায় উধাও হল, আমি জানিও না। লাফিয়ে বেরিয়ে একটা গাছে উঠে পড়েছিলাম, জল নেমে গেলে এক কোমর পলি আর আতঙ্কে জমাট মৃত্যুর জগৎ ঠেলে উর্ব্ব্বাসে পালিয়েছি। বন্ধু, তার স্বা—তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খবর নেবার সময় ছিল না, উপায়ও ছিল না। দিন সাতেক পরে—অনেক কষ্টে নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যাকে সামনে পেয়েছি—অনেক রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়েছি তাকে। আমি যদি একটা বুনো শুয়োর হতুম—এর বেশি কী আর করতে পারতুম আমি!

লোকগুলোর আলাপ-আলোচনায় আমার কেমন একটা অস্বস্তি হল, একবার ভাবলুম, আমার পকেটে 'ফ্লেশ-লাভার্স' বলে যে পেপারব্যাঁকটা আছে, সেটা বরং পড়ি—ট্রেনের তো এখনো চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তবু ওদের কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল, আমি ঠিক শুনতে চাইলুম না—তবু শুনে যেতে লাগলুম—করোগেটেড টিনের চালটা চোখের সামনে ঝকঝক করে চলল।

তারপর সেই লোকটার গলা আরো গভীর হতে থাকল, স্বৃতির ভেতরে ডুবে গিয়ে মাহুষ যেমন করে কথা বলে—কখনো স্বপ্ন দেখে, কখনো জাগে, কখনো বাইরেটাকে আবছা করে দেখে—কখনো দেখে না, তেমনি স্পষ্ট অথচ ছায়া ছায়া ভঙ্গীতে ভাঙা মোটা আওয়াজে সে কথা কইতে লাগল। এখন তার স্বরে জোয়ারে ফেঁপে ওঠা রায়মঙ্গল নদী গম গম করতে লাগল, নোনা সমুদ্রের হাওয়ায় সুনন্দী-হেঁতাল-গোলপাতার মর্মর উঠতে লাগল। আমি এতক্ষণ কোথাও ছিলাম না—এবার ওই লোকদুটো, রেলের লাইন, রোদ-ঝলসানো টিনের চাল, রাধাচূড়োর ছায়া—সব

মিলিয়ে গেল। চারদিকের অন্ধকারের ভেতর শুধু স্মৃতি জড়ানো একটা স্বর জেগে  
রইল কুয়াশামাখা আলোর বৃত্তের মতো।

‘দেশ-ঘর যখন গেল, তখন বউ আর দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি শেয়ালদা  
স্টেশনে। তারপর ক্যাম্প। তারও পরে? বউটা মরল কলেরায়, ছেলেটা  
ভিক্টোর দলে মিশল। মেয়েটা একটু বড়ো হয়েছিল—সেটা যে কোন্ চুলোয় গিয়ে  
পৌঁছল বোধ করি ভগবানও তা জানে না।

তা ভাই ছাড়াই দাঁও এ-সব কথা, এগুলো শুনে শুনে তো তোমাদের কান পচে  
গছে। মোক্ষা—বছর না ঘুরতেই আমি হাত-পা বেড়ে সাফসফ হয়ে গেলুম।  
তখন যেখানে যাই—যেখাই থাকি, আমার কিসের ভাবনা! ঘুরতে ঘুরতে চলে  
এলুম বাংলা দেশের আর এক মল্লকে।

কী না করেছি বছর দুই ধরে। সরকার থেকে লোন দিয়েছিল, ব্যবসা করতে  
গেলুম—ছ’ মাসও টিকল না। জাত চাষীর ছেলে, সাত জন্মে করেছি ও-সব, না  
বুঝি কিছু!

আসামের দিকে দল বেঁধে গিয়েছিলুম একবার—পাহাড়ের ঢালে বাস্তু বেঁধে  
জমিতে চাষ দিয়েছিলুম—বলব কী ভাই সোনা ফলেছিল; কিন্তু থাকতে দিলে  
না। প্রথমে এল সরকারী নোটিশ, কিন্তু বন-বাদাড় কেটে এত কষ্টে ফসল করেছি—  
ছেড়ে যাব? তাতে দিলে হাতি লেলিয়ে। ঘরদোর ভেঙে, আমাদের বৃকের  
পাঁজরার সঙ্গে ফসল দলে-পিশে উৎখাত করে দিলে—হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিলে  
এরা পাকিস্তানের চেয়েও সরেস।

ও-সব কথা থাক দাদা—আমাদের ছোট মুখে মানায় না। কাঁদতে কাঁদতে কে  
যে কোন্ দিকে ছটকে পড়ল বলতে পারিনে, আমি আসাম ছাড়িয়ে আবার বাংলা  
দেশে এলুম।

পৌঁছেছিলুম একটা ছোট শহরে। জনমজুর খাটলুম কিছুদিন, কিন্তু চাষীর  
রক্ত যাবে কোথায়। কারো কাঁধে লাঙ্গল দেখলে, হাওয়ান ধানের শীষ ছলতে দেখলে,  
এক পশলা বৃষ্টির পর কটা লাউ-কুমড়া-পালঙের পাতা সবুজ হয়ে লকলক করতে  
দেখলে যেন কান্না উছলে উঠত বৃকের ভেতর।

সরকার থেকে তখন লোক পাঠাচ্ছিল আন্দামানে, জমি-টমি দেবে। কিন্তু সেই  
হাতির পর থেকেই আমার ভয় ধরেছিল, দাঙ্গা। সে তো কালাপানির দেশ—  
সেখানে আবার কী লেলিয়ে দেবে কে জানে। আমার আর কী আছে, মরি তো  
এই বাংলা দেশেই মরব।

চাষীর ছেলে—একটুখানি জমি চাই আমার। এক বিঘে না হয় দশ কাঠা, দশ কাঠা না জুটলে পাচ কাঠা। কিন্তু কে দেবে জমি—কোথায় জমি! এ তো আমাদের দেশ নয় যে বন কেটে আবাদ করব, বাঘ-কুমির-সাপ তাড়িয়ে মাটির দখল নেব।

তবু আবার জমি পেলুম।

শহরের বাইরে এক পাহাড়ী নদী। যত বড়ো নদী, চড়া তার চাইতেও বেশি। এই চড়া বোধ হয় সরকারী সম্পত্তি—কিন্তু তাতে এখন কাশ, শন আর ইকুড়ার জঙ্গল। আগে বর্ষায় চড়াটা তলিয়ে যেত, কিন্তু দশ-বারো বছর ধরে তার খানিক জায়গা অনেকেটা উঁচু হয়ে গেছে, আর ডোবে না—সেখানে ঘাস-পাতা পচে-বেশ জমি তৈরি হয়ে গেছে।

মানুষজন কেউ থাকে না—কার গরজ পড়েছে ওখানে থাকতে। নদীর খেয়া পেরিয়ে রাত-বিরেতে যারা চর পেরিয়ে আসে, তারা হাওয়ার ঘাসবনের শাঁই শাঁই শব্দ শুনে মনে মনে রাম নাম জপে। তা ছাড়া ভয় দেখাবার জন্য দুটো-চারটে আলোয়া তো আছেই।

বিশেষ করবে কিনা জানি না, জমির খিদে আমি আর সহিতে পারছিলুম না, কিছুতেই থামতে চাইছিল না বৃকের কান্না। একটা ধানের ছড়া দেখলে, দুটো শাকের পাতা দেখলে যেন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার।

শেষকালে খ্যাপার মতো আমি ওই চরে গিয়ে উঠলুম। হাতে যে দু-চারটে টাকা ছিল, তাই দিয়ে দা কিনলুম, কোদাল কিনলুম, খুঁটিনাটি আরো কিছু কিনলুম। আমার জমি আমিই গড়ব।

একাই? একাই। আমার আর কে আছে—তা ছাড়া আর কেই বা আমার সঙ্গে যাবে ওই ভুতুড়ে চড়ায় জমি গড়তে? কোন্ ফসলটাই বা ফলবে ওখানে? বালি জমি, ধান-পাট কীই বা হবে?

কিন্তু কিছু না হোক, ক'টা শাক তো তুলতে পারব। পটোল হবে নিশ্চয় দু-চারটে, ফুটি-তরমুজও কি ফলাতে পারব না?

আরো দশ ঘর উদ্বাস্তর সঙ্গে আমারও একটা হোগলার কাঁপ ছিল শহরের এক টেরয়ে। সেটা তুলে নিলুম।

সবাই অবাক হয়ে বললে, “কোথায় চললে?”

“নদীর চড়ায়।”

“সেখানে কী?”

“জমি গড়ব।”

“মাথা খারাপ? কী জমি হবে ওই কাশ আর শনের জঙ্গলে?”

“জানিনে। চেষ্টা করে দেখব।”

ঠাট্টা করে কী বিশ্বাস করে বলতে পারি নে, একজন বললে, “ওই চড়ায় পেত্নী আছে।”

বললুম, “দেশ ছাড়বার পরে মরে তো ভূত হয়ে আছি, পেত্নীতে আমার কী করবে?”

মরুক গে—সব কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যায়। আমি একাই বাস্তু বাঁধলুম নদীর চড়ায়। বয়েস অল্প ছিল, কব্জিতে জোর ছিল, মাথার ভেতরে খ্যাপামি ধরে গিয়েছিল। লেগে গেলুম জঙ্গল কাটতে। গোটা কতক সাপ-খোপ মেরে শেষতক বিঘেটাক জমি সাফ হয়ে গেল।

তোমরাও তো চাষী, জানোই তো ভাই—মাটিতে মন থাকলে মাটি তোমায় কক্ষনো ঠকায় না। কিছু সে তোমায় দেবেই। শাক-সজ্জী হল, পটোল হল, ফুটি ধরল। তখন দিনের বেলা যারা চেয়েও দেখত না, আর রাত-বিরেতে চড়া পেয়িয়ে যাওয়ার সময় রামনাম করত, তারাই দু-একজন করে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

“বাঃ, বেশ পটোল হয়েছে তো তোমার।”

“এ মাটিতেও তো শাক-টাক হয় দেখছি।”

এক-আধজন বলত : “এই চড়ায় একলাটি থাকো, তোমার ভয় করে না?”

“কিসের ভয়?”

“মানে—জন-মনিষ্টি নেই, তেনাদের যাওয়া আসা আছে—”

বলতুম, “তেনাদের তো কখনো দেখিনি। যদি আসেনই, আলাপ করে নেব।”

“তোমার সাহস আছে—বলতে হবে সে-কথা।”

“হঁ। এখানে—এমন একলাটি থাকা—”

শুধু একজন একবার বলেছিল, “পাহাড়ে নদীর চড়ায় ঘর বাঁধলে হে?” সব নদীকে বিশ্বাস করতে নেই। ইচ্ছে মতো খাত বদলায়—একদিন এসে আবার কাঁপিয়ে পড়বে হয়তো।”

“বারো বছর যদি কাঁপিয়ে না পড়ে থাকে, আর পড়বে না।”

নদীকে আমার ভয় ছিল না, কিন্তু সত্যি বলতে কি—প্রথম প্রথম রাতিরগুলোকে ভেতন ইয়ে লাগত না। অঙ্ককার থাকলে চারদিকটা কেমন থমথম করত, বাতাসে

কাশ-শন-ইকড়ার শৌ-শৌ আওয়াজে কেমন ভূতুড়ে কান্না শোনা যেত একটা। অনেক দূরে একটা শ্মশানঘাটা—তার চিতার আশুণ দেখা যেত—আরো খারাপ লাগত তখন। অদ্ভুত আওয়াজ করে এক-আধটা পোকা ডাকত, অমন শব্দ এর আগে আর কখনো শুনিনি। যেদিন চাঁদ উঠত—সেদিন কেমন সাদা সাদা মরা আলোয় ভরে যেত সবটা, মনে হত সমস্ত চড়াটা জুড়ে চিতার ধোঁয়ার মতো কী যেন জমাট হয়ে আছে, বাতুড়ের ডানার আওয়াজ শুনলে পর্যন্ত কেমন একটা কাঁপুনি জেগে উঠত বৃকের ভেতরে।

কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেল। তারপর এমন হল যে আঁধার রাতে এই চড়ায় আমি একলা মাহুষ বসে আছি—এইটে ভাবতেই ভালো লাগত আমার। ভাবতুম—আমি সব পারি—সব বন-বাদাড় কেটে এই ভূতুড়ে চড়ায় সমস্ত জমি উদ্ধার করে আনতে পারি—ফসলে ফসলে ভরে দিতে পারি। এ চর কারো নয়, কেউ এর মালিক নয়—আমি একে দখল করেছি, এ আমার, শুধুই আমার।

তখন চাঁদের আলোরও রঙ বদলাতে লাগল। চিতার ধোঁয়া নয়—জ্যোছ'না রাত্তিরে যেন দুধের বান ডেকে যেত। আমি দেখতে পেতুম, সেই আলোয় আমার ফসলগুলো স্বাসে আর স্বাদে ভরে উঠছে—টিপ টিপ করে ঝরা শিশিরে আরো পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠছে ক'টা বেগুন, ক'টি ছাঁচিকুমড়ো। আর তখন আমার মনে হত—এখন যদি বউ থাকত, আমার ক'টা ছেলেমেয়ে থাকত—

এমনি একটা জ্যোছ'নার সন্ধ্যায়, আমার একলা ঘরের দাঁওয়ায় বসে এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি একদিন ভয়ানক চমকে উঠলুম।

একটু দূরেই ছায়া কেলে গোল মতো কী একটা দাঁড়িয়ে।

বাহুর ?

আরে দূর—এখানে কার বাহুর আসতে যাবে? তা ছাড়া অমন চেহারার তার হতে যাবে কোন্‌ দুঃখে? এ অনেক মোটা, গোল, বেঁটে বেঁটে পা, ঝাড়ে-গর্দানে ঠাসা, গায়ে খাড়া খাড়া বড়ো লোম, মুখের ডগাটা ছুঁচোলো, আর তার ওপরে গুলটানো নখের মতো বাঁকা দাঁত একটা। দেখেই বুক চমকে গেল, প্রকাণ্ড একটা মদ্য বুনো শুয়ার।

অ্যান্ডিন আছি এখানে—দেড়-দু বছর হয়ে গেল, এ মকেলকে তো এর আগে কখনো দেখিনি। গোটা চড়াটাই আমি ঘুরেছি, বন-বাদাড় ঠেঙিয়েছি, শন কেটে এনে ঘরে ছাউনি দিয়েছি—দু-চারটে খরগোস ছাড়া আর তো কিছু চোখে পড়েনি এর আগে। সাপ অবিশ্রি আছে, তা যে তল্লাটের মাহুষ আমি—সাপ নিয়ে তো

নিতি ঘর করতুম। এ হতচ্ছাড়া তো এখানে আগে ছিল না—থাকলে নিশ্চয় দেখা হয়ে যেত অনেক আগেই।

এল কোথেকে ?

কিন্তু সে ভাবনা পরে। এখন তো বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। মন্দা দাঁতাল শুয়োর—জানোই তো কী বজ্জাত জানোয়ার। আচমকা মুখোমুখি হয়ে গেল তো আর কথা নেই—সোজা তেড়ে এসে নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। আমার এক পিসেমশাইকে শুয়োরে মেরেছিল—সে কথা মনে হলে এখনো গায়ের ভেতরে আমার বাঁকুনি দিয়ে ওঠে।

বেশ ছিলুম একলা চড়ায়—রাজ্জার হালে। কোথেকে এই আপদটা এসে জুটল হে ?

ঘরে একটা সাপমারা বল্লম ছিল। ভাবলুম, এনে তাক করে দিই ছুড়ে। তার পরেই মনে হল, যদি ফসকায় ? প্রায় হাতির ছানার মতো চেহারা—তার ওপর যা বদখচ মেজাজ। একেবারে ঘর স্ফুই উড়িয়ে দেবে আমাকে।

আমি যেখানে ছিলুম সেইখানেই রইলুম ঠায় বসে, আর শুয়োরটাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার দিকে চেয়ে রইল। নড়া-চড়া কিছু নেই, যেন কাঠের পুতুল।

আমি দেখতে লাগলুম জ্যোছ'নায় ওর ক্ষুদে চোখ দুটো মিটমিট করে জ্বলছে—একটা গোলমতন ছায়া জমে আছে ওর পায়ের কাছে, আর আমার দিকে তাকিয়ে ও যে কী দেখছিল সে ওই-ই বলতে পারে।

একটু পরে ফোস করে গোটা হুই খাস ছাড়ল, ঘোঁৎ করে যেন আওয়াজও তুলল একটু, তারপর আন্তে আন্তে খুট খুট করে বেরিয়ে গেল ঘরের সামনে থেকে। আমি দেখতে পেলুম, একটু এগিয়ে ঢুকে গেল ঘাস বনের ভেতরে।

আপদ এখন তো গেল, কিন্তু গোটা রাস্তির আমি ঘুমতে পারলুম না। এ তো মহা জ্বালা হল দেখছি। আর তো আমি ইচ্ছেমতো এদিক-ওদিক ঘুরতে পারব না—বলতে পারব না, আমি এখানকার মালিক, এই চর আমার রাজত্ব। এ ব্যাটাচ্ছেলে কোন্‌খানে ঘাপটি মেরে থাকবে—কখন কে জানে এর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে—তারপর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাড়া লাগাবে—যাকে বলে শুয়োরের গৌঁ। ঘাস-কাশের বন আর এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে আমি দৌড়েও পালাতে পারব না—ওই দাঁত দিয়ে একেবারে ফালা-ফালা করে ফেলবে আমাকে।

কোথেকে এসেছে এ-কথা ভেবে লাভ নেই। কোন্‌ দূরের জ্বল থেকে পথ

তুলে কিংবা তাড়া খেয়ে এই চড়ায় এসে নেমেছে সে ওই মক্কেলই বলতে পারে। কিংবা কে যে কোথা থেকে কোথায় যায়—ভগবানেরও কি জানা আছে সে খবর? আমিও কি জানতুম, স্তম্ভরবন, অথই গাও আর মেঘবরণ ধানের দেশ থেকে শ্রোতের কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে আমি এই চরে এসে ঠেকব? আমি কি জানতুম এমন সন্ধ্যাও আমার আসবে যখন গাঁয়ের বিশালাক্ষীর মন্দির থেকে ঘটার শব্দ উঠবে না, নিমগাছের ছায়া কাঁপবে না আমাদের উঠোনে, হাওয়ায় উঠবে না বুনো ফুল-গাছগাছালির সঙ্গে ফুটন্ত ভাত কিংবা তপ্ত খেজুব গুড়ের পাকে চিড়ের গন্ধ, শোনা যাবে না কীর্তনের গান? আমিও কি ভেবেছিলুম, আমার একলা সন্ধ্যায় কেবল ঘাসবনে শন শন করবে হাওয়া, কেবল অদ্ভুত আওয়াজ তুলে পোকা আর ঝিঁঝি ডাকবে আর অনেক দূরের জলন্ত চিতা থেকে কয়েকটা আগুনের পিও লাফাতে লাফাতে এসে আলেয়া হয়ে দপদপ করবে এখানে-ওখানে?

তাহলে ওর দশা আমারই মতো। ওরও আলাদা জঙ্গল ছিল, চেনা মাটি ছিল, বুনো গুল ছিল। হয়তো বা স্তায়োরদেরও দেশ আলাদা হয়ে গেছে, তাড়া খেয়েছে লেখান থেকে। ও ব্যাটাচ্ছেলেও আমারই দলের—বাস্তহার।

বাস্তহার। কথাটা মনে হতে একটু হাসি পেলো, কিন্তু বেশিক্ষণ হাসিটা থাকল না। বাস্তহার। হোক আর নাই হোক—আদতে তো বুনো স্তায়োর। মাছঘের শত্রু। যখন নিজের তালে আছে, বেশ আছে। কিন্তু যা মেজাজী জানোয়ার, একবার যদি ক্ষেপল তো—

পরদিন থেকে যা হোক একটা দা কিংবা বল্লম সব সময় রাখতুম হাতের কাছে। চলন্তে-ফিরতে বার বার নজর রাখতে হত চারপাশে। আর বলব কি হে—দেখাও হয়ে যেত স্তায়োরটার সঙ্গে।

কিন্তু দেখা হলেই দাঁড়িয়ে যেত ওটা। দিনের বেলায় দেখেছিলুম—রাতে যা ছেবেছি, জানোয়ারটা তার চেয়েও বড়ো। গা ভর্তি কাঁটার মতন রোঁয়া—মস্ত দাঁতটা চকচক করছে শাদা, এখানে-ওখানে কাদার চাপড়া লাগানো ইয়া পেলায় শরীর। তেড়ে এলে মা বলতেও নেই বাপ বলতেও নেই। কিন্তু যেই মুখোমুখি হল কিংবা আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো বৌ করে—অমনি ঠায় দাঁড়িয়ে গেল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। নড়া-চড়া নেই—কিছুই না—খানিকটা কেবল মিটমিট করে চেয়ে রইল, তারপর যেন কিছুই হয়নি—এমনি করে গা ছুলিয়ে তুর তুর করে কোন্‌দিকে চলে গেল।

অনেকবার ভেবেছি তুলি বল্লম—ধাঁ করে মেরে দিই, কিন্তু কিছুতেই হাত



উঠত না। কেবল মনে হত—ও যখন আমায় কিছু বলে না, তখন খামোকা গুকে আমি মারতে চাই কেন !

দিনের বেলা আমার ঘর-দোরের দিকে গুকে কখনো আসতে দেখিনি। আমি ভেবেছিলুম, এই এল শুয়োর—আমার ক্ষেত-টেত খুঁড়ে কিছু আর রাখবে না—যে কটা ফুটি হয়েছে খেয়ে একেবারে শেষ করে দেবে।

তা গোড়ার দিকে এক-আধটু খোঁড়াখুঁড়িও করেছিল বইকি, শুয়োরের স্বভাব যাবে কোথায়। একদিন বেশি রাত্তিরে আওয়াজ শুনে বেরিয়ে দেখি—ওই কাণ্ড ! কী মনে হল, হাঁক পেড়ে বললুম, “এই মজ্জেল, কী হচ্ছে ওটা ?” হুড় হুড় করে ছুটে পালালো, তারপর থেকে আর ও-সব করতে দেখিনি।

হতে পারে—দাঁতাল হলেও শুয়োরটা ভীতু, ভালো মেজাজ, হাঙ্গামা-হুজুং পছন্দ করে না। মাঝে মাঝে কত রকমের হয়, জানোয়ারেরই কি রকমের হতে পারে না ? তবু আমার মনে হতে লাগল ওটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেছে। এই নির্জন ভূতুড়ে চড়ায় ও-ও একা, আমিও একা। আমারও এক এক সময় বুকের ভেতরে হু হু কবে—মনে হয়, সব ছিল, ঘর ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল ; তখন নিজের এই রাজত্ব—এই ক্ষেতটুকু—এই জমি গড়বার স্বথ—সব ফাঁকা হয়ে যায়, মনে হয়—আমার কিছুই দরকার নেই, কিছুই না। তেমনি ওই শুয়োরটাও একা—ওরও চেনা জঙ্গলটা কোথায় হারিয়ে গেছে, ওরও আপনার জন ছিল তারা কেউ নেই—কোথাও নেই। আমি যখন ফাঁকা মন নিয়ে কোনো অন্ধকার রাতে—কোনো জ্যোছনার ভেতরে দাঁওয়ার ওপর চূপ করে বসে থাকি—তখন অন্ধকারটা এক জায়গায় আর একটু ঘন হয়, জ্যোছনায় কখনো একটা ছায়া পড়ে—ওই শুয়োরটা এসে দাঁড়ায়। তখন ওরও একা লাগে—ও-ও সঙ্গ খোঁজে। আলোয় হোক আর আঁধারে হোক—ওর চোখ দুটো চিকচিক করে জ্বলে। ও এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—আমি ওর দিকে চেয়ে থাকি। তারপর ফাঁস করে যেন একটা নিখাস ফেলে, ধোঁং করে একটু আওয়াজ হয়। কী একটা বুকে নিয়ে ভারী শরীরটাকে একটু একটু দোলাতে দোলাতে আবার চলে যায় ঘাসবনের ভেতর।

তোমাদের অবাঁক লাগবে শুনলে, এর পর থেকে আমার আর ওটাকে ভয় লাগত না। কতদিন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে আমার প্রায় গা বেঁধে চলে গেছে, কতবার দেখেছি কোথায় একটু কাঁদা জল জমেছে—খুঁশি হয়ে গড়াগড়ি করছে তার ভেতরে, কোনোদিন দেখেছি মাটি খুঁড়ছে নিজের মনে। আর রাত হলে, যখন চরের ওপর

কেবল শাঁই শাঁই করছে হাওয়া, যখন দূরের শ্মশানে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে চিতার আশুনা—এমন কি মড়া-পোড়ার গন্ধও ভেসে আসছে এক-আধটু, আর আমি ফাঁকা মন নিয়ে—বুকের ভেতরে একটা কান্না নিয়ে বসে আছি, তখন ও এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে, যেন বলতে চাইছে নিজের কথা, যেন সাধুনা দিতে চাইছে।

শেষে এমন হল, শুনলে হাসি পাবে তোমাদের, দু-একদিন ওটাকে দেখতে না পেলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। আমি চমকে উঠে ভাবতুম—যেমন নিজের খেলালে এসেছিল তেমনি করেই চলে গেল নাকি আবার? আর ভাবলেই আমার ভয় করত। যতদিন একা ছিলাম—বেশ ছিলাম। কিন্তু ওটা আসবার পরে কখন যেন হুজুন হয়ে গেছি। ও আমাকে বুঝতে পারে, আমি ওকে বুঝতে পারি। তখন বেরোতুম খুঁজতে। হয়তো দেখতুম, অনেক দূরে, অনেকখানি জঙ্গলের ভেতরে কোথাও খানিক জল কাদার ভেতরে হাত-পা মেলে শুয়ে আছে। তোমরা বলবে, আমাকে পাগলে পেয়েছিল। আমিও কি তা ভাবিনি? কিন্তু সেই চড়ায় সব অল্প রকম হয়ে গিয়েছিল, একটা আলাদা মন হয়ে গিয়েছিল আমার—আমিও একটা আলাদা জীব হয়ে গিয়েছিলাম যেন।

জিজ্ঞেস করতুম, ‘আসিস নি কেন?’

যৌৎ করে একটা আওয়াজ তুলে ছুটে পালাতো। যেন লজ্জা পেতো মনে হয়। বলবে, আমার এ-সব মনগড়া। যাকে বলে বুনো শুয়ার, বোকা, গৌয়ার, কচু-কন্দ খুঁজে বেড়ায়, যখন-তখন যাকে ইচ্ছে তাড়া করে—তার বয়ে গেছে তোমার মনের কথা বুঝতে। নিশ্চয়—নিশ্চয়, সব মানি। তবু দেখতুম, সেই রাত্তিরে কিংবা পনের রাত্তিরেই ওটা এসেছে। আমার দাওয়ার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছোট চোখ দুটো চিকচিক করছে জোনাকির মতো। কিছুক্ষণ থাকত ওইভাবে—যা হোক একটা কিছু বুঝে নিত—তারপর আবার আশ্বে আশ্বে চলে যেতো নিজের মনে।

শহরের বাজারে তরকারী বেচতে আমি নিজে নিজে যেতুম না, অল্প লোক এসে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যেত পাইকারি দরে। তারা আসত হুগুয়ার দু’চারদিন, তা ছাড়া একটু দূর দিয়ে খেয়ার লোকজনের যাওয়া-আসা তো ছিলই। তাদেরই কারো চোখে পড়ে থাকবে। একদিন হঠাৎ দেখি, শহর থেকে শোলার টুপি আর হাকপ্যাট পরে, কাঁধে বন্দুক নিয়ে দু-তিনজন ভদ্রলোক এসে হাজির।

প্রথমটা ভেবেছিলাম—চরের ওদিকটায় এ-সময়ে দু-চারটে চখাচখি পড়ে, তাই মারতে এসেছে। কিন্তু চলে এল আমার ঘরের দিকেই।

“তুমি এখানে থাকো ?”

“আজ্ঞে ।”

“এ-সব তরি-তরকারি তোমার ?”

“আজ্ঞে ।”

“এ তো খাসমহল জমি । পত্তনি নিয়েছ ?”

“আজ্ঞে না ।”

“বে-আইনি । একদন বে-আইনি ।”

কে জানে, কাকে বলে আইন, কাকে বলে বে-আইন ! এই ভূতুড়ে চড়ায় নরকারের নজর তো কোনোকালে ছিল না—আমিই এখানে একা হাতে মাটি গড়েছি, ফসল ফলিয়েছি । কিন্তু আইন বে-আইনের ভাবনা আমি আর ভাবতে পারি না । যেদিন হাতি এনে আসামের পাহাড়ে ফসলের সঙ্গে আমাদের বৃকের পাজর অবধি দলে দেওয়া হয়েছিল, সেদিন থেকে ও-সব ভাবনা আমি ছেড়ে দিয়েছি ।

বাবুদের একজন ফস করে একটা সিগারেট জ্বালেন । বললেন, “যাক্, সে-সব পরে হবে । এই চড়ায় বুনো শুয়ার আছে, তাই নয় ?”

ধক্ করে উঠল আমার বৃকের ভেতরটায় । আমি তিনটে বন্দুকের দিকে তাকালুম ।

“কে বললে আপনাদের ?”

“আমরা খবর পেয়েছি ।”

তোমরা শুনলে রাগ করবে কিনা জানিনে, আমি দেখেছি, হারামীর দিকে জানোয়ারের চেয়ে মানুষেরই টাঁক বেশী । তক্ষুনি মনে হল, বলি : “যান ওদিক পানে—কাদার মধ্যে বসে আছে দেখেছি একটু আগে, দিন সাবড়ে ।” আর তক্ষুনি কে যেন কানে কানে বললে, “ছি ছি হে, তুমি শুয়ারের চাইতেও ছোটলোক হয়ে গেলে । ও তোমায় বিশ্বাস করে, তার এই প্রতিদান ।”

বললুম, “বাজে কথা । আড়াই বছর ধরে আমি আছি এখানে । চরের জঙ্গল ভেঙে চলাফেরা করি । কোনো শুয়ার কখনো আমার চোখে পড়েনি ।”

“কিন্তু একজন যে বললে—”

“ভুল বলেছে । শেয়াল-টেয়াল দেখে থাকবে হয়তো ।”

“তুমি ঠিক জানো ?”

“আজ্ঞে এই চড়ার আমি বাসিন্দে। আমি জানিনে তো অল্প লোকে জানবে?”  
বাবুরা এ গু-র মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম, “তা খরগোস-টরগোস আছে ছু-চারটে। খুঁজে দেখতে পারেন।”

“দূর, খরগোস অযাত্রা। আর সেগুলো খুঁজে কে সময় নষ্ট করবে—কেই বা।  
টোটা খরচ করতে যাবে?”

বাবুদের দুঃখ হয়েছে মনে হল : “বাজে লোকের কাছে উড়ো খবর শুনে হাঁটা-  
হাঁটিই সার হল। চলো হে।”

• শুয়োরটা সে রাতে এলো না, এল পরের রাতে। বললুম, “তোকে বাঁচিয়েছি,  
বুঝলি? তিনটে বন্দুক ছিল—কিছু করতে পারতিস না।”

নিসাড়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বললুম, “এবার ক’টা কচু লাগাব ঠিক করেছি। খুঁড়ে-মুড়ে ধেন বরবাদ করে  
দিসনি। তাহলে ঠিক বলে দেব বাবুদের।”

তেমনি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আন্তে আন্তে চলে গেল।

দিন কাটছিল, এইভাবে কতদিন কাটত জানি না। কিন্তু সেই সকালে সরকারী  
শেয়াদা এসে আমাকে নোটিশ দিয়ে গেল। কেন আমি খাসমহলের জমি জবর-দখল  
করেছি, কেন আইন-মোতাবেক পত্তনি নিইনি, হজুরে হাজির হয়ে আমায় তার  
কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সেই যে তিনবাবু এসেছিল, তারাই কেউ ফিরে গিয়ে এই  
উপকারটা করেছে আমার।

নোটিশ নিয়ে আমি চূপ করে বসে রইলুম ঘরের দাওয়ায়। আগের দিন থেকেই  
টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছিল, আজ আকাশ আরো ঘোলাটে, আরো অন্ধকার। ওদিকে  
নদীতে জল বাড়ছে, গৌঁ গৌঁ করে উঠছে তার ডাক। ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে থেকে  
থেকে—চারদিকের ঘাসবনে ঢেউ উঠছে।

জল আসছে নদীতে। চরের খানিকটা ডুবে যাবে। কিন্তু আমি যেখানে আছি  
সেটা ডুবে না—আজ চোদ্দ বছর ধরেও ডোবেনি। নদীর ভাবনা নেই, আমি  
মাছঘের কথা ভাবছিলাম। এমনি একটা মেঘলা দিনেই যখন ধানের ক্ষেতে বাতাস  
ঢেউ দিয়েছিল, সেইদিনই ওরা হাতি এনে—

• পত্তনি নিতে হবে, খাজনা দিতে হবে? কত চাইবে কে জানে? নাকি  
উচ্ছেদই করে দেবে? ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখলুম বৃষ্টিতে ভিজ্জে চিকচিক করছে  
পটৌলগুলো—হাওয়ার মাতন লেগেছে চলচলে লাউয়ের পাতায়। চোখ জ্বালা

করতে লাগল। সারাদিন কিছুটা খেতে ইচ্ছে করল না আমার—ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে চূপ করে শুয়ে রইলুম।

শুয়ারটার ভাগ্যি ভালো আমার চাইতে। ওকে খাজনা দিতে হয় না, পঁতনি নিতে হয় না, ওর উচ্ছেদের ভয় নেই। ভয় নেই? আমি যখন থাকব না—তখন ওরও তো পালা মিটে যাবে। তখন আবার তিনটে বন্দুক আসবে, হয়তো লোকজন নিয়ে ঘেরাও করবে জঙ্গল—তারপর একটা মস্ত দাঁতাল শুয়ার মারবার আনন্দে বাবুরা—

সব বিস্মী লাগছিল, সব ফাঁকা ঠেকছিল, অনেকদিন পরে বৌ আর ছেলেমেয়ের জন্তে আমার কান্না আসছিল। হাওয়া-বৃষ্টি-দুর্ঘোগের ভেতরে সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে যে কিভাবে কেটে গেল জানি না। তারপর রাতে ঘুমে এল, আর তারো পরে—

জেগে উঠলুম বানের ডাকে। ঝড়-বৃষ্টির প্রায় মহাপ্রলয় তখন। কিন্তু কিছু আর ভাববার সময় ছিল না। চর ভাসিয়ে ছুটে এল পাহাড়ী নদী—মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ঘর, আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছিলুম—এক ঝটকায় আমাকে কুটোর মতো তলিয়ে নিয়ে চলল।

ডুবতে ডুবতেও টের পেলুম আমার কাছেই কেমন একটা ধোঁং ধোঁং আওয়াজ। তা হলে দুজনেই ভেসেছি—দুজনেই আবার একসঙ্গেই বাস্তুহারা। কী করে কী হল জানি না—আমি দু-হাতে শুয়ারটাকে জাপটে ধরে মাথা জাগিয়ে তুললুম। আর সেই প্রকাণ্ড জানোয়ারটা—যার স্বজাতেরা স্তম্ভরবনের গহীন গাও পেরিয়ে চলে যায়—যারা সমুদ্রের মতো রান্ধুসে নদীকে ভয় পায় না—বাঘ-হরিণ পৌছবার আগে যারা নতুন জাগা চরে গিয়ে বাস্তু বাঁধে, সে আমাকে টানতে টানতে—জলের ওপর নাক তুলে সাঁতার কাটতে কাটতে সেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল।

আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্তে ক্ষ্যাপা স্রোত মরণ-সাপট দিচ্ছিল। সইতে পারলুম না—আমি জ্ঞান হারালুম।

যখন চোখ চেয়েছি, তখন সকাল। দেখি, জনতিনেক মানুষ আমায় সৈঁকতাপ করছে। বললুম, “শুয়ারটা?”

তারা বললে, “কিসের শুয়ার? বানে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ডাঙায় ঠেকেছিলে, আমরা তুলে এনেছি তোমায়। কোথাকার লোক হে?”

‘শুয়ারটা কোথায় গেল জানি না। হয়তো আমায় কোনোমতে ডাঙায় ঠেলে দিয়ে সে নিজের আর উঠতে পারেনি, ভেসে গেছে। তোমরা হাসবে, পাগল বলবে

আমায়—কিন্তু আমি ঠিক জানি, ও যদি বেঁচে থাকত কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ত না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার মতো ওরও তো কোন দোসর নেই।’

সেই ভাঙা গভীর গলাটী ~~বলল~~। নিঃশব্দে বসে থাকল দুটি চাষী, আমি করোগেটেড টিনের চালটার দিকে চেয়ে রইলুম, আমার চোখ জ্বলতে লাগল, একটা ক্লাস্ত কাক ডেকে চলল রাধাচূড়োর ডালে।

সেই লোকটা আবার বললে, “কখনো সূর্যের মাহুষ হয়, বুঝেছ—কখনো আবার মাহুষ—

চমকে আমি উঠে দাঁড়ালাম—আমাকেই বলছে ? স্টকেসটা ভুলে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম। ট্রেনের সিগন্যাল দিয়েছিল। আমি ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী—আমার কামরাটা থাকবে আর একটু ওদিকে। গাড়ী ফাঁকা থাকলে বসে বসে পড়তে পারব “ফ্রেশলাভার্স” বইটা; আর তেমন যদি সহযাত্রী পাই তা হলে বেশ রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়ে উত্তর বাংলার বস্তার গল্পও শোনাতে পারব তাদের। রেল স্টেশনের এই উদ্ভট বাজে গল্পটা ভুলে যেতে আমার সময় লাগবে না তখন।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



এখন নির্দয় শীতকাল, ঠাণ্ডা নামছে, হিম আর চাঁদ ফুটে আছে নারকেল গাছের মাথায়। অল্প বাতাসে একটা বড় কলার পাতা একবার বুক দেখায় একবার পিঠ দেখায়। ওদিকে বড় গঞ্জের রাস্তার মোড়ে রাহাত খানের বাড়ীর টিনের চাল হিম ঝকঝক করে। এক সময়ে কালুর মায়ের কুঁড়েঘরের পৈঠায় সামনের পা তুলে দিয়ে শিয়াল ডেকে ওঠে। হঠাৎ তখন স্কুলের খোয়ার রাস্তার দু'পাশের বন-বাদাড় আর ভাঙ্গা বাড়ীর ইটের নুপ থেকে হু-উ-উ চিংকার ওঠে। ঈশেন কোণ থেকে এখন ধর ধর লে লে শব্দ আসে, অন্ধকার—ভূত অন্ধকার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চাঁদের আলো আবার ঝিলিক দেয় টিনের চালে। গঞ্জ রাস্তার উপর ওঠে আসে ডাকু শিয়ালটা মুখে মুরগী নিয়ে। ডানা বামড়ে মুমূর্ষু মুরগী ছায়া ফেলে পথে, নেকড়ের মত ছায়া পড়ে শিয়ালটার, যাবার দিকে মুখ তুলে চায় সে, রাস্তা পেরোয় ভেবেচিন্তে—তারপর স্কুলের রাস্তার বাদাড়ে ঢোকে। হাতে লাঠি চাঁদমণির বাড়ীর লোক ঠ্যাঙাড়ের দলের মত হল্লা করে রাস্তায় পড়ে—কোন দিকে গেল শালার শিয়েল, কোন দিকি ক দিনি। আরো হিম নামে।

বড় পুলের ওপর থেকে নীচের পানিতে আপন ছায়া দেখতে চায় নিবিষ্ট হয়ে সন্নদারের ছোট তরফের বড় ছেলে ইনাম। পানির রূপোলী মেঝেয় হাতড়ে বেড়ায় নাক-মুখ। হিম নামে যেন শব্দ করে, বাতাস আসে শির শির, খড়মড় উড়ে যান্ন বিকেলের বাদাম খোলা, পাগলীর নোংরা ঝাকড়া চেক লুঙিতে সঁটে থাকে। খাদের আনশাওড়ার পাতা থেকে আলো চলকে ওঠে, কাঁঠাল গাছের পুবদিকের ডাল হাত নাড়িয়ে ডাকতেই থাকে বিচ্ছিরি। অজস্র খঞ্জনী বেজে ওঠে বনবন।

ইনাম পুল ছেড়ে খুলো ভেঙে শুকনো বিলের কিনারায় দাঁড়ায়। সেখানে

শঙ্খচূড়োর মত দেখায় যে ধবল পথটা এখন তা জ্বলন্ত হয়ে এলো, আর ফেকুর বাঘের মতো শরীরটা দেখা গেল। তার পেছনে স্ফাস। ওরা খুব গল্প করছে। যে জন্তু এখানে এখন এত রাতে সে সম্বন্ধে কোন কথা নেই। কখন স্ফাস আমার বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল, অমৃতের মত পুরী খেয়েছিল আর অটেল মিষ্টি, সেই গল্প। ট্রানজিস্টারটা বেজেই চলছিল ফেকুর বগলে, ওরা কেউ শুনছিল না, কণিকা বিলের কিনারার দারুণ ঠাণ্ডায় বুথাই গাইছিলেন অন্ধকারে একা থাকার যন্ত্রণা। ইনিয়িং বিনিয়িং। আর আশ্চর্য্য একটা পাখিও ডাকছিল না। বিলটা চিৎপাত হয়ে পড়েছিল। রেডিওটা বন্ধ করে দে—ওদের দেখে ইনাম বলল। অসহ লাগছিল তার। আইছিস—দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা হুঙ্কনে। স্ফাস হাসল, বিড়ির ধোয়াল কালো দাঁতগুলো প্রায় মুখের বাইরে চলে এলো। ইনামের আবার অসহ লাগল। রেডিও বন্ধ করে দে—বলল সে। কেউ শোনবে না, শোনলেও এদিকি আসবে নানে কেউ, ফেকু বলল, সেজন্তু বলতেছি না, খারাপ লাগতেছে গানডা। কণিকার গলা টিপে দিল ফেকু। এখন চল, দেবী করলি ঘুমিয়ে পড়বেন আবার, ফেকু বলল আর ট্রানজিস্টারটা স্ফাসের হাতে দিল। সেটা নিতে নিতে স্ফাস প্রশ্ন করে, কেডা? বুড়োডা আবার কেডা! সন্ধ্যা হলে ঘুমিয়ে পড়বে কেশো বুড়ো—থু করে থুথু ফেলে বলে ফেকু। যেতে যেতে বাতাস বেড়ে গেল একটু—ফাঁকা বিল থেকেই আসছিল বাতাসটা। শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছিল। ঝপ্ করে মাছ লাফিয়ে উঠল কাজীদেব পুকুরে। আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল খাঁদের বাড়ীতে ধান সেদ্ধ হচ্ছে উঠোনে। উন্ননের আগুন দপ্ করে জলে উঠে খাঁদের স্বন্দর স্বন্দর মেয়েদের মুখ একবারের জন্তু বলসে উঠল। ইঙ্কুলি যাতিছিস না আজকাল—স্ফাস জিজ্ঞেস করে। না—ইনাম জবাব দেয়। পড়বি না আর? না, পড়লি আমারে কেউ সিনি দেবে ক। চাকরি করবি। হয়, চাকরি গাছে ফলতিছে। স্ফাস আর কিছু বলে না। ট্রানজিস্টারটা নিয়ে খুচরো শব্দ করে শুধু আর বেটপ বূট জুতো দিয়ে ধুলো ছড়ায়। নাকে ধুলো এসে লাগতেই রুকুর গন্ধ পাওয়া যায়। ইনামের বিকালের কথা মনে পড়ে, হাটবারের কথা, মাছের কথা। মাছ থেকে নদী। নদী এখন প্রায় শুকনো, চড়া পড়ে গেছে। গরুর গাড়ীতে লোকে বালি এনেছে নদী থেকে। বাঁকের কাছে কাশ হয়েছে। এ পাড়ে স্থল বাড়ী বড় সন্ননে গাছে ফিঙে, তার লম্বা লেজের ছলুনি। স্থলের পেটা ঘড়ি ভেঙে গেলে এক টুকরো রেল রুলিয়ে লোহার ডাণ্ডায় ঘনাং ঘনাং আওয়াজ—হুড়মুড় করে হেডমাস্টার, শালার জোকার একটা, বই বগলে মাস্টার তারাপদ, তার পাকানো চাদর, আধভান্দা দাঁত আর মুখে কথার ফেনা। এই



সব মনে পড়ল। বরষক করে ছবিগুলো এলো, যেন দক্ষিণ বাতাসে শুকনো নিমের পাতা ঝরে পড়ছে, আর ছবিগুলো চলে গেল যেন ট্রেনটা যাচ্ছে পুল পেরিয়ে, মাঠের বুক চিরে ঞাংটা ছেলেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। ছবিগুলো পেরিয়ে যেতেই খেয়াল হয় স্হাস সেই গল্পটা আরও তোড়জোড় করে বলছে, ছোটমামার বিয়ের বরযাত্রী যাবার গল্প। ওর একটা কথাও শুনছে না ফেকু, সে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল—চাঁদের আলোর মধ্যে দেশলাই-এর আগুনটা দেখালো ম্যাড়মেড়ে আর ফেকুর বিতিকিচ্ছ মুখটা দেখা গেল, কপালের কাটা দাগটা, মুরগীর মতো চোখ, নীচে ঝোলানো ঘোড়ার মতো কাল ঠোট। খাবি নাহি? ফেকু জিগ্গেস করে। স্হাস গল্প খামিয়ে সিগারেট নেয়, দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যাওয়ায় আর একটা জ্বালায় এবং আবার শুরু করে, লক্ষে যাতি হয় তো, মধুমতী নদী দিয়ে—অন্ধকারের মধ্যে গেলাম—ছুপাশে গেরাম না কিডা জানে—মনে হচ্ছিল সোন্দর বন। এমন অন্ধকার আর এমন জোঙগল বুজ্জিচো। ইনামের মনে হলো স্হাস গতকাল থেকে গল্পটা বলছে আর আগামীকাল পর্যন্ত চলবে। নাপিত বেটা কমিয়ে কতি পারে না? একেবারে অসহ্য লাগলে এই কথা ভাবল ইনাম। স্হাসের গল্পে একশোটা পল্লব—ছোটমামার চেহারার বর্ণনা, বিয়ের সম্বন্ধ, পাত্রীর খোঁজ, পাত্রীর কাকার সন্দেহ ছোটমামার বাবার ঝগড়া, বিয়ের দিন ধোপাবাড়ী থেকে সিন্ধের পাঞ্জাবী ভাড়া নিয়ে আসার ঝকমারি—কিছু বাদ দিচ্ছিল না সে—তাই ইনাম বলল, তোর ছোটমামা বিয়ে করতি গ্যালো ক্যানো ক তো? স্হাস কান দিল না; সকালে দূর্য উঠতি মধুমতী ঝকমক করতিছে, জ্যাঠামশাই ধপ করে কাদায় পড়িলো লক্ষ থেকে নামতি গিয়ে আর মামীর বোনেরা যা সোন্দর সে আর কলাম না। তোর মামার বাড়ীডা কোয়ানে, শালিরা বেড়াতি আসলি কস আমাকে—ফেকু কথা না বললেই নয়, তাই বলে। সেটি হচ্ছে না, বুজ্জিচো—চোখ বন্ধ করে মনের আয়ানে বলল স্হাস। ও, তাই তুমি মাসে পাঁচবার করি বেড়াতি যাচ্ছ, বুজ্জিচি ওথেনে তো পয়সা কড়ি লাগে না—আরামেই আছ দেখা যায়—ফেকু চোখ মটকে বলে।

রাহাত খানের টিনের চাল দেখা যাচ্ছে না আর, পুল কোথায়, বিল সরে গেছে কখন। চাঁদমণির বাড়ীর লোকজন চূপ করে গেছে এখন। একটা মুরগীর শোক আর কতক্ষণ থাকে! কাল হয়ত বসুবাবুদের ইটখোলায়, না হয় সরকারদের পড়োবাড়ীর ভেঙে-পড়া সিঁড়িখরের মধ্যে বেচারির চকচকে পালক, হলদে ঠ্যাং কিংবা ঠোঁটের গুণাগুণ পাওয়া যাবে। চাঁদমণির লোকজন কাজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু বুড়িটা বসে আছে, ফাটা পায়ে তেল ঢালছে আর পিদিমটা কেন নিভছে না তা

পিদ্বিম ছাড়া আর কেউ জানে না। কি ঠাণ্ডারে বাবা—বউ অ বউ আর একটা খায়াতা দে, মরে গেলাম, হেই বউ। বউটা কুস্তকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছে আর ছেলোটো বকছে বিড়বিড় করে, মরে যাচ্ছে না ক্যানো? বুড়ি আর একবার টেঁচায়, কিন্তু হঠাৎ হাওয়াটা ওঠে, স্মসাম শব্দ জাগে, বুড়ির কাঁপা গলা কেউ শুনতে পায় না। এইরকম জীবন চলতে থাকে।—ফেকু ঠোঁটে কুলুপ দেয়, স্হাস হঠাৎ ট্রানজিস্টারের চাবিটা ঘট করে খুলেই আবার বন্ধ করে দেয়—ইনাম মাথা নীচু করে ভাবতে থাকে।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর পা ঠুঁকে ধুলো ঝাড়ে ওরা। পাশের গলিপথটায় দোকার সাথে সাথে জাপটে ধরে অন্ধকার এবং সপাং করে চাবুক চালিয়ে দেয় কি একটা লতা। ফেকুর ঠোঁট খোলে, অতি জঘন্ট একটি গাল দিয়ে ওঠে লতাটিকে। তারপর শাস্ত হয়ে গল্প শুরু করে, শালা আজকাল এত বেশী ধরা পড়তিছি ক্যানো কতি পারিস? এই কথায় স্হাসের চোখ দুটি চকচক করছে কৌতুহলে, একটা কথা কই, কিছু কবি না ক। ফেকুর সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে বলে, অত মার খাস কি করে, আমাকে বলতি পারিস? শালার দাদা এক চড় মারলি চোখে অন্ধকার দেহি। মার খাওয়াডা শিখতি হয় বুঝিচো বাপধন—ওস্তাদের কাছে শিখতি অয়। লেহাপড়ার জন্তি ইঙ্কুল যাতি হয় যেমন, তেমনি—ফেকু বলে। ইনামের আবার অসহ লাগে, ইঙ্কুলি লেহাপড়া বিয়োচ্ছে, বিটার শালার মাস্টাররা—ইনাম এমন কথা বলে যা মুত্রণযোগ্য নয়। ফেকু তখন বলছে, ইস্টুপিট হলি আর মার খাতি না জানলি মান্দের পহেটের কাছে যাতি নেই। পহেট থে ট্যাহা বেরোয়ে থাকলিও না। টাকার কথা শুনে ইনাম অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল। টেণ্ডু ড্রাইভারের কথা শুনে ভীড়ে হাত দিয়েছিল বটিমুখে এক ভদ্রলোকের পকেটে—কাগজ খড়মড় করে উঠল আর এমন শব্দ হোল যে মনে হোল যে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। অ্যাও করে গড়র গড়র গর্জন করে উঠল লোকটা—কিন্তু আমলে ভদ্রলোক গলা ঝাড়ছিল। কাজেই ইনামের কাছে পয়সা নেই। নারকেল চুরি করে বিক্রি করলে হয়—কিন্তু ভাতের চালের অভাবে উপোস করে থাকতে বড়ো কষ্ট।

পথটায় অন্ধকার থকথক করছে। মাথার উপর বাঁ দিকে লতা ডান দিকে চলে গেছে জাল বুনতে বুনতে। গল্প করতে করতে ফেকু স্হাসের উপর এসে পড়ে আর স্হাস চীৎকার করে, উরে মরিছিরে বাপ। ফেকু বলে, দেহিস রেডিওডা ফালাস না, সেদিন কি হোল ক দিনি, এক বাস লোক—বাস যাচ্ছে চল্লিশ মাইল পঞ্চাশ মাইল স্পীডি, সামনের লোকটার পাঞ্জাবীর পহেট থে নোটগুলো বারোয়ে আছে—হাত দিতি থপ্ করে ধরে ফেলল। তারপর উরে মার ভাংগড়ে যেন গরু পড়েছে।

কপালি তার ঘা শুকোয়নি এহনও। এইবার গুণ্ডোটা শুরু করিছে ইনাম ভাবল। গল্প শুনতে শুনতে সুহাস ট্রানজিস্টারটা চালিয়ে দেয়, গর্জন করে ওঠে সেটা। আওয়াজটা কিস্তত শোনা যায় ঠাণ্ডা আর স্তব্ধ অন্ধকারে। সুহাস খুঁ ফেলে বলে, শালা খ্যাল গাতিছে—বলেই চাবি বন্ধ করে এবং তুমি যে আমার জীবনে এসেছ ধরে দেয়! ভিটে থেকে একটা কুকুর উঠে এসেছে—ক্ষণ চীৎকার করার চেষ্টা করছে। গলা যখন ফুটল না ইনামের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে সমস্ত পাছাটা দোলাতে শুরু করে। নড়েচড়ে গরম হ'তছ শালা—ফেকু মস্তব্য করল এবং কেন তার জীবন নষ্ট হোল, কে কে নষ্ট করল আর পকেটমারার কৌশল, তার নিজস্ব নৈপুণ্য, মাফল্য এবং পিটুনী খাওয়ার অভিজ্ঞতা বলেই যেতে লাগল। করবটা কি কতি পারিস? লেহাপড়া শিখলি নাহয়—। লেহাপড়ার মুহি পেছাপ—ইনাম বলল। আবার অসহ লাগল ওর। তাহলি—ফেকু ভেবেচিন্তে বলল, উচো জায়গায় দাঁড়িয়ে সবির ওপর পেছাপ। কাজ কৌয়ানে, জমি নেই খাঁটি, ট্যাহা নেই ব্যবসা করি—কি কলাডা করবানে?

পাখীদের কোন গান নেই এখন। শব্দ শোনা যাচ্ছে চাপা। কুয়াশা আর হিম জড়িয়ে আছে ওদের। সামনে বিড়ালটা যখন পার হয়ে গেল, শুধু দুটি জলজলে চোখ দেখা গেল তার। এখন সুহাস, ফেকু বা ইনাম কথা বন্ধ করেছে। সুহাসের বগলে ট্রানজিস্টার, ফেকু মাফলার মুখের উপর জড়িয়ে নিল—ইনাম হাতে হাত ঘষে একটু গরম করতে চেষ্টা করল। ডাইনে পালদের বাড়ী, মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈরী করে, পরিচয় জিজ্ঞেস করলে রাস্তা থেকে হেঁকে জবাব দেয় পাল মশাই; তাঁদের বাড়ীর পলস্তরা খসা-দেওয়াল, কারণ বাড়ীটা আসলে সেনেদের। ওরা চলে গেছে পঞ্চাশে। বাতাবি লেবু গাছটার পাশ দিয়ে যেতে চড়াং করে একটা পাতা ছেঁড়ে ইনাম আর ঠাণ্ডা উঠোনটার দিকে চেয়ে থাকে। পোড়ামাটির গন্ধ নাকে লাগে, কালো জালাগুলো ছড়িয়ে আছে দেখা যায়, ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘুমজড়ানো গোড়ানো ভেসে আসে। সব ঘুমিয়ে পড়েছে—সুহাস বলে। ফেকু সায় দেয় ঘোঁং করে। আজ না আসলেই হোত—সুহাস অভিযোগ করতে থাকে, ভয় করতিছে আমার। ফেকু ভ্যাংচায়, ভয় করতিছে, কাঁচ ছ্যামরা, হুধু খাবা। সুহাস বলেই চলে, বুড়োরে দেখলি আমার ভয় করে। একবার মনে হয় মরে যাবেনে এছনি, একবার মনে হয় আমাদের সব কডারে খুন করবেনে। বাড়ির মধ্য চোহার সময় মুখডা দেহিছিল? দেহিছি—তুই থো, তাচ্ছল্য করে ফেকু, পয়সা পালি মুখডা কেমন হয় দৌঁহিস একবার। ফেকু হারামজাদাটারে খুন করতি পারলি হোত—ইনাম ভাবল। সুহাস পরে ফেকুর দলে মিশল। সে বলছে, এটু এটু সর হইছে এমন ডাবের মতো

লাগে মেয়েডারে। ঠিক কইছি না, ক। তোরেও খুন করতি পারলি হোত—ইনাম আবার ভাবল। ওরা এখন হাসাহাসি করছে, ঢলাঢলি করছে, কলবল করে আলাপ করছে। ছু পা এগিয়ে ডাক্তারবাবু ভেতরে বসে আছেন—মোটা সাদা বিরাট শরীর, হারিকেন জলছে, তাই খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল আর পুকুরের বাঁধা ঘাটে একটি মাত্র শুকনো পাতা ফর ফর করে পাক দিতে থাকল। বাঁ দিকের খোলা জায়গাটা এসে গেছে এখন, কুয়াশার সঙ্গে মিশে ঘোলা ছুধের মত টাদের আলো খুদে খুদে মরা ঘাসের ওপর পড়েছে। পেছনে জামগাছটা কালো—তার পেছনে সব কালো এবং নির্জনতা। আর এইসব ছাড়িয়ে যেতে আরও নিজনতা, পোড়ো জমি, জঙ্গল, পানের বরজটা, কাশ আর লম্বা ঘাস আর মজা পুকুর এবং বিল। এখন ডাইনে দড়ি দিয়ে বোলানো বাঁশের গেট। গেট পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জমি চিং হয়ে শুয়ে। ঠিকছু ফলেনি সেখানে। ইনাম এখন পিছনে আছে, অনেকটা পিছনে, এমনকি ফিরে যেতে হতে পারে হঠাৎ এমন মনে হচ্ছে। লাল আলোটা আসছে কাঠের রড লাগানো জানালা দিয়ে, মজা পুকুরে শিয়ালের চকচকে চোখ ঝিলিক দিচ্ছে কিছু খুঁজে। ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি করে ডেকে ডানা ঝটপট করে পুরনো ডাল ভেঙে বাজ পাখিটা নড়েচড়ে বসল। ফেকু দড়ি বোলানো বাঁশগুলো তুলে ধরেছে, হাত নেড়ে ডাকছে স্হাসকে—স্হাস জ্বীনজ্বিন্টারটা হাতে নিয়ে অন্য হাতে ঠোঁট চেপে আছে, আর কিছুতেই এগোচ্ছে না। ইনাম চট করে সামনে এসে ফেকুর কাছে টাকা চায়, দুডো ট্যাহা দে—কাল দিয়ে দেবানে। বাঁশগুলো ছেড়ে দেয় ফেকু, অ, খালি হাতে মজা মারতি আইছ? নুহুতে সোনালী হাত সামনের আবছায়ায় ভেসে ওঠে নীল পানিতে সাদা মাছের পেটের মতো। সেই হাত মাথায় রাখে। চুল সমান করে দেয়। আঙুলে তেল আগলে আঁচলে মোছে। ইনাম নিজে কিনে দিলেও মিলের শাড়িটা খুলে নেওয়া যায় না তখন। ব্যাকুল হয়ে ইনাম বলে, দুডো ট্যাহা দে, কাল দেবানে, সত্যি কচ্ছি। ট্যাহা লাফাচ্ছে, মোড়ে দুডো ট্যাহাই আছে আমার কাছে—ফেকুর মূলোর মতো দাঁতগুলো কড়মড় করে ওঠে। তা হলি স্হাস দে—দে স্হাস, কচ্ছি কাল দেবানে, ঠিক কচ্ছি দে স্হাস, তোদের মা কালীর দিব্যি, কাল দিয়ে দেবানে—ছটফট করে ইনাম। স্হাস বলে ফেকুকে, কিছু কয়নি এতক্ষণ, কেমন গুড়ি গুড়ি আসতিছিল দেখছিস। উরে ভুই কি ইন্স্ট্রুপট—সে হাসে, মাইন্নি কচ্ছি, পকেটে হাত দিয়ে ত্যাখ—দুডো ট্যাহা আছে মোড়ে, দাদার পহেট খে মারিছি, মাত্তর দুডো ট্যাহা। তখন ইনাম স্হাস্ত হয়। গেটের কাছে ফেকু আর স্হাস গলাগলি

দাঁড়িয়ে। জানালায় কাঠের রডে মুখ লাগিয়ে বুড়োটা চিৎকার করে, কে, কে ওখানে গো—ঐ্যা। লাল আলোটা সরে যায় জানালা থেকে, হড়াম করে দরজা খোলে, হাতে হারিকেন নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গেটের কাছে আসে মান্নবটা। সমস্ত উঠোনটায় বিরাট ছায়া, খাটো লুড়ির নীচে শুকনো ছুটো পা। এসে গেটের পাশে করবী গাছটার পাশে দাঁড়ায়। আলোটা মুখের কাছে তুলে ধবে লোকটা। বোশেখ মাসের তাপে মাটিতে যেন ফাটলের ঝাঁকিবুকি এমনি ওর মুখ। ঠাণ্ডা চোখে ইনামকে দেখে, ফেকুকে দেখে, দুহাসকে দেখে, দেখতেই থাকে, বিঁধতেই থাকে, হারিকেনের বাতিটা তোলে কাঁপা হাতে, এসো তোমরা, ভাবলাম কে আসছে এত রাতে। কে আর আসবে এখানে মবতে। জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই—ইচ্ছে করলে কি আর ঘুমানো যায়—তার একটা বয়স আছে—অজস্র কথা বলতে থাকে সে—মানে হয় না, বাজে কথা বকবক করেই যায়। এসো, বড্ড ঠাণ্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতবে কি ঠাণ্ডা নেই? একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার আর ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে। সবাই ভিতরে আসতে করবী গাছটার একটা ডাল ঝটকানি দেয়—পায়ের নীচে মাটি ঠাণ্ডা, শক্ত আর সেজন্তে ইনামের গোড়ালিতে ব্যথা করছে।

ভিতরে কালো রঙের চৌকিটা পড়ে আছে। ঘুমের মধ্যে মুরগীগুলো কঁক করে উঠল। আবার হু-উ-উ চিৎকার এলো। বিলে বাতাস উঠেছে শোনা গেল। ভাঙা চেয়ারে ভদ্রলোকটি বসে। হারিকেন মাটিতে নামানো। ওরা তিনজন চৌকিতে কাছাকাছি বসেছে। কেউ কথা বলছে না, বুড়োর অ্যাজমার কষ্টের নিঃশ্বাস পড়ছে। তুখোড় লোকটা এখন চূপ—ভসভস বাতাস ছাড়ছে মুখ দিয়ে। খোঁচা খোঁচা শাদা দাঁড়ি দেখা যাচ্ছে। শিরগুঠা আঙুল চেয়ারের হাতলে পড়ে আছে। নোংরা নখ দীর্ঘদিন কাটা নেই। গলার কাছে জেমা এসে জমলে বাতাস যাওয়া-আসা প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। ইনামের ইচ্ছা হোল একটা নল দিয়ে সাফ করে দেয় ফুটোটা। তারপর কি খবর, ঐ্যা? সব ভালো তো? ঘড় ঘড় করে কথা এগিয়ে চলে। আক্ষেপ, বিলাপ, মরে গেলেই তো হয় এখন, কি বলো তোমরা? টক করে মরে গেলাম ধরো। তারপর? আমার আর কি?—ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং, চলে গেলাম, বুঝে মরণে বুড়ি—ছানা পোনা নিয়ে বুঝে মরণে। এই তোমরা একটু আধটু আসো, যখন তখন এসে খোঁজ খবর নাও। সময় ধনময় নেই বাবা তোমাদের। তোমরাই ভরসা, আমার পরিবার তোমাদের কথা বলতে অজ্ঞান। ফেকু ভয় পেয়ে গেছে এখন। বুড়োর মুখের দিকে বায়বার চেয়ে

ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে আর সিঁটিয়ে যাচ্ছে। স্হাস চোখ দুটো গোল গোল করে চেয়ে আছে। বুড়োর মুখ এখন বহুরূপী। স্হাস ভাবছে, কেশো বুড়োটা, খুন করবেন মনে হ'তিলে আমার। আজ ক্যানো যে আলাম। না আসলেই ভালো হ'ত। তোমরা না থাকলে না খেয়ে মরতে হ'ত এই জংগলে জায়গায়—বুড়ো বলছে, বাড়ীর বাগান থেকে অন্ন জোটানো আবার আমার কন্ম—হাঃ। ও তোমরা জানো। আমরা শুকনো দেশের লোক ব'ইলে না—সব সেখানে অন্মরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের। এখানে না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে, বাবার। ছেলেমেয়েগুলো তোমাদের কি ভালোই না বাসে। এই ছাখোনা বড় মেয়েটা, রুকু এখন চা করতে যাচ্ছে তোমাদের জন্তে—একটা শ্লেয়ার দলা খাস-নালীটাকে একেবারে স্তর করে দেয় আর চোখ কপালে তুলে কাশছে। কথার খই ফুটছিল অথচ এখন মরে যাবে নাকি? আমরা চা খাবো না—চীৎকার করে ওঠে স্হাস আর ফেকু। খাবে না? বুড়ো সামলে নিয়ে শান্তভাবে বলে, অ, ঠিক আছে। তাহলে তোমরা এখন চা খাবে না—অ্যা—আচ্ছা, ঠিক আছে।

বিল থেকে বাতাসটা উঠে আসছে। এখন অখথ গাছটার মাথায় ঘুবছে, পাক খাচ্ছে, এগিয়ে আসছে, খঞ্জীর বাজনাও এগিয়ে এলো সঙ্গে, খোলের চাঁটি আর কি বিশাখার কথা, কি তমালের কথা—সব এসে আবার দূরে চলে গেল। স্হাসের চাদরের মধ্যে নোট খড়মড় করে, সেগুলো নিয়ে ফেকু নিজের পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে—দলা পাকায়, ভাবে, ভয় পায়, শেষে বুড়োর দিকে ঝুঁকে পড়ে, স্হাস আর আমি দিচ্ছি।

চেয়ারের উপর লোকটা ভয়ানক চমকে ওঠে। পড়ে যাবার মত হয়। খটাগট নড়ে পায়গুলো, তোমরা দিচ্ছ, তুমি আর স্হাস? দাও। আর কত যে ধার নিতে হবে তোমাদের কাছে, কবেই বা শুধতে পারব এই সব টাকা। স্হাস থেমে গিয়েছিল, এখন উঠে দাঁড়ায়, চলে যাবে এখন? এত তাড়াতাড়ি? রুকু রাগ করবে—চা করতে দিলে না ওকে। ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে আর কোনদিন কথা বলবে না। দাঁড়াও—হারিকেনটা রেখে বুড়ো বেরিয়ে যায়—ছায়াটা ছোট হতে হতে এখন নেই। মুরগীগুলো আবার কঁ কঁ করে ওঠে, রাত কথা বলে ওঠে বয়স্ক বৃদ্ধা হয়ে, তীক্ষ্ণ গালাগালি অন্ধকারকে ফাঁড়ে। চূপ চূপ মাগী, চূপ কর কুত্তী—এবং সমস্ত চূপ করে যায়। বুড়োটা ফিরছে এখন—মাথা নামিয়ে, কাঁধ ঝুলিয়ে ঘরে এসে ফিসফিস করে, যাও তোমরা, কথা বলে এসো, উই পাশের ঘরে। ইনাম তুমি বসো, এখখনি যাবে কেন? এসো গল্প করি।

বুড়োটা গল্প করছে, ভীষণ শীত করছে ওর গল্প করতে, চাদরটা আগাগোড়া জড়িয়েও লাভ নেই। শীত তবু মানে, প্লেয়া কিছুতেই কথা বলতে দেবে না তাকে। আমি যখন এখানে এলাম, সে গল্প করেই যাচ্ছে, আমি যখন এখানে এলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে, কাঁপতে কাঁপতে বলছে, বুঝলে যখন এখানে এলাম। তার এখানে আসার কথা আর কিছুতেই ফুরোচ্ছেনা—সারাবাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম—আমি প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই—তখন—হু হু করে কৈদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ীর শব্দ আর অল্পভবে নিটোল সোনা রঙের দেহ—সুহাস হাসছে হি হি হি—আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে—বলে খামলো বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল—ফুলের জন্তু নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্তু, বঃ'ত করবী ফুলের বিচির জন্তু। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিত্তে। আবার হু হু ফোঁপানি এলো। আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়োর মুখ—প্রথমে একটা করবী লাগাই বুঝেছ, আব ইনাম মনে মনে তেতো তেতো—এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?।

□ □



আয়নায় এখন ; আঁচল দিয়েই মুখ সে মুছে, এবার যথাযথই প্রাক্তিকলিত, এব' অতীব স্পষ্ট। যদিও সে ছোট এ আয়না ; তৎসঙ্গেও আবক্ষ দেখা যায়, যখনই যেখানেই ঈষৎ ফাঁক সেখানে সেখানে দীনঘরের স'্যাতসে'তে ঘরের এটা সেটা। যথা তোরঙ্গ যথা ছেঁড়া মাদুর যথা পিতলের কাঁসার অকেজো তৈজসপত্র ; এসব আয়নায় আসে, আর আসে জানালার মুখোমুখি অল্প জানলাবহির্গত উর্ধ্বগামী বিপুল ধোঁয়ার চরিত্র,—আয়নার গভীরতা, আয়নার অন্তরীক্ষ শূন্যতাকে পরিপূরণ করেই ; এই সত্য। এমনও মল্লিকার আবক্ষ, সে আপনাকে আর এক ভবিষ্যৎ থেকে অল্প নিরীক্ষণ করে , কেমন ধারা মুখটা হয়ে আছে যে তারা অথবা পুরুষোচিত ক্লাস্তি এখানে সেখানে। আয়নার সাক্ষাৎ নীচেই ব্রাকেট, ওটা পাউন্ডার এটা কাজল এটা এসেম্পের শিশি তাতে শুধু স্বচ্ছতাই, তেল টসটস ফিতে, কিছু কাঁটা—এ সকলি সত্ত্ব মৃত কোনজনের ঔষধের সমারোহ বা , আর যে, পুরুষোচিত ক্লাস্তির ক্ষেত্রে এসকল যে, স্রিয়মান, নিষ্ক্রিয় !

এবার মল্লিকা আরবার সাহস সহকারে আয়নার প্রতি চাইল, সেখানেই সে যেন অল্প কেউ আর। এ যেন তার সে উবল বক্ষদয় নয়, যেন এ কেশসম্ভার আর কারও, আর অল্প কারও। আজ সকালে, আজ খাবার পরে দুপুর বেলা যে, এই তো যে তুফান ছিল, সে তুফানের কণামাত্র কেন যেমন নেই। তার বাবার বাঁশঢলা কাশির আওয়াজ এবং মায়ের শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড় এবং দুজনের অকাল বার্ষিক্য যে তুফানকে ; অপরিষর উঠনের টোকো গন্ধ, বালিখসা দেওয়ালের বুল যে তুফানকে কোন ক্রমেই ক্লগ করতে পারেনি, এমন কিরূপে একভাবে তা যেমন ছিল না এমতই মনে হয়। মল্লিকা আয়নায় অথবা এও হয় যে আয়না মল্লিকায়। চিঠি



এলো। ছপুর বেলাকার ঐটুকু সময় সেইটুকু সময় অধিক মোহের ; বহু বহু দূরে প্রাস্তন সময়ের অন্তরে সহজেই নিমেষেই যাওয়া আসা এবং সে তদানীন্তন সময়েব সকল অস্তিত্বের সঙ্গ হয়, সেখানকার ফুল আজও তেমনই নবীনা, এমনও যে তেমনই গন্ধবহু, তারা গায় গায় লাগে। এবং যে ঘুমোয়নি সে হয় মল্লিকা, তখন যখন সে এমত একটি নিবিড় অল্পভবের মধ্যস্থ, যে সে মল্লিকা একরূপ এক আরামের আধারে ; চোখের পাতা বন্ধ অন্ধকারের মধ্যে কে যেমন তার নাম স্মর করে পড়লো—এরপর তারই বৃকে, আদখোলা বেশখোলা বৃকে কিসের যা এমন লাগলো। মল্লিকা চেয়ে দেখলো, হরি। বৃকের দিকে, কোনমতে চাইলো, আর যখন, অচেনা বস্তুর মধ্যে একটি গুরুধাম। এবার কোনমতে, একভাবে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে বসলো ; যখন তখন সে এইভাবে বসে ; তার বৃকের কাপড় কোলে, কোল বেয়ে সে কাপড় মাটিতে লুটায়। ইতিমধ্যে শুধু হাত দিয়েই চুলের গোছ অদ্ভুত করে ধরে অনায়াসে ফাঁস করলে, মল্লিকা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সম্মুখে চিঠি।

ইতোপূর্বে এমন যে সে চিঠি কখনও পায়নি। অবশ্য সেই সকল চিঠি অগ্র, সেই সকলের ঠিকানার ছাদে চিঠির সকল পাঠ উপছে থাকেই চিঠি না খুললেই বা ! প্রায় চিঠিই তার মায়েয় নামে ফলে তখন সে পড়ে মা শোনে। বন্ধুদের চিঠি, চিঠিতে লেখা প্রায়, প্রায়ই 'এবার এটি (ছেলে) হতে কোন কষ্ট পায়নি', মল্লিকা সেই স্মৃত্তে ভাবে সারাজীবন কষ্ট পাবে বলেই ভগবান ওই কষ্টটা আর দেননি। এ চিঠির খাম আর এক, রঙ আলাদা। টাইপছাঁদে লেখা নাম, যে এ সকল অক্ষরে ন্যাজে গোবরে জীবনের কোন পাঠ অস্পষ্টতও নেই কোন কিছু নেই। মল্লিকা এখন সম্ভরণে চিঠিটা খোলে।

দু'হাতের উপরিভাগে চিঠি, যখন তার হরুশে অবহেলা বাঁধা খোঁপা আবার ধসে পিয়েছে, আর দু' হাতের মধ্যস্থে যা যেমন বিষপাত্রেই। তারের জাল দেওয়া জানালা ভেদ করে তিনটের রোদ। মল্লিকার এমন ধারা বসে থাকা কেমন যেমন, ক্রমাগত কি এক ভাবান্তর ! একবাব এক আশ্বাস : দু' বেলার হেঁসেল, একটা ঠিকে কি রাখা যেতে পারে ; যে এমন, বাপের জন্ত অন্তত ভাতের পর দুটো সিগারেট ; আরও রুই মাছের কালিয়া খেতেও সাধ আছে। ধোপাকে কাপড় দেওয়াও যাবে। এখন যেখানে এসেল সে দিকে চায়, মনে হয় এ প্রয়োজন মিটেবে বা, কাতাদড়ির আলনার পাট উঠিয়ে নিশ্চিত একটা ব্যাকেট। এই আশ্বাসের পরই হতাশার ঝাপটা, কিসের কারণেই বা এ হতাশা তা তার ঠিক জানা নেই। তবু এ হতাশা।

তবে যে এই স্বার্থ যে, সেই হতাশা—জীবনের ষত অপ্রয়োজনীয় অহেতুক কোণ

বহি আসে, ক্রমে তার প্রতি আসে। এবুঝি, কতু বা মনে হয় উর্ধ্ব আকাশ থেকে, কতু বা কোন বাগানের মধ্য হতে; কিম্বা ফাঁকা রাস্তার নির্জনতার উপরে যখন বৃষ্টি হয় গাছের রঙ তখন আবছায়া—সেখান থেকেই হয়। মল্লিকা কখন যে এসকল কিছু দেখেছে তা সে জানেই না, অল্প লোকে তো নয়ই। লোকে ভাবে মল্লিকা এতকাল শুধু দাঁত সংস্কার করেছে, একারণে যে তার দন্তপীতি অতি মনোহর। ফলত এবং কখন যে তার রক্তে রসে এসকল দূরাগত-দৃশ্যগুলো মিশেছে সন্দেহ হয়েছে কে জানে। যৌবনের জীবনের অনেক যা কিছু ওই সকলের হাতেই সে জমা করে দিয়েছিল, ওখানেই হেতুহীন গোপনতার মধ্যেই ব্যাঙের আধুলি। হতাশ একারণে যে যৌবনের সবটুকু সব, নিশ্চিতই অযথা হবেই।

যদিও এপারের লক্ষা গাছ রাঙা, ছপরের রোদ ভারী মিঠে, ছাকড়া গাড়ীর শব্দ আর ফোড়নের গন্ধের সমঝদারী করার সময় যখন যেমন সে কখনই পাবে না; তেমনি অল্প-পক্ষে তাকে লক্ষ্য করার সময় নেই, সে আর আইবুড়ো মেয়ে থাকবে না কখনই, চাকরে হবে। ম্যাগো চাকরে। এতটুকু মান তাকে আর কে দেবে যেহেতু সে চাকরে সেইহেতু; তার আঁচলটা যদি দৈবাৎ কারো মূখে লাগে কতটুকু স্পন্দন জাগবে তাতে কার! হাতের খবরের কাগজটা দিয়ে সরিয়ে আবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে লোকটি, যুবকটি। এরাই অন্যহাতের ইলিশের দিকে, অল্পহাতের ফুলকপির দিকে, এখনও সে অন্যহাতের ভাঁজরত খবরের কাগজের দিকে চাইবে, তবুও ভুল-ক্রমে চাকরে স্ত্রীলোকের প্রতি চাইবে না। তাকে, মল্লিকাকে কাল পরশ থেকে আর তেমন ভাবে কেউ আর দেখবে, যদি বা দৈবাৎ, তাহলে সেই চাহনির মধ্যে কোন সন্দেহযোগের চিহ্ন নিশ্চিত থাকবে না। গ্রাম্যরা যে চোখে পাথরেকৌদা ঘন্নিগী দেখে থাকে, এদেখা হয় সেই দেখা।

অল্পই সেই শেষ দিন। যেহেতু কাল সে, এত সময়ে অফিসের কাজে ব্যাপৃত, সমস্ত সনাতন জাতি আর মল্লিকা কোথায়? বিদায় নেবার কাল এবার। তের চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আজ প্রায় ঐ দশ বছর যে অল্পভব নিয়ে কাটিয়েছে সেই অল্পভব সোজা ফেলে দিতে হবে, যেমন চিরুণীতে জড়ানো হেঁড়া চুলের গতিই, তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পাকিয়েই, তিনবার থু থু করে এখন জানালা গলিয়ে ফেলে দাও। যে তার এত বুকভরা ভালবাসা তা অযথাই হয়, আগামী কাল থেকে আর কেউ একথাই যে, তাকে আর তেমনভাবে দেখবে না। অনেকেই বলে, সে শাড়ী পরতে জানে না, শুধু সে কেন তারই মত আর বাঘের অবস্থা, তারো জানে না; যদি স্বযোগ হয় তবে দেখবো, শাড়ী যে গায়ে তোলা যায় একথা বিশ্বয়ের, কেম না

যেহেতু সে শাড়ী হয় শতচ্ছিন্ন, জীর্ণ এবং আরো যে অতি অধিক তা নোংরা। সেই ভাবেই সেই শাড়ীর মধ্য থেকেও কত সুন্দর লাগতো তাকে তা বোধকরি অল্প অনেকেই জানতো, সে তো জানতোই। যদিও সে, হাতে ঝাঁজলা করে নিয়ে আপন মুখ দেখার আর পাঁচটার মত বাতুলতা তার ছিল না; তবু সেটুকু সত্য সে জানতো। অথু তার মনে হয় সেটুকু না জানলেই বা কি হতো চাকরিই যদি তার বরাদ্দ এখন তখন! এততেও তার মনটা কোনরূপেই সায় দেয় না, তার আপনকার এ ক্ষতি কোনক্রমেই মেনে নিতে ইচ্ছে হয় না, কেমনে বা সে-ভাবে যে আর কোন অর্থ নেই, সে শুধু চাকরেই, শুধু মাত্র জীবন-বীমা করা ছাড়া অল্প কোন লক্ষ্য কিছু করার নিজের জীবনের কারণে থাকবে না। এ ব্যতীত সে আর কি করে।

তবু মন, আছে আছে করে করে উঠে এখনও। কুমারী বলে তাকে গ্রাহ্য করবে না, একথা প্রতিবার মনে হয় অথচ মন মানতে চায় না, কত ছেলেই তাকে ভালবাসতে পারতো সেও পারতো কিন্তু কোনক্রমেই হয় লজ্জা কারণে অথবা অল্প কোন কারণে তা ঘটে ওঠেনি। এখন সকল কিছু কথা কোণঠেসা করছেই। ছি ছি কি ভুল হয়েছে। অন্তত শিশিরকে। বেচারী কি মার খেয়েছিল, শিশিরের বাপ শিশিরের হাড গুঁড়ো করে দিয়েছিল, প্রায় দুদিন খেতে দেয়নি। শিশির মল্লিকার সঙ্গে প্রায় খুনসুড়ি করতো, তখন মল্লিকার বয়স তের চৌদ্দ হবে, তখন ওরা দর্জিপাড়ায়। একদিন ঠিক দুপুর বেলা ছাদে; হঠাৎ শিশির মল্লিকার ছোট দুটি স্তনে হাত দিয়েছে, মল্লিকা চমকে উঠেছে, সে কথা স্মরণে সে চমকে উঠলো। ছাদের কোণে ছিল রাধুর মা, তার চোখ এড়ালো না। মল্লিকা রাধুর মাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠে অসভ্য বলেই, বসে পড়ে কাঁদতে লাগলো। এখন কোথায় বা শিশির। সে এম-এ পাশ করে, মাস্টারি করে, শরীর তার বড় খারাপ। আরও কত, তাদের কলেজের অঙ্কনার ভাই সেও তো তার প্রতি কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, অল্প পক্ষে সে শুধু ক্রমাগত ভয়ই পেয়েছিল, অভিজ্ঞতাবশত নয়, এমনি। এমনি করে যদি বিশেষভাবে ভাবা যায় দেখা যাবে চার পাঁচজন এসেছে বেশ কাছে, আরো কাছে— যখন এমন সম্বন্ধ হতে পারতো যা আর কাছছাড়া করার নয়। তখন সে আপনকার অজানিতেই একথা ভাবে, তখনই যেমন তার খেয়াল হলো, হিসাব দেখলে অল্পও দময় তার আছে।

সম্মুখে আয়নার সম্বন্ধ সে খোয়াকে একথা অসম্ভব মিথ্যা বৈ অল্প না। কতক-মানে এখনও এ মুহূর্তে সে দেবীরূপে আদরলীয়া নিশ্চিত। এ শুধু আয়নার দৃশ্যবোধে সে জানে, যে সে মল্লিকা আর পিছনের অমরতার মধ্যে এতটুকু বৈষম্য

কোথায় বা। এ অমরতার বেমন সাক্ষাৎ সেই, শুধু মাত্র সত্য এই হয় যে ; পোশাকের ভেদ, কালের ভেদ এছাড়া অথগুই একই। তবে যখন অফিসের পথে যেতে চটি ছেঁড়ে, সেটি ঘাড়গোঁজা মুচির সামনে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়াবে, মুচিটা একটা চাউস জুতো এগিয়ে দেবে—তাও ডান পায়ের জুতো বাঁ পায়ের পরতে! মল্লিকার এখন সাজ শেষ হয়েছে, এখন সে আয়নাটাকে মুছলো নিজেকে একটু দেখে নেওয়া।

মল্লিকার মা ইতিমধ্যে ছাদের কাপড়তোলার পথে পাঁচটা বৌঝিকে এ খবর দিয়েছে, দোতলার ফোকলা বৌটা এখন এসেই, সত্ত্ব সাজা মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ‘খাওয়াতে হবে মাইরি।’ এরপর তারপর মল্লিকার প্রতি দ্বৈধে বললে, ‘এতেক’ভাবনা কেনে গা! এত ঘটা করে বার হওয়া কোথায় গা, বন্ধুদের খবর দিতে বুঝি!’

‘হু।’

‘উঃ হু প্রাণনাথের ফেরে।’

ফোকলা মুখের প্রাণনাথ কথাটি বেশ মিঠে, মল্লিকা এ কথায় হাসলো। কিন্তু তাকে বলতেই হলো—‘ই্যা প্রাণনাথ আমার জন্ম বাঁশীতে ফুঁ মেরে মেরে আর দিশে বিশেষ পাচ্ছে না।’ এঁফাকে মল্লিকার মধ্যে খেলে গেলো; যদি আনা চারেক পয়সা চায়, ঠনঠনেতে পাঁচ পয়সা; এটা সেটা আর অফিসের ট্রাম ভাড়া। যখন সে একথা মনে গণে, ফোকলা বৌটা বলে উঠলো, ‘চলি ভাই।’

যখন মল্লিকার কষ্ট হলো, কিন্তু আনন্দের যে সে ইঁফ ছাড়লো। মহাছেঁচড়া মেয়েটা, যে তার সাবান চুরি করেছে বলে কি নওলাদওলা করলে, সাবান মল্লিকা চুরি করে নেয়নি, বরং সে চুরি করে রেখেছিল। অবশ্য তা দোষের, কিন্তু ভাববার যে চুরির সঠিক অপরাধ হয় কি। মল্লিকা যখন বৌটি চলে গিয়েছিল, তখন সে মনস্থ করে ঠনঠনেতে প্রণাম করেই আসবে। পরে পূজা হবে। সে ঘুরে আয়নায় আবার একবার এশ্ৰুণে আপনাকে দেখলো। ঠনঠনেতে যখন সে দাঁড়ালো তখন মনে হলো, বাড়ী ফিরে যাই। সম্মুখে দেবী প্রতিমা অশ্রুদিকে আপনকার এমত মন আর পিছনে অথবা পার্শ্বেই হাজার চাকাচলা রাস্তা। এতাবৎ যে ক্ষমতায় এতদূর সে এসেছে সেটুকু দেখা গেলো সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর পরবর্তী যা ছিলো মনে অর্থাৎ আপনকার বাসনা, যে সেইকে সম্পাদনা করার মন যেমন আর নেই। এতদিনের তিল তিল না পাওয়ার, অভাবেরই ছুঃখ দিয়ে সে চৌকাঠে মাথা ঠেকালো, সে ঘাড় ফিরিয়ে দূরে রাডা চটি জোড়ার দিকে চাইলো, সে জোড়া সেখানেই তেমনি। ভগবানকে

মাথা নত করে ধগু ধগু করে, যে আর কসামাছ রশ্মন দিয়ে খেতে হয়তো হবে ণ। শাড়ীটা আবার মিলিয়ে নিলে, রাস্তায় আবার নামলে, নিজেকে যখন সে ছি ছি দেয় যখন সে ছেলেমানুষী ছাড়া আর কি বলে তখন তখন রাস্তায় চলে। তারপর চলতে চলতে এক বাড়ীর দরজায়।

কড়া নাড়ার শব্দ শ্রবণেই সে অসম্ভব মুসড়ে পড়লো, টেলে গায় যেমন জ্বর। যদিও সে কড়া সে নিজেই এখনও নাড়ছে। যদি এমত সম্ভব হতো তার মুখমণ্ডল ঠাণ্ডর করা যেতো, তখন তার মুখমণ্ডল আরক্ত চক্ষু পদদ্বয় কম্পমান আর সে বেপথুমতী। বাড়ীর ভেতর হতে গলার আওয়াজ এলো, ‘কে—এ্যা।’

‘আমি’ এ উত্তর দিতে তাকে যেমন হাতব্যাগ হাতড়াতে হবে এমত, এখন সে চূপ। কার্য পরম্পরা তার চোখে পড়ে ইতঃপূর্বে কখনও সে আপনাকে এভাবে লক্ষ্য করেনি, ভিতর থেকে খিল খোলা হয়, তার শব্দ আসে। এরপর দরজা দুইটি। একটি লোক। এ লোকটির গায় কোন মতে কোঁটার খুঁট, যখন হাতে একটা আধ খাওয়া রুটি যখন মুখেও খানিকটা আছে, লোকটি সেইভাবেই বললে, ‘আরে এসো।’

দরজা খোলাই রইলো।

এখন ওরা ছোট একটা দালানে, একটা লঠন, তার আলোতে একটা বাটি এক গেলাস জল, লোকটি বোঁ করে গিয়ে উক্ত বাটির সামনে গিয়ে বসলো এবং মল্লিকাকে বলল, ‘তুমি ঘরে বসো আমি আসছি। মা নেই।’

বেচারী মল্লিকা সে ঘরের চৌকাটের সামনে চটি খুলে ঘরে ঢোকান পূর্বে আবার ঘাড় ফিরিয়ে, রুটি ব্যাপৃত লোকটিকে দেখলো লঠনের আলো লাল, মুখটা তার কাঠবৎ নড়ে নড়ছে। রাত্তির ষড়ির শব্দ যেমন কেমন এখানে লোকটির রূপও তেমনই। মল্লিকার আপন মুখমণ্ডলের যে রক্তিমতা তা ক্রমে থেমেছে, তবে বৃষ্ণ তেমনই হিম অল্পভব এক্ষণেও আছে। ঘরে সে প্রবেশ করলো, কিন্তু যেমন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, জানলা বরাবর ওখানে ইঁট তোলা খাট, কয়েকটি বালিশ, একটা বাজ্ঞে কাঠের দেওয়াল তার উপর নানা কিছু, ঘড়ি ক্যালেন্ডার রকমারি বিহ্বক, একটি টিনের বাস্ক। এপাশে আলনা, একটি চেয়ার কয়েকটি বাস্ক ঢাকনা দেওয়া। অজস্র আসবাব। ঘরের চতুর্দিক দেখার পর মল্লিকা একটি চেয়ারে বসে পড়েছে। ফুস্ফুসেওয়া ঝালরদেওয়া হাতপাখা দোলাচ্ছে। এখন গরম কাল, ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যার হাওয়া। গলি পেরিয়ে পদশব্দ, কখনও ঘুঘনি আলুরদম। সহসা মল্লিকা বলে উঠলো, ‘আমি উঠি—’

‘এই যে হয়ে গেলো’, বলে কৌচার খুঁটে লোকটি মুখ মুছতে মুছতে এখন ঘরে ঢুকলে, দরজার মাথা থেকে গামছা নিয়ে আবার মুখ মুছলে, পরে বললে, ‘তারপর—আমি আবার রাস্তায় কিছুটা খাই না বুঝলে, আর পয়সাই বা কোথায় তাই—তা তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হলো তো’—বলে বালিশের কোণে নভেলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাইলো, হাত দিয়ে বইটা টেনে আপনার কোলে আনলে।

মল্লিকা এবার বুঝলে সে অত্যন্ত অসভ্যভাবে লোকটির দিকে চেয়ে আছে যখন সে মাথা নামালে, মল্লিকা ক্ষণিকের অস্থিরতা ভেঙে আবার তার দিকে চাইলে।

লোকটি বললে, ‘দেখো না মা আবার কোথায় গেছে, পাশের বাড়ীতে চাবিটা দিয়ে কোথায় যেন গেছে। পাড়া বেড়াতে আর কি!’ বলে একটু হাসলে।

মল্লিকা পাখা একটু চালাবার চেষ্টা করার সঙ্গের বললে, ‘কোথায় গেলেন আশ্চর্য!’

‘বলে কে, আবার নোতুন উপসর্গ হয়েছে, আমার জন্ম মেয়ে দেখা’ বলেই লোকটি হা হা করে হাসলে, লোকটি কথা বলছে যখন মল্লিকা তার দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে শুধু একথাই তার মনে হয়, এ লোকটি অনেক বদলে গেছে। একই ভাবে লোকটি অনেক কাল এ জগতে বাস করেছে অথবা,—ঠিক এমত সময় শোনা গেল।

‘ভৌদা বাড়ী এলি’ বলতে বলতে কদমছাঁটা গিন্নী দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, তার মুখে চোখে দেবাজের উপরস্থ আলো কিয়ৎ পড়লো, এবার গিন্নী মল্লিকাকে দেখতে পেলেন, বললেন, ‘ওমা বুড়ু কতক্ষণ—’

মল্লিকা গিন্নীকে দেখেই জড়সড়, তার মুখের রক্তিমতা আবার দেখা দিল, কেননা তার কিছু এক কপট অভিসন্ধি ছিলই তা যেমন বা আরও স্পষ্ট, ঘরের এ অল্প আলোতেও। মল্লিকা কোন ক্রমে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে, ‘এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম আমার—’

‘তা বেশ বেশ, তোমার মা কেমন, বাবা।’

‘সবাই ভাল, অনেকক্ষণ এসেছি।’

‘বোস বোস চা করি আগে’ বলে গিন্নী তাকে নিয়ে দালানে একটা আসন পেতে দিয়ে বললেন, ‘বস।’

মল্লিকা আডডাখে দেখলে ঘরের অভ্যন্তর যেই লোকটি দেবাজস্থিত আলোটাকে নামালে, ঘরের আসবাবের ছায়ার ওলট-পালট হলো, কেউ কেউ এতে করে গাঢ় হলো, লোকের হাতের ছায়াটা, স্পষ্টই দেখলে, প্রকাণ্ড বিপুল। লোকটি শুয়ে

পড়লো এবার, ‘আঃ’ একটা আরামের শব্দ, এই বোধহয় চীৎকার ! এমতই তারপর নভেলটা মেলে ধরলো, স্থম্পষ্ট আর দেখা গেলো না। এমত দৃশ্বে মল্লিকা কোন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, সে আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাইলো না। অনেক সময় সেও লোকটিকে দিয়েছিল, লোকটি যেমন কেমন ধারা হয়ে গেছে।

গিন্নী বলছেন, ‘ভোঁদা আমার কোথাও যায় না, অফিস আর বাড়ী ব্যাস্।’

মল্লিকা তাকে বাধা দিয়ে তখন বললে, ‘আর দেবী করবো না মাসীমা, দেবী হয়ে যাবে’ বলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো, একটু উচ্চ কণ্ঠে বললে, ‘ব্রজদা চলনুম।’

লোকটি, ব্রজদা তেমনই শুয়ে, বললে, ‘আচ্ছা আর একদিন এসো...’

মল্লিকা অন্ধকার আর গ্যাসের আলোর মধ্য দিয়ে একটা একটু বড় রাস্তায় যখন পড়েছে এখন তার আপন মনের দিকে চাইবার ক্ষমতা, তার তিলেক ছিল না এমতই। মন তার এতে করে এত বেশী শুধু তা যাবৎ না স্পষ্ট আলোতে দেখা যায় তাবৎ বুঝবার উপায় তার নিজেই ছিল না। অসম্ভব তাঁর এ অভিজ্ঞতা, ব্রজকেই তার ভাল লাগতো, আর সে কিনা এমন ধারা হয়ে গেছে, এ তার যদি কোনক্রমে জানা থাকতো তাহলে একটা নিশ্চিত যে সে কখনই সেখানে যেতো না। মল্লিকা কি চেয়েছিল, যে ব্রজ তাকে একবার দেখুক, ভাল করে দেখুক বা হাতের উপর হয়তো বা হাতখানি রাখতে পারতো। একথাও মল্লিকার মনে পড়লো আচ্ছা ব্রজদার মার কি কিছু তাকে দেখে মনে হয়েছিল ! কে জানে !

কিছুই তো নয়, একটা লোক এবং তার দৈনন্দিন কার্য পরস্পরা আর এক মানুষকে কি ভাবে আঘাত করতে যে পারে তা মল্লিকার আপনাই ধারণার বাহিরে ছিল। ব্রজ, তার এই ধারণা ছিল তাকে ভালবাসতো বা ভালবাসতে পারতো। মেয়েমানুষকে যে ভালবাসতে হয় লোকটা যেমন এই সাধারণ কথাটুকুই জানে না।

মল্লিকা ব্রজর এমত উদাসীন ব্যবহারে অত্যন্তই আহত হয়েছে, সে নিজে যখন সকল কিছু ভাব প্রকাশ তো করছিল, এই হার তাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। এখন কোথাও মল্লিকা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে—তার চাই কাউকে কোন ব্যক্তিকে— এখানে রাস্তায় একটা ছোট অন্ধকার সেখানে সে যেমন দৃপ্তভাবে দাঁড়াবার সাহস পেলো, একদিকে বাড়ীর রাস্তা অন্যদিকে আনন্দের বাড়ী, সে আনন্দ।

দরজাটা খোলাই ছিল, মল্লিকা হালালে ঢুকতেই দেখলে তোলা উত্তনে টগবগ করে বোল ফুটছে, নতুন পটলের গন্ধ আর বাগদাচিংড়ির স্বাদ সমস্ত স্থানটি ভরে আছে। মল্লিকা দেখলে, ঘরে একটি লোক আয়নার সম্মুখে সবেগে চুল আঁচড়াচ্ছে,

পাশে একটা ছোট মেয়ে, ও পুঁটি। আনন্দের মা সেই ঘর থেকে দালানে আসতেই মল্লিকাকে দেখেই—‘ওমা বুড়ু কি খবর রে—বোস বোস।’

‘এই এলুম।’

এখন আনন্দ আয়না থেকে ঘাড় ফিরিয়ে মল্লিকাকে দেখে মুচকি হাসলে, বললে—‘কি খবর—বসো।’

মল্লিকাকে বসতে দিয়ে, আনন্দের মা একটা কাঁসিতে ঝোলটা ঢেলে রাখে, হাত ধোয়, একটা কেটলীতে একটু জল চাপিয়ে দিয়ে এবার মুখ তুলে বললেন, ‘বল শুনি—তোর মা কেমন আছে, বাবার হাঁপানি।’

মল্লিকা আনন্দের মাকে একবার দেখলে, তার ভাল লাগলো। ঠিক এমত গৃহিণী হতে ভারও সাধ হয়, বেশ পরিপাটি, বেশ কর্মপটু, আদর যত্ন ব্যক্তি বকেয়া থাকে না। মল্লিকা আস্তে আস্তে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলে, এরপর আনন্দ তার সাজ হয়েছিল, সে এসে দাড়ালো, বললে, ‘চলি মা।’

‘সে কি রে চা খাবিনি, তোর জগ্গেও তো চা চাপিয়েছি।’

‘না দেবী হয়ে যাবে।’

‘আচ্ছা তাহলে যা, আর কাল সকালেই আসিস, না হলে উনি কিন্তু বড্ড রাগ করবেন, আর বৌমাকে হাওড়া থেকে একটা ফিটন করেই আনবি—’

‘ট্যান্ডি—’

‘না না ট্যান্ডির দরকার নেই।’

‘আচ্ছা ফিটন এক টাকার মধ্যেই হবে।’

মল্লিকা এখন যেমন সে বেয়াকুফ। যে সে ভালভাবে আনন্দের দিকে চাইতে পারলো না, কবে তার বিবাহ হলো, কবে তার চাকরীই বা হলো! আশ্চর্য! তার আপনার প্রতি অতি ক্রোধ জন্মায়। বারবার বলছে, সে কি এতকাল মরেছিল। ব্রজর দাঁত বার করা হাসি আর আনন্দের কাঁতিকবেশে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা দেখার জগ্গই এতকাল যৌবনের সকল সৌন্দর্য নিয়ে বসেছিল। সে বুঝতে পারলে যে অগ্গই সনাতন পৃথিবীর সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন হবে, নিজের কাছে আপনার একটি মূল্য সে ধরে দিতে চাইছে সত্য, কিন্তু একথাও বুঝলে বড় কাল বিলম্ব হয়েছে। যে অহুভবের দামে সে সারা জীবনটাকে পেতে পারতো, কল্যাণ আর পাবেই না। ভাল, কিন্তু যে সাহস আজ, এমত সাহস তার ছিল কোথায়, গতকাল তো তার প্রেমের নামকে চমকে উঠে শোনাই তো ছিল তার ধারা। মাহুকের চাহনি আর হিংস্রতাকে ভিন্ন করে দেখেছে কি।



অ্যামহাস্ট' স্ট্রিটের রাস্তা, ছোট পার্কটা অনেক ভীড়, কাঠে কৌদা ছবি এমত । মল্লিকা ভাবলে রাস্তার এই গাছটির তলে দাঁড়াই, সে দাঁড়ায় । আঁচলটা তার চোখে চাপতে ইচ্ছে করলো, এ কারণে যে তার হারটা সম্যক সে বুঝেছে । এও শুনেছে ; লেখার মত সেও শ্রামবাজারের মোড়ে চপ ভালো, হারিসন রোডে আগ্রার ডালমুট পাওয়া যায়, আমড়াভালায় ভাল লসীর খোঁজ রাখবেই । চপটি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নির্জন পার্কে দাঁড়িয়ে বা বেঞ্চে বসে গপাগপ করে খাবে, কোকিলের গান আসে, হাওয়া আসে, শীতলতা, সে সব ভ্রক্ষেপ করবে না, চারিদিক চেয়ে একটু কাপড় তুলে সায়্যা, সায়্যাতে হাত মুছবে । অথবা বীণা যেমত স্বভাবের, কোথায় ব্রাসিয়ে ( বড়িস ) পাওয়া যায় তার খোঁজ রাখে, হরেক রঙ, লাল, নীল কোনটা আবার 'একোয়া মারাইন' ? সায়্যা আর তাই পরে সন্ধ্যায় আয়নায় অনেককাল কাটায় ।

কি ভাবে একভাবে চেপে বসেছে যে, সব কিছু হারাচ্ছে, এ তার মনকে কেই বা বুঝায় ! রাস্তায় এমন ঘটনা নেই, লোক নেই মুহূর্তেই তার মনে হতে পারে সব ভুল ।

'ওমা বুড়ু—মল্লিকা না ।'

'আরে শোভনাদি ।'

'তুমি এদিক দিয়ে ।'

'আমার এক আত্মীয়র বাড়ী এসেছিলুম, রাস্তাটা বেশ ফাঁকা তাই ঘুরে যাচ্ছি, কলেজ স্ট্রীট বাব্বা দম বেরোয়—আপনি ?'

'বাড়ী, চল না আমার...না না যেতেই হবে...'

শোভনার চোখে অন্ত এক আলো এসে পড়েছে, তার চোখমুখে দেখা যাবে পুরুষালী দাঁপ্তি, যে দাঁপ্তি, যে কোন রমণী, যে সে ঘাটের পথে, বাটের পথে, চিকের আড়াল হতে দেখুক, ভাল এ দৃষ্টি লাগবেই । শোভনা এখন মল্লিকার হাতটা ধরে ফেললে, যদিচ হাত ধরাটার কোন প্রয়োজন ছিল না । শোভনার স্পর্শের মধ্যে কেমন এক দিব্য উষ্ণতা, এ উষ্ণতা বহুকাল বয়সী বহুজন প্রিয় । মল্লিকার এ উষ্ণতা ভাল লেগেছিল, ভারী ভাল লেগেছিল । বললে, 'চলুন ।'

'চল না ছাদে বসি একটা মাদুর পেতে ।'

ভারতীয় চিত্রতে যেমত বিছানা তেমনই এ বিছানা, একটা বালিস, ওপাশে দেওয়ালে ঝঙ্কার । এখানে আজ আধছায়া আকাশে চাঁদ আছে । মল্লিকা ওপাশে বসে কি কথা কইবে ভেবে পায় না, দুঃখের কথা ছাই আর কইতে ইচ্ছে হয় না ।

শোভনা আর একবার মল্লিকার দিকে চাইলো । মল্লিকা দেখা যেমন বা ভার

ফুরাতে জানে না, গম্ভীর অতি। শোভনার কানে দমকা আওয়াজ এল ‘বেল্লু...’  
শোনা মাত্রই শোভনা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘এক বাটি।’

শুভ ছাদ, চারকোণা, চারকোণা এক অলুভব, উপরে আকাশে রাত্রি তদউর্ধ্ব  
শ্রামনীলিমাই। মল্লিকার সমস্ত ক্লাস্তিটা অথবা যে যাকে এতাবৎ আপসোস বলা  
হয়, ক্রমে এখন এই প্রতীয়মান যে যা তা আর নাই। এক্ষণে, আপনকার শাড়ীটা  
ঈষৎ আউরে দিয়েছিলই, এলো করেই দিয়েছিলই সেখানে যেখানে করার ছিল।  
মন তার সত্যই যথার্থ বাস্তব হয়ে উঠেছে, অল্প আর সময়ে—হয়তো এই মনই  
ফুলের গন্ধ কই জোনাকি কোথায় বলে ভারী অপ্সর হয়ে উঠতই, এ সত্য তার  
জানা। এ কারণ এই, চিরকাল ভাল লেগেছে সোডা সাবানের গন্ধ অথবা ফোড়নের  
বাস, এর বড় ভাল লাগা তো তার আছে! যথা তার জীবন আছে, যথা তার  
অমরতার দাবি আছে। শোভনার এ ব্যবহার বড় আপন বলি মনে হয়, বহুদিনেব  
শোভনাদি! না তা কেন, বহু যুগের শোভনাদি, গায়ে রঙ যার হালি মুগের মতত।  
মল্লিকার আজ কেমন হয় যে সে শোভনার জীবন জানার প্রয়োজন বোধ করে।  
এখন শোভনা দরজায়, দেখা যায় তার হাত দুটি পিছনেই, আবদ্ধ সম্ভবত। গায়  
তার ব্লাউজ নেই—শাড়ীটা হাওয়া হাওয়া, মল্লিকার তা নজরে পড়ল।

‘ভাই বড্ড গরম আর গায়ে জামা রাখতে পাচ্ছি না, বৃড়ু তোমায় আজ খেয়ে  
যেতে হবে।’

‘সে কি, না না’—

‘না না শুনবই না, যতবারই বলেছি ততবারই না না, আজ খেতেই হবে,  
বলা শেষ না হওয়ায় আগেই শোভনা বসলো, এবার কিঞ্চিৎ নিকটেই।

সগুফুলের বিনীতি গন্ধ এখন সমস্ত আবহাওয়া, এমনও যে বহু দূরে আকাশে  
নক্ষত্রে এবং গভীরতায় প্রভাব হানলে, আর এইখানে পুরাণের এক উপার স্বাধীনতার  
স্বাদ আনল যে সে ফুলের গন্ধ ছিল এমতই জোর। সে ফুলের শ্বেতরূপের সঙ্গে  
চন্দ্রালোক সম্ভব কৃষ্ণময় সর্ব্জতা, অথচ কোন কাঠিন্য নাই অথচ কোনক্রমেই অশিষ্ট  
নয়, একটি নদী ঝটিতিই ব্যগ্রভাবে নিমেষেই নেমে সম্মুখে এলো—সঞ্জলিবদ্ধ, ফুল -  
শস্তার এ কারণেই এর উত্তরে—যে নিশ্বাস প্রযুক্ত মহিমাধিত মরজ্জগত যে সে তা  
লক্ষণে বর্ধিত হয়েই, যুবতী ঘোবনার সম্মুখে উদ্যোগ স্পষ্ট হয়ে উঠলোই। এখন  
মল্লিকা এ ফুলের মাথায় থ, বেবাক। কোনক্রমে আপনকার চক্ষুদ্বয় তুলে শোভনার  
চোখের উপর ধরলে, সেখানে যে হালি পাথর হয়েছে সে পুরুষেরই এমতই, বা হাতে,  
হাওয়াকৃত আন্দোলিত চুলগুলি এখন সে ঠিক করেছিল, আর আরও বিচক্ষণতা

সহকারে মনটা সে ঠিক করতে চাইলে, এ সময় শুনলে, 'তোমার জন্ত' 'নাও না তোমার জন্ত' শোভনার গলা, রাতজাগা শেষরাতের গলার কিছু। অবশ্য অসভ্য অর্থ করা যেতে পারে। আবার সে বললে, 'পরো না খোঁপায় না গলায়...'

মল্লিকার বুক যেমন হিম শুধু আতিশয্যেই। আপনকার গলা পরিষ্কার করে বললে, 'আচ্ছা সে আচ্ছা শোভনা দি...না...খাক।'

'বল না বল না।'

'আচ্ছা আপনি কখনও কাউকে ভালবেসে.....'

মল্লিকা, শোভনা তার হাত ছোটো ধরে টেনে আপনার কাছে আনলো, কাঁচের চুড়ি ভেঙে টুকরো, ভাঙার শব্দ এতই অল্প যে লোক জড় করলে না অথচ বিজ্ঞরা বলবেন প্রয়োজন ছিল। শোভনা আপনার মধ্যে মল্লিকাকে এনেছে, সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিয়েছে, সে মালা তার কণ্ঠে বিলম্বিত, চুষনে চুষনে চুষনে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে। এবার শোভনা খাদের গলায় 'কই তুমি তো আমায় খেলে না। তুমি আমায় ভালবাস না?'

'বাসি!'

মল্লিকা শোভনাকে বিশেষ অপটুতার সঙ্গে গভীরভাবে চুষন করলে।

শোভনা জিজ্ঞাসা করলে, 'আগে কখনও কাউকে কখন এমনভাবে...'

'হ্যা...আচ্ছা আপনি?'

'আমায় তুমি বল, আমি তোমার কে? বল?'

'আচ্ছা তুমি।'

'না' দৃঢ়কণ্ঠে শোভনা বললে। বোধহয় মিথ্যা। হেসে বললে, 'আমি তোমার স্বামী তুমি—'

'বউ।'

শুনে শোভনা আবেগ চুষন করলে। শোভনার মুখস্থত লাল মল্লিকার গালে লাগলো।





সেনমশায় কৃতী পুরুষ।

কৃতিত্ব কি বস্তু, তা তিনি আসলেই জানেন। যেমন ধরা যাক, টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি অথবা বাড়ি-গাড়ির সমাবোধকে তিনি আদৌ কৃতিত্ব বলবেন না। কৃতিত্ব হচ্ছে নিজেকে সবলভাবে পাওয়ার মধ্যে।

তাঁর স্বপ্নমশায় সারল্যের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইরকম : স্বযোগ পেলে তাব ব্যবহার করা অসারল্যের লক্ষণ নয়। আসলে তুমি যখন ঠকে গেলে তখনই সরে দাঁড়াচ্ছে, আর মন থেকে মুছে ফেলছে সবকিছু তখন তুমি সবল।

এইজন্তে আমাদের সেনমশায় সীমান্ত বরাবর পরিষ্কার একটি সরলরেখা টেনেছিলেন। কালক্রমে এই পথের অহুসারী তিনি সার্থকতার মুখও দেখেছিলেন, তবে অপরপক্ষে তা সন্দেহাতীত না-ও হতে পারে।

দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব মানুষেরই আলাদা। একের অভিজ্ঞতার স্বাদ অগ্বে বোঝে না। তাই এই সব কিছুই সমন্বয়ে স্বতন্ত্র মানুষ গড়ে ওঠে। জীবন-বাবাস্কীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলার সময় সবাই আপন ঘর সামলাতে ব্যস্ত। সাধারণত দেখা যায়, এই মহাপ্রভুকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো শক্ত, তুমি যদি ডালে ডালে ফেরো তো তিনি পাতায় পাতায় ঘুববেন। সেনমশায় বলেন, ব্যাপারটা উল্টে দিতে হবে। আমি এই সহজ আছি, দেখি তুমি কেমন করে ঠকাও।

সেনমশায় একটি দোকানের মালিক।

লোকে বলে সেনমশায়ের দোকানে গরু হারালে গরু পাওয়া যায়। অবশ্য একটু বাড়িয়ে বলে। গরু ঠিক তাঁর দোকানে পাওয়া যায় না, বাসায় যেতে হয়—দোকান থেকে খুব বেশী দূরেও নয়। খাড়ি-গুঁড়ো মিলিয়ে গোটা সতেরো হয়েছে। খবলী

নামক গাভীটি এই বংশলতিকার মূল এবং অষ্টাবধি জীবিত। সেনমশায়ের ইচ্ছে ধবলী বেঁচে থাকতে থাকতে তার বংশের কোয়াটার-সেঞ্চুরি হয়ে থাক।

গরুর দরকার হলে দোকানে খবর নিয়ে বাড়িতে এসে দাঁত দেখা চলে। এরকম হয়েওছে। কিছুদিন আগে উকিল রিয়াজদ্দিন আহমদ যখন সেনমশায়ের দোকান থেকে তালমিছরি কিনছিলেন দুধ দিয়ে খাবেন বলে এবং খাঁটি দুধ পাওয়া কি পরিমাণ দুধর তার ভয়াবহ বিবৃতি দিচ্ছিলেন, সেনমশায় তখন অর্ধ দিম্পট একটা দুধালো গাই অফার করে বসলেন। শেষটায় অবশু দরে বনে নি, আর উকিল সাহেবেরও বাসায় জায়গা নেই।

অতএব, সেনমশায়ের দোকানে গরুতক সমস্ত সামগ্রী পাওয়া যায়। ডিয়ারবর্ন-এর মার্কোলাইজ্‌ড্ ওয়াস্ক থেকে ভাজা সোন। মুগের ডাল, নশ, হজমীগুলি, ইস্তক গোল আলু। গরমের দিনে তালপাতাব পাখা এবং শীতের মুরহুমে পশমী বস্ত্রও অপ্রতুল নয়। ইঁহরের উৎপাতে অতিষ্ঠ গৃহস্থামী নিশ্চিত বরাভয় লাভের জন্তে সেনমশায়ের আশ্রয় নেন। সেনমশায় তাঁর কাছে এক প্যাকেট র্যাটম অথবা একটা খাঁচাকল বিক্রি করতে উৎসাহী হন স্বাভাবিকভাবেই।

মোহনপুরের ঘি, তিল তেল, চূয়া এবং গোলাপজলের র্যাকর্টার উন্টো দিকের র্যাকেই শিয়ালকোটের ফুটবল ইত্যাদির 'বিপুল সত্তার' সর্বদাই বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

সেনমশায়ের স্ত্রী শ্রীমতী নন্দরানী।

নন্দরানী সেনমশায়ের স্ত্রী হন প্রথমে অথবা সেনমশায় নন্দরানীর স্বামী হন প্রথমে বলা মুস্কিল। তবে নন্দরানী বলেন, সেনমশায় তাঁর বাবার দোকানে কর্মচারী ছিলেন। বিবাহের পরে একটি গাভী (ধবলী), সামান্য কিছু নগদ টাকা এবং পরিশ্রমপটু শরীর নিয়ে তিনি সেনমশায়ের ভাগ্য গঠনে শরিক হন। বস্তুত, ভদ্রমহিলা এই বয়সেও যা পরিশ্রম করেন তাতে তাক লেগে যায়। চাকর সেনমশায়ের বাসায় থাকে না। বারোটি গো-পুঙ্কবের ময় পরিষ্কার করে, এক দিন, দু' দিন অথবা তিন দিন। পরেই সে আপন প্রস্থানের পথও পরিষ্কার করে নেয়। একবার কেবল এক বিশালদেহী পশ্চিমা চাকর এসেছিলো অভাবে পড়ে। সেনমশায় স-বংশে খুশী হয়েছিলেন—যদিও তার মেয়াদ মাত্র দশ দিন ছিলো।

অতএব সেনমশায়ের সাকসেস লিস্টে (১) নন্দরানী, (২) দোকান এবং (৩) ধবলীর নাম তোলা থাক।

কিন্তু সাকসেসন লিস্টে নাম মাত্র একটি : সেন-দম্পতির অবর্তমানে পাল্লিঙ্ক

তথা আইনালুখায়ী গৃহীত পোস্তপুত্র ননীগোপাল সেনই সমস্ত সম্পত্তির (গোপণ সহ) উত্তরাধিকারী।

নন্দরানীর ছোট বোন দেবকীরানী অপাত্রে পড়েছিলো। দু'টি মাত্র পুত্রসন্তান, কিন্তু তাদের মুখেও অন্ন উঠতো না। নন্দরানী করুণাপরপরশ হয়ে কনিষ্ঠটিকে নিজের কাছে এনে রাখেন। বয়স হওয়া সবেও স্কুলে ভর্তি করে দেন। তারপর খাড়া ননীগোপাল যখন ক্লাস ফাইভে পড়ে তখন জ্বর তর্জনে অতিষ্ঠ সেনমশায় তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

অবশ্য দোকানে সাহায্য করার জন্তে সেনমশায়কে একজন লোক রাখতেই হতো। সে-ই একাধারে দোকানের কর্মচারী, ব্যবসায় পরামর্শের সহকারী, গোপণের রাখাল এবং অবস্থা বিশেষে পাচক ও ভূত্যের কাজ চালিয়ে নেয়। শ্রীমতী নন্দরানীর ভাষায়, বাড়ির ছেলের মতন থাকে।

সেনমশায়ের আরও অনেক গুণ আছে। প্রস্তুত-প্রণালী দেখে এবং হাতে-কলমে শিখে তিনি স্নো, টুথপাউডার, কেশটেল, নশ্ব ইত্যাদি ইত্যাদি তৈরি করতে শিখেছেন এবং এটা এককালে বেশ ফলাও ব্যবসা ছিলো। দোকানে 'কর্মচারী' হিসেবে যে-ই আসে তাকেই অবস্থা বুঝে সেনমশায় এই বিছাগুলো শিখিয়ে দেন।

ব্যবসার আগে খুব জোর ছিলো। ইদানীং মন্দা পড়েছে। দোকানে পণ্যের রকমারি বৃদ্ধির এ-ও একটি কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। এককালে বাইরে থেকে আসা মাল দোকানে সাজিয়ে বাসার ফিরতে রাত দুটো-আড়াইটে বাজতো। খেলার মাঠের শটকাট রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেনমশায় তৎকালীন কর্মচারী কার্তিককে বলতেন, এখন আমাদের বেগুন টাল। অর্থাৎ এক বেগুন গাছে অজস্র বেগুন ফলছে। আর এখন নিতাইকে বলেন, মুলো টাল—একটি উপড়োলে আর কিছু থাকে না।

ওর মাথার সূচিকর্ণ কেশরাশি নির্লঙ্ক শুভ্র। হেয়ার ডাই ব্যবহারে তাঁর আপত্তি। যদিও নিজ হাতে তিনি 'মনিং স্টার' হাজার হাজার ফাইল বিক্রি করেছেন। কিছু দিন মাথায় বিলিতী তেল ঢেলে কেশের শুভ্রতা হ্রাসের প্রয়াস পেয়েছিলেন, বর্তমানে অহস্তে প্রস্তুত মধ্যমনারায়ণ মাখেন।

এইবার একে একে সেনমশায় পরিচালিত ফার্মগুলোর (আণ্ডার ওয়ান রুফ) নাম করা যাক :

- ১। মনোহারী ও স্টেশনারী ডিপার্টমেন্ট (কোনো নাম নেই)।
- ২। মূরী ও বেনেতি ডিপার্টমেন্ট (ঐ)।

- ৩। ক্রীড়া সরঞ্জাম (সেন স্পোর্টিং কোং)।
- ৪। পারফিউমারি সেকশন (ইউনাইটেড কেমিক্যাল ওয়ার্কস)।
- ৫। কবিরাজী ডিপার্ট (আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট)।
- ৬। অগ্নাগ্র (ইনক্লু ডিং তালপাখা, পা-পোশক, তামাক ইত্যাদি)।

কিছুক্ষণ আগে সকাল হয়েছে। শানবীধানো গোয়াল থেকে গোবংশের হটপাটের শব্দ কানে আসে। তাদের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের গন্ধে বাড়ির বাতাস ভারী।

বী পাশে বিচালির প্রকাণ্ড ছুপ। সেনমশায় দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছেন। ডান পাশের জায়গাটা ক্রমে চার ইঞ্চির মতো করে কাটা বিচালির টুকরোয় ভরে উঠছে। সেনমশায়ের সামনে ছোটো একটা খাটো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে কাঁচি রাখা। মাঝে একবার হাত দিয়ে তিনি তার ধার পরীক্ষা করলেন। ধার কমে এসেছে। সেনমশায়ের নির্দিষ্ট সময় উত্তরে যাচ্ছে। আরও তাড়াতাড়ি হাত চালাতে হয়।

ওদিকে ননী এবং নিতাই টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে জল আনছে বালতি ভরে। বড়ো বড়ো মাটির গামলা ভরে উঠছে আশু আশু। রাতের ভেজানো খইলগোলা এনে সেই জলে ঢালা হলো। তারপর কাটা বিচালি ঠেসে মেখে দেওয়া হলো।

ধবলী এবং তার বংশধরদের কাজ শুরু হয়। তারা ছটোপুটি করে মুখ চালাচ্ছে। খানিকটা কলাইয়ের ছুবি জাবনার ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া গেলে তারা মচ্ছবের ভোঙ্ক মনে করতে থাকে।

কালো গাইটার সঙ্গে নন্দরানী কিছুতেই পেরে ওঠেন না। বাঁটে হাত দিতেই লাথি ছুঁড়ছে। অগত্যা নিতাই (দোকানের কর্মচারী-কাম-গোগণের রাখাল-কাম-পাচক-কাম-গৃহভৃত্য-কাম-গৃহশিক্ষক—সেনমশায় দুপুর বেলাটা একলা দোকান চালাবার কষ্ট স্বীকার করে তাকে কুলের শেষ ক্লাসে পড়বার সুযোগ দিয়েছেন। গর্ত, সে ননীকে সময়মত পড়া দেখিয়ে দেবে।) নন্দরানীর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। দু'চার বাড়ির চাকররা এরই মধ্যে এসে পড়েছে। নন্দরানীর দুধের বিশুদ্ধতা নিয়ে কারো সন্দেহ নেই।

সেনমশায় হাতের কাজ শেষ করে উঠে পড়লেন। পরনের গামছা খুলে তলধুতিখানা পরে নিলেন। মধ্যমনারায়ণ তেলের শিশিটা বারান্দায় তাকের ওপরে ঠাকে। সেনমশায় সেদিকে বান। আনের শেষে একটু তুলসী-ভজনা হবে।

( স্বামী-স্ত্রী দুজনেই “নমো তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়সী” বলে দৈনন্দিন আঙ্গিক সেরে থাকেন— গানটা সেনমহিষী নবদ্বীপ থেকে শিখে আসেন । ) তারপর জলযোগ শেষে নিতাইকে আসতে বলে সেনমশায় দোকানের উদ্দেশে পা বাড়ান ।

কিন্তু আজ মধ্যমনারায়ণ বসাতে একটু বেশী সময় নিচ্ছে । হাতটা তেমন চলছে না । সেনমশায়কে দেখে সন্দেহ হচ্ছে, আসলে হয়তো কাঁচির ধার তেমন কিছু কমেনি ।

এক সময় মধ্যমনারায়ণের হাতখানা খেমে পড়লো । তিনি আরও একটু থমথমে হলেন ।

নিতাই, দোকান যাওয়ার পথে পরেশবাবুর বাড়ি হয়ে যাবি, বলে তিনি উঠলেন । ঘরের মধ্যে জামার পকেট থেকে একটা লম্বা ফর্দ বের করে এনে নিতাইয়ের হাতে দিলেন, উনত্রিশ টাকা ছয় আনা । বলবি আজই দিয়ে দিতে ।

নিতাই চোখ তুলে তাকালো দেখে সেনমশায় বলেন, না, ভদ্রতা করে কি লাভ । টাকার কাজ আছে । সেনমশায় আরো গম্ভীর ।

কিছু পরে তিনি দোকানে বেরিয়ে গেলেন । জাবনা দেওয়া শেষ হলো । ননীর ছুটো অঙ্কও কবে দেওয়া হলো । এবার দোকান যেতে হয় নিতাইকে । নন্দরানী যেতে দিলেন না, গোবর জমেছে একগাদা, ছড়িয়ে দিয়ে যা ।

কোমরে, গাঁটে কেমন একটা ফিকব্যথা । সকাল বেলায় ঠাণ্ডা জল গায়ে ছিটিয়ে ঘুম ভাঙানোর একটা অভ্যুপ্তি । নিতাই লাল চোখে নন্দরানীর দিকে তাকালো । সকালের রাগটা আবার সমস্ত শরীর কাঁপায় । নড়ে না । মনে মনে সেই গানটা আঙড়ালো, ‘জিনয়নী দুর্গা।’ রাগ হলে নন্দরানীকে তার জিনয়নী মনে হয় । ( জিনয়নী তিন নম্বর নয়নটা ভাগ্যে কাজ করে না । )

তবুও নন্দরানী মাঝে মাঝে বলেন, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি । বাবু নবাব সাহেব ।

নিতাই নিজেকে কাক । অতএব জানে ভাতের লোভ কি বস্তু । বারবার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হলো, গোবরের গন্ধ সহজে যেতে চায় না । বাজারের থলে নিতে হলো । দোকানের কাজ শেষ হলে বাজার করে বাসায় দিয়ে স্কুলে যাবে নিতাই ।

অতএব, খেলার মাঠের মাঝখানটা হেঁটে পার হতে বৃক্কের মধ্যে একটা কনকনে ব্যথা উঠলো তার ।

( নিতাইয়ের জন্তে সান্দনা : গত পূজায় ননীকে এবং তোমাকে একইরকম জামা-প্যাণ্ট দেওয়া হয়েছিলো । এবং তাই পরে দুজন দোকানে এলে একজন



খরিদার ছ' ভাইয়ের খুব প্রশংসা করলো, মনে নেই ? নন্দরানীকে একবার বোনের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় এক সহযাত্রিনী বৃড়ী এটি বডো ছেলে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, মাসতুতো বোনের ছেলে, মনে নেই ? )

যাই হোক, সেনমশায় বললেন, নাঃ, আর পারি না, লোকের সঙ্গে ভদ্রতা রেখে পারি না। সম্পর্ক রেখে পারি না।

মুখটা, চোখ দুটো, কান দুটো লাল হলো।

সন্ধ্যার দিকে তাঁর দোকানে অনেকে আসে।

গতকাল সন্ধ্যায় পরেশবাবু দোকানে বসেছিলেন। এমদাদ আলী অফিস থেকে ফিরে বাসায় যান না। বাসা দূরে। সেনমশায়ের দোকানের তালমিছরি চুবে সান্দ্য অবসরটুকু কাটান।

যেহেতু একই অফিসে চাকরি করেন, অতএব এমদাদ আলী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি, পরেশবাবুর লেটেস্ট রেজাণ্ট কি ?

পরেশবাবুর পাঁচটি কল্যাণ ও একটি পুত্র, স্ত্রী বর্তমানে সন্তাবনাময়ী।

পরেশবাবু একটু ক্লিষ্ট হেসেছিলেন। বলেছিলেন, দিন কয়েকের মধ্যেই বেরুচ্ছে।

দোকানে খরিদার ছিলো না, সেনমশায়ও তাই আলোচনায় অংশভাগী হতে চান।

এমদাদ আলী চোখ তুলে বলেন, বিয়ে না করে ভালোই করেছি, কি বলেন মশাই ? দেখুন দেখি, চুল পাকেনি এগনে।

সেনমশায় পরেশবাবুর দিকে চেয়ে থাকেন। পরেশবাবু একটু হেসে বলেন, তা আমার মাথায় পাকা চুল পাবেন না। বড়ো মেয়েটার জন্তে মাথায় পাকা চুল রাখা যায় না।

সেনমশায় পরেশবাবুর দিকে চেয়ে থাকেন।

এমদাদ আলী আবার বলেন, তা পরেশবাবু, আপনাদের কিন্তু খুব উর্বরা।

সেনমশায় জায়গা থেকে উঠে দুই চারটে বাস্তু ধরে টানটানি করছিলেন। কিন্তু না, বলতেই হলো, এতে লাভটা কি ? শেষে তো হবে হাড়ির হাল।

পরেশবাবু এমদাদ আলীর দিকে চেয়ে বলেন, লাভটা আপনারা বুঝবেন কেমন করে ? মাথা থাকলে তবে তো মাথাব্যথা বোঝা যাবে।

মুখটায়, চোখ-কান দুটোয় গরম হলুকা লেগেছিলো সেনমশায়ের।

নিতাই এসে দোকানে ঢুকলো। বললো, পরেশবাবু বলেছেন, ছ' তারিখে সব মিটিয়ে যাবেন।

আরে রাখ রাখ ছু তারখ। কতো ছু তারিখ বাবে। সেনমশায় গরগর করেন, ব্যাটারী যেহো শূয়রের মতো—।

দোকান ঝাঁট দিয়ে, শুছিয়ে, বাজারের থলে এবং টাকা নিয়ে নিতাই বেরিয়ে গেলো। ফিরে এসে পাই-পয়সাটির হিসাব পরিস্ত সে দিয়ে থাকে।

উনি তুফীস্তাব অবলঘন করে বসে আছেন। দোকান থেকে বেরতে নিতাইয়ের কথা মনে এলো। আসলে 'তুফীস্তাব' কথাটা খুব স্পষ্ট নয়; হলে নিতাই বলতো না, 'শালার ব্যাটা তুফীস্তার !'

কিন্তু সেনমশায় আমাদের অনেক জানেন, অনেক দেখেছেন। জীবনটাও অনেক দূর এগিয়েছে। বেগুন টাল মুলো টালে পরিণত তবুও তিনি স্বচ্ছ। ইউনাইটেড কেমিক্যাল ওয়ার্কস আজ লজ্জায় মুখ লুকনোর পথ পায় না, সেনমশায় জানেন! অয়েবেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জায়গা ক্রমাগত ভাজা মুগের ডাল দখল করতেও তাঁর মনে তুফীস্তাবই জাগে। দুপুরে কাজলীদের গা-ধোয়ানোটা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

সেনমশায়ের দোকানে পুরনো ধরনের কেতা। চেয়ার আছে কয়েকখানা খরিদ্দারের জন্তে। নিজেদের বসা হয় গদিতে। এখন দুর্গাপুরের কথা মনে পড়তে তিনি গদির পিছনের রয়াকটায় হেলান দিয়ে বসেন। চোখের সামনে রোদের আয়নায় দুর্গাপুরের মাঠ ঝকমক করে। বাতাসগুলো হু হু। বাজে, বাজে, রাখাল বাঁশী বাজায়। স্খ।

কিন্তু এখন হুংখ। এই হুংখ কোথায় থাকে? সারা জীবন বেয়ে বেয়ে মাথায় ওঠে। নেয়ের কুকুর। সে এসে সব কাজে সামনে দাঁড়ায়। সে-ই স্খ। দুর্গাপুর, মাঠ, রোদ, বাতাস, বাঁশি, স্খ, হুংখ, স্খ।

সেনমশায়ের বাশায় কাঠ কেনার কারবার নেই। ধবলী সবংশে সাহায্য করে কাঠ কেনার খরচ বাঁচিয়ে দেয়।

নন্দরানী আরও হুংখানা ঘুঁটে উঠুনে গুঁজে বারান্দায় এসে ডালের কুলো নিয়ে বসলেন। হায় রে হায়, নন্দরানী, উঠুখল নেই, যমল অর্জুন নেই, নাডুগোপাল নেই, ননী ননীচোরা নয়। সে স্খলে।

এমন সময় ভদ্রমহিলা এসে ঢুকলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম কাপড়টি পরনে। ছোটো একটি পুঁটলি বগলে। চাউনির জ্বাবে বললেন, নন্দদিদি বুঝি আপনি? আমি সুনলাম, এই বাসায় বাঁজা মেয়েলোক আছে, তাই—

নন্দ সন্দেহ সন্দেহ করে তাকে বসবার আসন দিলেন। কে জানে, মাতৃষের কেয়ামতির কি শেষ আছে কিছু? বেশী সন্দেহ ভালো নয়।

আমার আর এসবে কি দরকার, পথটখ সব বুজে গেছে।

পথ কি আর বোজে ভাই! তিনি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞের হাসি হাসলেন, খালি মুখ আটকে থাকে, ছাড়িয়ে দিতে জানা চাই।

নন্দরানী বললেন, কতো দেখলাম, সারা জীবন দেখলাম। শেষ হতে চলেছি, এখন আর দেখে লাভ কি? কতোজন এলো গেলো।

যাহুকরী একটু উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, এখন আমি কিছু চাই না। এক পয়সাও না। যা যা করতে বলবো শুধু তাই করতে হবে। সময়মত এসে খোকার মুখ দেখে সোনার বালা নিয়ে যাবো।

নন্দরানী হাসবেন কিনা ভেবে চূপ করে রইলেন।

অতএব পাঁচটা ডিম বাজার থেকে আনতে হলো। নিতাইয়ের স্কুলে যাওয়া হলো না। 'ত্রিনয়নী' এবং 'তুষ্ণীস্তার' উচ্চারণ করতে করতে সে বাসায় বাজার পৌছে দিয়ে আবার দোকানের দিকে চললো।

ডিম পাঁচটা মস্তপূত হলে পর ভর সন্ধ্যাবেলায় নদীর পারে যে ছুই মুখওয়ালা গতে সাপ থাকে, সেই গর্তে রেখে আসতে হবে। তবে সাপের গর্ত হওয়া চাই অবশ্য। শ্রীমতী এখন কিছু নেবেন না। মাত্র পাঁচ সিকে মস্তদক্ষিণে লাগবে।

নিতাইয়ের মুখে সনে সেনমশায় চটে গেলেন, আবার এই সব!

কিন্তু ভেবে দেখলেন, জীবনটা তাঁর একার হলেও ভোগে অংশীদার আছে। হঠাৎ পরেশবাবুর কথা মনে হলো। পরেশবাবুর পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে। আবার হবে হয়তো ছেলে কি মেয়ে। পরেশবাবু কাল সন্ধ্যায় দোকানে এসেছিলেন জিনিস নিতে আরও, অথচ আজ টাকাটা দেননি। অতএব তিনি পাঁচ ডিমের দাম ক্যাশবান্ড থেকে বের করে দিলেন। সেই সঙ্গে আরও কিছু টাকা দিয়ে বললেন, নস্টি ফুরিয়ে গেছে। র, পরিমল ছুটাই। মতিহারী কিনে নিয়ে যা। একেবারে তৈরি করে নিয়ে আসবি বিকেলবেলা।

স্কুলে যাওয়া হয়নি। হুঁবার করে বাজার করা। গায়ে জল ছিটানোয় ঘুম ভাঙলো। বাইশ বালতি জল টানলাম। র নস্টি। গন্ধগলা পরিমল নস্টি।

একটার জন্তে ভামাকপাতা মুড়মুড় করে শুকিয়ে হামান দিস্তায় গুঁড়ো করতে হবে । পরিমলের জন্তে পাতা কালোমতন করে জাঁচে শুকোতে হবে । হামানদিস্তা, শিল-নোড়া, আ্যামোনিয়া, মেনখল, পরিষ্কার চূনের জল টেলে সেগুলো মাখা হলে কালো হয় । কাজের শেষে নাক জালা করে । সাবায়াত মাখা ভার, ঘুম হয় না ।

বুড়ী বেটীর ছেলের শখ ! ছেলের আগে নিজেরা পটল তুলবে । শালার ব্যাটা তুফীস্কার । ঠোট কাঁপতে থাকে । কিন্তু সে নিজে কাক, অতএব বাজারের পথে ।

আর স্কুলে বসে আমাদের ননীচোরা নয়, ননীগোপাল তখন অঙ্কের ক্লাসে মিডি-ভান্কার মধ্যমিসিঁড়ি কামড়ে ধরে পড়ে আছে । তারিণী মাস্টার ঠাট্টা করে বললো, সেনমশায়ের পোলা তুই, মাঝসিঁড়িতে আটকে গেলি !

হায় রে হায়, দেবকীর নয়, নন্দরানীর ননীগোপাল লাল চোখে তা কালো ।

ব্যাটা সাপগুলো গর্ত করে কোথায় ? কামড়ানোর সময় ব্যাটার ঠিক হাজির কিন্তু নদীর পাড়ে গর্ত নেই ।

আর একটু সময় গেলেই সন্ধ্য হবে । ওপারের ধানক্ষেতের হলদে আভা মিইয়ে এসেছে । অড়হরের ক্ষেতের ফাঁক দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না । জমাট অড়হর হচ্ছে ।

গোটা কতক গর্ত পাওয়া গেছে । কিন্তু দূরে দূরে । ছুঁটো মুখ কারোরই নেই । নিতাই মনে মনে বললো, বেটীর ছেলের শখ ।

আর খানিক খোঁজাখুঁজির পর দুমুখ অল্প দূরে দুবে একটা গর্ত পাওয়া গেলো । নিতাই বললো, রাখ এখানে ।

খি খি করে হাসলো ননীগোপাল, এ গর্ত কিন্তু শেয়ালের, তা রেখে যাই, শেয়ালভোগ !

কিন্তু নিতাইয়ের মনে হলো, এ গর্ত ইঁহরের, নিখাত ইঁহরের ! সাপগুলো বড়ো শয়তান । ইঁহরের গর্তে ঢুকে থাকে । কোকিলগুলো বড়ো শয়তান, কাককে ঠকায় । সে নিজে কাক ।

খাওয়া-দাওয়ার পর দোকানেই গিয়েছিলেন সেনমশায় । একটু তন্দ্রামতন, কাজটা গদির ওপরে বসে বসেই সারা গেলো । কিন্তু বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কের

मध्ये केमन करे । सापेर गर्त मेला दुःखर । अक्कारे चेना थाय ना । उरा कि एतोक्के वाडिं थेके वेरियेछे ? यदि ना वेरोय !

अल्लक्केणेर जञ्जे दोकान वक्क करते सेनमशाय मात्र दुटो ताला व्यवहार करेन । त्हाई शेवे, दुटो ताला तिनि दोकानेर पाल्लागुलो टेने दिये ताते आटलेन ।

ना, वासाय गिये लाड नेई । एकेवारे नदीर धारेई थाण्णा भालो ।

चोमाथा छेडे नदीर दिके एगोतेई निर्जनतार सक्के अक्कार घन ह्ये एलो । वक्क आदालत पाडार पेछने नदी । विराट अश्वथ आर वटे अक्कलटा सुक्क, गञ्जीर । जमाट अक्कार एखन अस्पष्ट । वाहुड-पक्कायेत अश्वथेर शाथाय दिनशेयेर हिसाव निये महा कोलाहल शुरु करेछे । तांदेर परिपाकयत्त थेके निर्गत वटक्केलर कट्टु गक्के वातास भारी ।

शेवे नदीर पाडे आसा गेलो । नदी अनेक दूरे नेमे गेछे । अतएव तांके थानिक नीचे नामते हवे । शानवाधानो सिंङ्गिटा दिये नामा थाक । यदिउ जल सिंङ्गिर गोड़ा छेडे विश हात तक्काते चले गेछे तवू सेथानकार जल कालो ह्ये थिरथिर करेछे । उपांरेर गाछपालाय जमाट अक्कार । एकटा एकला पाथि, सेनमशाय भालो करे देखलेन, ह्या, एकटा एकला पाथि, एकटा अडहरगाछेर माथाय वसते गाछटा माथा नामिये दिलो, आवार तुललो, आवार नामालो । पाथिर दोलना । गाङ्गशालिक बोधहय, टिटि करे डेके तखनई उडे गेलो ।

आर तखनई तिनि सुनलेन थि थि करे हेसे ननीगोपाल वज्जे, राथ राथ उथानेई । शेयालेर गर्तेई राथ । व्याटार आज महाफुति । पाचटा छेलेर डिम थावे ।

सेनमशाय सिंङ्गिर मावामाछि एसे सुक्क ह्ये दाडिये पडलेन । हु' पाश उचू करे आलिसा देण्णा सिंङ्गिर थाडा नीच थेके स्पष्ट शोना गेल उंदेर कथा ।

उरा ता हले तार आगेई एसेछे ।

अक्कार आर उ कालो ह्छे नदीर सक्के सक्के । किञ्चु तांर जलेर धारे थाण्णा हलो ना । पाये पाये चुपि चुपि तिनि उठे एलेन ।

पा हु'टो वडो भारी बोध ह्छिलो । उठानो थाय ना । किञ्चु ए-रकम केनो ? जलेर धारे थाण्णा ह्य ना ए तो जानाई । कवे कोथाय सुनेछिलेन गान, 'नीर भरने क्यारसे थाउ सथिरे ।' अनर्थक गानटा वारे वारे मने घुरते थाके । अक्कार अश्वथेर तला पार हते हतेई त्हाई तांर पा हु'टोर भारउ

কমতে থাকে। চৌমাথার আলো দেখা যায়। সব দোকানের আলো জ্বলে মেলার মতো দেখাচ্ছে।

সারা শহরে ধর্মঘট হলেও সেনমশায় বিকেলের দিকে এসে দেখেন দোকান খোলা যায় কিনা। সেই দিনটা তাঁর ভালো যায় না।

আর এখন সব দোকানে বাতি, আলো। তিনি অন্ধকারে একা, দোকান বন্ধ। ক্ষত পায় তিনি ফিরে চলেন।

বটপট তালু দু'টো খুললেন। পাল্লা গোটালেন। রইসউদ্দিন সাহেব মিঠা তামাকের বাঁধা খরিদার। তিনি এই অনিয়ম দেখে হতভম্ব হয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেনমশায়কে দেখে পরম বিন্ময়ে শুধালেন, কি ব্যাপার?

আর বলবেন না, দোকানের পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকে সেনমশায় বললেন, আর বলবেন না, বুড়ো বয়সে ছেলের শখ।

হা হা করে হেসে রইসউদ্দিন বললেন, কার? আপনার নাকি?

একটু চমকালেন সেনমশায়, মুখের কথা শেষ করে লাভ নেই ভেবে বললেন, না, পরেশবাবুর। বিকেলে শুনলাম তাঁর নাকি ছেলে হয়েছে।

বলে সেনমশায় স্নইচটা টিপে দিলেন। উজ্জল আলোয় ঘর ভরে গেলো। মনে হলো, দোকানটা তাঁকে পেয়ে হাসছে। মনে হলো তিনি একটা অল্পরকম কিছু করছিলেন, জীবনবাবাজীর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হেরে যাওয়ার মতন।

খুশী হলে তিনি উর্ বাত বলেন, তাই মনে মনে বললেন, কে ফাঁকি দেবে, এই তো হাম ছায়।

সেনমশায় গদিত্তে বসলেন। যেন আবার তিনি সরল রেখার ওপরে এসে দাঁড়ালেন।





[ এক রাত্রি ]

“তোমার শীত করছে স্খা ?” ঠিয়ারিংএ হাত রেখে নিরুপম আড়চোখে তাকিয়ে বলল। বলেই তার মনে হল, এ-কথা বললাম কেন। যদিও শেষ রাত, তবু মাসটা তো অক্টোবর, এখন গাড়ি চলছে বলেই স্খার শীত করছে এ কথা ধারণা করার কারণ কী। আসলে পৌর-দীমার শেষ চেক পোস্টটা পেরিয়ে যেতেই নিরুপমের মনে হয়েছিল চারদিক খুলে গেছে, সবুজ-সবুজ একটা গন্ধের ঝাপটা চোখে মুখে লাগছে। মনে হয়েছিল। দেখা যায় না, তবু সে যেন অহুভব করল রাত্তার দু’পাশে রাশি রাশি জলজ তৃণ ছেয়ে আছে।

সে একা এইরকম একটা আধা-ভৌতিক প্রতীতিও তাকে ভর করেছিল। সেই ছমছমে ভাবটা কাটাতে নিরুপম অহেতুক বলে উঠল, “স্খা, তোমার শীত করছে ?” জানালা ধেম্বে যে বসে, অস্পষ্ট, অপার্থিব, একটি অবয়বের আভাস মাত্র, তার দিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। “স্খা !” নিরুপম একবার ডাকল নরম করে। “স্খ-উ-ধা।”—বিতীয়বার প্রায় চিৎকার করে। জানালার পাশের মুখটা এদিকে ফিরল, তার চোখের পাতা কাঁপছে, ঠোঁট নড়ছে, সাড়া মাত্র ওইটুকু। কিংবা খুব ক্ষীণ “কী ?” অথবা অস্বরূপ একটা ধ্বনি, ন্যূনতম, শোনা গেল।

“কিছু না। এমনি। ডাকলাম।”

“অতো জ্বোরে ! ওভাবে তো লোকে দূরের লোককে ডাকে।”

“তাই তো। হঠাৎ মনে হয়েছিল কিনা যে, আশে পাশে কেউ নেই। তুমিও দূরে সরে গেছ।”

“পাখল,” স্খা বলল সংক্ষেপে, মুঠোভরা ধুলো ঝুরঝুর করে ছেড়ে দেওয়ার মতো করে।

ড্যাশবোর্ডটা জ্বলছে ধূর্ত কোনও শৃগালের চোখ ঘেন, তার লাইটারে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিরুপম হাতঘড়িটায় সময় দেখে নিল। আকাশে লেশমাত্র মেঘ নেই, অসীম সৌভাগ্য, সেখানে এই শেষ প্রহরে রক্তাঙ্গ একটা টাঁদ তখনও অবশিষ্ট। তাকে নিশ্চয় দেখে ছু' চারটে তারা ইতস্তত ফুটি ফুটি করছে, নতুবা চরাচরে পরিব্যাপ্ত অন্ধকারই শুধু পরিদৃশ্য। হেডলাইটের খোঁচা খেয়ে চমকানো অন্ধকার কোথাও তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে মগডালে, কোথাও আহত পশুর মতো নেমে পড়ছে নয়ানজুলিতে, ঘাসের স্ব্বাসে মুখ ঘষে ঘষে বোবা ভাষায় গজরাচ্ছে।

তবু দমবন্ধ ওই গহ্বরটার বেড়াঙ্গাল থেকে যে বেরিয়ে আসা গেছে, এই ঢের। স্বভাবে শহরটা হিংস্র। গাড়ি নিয়ে অন্ধকারে কাউকে পাড়ি দিতে দেখলে বেশ খানিকটা পথ পর্যন্ত পিছু পিছু তাড়া করে আসে, গৃহস্ববাড়ির কুকুরের মতো। তারপর একসময় নিজেই থেমে যায়, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপায়, শ্বাস নেয় জোরে জোরে। অপলক চেয়ে থাকে, আক্রোশে নিফল কৌশে।

সুধা এসব কিছুই টের পায়নি। গাড়িতে উঠেই, ঘুম নয়, ঘুমের মতো। ঘুমের ভানটাই বেশি ভয়ানক, মৃত্যুর মতো।—“আমি যদি একটি শব বহন করে যেতাম, একাকী কোনও নিঃসঙ্গ অন্ধকার রাত্রে, সেই অল্পভূতিও এইমতো হত,” নিরুপম স্বগত বলল, “আশ্চর্য, শহরের রাস্তায় কতদিন দেখেছি, কিন্তু কোনও শব-শকটের চালকের মুখের দিকে কোনদিন তাকাইনি তো!”

শীত নেই, তবু ফিরে ফিরে সে শীতের কথাতেই চলে আসছিল।—“কাচ তুলে দাঁও সুধা, বুঝতে পারছি তোমার কষ্ট হচ্ছে।”

“না তো!”

তবে তুমি এত ঠাণ্ডা কেন। কথার পিঠে এই কথাটা মুখে এসে পড়েছিল, নিরুপম সামলে নিয়ে বলল, “তোমার চুল এলোমেলো হয়ে যাবে।”

“এখন নেই বুঝি?” সুধা ফিরে তাকাল, একেবারে সোজাসুজি, চোখ দুটি বিস্ফারিত, ফলে তার সম্পূর্ণ মুখটাই অতিক্রম বৃহদাকার দেখাচ্ছিল, “এখন নেই বুঝি?” সামান্য জিজ্ঞাসা, কিন্তু তার অঙ্গ কোনও অর্থ আছে। সুধা এই কথাই বলতে চাইছে কি “আমার সবটাই তো এখন এলোমেলো অগোছালো”, গত রাত্রির একটি কৃষ্ণিত স্মৃতিকে মেলে ধরতে চাইছে এই প্রাক-সকালে?

“চুলের কাঁটা-টাটা সবই পড়ে আছে সেখানে, ওই হোটেলে, ঠিকঠাক হবার সময় পেলাম কই, চটিটা পায়ের গলিয়ে কোনরকমে—”

সুধা আশ্বে আশ্বে বলছিল, কিন্তু ততক্ষণে নিরুপমের ভিতরে একটা প্রতিরোধ



প্রবল হয়ে উঠেছে, বলতে চাইছে “খামো,” সেই সঙ্গে কাতর একটি অহুন্নয় “দোহাই তোমার, ওই হোটেলের কথা টেনে এনো না।”

কিন্তু এতক্ষণ নির্জীব ছিল যে, সে সহসা নির্ভূর নির্লজ্জ হয়ে গেছে, নিরুপম স্বধাকে বলতে শুনল “মনে পড়ছে?”

উত্তর দিল না নিরুপম। তার নত দৃষ্টি লহমার জন্তে তার নিজেরই বৃকের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। স্বধা যখন উত্তর না পেয়ে বলল “কী দেখছ,” নিরুপম শুকনো হাসল “দেখছিলাম মন কোথায় থাকে।”

“মন তোমার আছে?” স্বধার গলা ক্রমে শাণিত হয়ে উঠছিল। “ছিল বলেই তো জানতাম,” নিরুপম হালকা গলায় বলল, অথবা বলে হালকা হতে চেষ্টা করল। আমি কি ওকে হাসাতে চেষ্টা করছি, সে ভাবছিল, এই পাথরটাকে তাতাতে কিংবা মাতাতে? আমার ভূমিকা কি অবশেষে এই, একটা কাতুকুতু-দেওয়া ভাঁড়ের?

আত্মধিকারের ভাবটা ঝেড়ে ফেলতেই সে হঠাৎ জোরে বলে উঠল, “স্বধা, ছাখো, ছাখো।”

স্বধা টেরচা চোখে চাইল, যেন কৃপা করে। —“কী দেখব, তোমার গাড়ি চালানো? সে তো অনেক দেখেছি।”

আর কিছু বলার নেই, বলে ফল হবে না। অথচ নিরুপম বলতে চেয়েছিল ছাখো, ছাখো, একটু পরেই সকাল হবে, ভোরের প্রথম পাখিটা একুনি উড়বে তাকিয়ে থাকো। বুখা। স্বধা দেখবে না। চোখ সে মেলে আছে ঠিকই; সেই চোখ, যা কিছু ছাখে না।

এই চলবে, যতক্ষণ না সকাল হবে? মরীয়া হয়ে নিরুপম আরও তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে রাতটা পার হতে চাইছিল। ইঞ্জিনটা উত্তপ্ত, খরখর, সামনের একটা ঘোড়ার নালের মতো বাঁক, সে অতিকষ্টে টাল সামলে নিল।

“আমরা কোথায় যাচ্ছি?” ফ্যাকাশে গলা, স্বধা বলছে। সে-ই উদ্দিশ্ট বলে ধরে নিয়ে নিরুপম বলল, “কোথাও না। শুধু যাচ্ছি।”

“তার মানে পালাচ্ছি,” স্বধা বলল তিরস্কারের ঢঙে, কিন্তু কী আশ্চর্য, তাই মেনে নিয়ে নিরুপম কথাটার অবিকল প্রতিধ্বনি করে বলল, “পালাচ্ছি। মগুপে আগুন লাগলে লোকে ছুটোছুটি করে বেরোবার পথ খোঁজে, বেঁচে থাকা থেকে পরিত্রাণ পেতেও আমরা ভেমনই যে যেদিকে পারি ছুটছি।”

“কাল রাত্তিরে ওই হোটেলের কি আগুন লেগেছিল?” স্বধা জিজ্ঞাসা করল, নিরুপম কণ্ঠ, “আর তাই কি নিরুপম, আমরা ছুটে ছিটকে বেরিয়ে পড়েছি?”

“সুধা,” নিরুপম যেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, “বারবার হোটেলটার কথা তুলো না, কালকের দুঃস্বপ্নকে আজকের দিনটাতে টেনে এনো না। সকাল হচ্ছে, টের পাচ্ছ না যে, সকালের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে?”

“সকালের একটা গন্ধ থাকে বুঝি?” সুধা বলল আন্তে আন্তে “গন্ধটা কিসের, ফোটা ফুলের?”

“সকালের নিজেই একটা মৌরভ আছে তার জন্তে ফুল ফোটার দরকার হয় না।” নিরুপম বলল, প্রত্যয়ের সঙ্গে। গাড়িটাকে এক পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেন সেই সকালেরই অপেক্ষা করতে থাকল।

ঝিঁঝি ডাকছিল ঝোপে-ঝাড়ে। পাখির বাসায় বাসায় সাড়া পড়ে যেতেই ঝিঁঝিরা থেমে গেল। ফরসা ফ্যাকাশে একটা দিন, একটা দিন চোখ মেলছে, কাছের দূরের দৃশ্যপট লুপ্ত কায়ী ক্রমশ ফিরে পাচ্ছে। পাশ থেকে সুধার মুখের একাংশ দেখা যাচ্ছিল, সেই মুখও ফরসা, ফ্যাকাশে। শেষ রক্তবিন্দুও যেন কেউ শুষ নিয়েছে। শুধু নিরুপমের মনে হল, সুন্দব। ওই মৌন্দর্যকে অধিকার করার বাসনা তাকে অকস্মাৎ আন্দোলিত করতে শুরু করল।

হাতটা ছাড়িয়ে সুধা বলল, “ছিঃ, এই বাসী মুখে?” নিরুপম শুনতে চাইল না। তখন ধমক দিয়ে সুধাকে বলতে হল “ওরা দেখছে।”

“কেউ তো নেই। কারা?”

এক ফালি জমির ওধারে একটা কুঁড়ে ঘরের বাইরে দুটো মুরগি চরছিল, সুধা ইশারায় তাদের দেখিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা হুঁজনে মিলে হাসল। মেঘ কেটে যাচ্ছে, ভারী হাওয়াটা হালকা হচ্ছে আবার। নিরুপম বলল, “দেখছে না। কারণ মোরগটা মুরগিটাকে নিয়েই এখন ব্যস্ত।”

“মুরগিটা খুঁটে খুঁটে গুকে কী যেন দিচ্ছে।”

নিরুপম সহসা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “তুমিও আমাকে কিছু দাও।”

প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকাল সুধা।—“কী দেব। সবই তো নিয়েছ কাল, এই তো কয়েক ষণ্টা হ’ল মোটে। নাওনি?”

“না না সুধা,” নিরুপম অধীর গলায় বলে উঠল “নিইনি। নিতে পারিনি, অথবা পাইনি। তুমিও দাওনি।”

অচঞ্চল, শুষ্ক সুধা কান পেতে শুনল। বর্ণহীন মুখে একটু-একটু রঙ, রক্ত যেন

কিরে আসছে। নিরুপমের অস্থিরতাকে কমা আর সহিষ্ণুতা দিয়ে স্পর্শ করে খুব নীচু স্বরে বলল, “ওর চেয়ে বেশি দেবার মেয়েদের আর কী থাকে?”

“আছে,” নিরুপম পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, “নিশ্চয় আরও আছে। পাওয়ার চরম চেহারাটা কি অতো অগভীর হতে পারে? আমরা বেরিয়ে পড়েছি তাই তো।”

“সেখানে যাচ্ছি, সেখানে বুঝি সব পাব?”

প্রবল বিশ্বাসে স্থির কণ্ঠে নিরুপম বলল “পাব।”

এর পর তখনকার মতো আর কথা ছিল না। এক কাঁক বক শাদা পাখা মেলে তখনই হাসিতে হলুদ একটা বাবলা গাছের তলায় বসল।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করেছিল এবার অব্যস্ত গতিতে। পথের পাশের দূরত্বজ্ঞাপক প্রতিটি শিলালিপি পড়া যাচ্ছে। নিরুপম হেসে বলল “আমরা কালের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছি, কিন্তু এই মাইলের লেখাগুলো আমাদের স্থানের বাইরে যেতে দিচ্ছে না।”

“স্থান আর কাল,” শুনে, সূধা বলল, “এই নিয়েই তো সমাজ?”

“এবং সংস্কার। আমরা যা পার হতে পারছি না।”

সীটে হেলান দিয়ে সূধা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনল, তার চোখ আবার বুজে এসেছিল, পা দুটি যত দূর মেলে দেওয়া যায়, দিয়ে সে শরীরটাকে ছড়িয়ে দিল। চোখ বুজেই সূধা বলল, যেন অগ্র কাউকে, “নিরুপম আমাকে কমা কোরো। কাল তোমাকে বোধহয় শুধু কষ্টই দিয়েছি।”

“সূধা, কষ্ট তুমিও তো পেয়েছ।”

“কিন্তু তোমার সমস্ত আয়োজনটা নষ্ট হল। আমি—” সূধা সসংকোচে উচ্চারণ করল “কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না নিরুপম যে, আমাদের সম্পর্কটা নিষিদ্ধ।”

কী উত্তর দেবে নিরুপম, কী দিতে পারে। মাজানো কোনও সংলাপ?— ‘নিষিদ্ধ বলে কিছু নেই সূধা। যা নিষিদ্ধ তাই প্রসিদ্ধ হতে পারে, তার প্রশংসা বৈষ্ণব কাব্য।’—কিন্তু বানানো কথা দিয়ে সূধার হৃদিকে অপমান করতে ইচ্ছা হল না। বরং দায় আর দোষ নিজের কাঁধে নেওয়াই বেশি পুরুষোচিত। বলল, “ভুল আমারই হয়েছে সূধা। ওখানে, ওই হোটেলটাতে তোমাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। তবু বিশ্বাস করো, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম যা চাই, ওখানে তা মিলবে।”

“কী চাই ?” উদাস গলায় স্খা বলল, চোখ তেমনই নিম্নীলিত । —“তোমার দোষ নেই । আমরা আসলে স্খা আর আনন্দের তফাত বুঝি না ।”

চুল অল্প অল্প উড়ছিল স্খার, একটি স্থতি ছোট ছোট কম্পন হয়ে একবার ওর সারা দেহে প্রবাহিত হয়ে গেল । স্খার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, কঠিন কয়েকটি পেশী, পরিস্ফুট কয়েকটি শিরা ওর ক্লিষ্ট মুখখানাকে মমতার যোগ্য করে তুলছিল । নিরুপমের লোভ হল, রুমাল বের করে তার মুক্ত হাতটি দিয়ে সস্তূর্ণনে স্খার কপালটা মুছিয়ে দেয় । ও কি ফিরে গেল গতরাত্রির ক্লিন্ন অন্ধকারে ? নিরুপমের মনে হল সে দাঁড়িয়ে আছে একটা সঁগাতসঁগাতে হুড়ক্দের ঠিক মুখটাতে, আর স্খা টলতে টলতে, প্রাচীন পাথরে গাঁথা প্রাচীরে ধাক্কা খেতে খেতে প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভিতরে, নিরুপম চোঁচিয়ে ডাকছে “স্খা আর যেও না, হারিয়ে যাবে, ফিরতে পারবে না,” কিন্তু তবু স্খা সম্মোহিত, আচ্ছন্ন, যেতে থাকল, কখন প্রকাণ্ড একটা কবাত ধস করে পড়ে গেল, আর দেখা যায় না, নিরুপমের নিজের গলাই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল ।

এখানে কী, এখানে কেন, স্খা প্রথমেই বলেছিল, বিস্মিত, আড়ষ্ট, সন্দ্বিষ্ট । ওর সমস্ত ভঙ্গিটাই একটা প্রতিরোধ হয়ে গিয়েছিল । যখন বাচ্চা ছোকরাটা ওদের বারান্দার পর বারান্দা পার করে দিয়ে একটা কামরায় বসিয়ে দিয়ে গেল, যাবার সময়ে টেনে দিয়ে গেল দরজাটা । ছোকরার মুখে একটু মুচকি হাসি ছিল হয়ত, নিরুপম লক্ষ্য করেনি, কিন্তু স্খার চোখে সেটা পড়ে থাকবে, পলকে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল স্খার মুখ, যেন আঁতকে উঠে বলল “এখানে কী ?”

“এখানে সন্ধ্যা, যেখানে আমরা এসেছি,” নিরুপম খতমত খেয়ে এর চেয়ে সস্ত্রাস্ত কোনও উত্তর দিতে পারেনি ।

“এ-খা-নে !” অত্যন্ত ক্লান্ত, আহত স্খা বলেছিল টেনে টেনে । হু’ হাতে ধানিকক্ষণ চোখ ঢেকে রেখেছিল ।

কিন্তু স্খা তুমি এখনও কেন চোখ বুঁজে মাঝে মাঝে কাছে এসে দূরে চল যাচ্ছ, এই লুকোচুরি এখন আর মানায় না, এখন, যখন চেয়ে আঁখো, গাড়ি ছুটছে, মসৃণ, সাবলীল, ইচ্ছে হলেই ওর গতি আমি বাড়াতে কমাতে পারি, একটু আগে চমৎকার রোদ ছিল, এখন হঠাৎ মেঘলা, সামনের কাচে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে, জমুক ; টলটলে অশ্রুপ্রতিম, বেশ দেখাচ্ছে, ওয়াইপার চালাব না, সে-সময় এখনও আসেনি, কয়েকটা ফোঁটা তো মোটে, বাতাসে শুকিয়ে যাবে । —“এই, এই !” নিরুপম স্খাকে ঠেলা দিয়ে ডাকল । স্খা তাকাতে বলল, “চা খাবে ?”

স্বধা বলল “মন্দ হয় না, কিন্তু পাব কোথায়, ক্লাস্ক তো আনান।”

“রাস্তার ধারে, কোনও একটা দোকানে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো বাজার আছে, এতক্ষণ নিশ্চয় ওরা তোলা উঠুনে ঝাঁচ দিয়েছে।”

দোকান থেকে দুটি ভাঁড়ে ওরা চা নিল, কিন্তু গাড়িটা খামাল গঞ্জ ছাড়িয়ে। এখান থেকে রাস্তাটা হঠাৎ কাঁপ দিয়েছে। তার অনন্ত বনাতের আভাসটুকুও মেলে না।

ঠাণ্ডা খানিকটা জল নিরুপম ঢালল গাড়িতে, বাকীটায় স্বধা চোখে জলের ঝাপটা দিল। ওর ভুরুতে, গালে, কানের কোণে জল চিকচিক করছে, একটা স্নিগ্ধ ভাব এসেছে। স্নিগ্ধতারও একটা সৌরভ আছে, নিরুপম মুগ্ধ হয়ে ভাবল।

“এই।” অবাক হয়ে সে শুনল স্বধাও তাকে ডাকছে “এই!” জলের ছোঁয়া ওর ভিতরেও লেগেছে। স্বধা বলছে “এই, এ-পথে আমরা আগে কখনও এসেছি?”

“কেন? তোমার মনে নেই? সেবার—সেবার অবশ্য উৎপলও সঙ্গে ছিল।” অবশ্য, নিরুপম ইচ্ছা করেই অবশ্য শব্দটা ব্যবহার করল (উৎপল তোমার স্বামী স্বধা, সে তো অবশ্যই। বরাবর সে অবশ্যই ছিল)।

উৎপলের নাম স্বধা শুনল কি শুনল না, অন্তত যেন শোনেনি এইরকম নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, “সেবার বোধহয় রাস্তার ছ’ধারে ফুল ছিল।”

“হ্যাঁ, পলাশ। সেটা মার্চ মাস ছিল যে।”

“এই ঋতুতে ফুল নেই?”

“আছে। অল্প ফুল। সেবার কিন্তু খুব গরম ছিল, একটু বেলা হতে না হতে সব তেতে উঠত, শুকনো হাওয়া আর ধুলো, টকটকে ফুলগুলোর চারপাশে ষোলতা আর ভোমরা চক্রাকারে অবিরত ঘুরত।”

“তুমি আমাকে এক গুচ্ছ পেড়ে এনে দিয়েছিলে”; স্বধা দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে বলল। —“মনে আছে। চূলে পরতে তুমি বলেছিলে, ঠিক সাঁওতালীদের মতো। শুনে উৎপল কী বলেছিল বলো তো?”

“মনে পড়ছে না।”

“রেগে উঠে বলেছিল আমার বউ বুঝি সাঁওতালদের মতো কালো?”

নিরুপম মনে মনে বলছিল, ‘স্বধা, উৎপলের কথা থাক।’ কিন্তু মনে মনে বলা বলেই সে-কথা স্বধার কানে গেল না। সে আন্তে আন্তে বলল, “উৎপল এই নকমই! চোখ নেই।”

হয়ত দেয়ি হয়ে যাচ্ছিল বলে, হয়ত শুধুই ওই কথাটা চাপা দিতে, নিকপম আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

সেই হোটেলে দুটি হাঁটুর মধ্যে ঘাড় গুঁজে অতক্ষণ বসে রইল, অথচ সূধা তো জানত। আমি ওর এই প্রতিক্রিয়ার, সত্যি বলতে কী, অর্থ বুঝিনি। মুহূর্ত-গুলো যেন কাতর তিতির পাখি, কোথাও বন্দুকের আগওয়াজ হতেই ভয়র্ভ, পালাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘরটাই যেন মুছে যাচ্ছে, সবই লুপ্ত হয়ে যাবে নাকি, হে ঈশ্বর, অকৃতার্থ, অনির্দিষ্ট কোনও ধারায় অভিয়ুক্ত আমিও একটা চেয়ারের হাতল ধরে বসেছিলাম, ওই চেয়ারটাই কাঠগড়া আমার, হতভাগ্য এক আসামীর, যে বসে আছে, সে আর নিয়তি এক নারী, দু'জনকে মাঝখানে রেখে সময় আর একটা দ' তৈরী করে ঘুরে যাচ্ছে।

অথচ সূধা তো জানত। কী একটা ইন্টারভিউ পেয়ে সে দিল্লি যাচ্ছে, খবরটা উৎপল আমাকে উৎফুল্ল গলায় দিতেই সূধাই তো ইন্ধিতপূর্ণ চোখে প্রথম আমার দিকে তাকিয়েছিল। সেই চোখ দুটি তাদের পাতায় পাতায় তালি বাজিয়ে বলছিল 'এত দিনে, এত দিনে।' উৎপল বলল 'যেতে আসতে সাতদিন। ওরা ফার্স্ট ক্লাস ভাড়া দিচ্ছে, খুব বড় একটা চান্স। দেখি, যদি আমার কপাল ফেরাতে পারি।' ঘাড় কাৎ করে সূধা শুনছিল, খরগোস যেমন ঝোপ-ঝাড়ে কান পেতে শিকারী প্রাণীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে কিনা মন দিয়ে শোনে। সূধার দৃষ্টি দ্রুত আমার সঙ্গে বৈদ্যুতিক বার্তা বিনিময় করছিল। 'বোকা', সেই দৃষ্টি বলছিল 'বোকা, ও ভেবেছে বড় চাকরি পেলেই ওর বরাত ফিরবে, ও তোমার সমান হবে।' জ্বরও একটা অল্পনয় আমি ওই নিবিড় করে সূর্য-টানা চাহনিত্তে পড়েছিলাম, অল্পনয় অথবা অল্পমতি। —'এইবার', সেই চাহনি বলছিল 'এইবার। তুমি একটা ব্যবস্থা করো। এই বাড়িটা ছাড়া অল্প কোথাও। যেখানে তৃতীয় কেউ নেই, শুধু আমরা। কানামাছি খেলা, চুরি করে ছুঁয়ে এসেই বৃড়ি হোঁয়া, আর সহ হয় না।' কথাগুলো নিঃশব্দ বহুদের মতো ফাটছিল। আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

হাওড়া স্টেশনে উৎপলকে উঠিয়ে দিয়ে আসবার পর থেকেই সূধার মধ্যে পরিবর্তনের ভাব টের পেয়েছিলাম, সতেজ ধরনটা আর নেই। গাড়িতে ফিরে এসে ও চূপ করে ছিল। একবার বলল, "সারাদিন ঘোরাঘুরি, ক্লাস্ত লাগছে।" তার পরেই বলল, "মনটা খারাপ লাগছে, জানো! উৎপলটা একা চলে গেল। ট্রেন ছাড়ার পর হাত বাড়িয়ে বলছিল 'ভাল থেকো, সাবধানে থেকো!'"

বারবার বলছিল। তুমি শোননি?” একটু পরেই আমরা হোটেলটার বাইরে এসে থামলাম।

স্বধাও নামল। অনিশ্চয়তা ওর প্রতিবারের পা ফেলায় অস্থূলব করছিলাম। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ওব কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললাম, “কী হয়েছে স্বধা, কী—কী?” স্বধা বলেছিল “কিছু না। হঠাৎ যেন একটা ছবি মনে পড়ে গেল—বিশী। বোধহয় বিলিতি কোনও সিনেমায় দেখেছি। একটা বাচ্চাকে কবর দিয়ে আসার পর তার বাবা-মা শোবাব ঘরে ঢুকছে। ঘরে আলো জ্বলেনি। হু’জনেই মুখ খুঁড়ে ফাঁকা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। আরও অন্ধকার নামছে। হু’জনেরই পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। শেষে সেই অন্ধকারে হঠাৎ হু’জন হু’জনকে যেন ভয় পেয়ে আঁকড়ে ধরল, তার পরেই কেটে গেল সেই দৃশ্য। ভাবতেও কাঁটা দেয়—আমি আর ছবিটা দেখতে পারিনি।”

শুকনো গলায় বলেছি “তাই বুঝি। কিন্তু—কিন্তু স্বধা, তার সঙ্গে আজকের মিল কী? উৎপল—আমরা তো শুধু ওকে বিদায় দিয়ে এসেছি।”

স্বধা শাস্ত স্বরে বলল “ঠিক। বিদায় দেওয়া আর কবর দেওয়া, দুটোকে ঠিক এক বলা যায় কি?”

একটা লোক-বোঝাই বাস এক দিকে, তার পাশ কাটিয়ে চলে আসছে ট্রাক, ভয়ংকর-গতি, দুটোর মাঝখান দিয়ে গাড়িটাকে অবলীলায় পার করে এনে নিকপম একটু দম নিল। রাস্তার দু’ধার এখন নিষ্পাদপ, নিস্তূণ। স্বধাকে ঠেলে তুলে দেখিয়ে দিল।

দেখল স্বধা, কিংবা দেখল না। একবার বলল “কিছু তো নেই। ধু-ধু কবছে তো শুধু।”

নিরূপমের বলতে সাধ গেল ‘সেইটাই তো দেখাচ্ছি। মাঠের পর মাঠ, দূরে দূরে কালো কালো বিন্দু। যত কাছে যাব, কালো ফোঁটাগুলো বড় হয়ে উঠবে। এক-একটা তালগাছ, এই সব প্রাস্তরের নিঃস্বতার প্রহরী। প্রাস্তরগুলো বিস্ত, নিজেদের জন্তে কিছু রাখেনি। রাখেনি বলেই ওরা আমাদের অনেক কিছু দেয়, দিতে পারে।’ বলতে সাধ গেল, বলা হল না।

স্বধা বলল, “সেবার যেন একটা অন্ধকোণে দেখেছিলাম, কুঁচি-কুঁচি রূপো ছড়ানো সারা মাঠে। সে কত দূরে?”

নিরুপম বলল, “আরও বেশ কিছু গেলে। সব আমরা পাহাড়ের একটা মহল পেরিয়ে এসেছি। মাঝে একটা লম্বা শালবন গেল, তার তলার মাটিতে ছায়া আর রোদে মিলে অনেক জেত্রা ঝাঁক। তুমি চেয়েও ছাখে নি।”

...এখানে কেন, এখানে কী, সূধা বলে উঠেছিল। সে আরও কতক্ষণ পরে? ছোকরা চাকরটা মুচকি হেসে দরজা টেনে দিয়ে গেল। সে ফিরেও এসেছিল। কতক্ষণ পরে? গরম, দু’ প্লেট পকোড়া আর চা রেখে গেল। চমকে উঠে সূধা বলল “এ কী!” খানিকটা চা চলকে ফেলল। সব স্বপ্ন টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, বিরক্ত গলায় বলে ফেললাম “সূধা, তুমি এমন ভাব করছ যেন কিছুই জানো না। যেন—” ফুস করে বেলুনের বাতাস বের কবে দেওয়ার মতো ভঙ্গিতে যোগ করলাম “কচি খুকি।”

সূধা তখন ওর সম্পূর্ণ মুখ-পূর্ণিমা আমার মুখে স্থাপিত করে বলল “না, জানি। আমি খুকি নই। আমি বত্রিশ। তোমার প্রেমিকা। কিন্তু রক্ষিতাও কি?”

চিংকার করে বলে উঠলাম “সূধা!” দেওয়ালের কান থাকলে সেই বিকট শব্দে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

“তবে কেন,” সূধা বলে চলেছিল “তুমি এখানে আমাকে এনেছ?”

“সূধা, তুমিও তো বলেছিলে আলাদা কোনওখানে, তুমি জানো না এর জন্তে আমার কত—”

“কত টাকা খরচ হয়েছে বলতে চাইছ তো?”

মরীয়া, ভাঙা গলায় বলতে থাকলাম “সূধা, তুমি বলেছিলে, আজ বাড়ি ফিরতে চাও না, আজকের সন্ধ্যাটাই আমাকে দেবে। পরে তোমার দিদির বাড়ী যাবে— শব্দ-শব্দিকে সেই কথাই বলে এসেছ।”

“তাই বলে এখানে?”

আবার আমার মাথা বেঠিক হয়ে গেল, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে “যাদের যাবার জায়গা নেই, যারা নিরুপায়, তারা আর কোথায় যায়? কোথায় যাব ভেবেছিলে তুমি? মন্দিরে?”

“না”, সূধা চেয়ে রইল একদৃষ্টে।—“আমারই তুল হয়েছিল। এইখানেই তো, এই অপমানে। এই আধা-বেশালয়ই আমার উপযুক্ত।”

তখনও থামেনি সূধা, নেশাগ্রস্ত বা স্তূতাবিষ্ট, কোনও দম-দেওয়ান পুতুলের মতো



বলে গেলে, “কিন্তু তা হলে? তা-হলে ওই বেয়ারাটা টা-পট দিয়ে গেল কেন।  
ওকে ডাকো, গ্লাস-টাস আরও কী-কী সব আনুক, এখানে রাখুক?”

তখন আমি হাত তুলে ভীষণ জোরে সেই দম-দেওয়া পুতুলটাকে চড়  
মারলাম।

সেই চড়ে কাজ হল, চড়টা যেন জাহুর মত কাজ করল। ওর গালে রক্ত জমাট,  
কিন্তু চোখের মণিতে আর সেই হিংস্র দ্যুতি ছিল না, অতর্কিত আঘাতে ফগিনী  
বশীভূত। ঠাণ্ডা স্বরে তাকে বলতে শুনলাম, “একটু বোসো।” বলেই সে, খোল  
দরজা দিয়ে সংলগ্ন স্নানের ঘর দেখা যাচ্ছিল, সেখানে ঢুকে গেল। জলের ঝাপটা,  
খস খস শব্দ, কিন্তু বোধহয় পাঁচ মিনিটও নয়, স্নান বেরিয়ে এল। সে এক ভীষণ  
বিস্ময়, আলগা করে শাড়ি-পরা, ওর হাতে কয়েকটা কাঁটা, চুল একেবারে খোলা,  
নগ্ন বাহুমূল আর কাঁধের উপর দিয়ে ঢালা, স্নান হাসছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক সেই  
হাসি, হাসছিল, হাসতে হাসতেই বলল, ‘একেবারে তৈরী হয়ে এসেছি।’ কপালের  
টিপটা নেই, মুছে এসেছে, হাতের কাঁটাগুলো রাখল ড্রেসিং টেবিলে, ‘দেখছ তো  
যদিও কচি খুকি নই, রীতিমত বর্ষীয়সী, তবু আমার চুল পরচুলো নয়, দেখছ তো’,  
আমি বিকারের শ্রলপ শুনছি, লুয়ে পড়ে স্নান হাতঘড়িটা খুলল, ওর পিঠের ঝাঁচল  
সরে গিয়েছিল, দেখতে পেলাম অস্ত্রবাস নেই, ঝাঁচল সরে গিয়েছিল বলেই,  
ছোট জামাটা নেই দেখতে পেলাম, পিঠের কাছে পর পর দুটো বোতাম শুধু,  
পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা অঙ্কের মতো, ‘তৈরী হয়েই এসেছি’ সে বলল আবার,  
এবার চাপা গলায়, হিস্ হিস্ হিস্ হিস্, পিচ্ছিল সাপ জড়িয়ে ফেলছে আমায়,  
আলো নেই, আলোটা পুট করে নেবাল কে, টের পাচ্ছি। সেই গলা যেন  
কারও গলা নকল করে করে, গলা, কার—কার, “এই তো চেয়েছিলে তুমি,  
এই তো চাও?”

কী চাই আমি, কী নেব, কী দেব, চাওয়া-পাওয়া দেওয়া-নেওয়া সব অন্ধকারে  
কাঠ ঠোকরানো, অন্ধ আর্ত দু’টি কাঠঠোকরা পাখি, শরীর মানে কি এক-খণ্ড কঠিন  
সাড়াহীন, সাড়াহীন কিন্তু জলছে, রচিত চিতায় বিকট ফটফট যেন, তবু বারবার  
তাকে ছুঁচ্ছি, যত ছুঁচ্ছি তত আমার সব কিছু বলসাচ্ছে। যখন আলো জ্বাললাম  
তখন আমার পাশে পোড়া কাঠ ছাড়া কিছু পড়ে ছিল না।

এ-সব কথা গত রাত্রির না কত জন্ম আগেকার ? মনে হচ্ছে বহু বহু বৎসর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত যেন, শত শত মাইলের কালো পাথর, কঁাকর আর রুক্ষ মাটি, মাড়িয়ে চলেছে তো চলেইছে, নিরুপম একবার মাথায় হাত দিল, এই দীর্ঘ সময়ে ওর সব চুল সাদা হয়ে যায়নি তো ! যদি গিয়ে থাকে তবে সুধা কি তাকে চিনতে পারছে, ঘুম ভেঙে সকালে একবারও কি ভাবেনি, শীর্ণ, শিরা-ওঠা এই মাছুষটা আমার পাশে কোথা থেকে এল, এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছেই বা বা কেন ?

না, ওই একটা গুণ সুধার, বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে না। হোটেলের প্রথমেরই বা টেচিয়ে উঠেছিল। তারপর চূপ, সেই থেকে চূপ। ওই কামরাটায় আলো জলে ওঠার পর ঠিকঠাক হয়ে এসে বলেছে “আর কী। এবার চলো।”

“তোমার দিদির ওখানে যাবে তো ?”

“এত রাত্রে ?” ঘড়িটা দেখে নিয়ে সুধা বলল, “ওখানে আর যাওয়া যায় না।”

“তবে কি তোমাদের, মানে উৎপলদের বাড়ি ?”

“সে তো আরও অসম্ভব। তোমার—তোমার কোনও জায়গা নেই ?”

নিরুপম বলেছে “আছে।” তারপর পাড়ি যখন শহরতলির পথ নিল তখন—  
“সুধা, তোমার ভয় করছে ?”

“ভেঙে গেছে।”

কোন কিছু পাবার আশা, তাও নেই কি ? নিরুপমের একবার মনে হল যে জিজ্ঞাসা করে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবল যে, না দরকার নেই। সুধা যদি বলে “ওই বিছানায় একটা শাঁখা ভেঙে পড়েছিল, দেখতে পাওনি ? কখন পুট করে ভেঙে গেছে। আমার আশা-টাশা এখন ওই ভাঙা শাঁখাটার মতন। টুকরোগুলো কুড়িয়ে ওই ঘরেই একটা বুড়িতে ফেলে দিয়ে এসেছি।” না, গত রাতের জের টেনে আর লাভ নেই। তার চেয়ে সুধা যেমন আছে, তেমনই থাকুক। শাস্ত, সম্মত।

আশ্চর্য, প্রতিটি মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে, অপঘাতের পরও। নতুবা সেই গন্ধময় অশু রাত্রির পর আমি একটি সকালে প্রসারিত হতে পারতাম কি, নিরুপম ভাবছিল। কলকাতায় কত বেলা অবধি ঘুমিয়ে কাটাই। সকাল, উষাকাল, কতকাল পরে প্রত্যক্ষ করলাম। কী অবাক ব্যাপার, সকালের তো বয়স বাড়েনি, সে অবিকল তেমনই আছে তাকে আমার শিশুকালে যেমন দেখতাম। পাহাড়

প্রান্তর, নদ-নদী অরণ্য, নিসর্গের কোনও কিছুই বয়স বাড়ে না। বাড়ে শুধু নর আর নারীর।

ক্রমাগত চড়াই ভেঙে ভেঙে নিরুপম ক্লাস্ত হয়ে উঠছিল। পর পর অনেকগুলো মাইলফলক ভাঙা বা লেখা মুছে-বাওয়া, কতদূর এলাম, গাড়ির মাইলোমিটার ঠিকমত কাজ করছে তো! ঠিক তখনই বেঁপে বৃষ্টি এল, দৃষ্টিহারী বৃষ্টি, বাঁকের পর বাঁক, পিছলে যদি যাই কোথায় পড়ব। ছুঁপাশের ঘন পাতার ছাতায় টুপ-টাপ, টপ-টপ, একটানা, এক-একটা উপত্যকা হাঁ করা, তারা বলে দিচ্ছে কোথায় পড়ব। কিন্তু পার্শ্ববর্তিনী নিখর-নিশ্চুপ হে রমণী, তুমি কিছু বলছ না কেন। নিরুপম ঈষৎ ভীত বলেই ক্রমশ রুপ্ত হয়ে উঠছিল, কামনা, লোভ, ক্রোধ সব পাশাপাশি থাকে। রিপূরা সব সহোদরা। আর তুমি অবুঝ সূধা, কিছু বুঝ না। কাল যদি অগ্নয় করে থাকি, দুজনের জন্তেই করেছি। অথচ রত্নাকরের রমণী, তুমি এখন আলাদা হয়ে যেতে চাইছ। হতে পারে, স্থান হিসাবে ওই কামরাটা নির্বাচন—আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সূধা তুমিও কি নিরলা একটি ঘর, একটু সঙ্গ, অন্তত একটি প্রহর কতবারই তো চেয়েছ, চাওনি? আমরা চুরি-করা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জুড়ে গাড়িতে গাড়িতে শুধুই তেল পুড়িয়েছি, একবার তোমারই অস্থির নির্বোধ টানাটানিতে গেলাম তোমার এক বান্ধবীর ওখানে, সুরিধে হয়নি। কখনও হস্তে হয়ে ময়দানে, ছিঃ, ময়দানে। এই শহরটার ইতিহাস কোনও দিন যদি রচিত হয়, তাতে এই কথাও লেখা থাকবে যে, এখানে প্রণয়ীযুগলের জন্তে হাজার কোনও স্থান নেই, নির্দয় শহরটা শরণার্থী প্রেমের জন্তে কোনও আশ্রয় রাখেনি। তবে?

খানিক পরে বৃষ্টির শেষ, পাহাড়েরও শেষ পাওয়া গেল বলেই নিরুপম যেন একটু স্বৈর্ঘ্য ফিরে পেল, নইলে তার উন্নততা হয়ত বাড়তেই থাকত। দিগন্ত পরিষ্কার, রাস্তা এখান থেকে আবার ঢালু, কিন্তু এ কোন্ রাস্তা? পীচ কই, এ তো লালমাটি। জলের ধারায় সব চিহ্ন যখন লুপ্ত, সে কোনমতে সামলে সামলে গাড়ি চালাতেই বাস্তু, তখন কি ভুল কোনও রাস্তা ধরেছিল? মনে তো পড়ে না। হাইওয়ে থেকে কতদূর সরে এল? বোঝা যাচ্ছে না। তখন চারদিকে চেয়ে নিরুপম ব্যাকুল গলায় বলে উঠল “সূধা, কিছু চিনতে পারছি না। আমি বোধ হয় ভুল পথে চলে এসেছি।”

একটুও বিচলিত হয়েছে, ভাব দেখে বোধ হল না সূধার। যেমন অচঞ্চল ছিল

তেমন ভাবেই গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল। ঘুরে ওপাশে এসে হাত বাড়িয়ে বলল “এসো।”

লম্বা ভিজে ঘাস, ওরা আশ্বে আশ্বে খানিকটা পথ উঠে গেল। পাহাড়ের গায়ে থাক-থাক কাটা, পাহাড়ীরা বোধ হয় ওইভাবে পরিশ্রমী ফসল ফলায়, চাষ করে— সেই পথ ধরে আরও কিছুটা যেতে একটা বাঁধ, তার উপরে দাঁড়াতে দেখা গেল একটা ঝিল, পরিষ্ণ। যেখানে দাঁড়িয়েছিল ওরা, সেখানে অনেকটা ঘাস পোড়া পোড়া, ফাঁকে ফাঁকে অর্ধগোলাকৃতি বেশ কিছু জমি, প্রাকৃতিক কোনও খেয়ালে গেকুয়া রঙের নয়, সাদা বালি-বালি!

“স্বধা, আমরা কি কোনও ঋশানে এলাম?” নিরুপম বলে উঠল ভ্রিয়মান স্বরে।

“এ তা নয়,” নিরুপম আঙুল দিয়ে মাটির হাঁড়ি, কিছু চেলা কাঠ আর গোটা হুই গর্ত দেখিয়ে দিল। সে একটা উঁচু মতন টিবি দেখে বসে পড়েছিল। স্বধা এগিয়ে এল তার কাছে। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল “তুমি আচ্ছা মাহুষ তো। এইটুকুতেই ঘাবড়ে গেছ? আমরা জলে পড়েছি নাকি!”

অহুতপ্ত কণ্ঠ, দৃষ্টি বিহ্বল, নিরুপম মাথা নেড়ে নেড়ে বলল “সে-জন্তে নয়, স্বধা, সে-জন্তে নয়, নেহাত কোঁকের মাথায় এত দূরে চলে এসেছি। কাল সব কিছু হিসেবের ভুল হল বলে মাথার ঠিক ছিল না আমার। রোখ চেপে গেল, ঘেভাবে পারি ফাঁকিটা উত্তল করব। জেদের বশে এত দূর টেনে নিয়ে এলাম তোমাকে, বিপদে ফেললাম। তোমাকে বলেছি একটা কোথাও যাচ্ছি, কিন্তু কোনও বিশেষ জায়গা ঠিক করা ছিল না। স্বধা, তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি।”

স্বধা ওর একটা হাত তুলে নিল—“আমাকে নয়, মিথ্যে বলেছ তোমাকে।”—

নিরুপম বলল “সে তো ওই একই হল। কিন্তু আমরা আজ ফিরে যাব কীভাবে। আমার হাত-পা অবশ, এতখানি পথ ফের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া— আমার সাথে কি ফুলোবে?”

উত্তরে স্বধা বলল, “স্টিয়ারিং এখন তো আমার হাতে।” রহস্যপূর্ণ ভঙ্গি, অল্প-অল্প হাসি, নিরুপম কথাটার মানে বুঝল না। খতমত খেয়ে বলল “স্বধা, তুমি তো—”

“গাড়ি চালাতে জানি না, তাই বলছ তো? গাড়ি চালিয়ে ষতটা আনা যাক, তুমি আজ চালিয়েছ। এখানে আজকের বাকীটা, নিরুপম আমাকে চালাতে দাও!”

“এখানে, এই ঋশানে?”

“এই স্থানে। নিশ্চয় কোনও নিয়তি আছে, নইলে এখানে আসব কেন। বলা যায় না, নিরুপম, লোকালয়ে যা মেলেনি, আমরা এইখানে হয়ত তা পাব।”

“তুমি দেবে?” নিরুপম অবিশ্বাসী গলায় বলল।

উত্তরে সম্পূর্ণ দৃষ্টি সংস্থিত করে স্বধা বলল, “তুমি দেবে না?”

“এখানে, এখানে”, কিছুক্ষণ পর নিরুপমের আশ্বস্ত মন আবার প্রজ্ঞাপতির মতো প্রলুদ্ধ নৃত্যপর হয়েছিল। শুকনো কাঠ ঠেকেছিল যাকে মাত্রই দশ-বারো ঘণ্টা আগে, অলৌকিক জাতুতে সে কি পুনরায় সজীব, সতেজ? এ কি তার চোখের বিভ্রম, সে কি সত্যিই সেই কাঠখানি সবুজ পাতায় ছেয়ে যেতে দেখছে! এ-স্বধা আলাদা, রূপান্তরিত জন্মান্তরিত।

“তবু”, নিরুপম বলল, “স্বধা তুমি কি ভেবে দেখেছ, আমরা থাকব কোথায়?”

ইঙ্গিতে স্বধা ঘন বনের একটা দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করল। সেখানে স্থঠাম-শরীর কয়েকটা গাছের ফাঁকে একটা কাঠের বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। সামনের দিকে ঝুঁকে চড়াই ভেঙে ভেঙে ওয়া সেখানে উঠে এল। চারদিকে তাকিয়ে স্বধা বলল “কেউ নেই। মনে হচ্ছে কেউ থাকে না। এটা তবে কী?”

“কাঠুরীদের কুটির” নিরুপম পর্যবেক্ষণ করে বলল।—“কেউ হয়ত কোনও দিন কোনও কারণে এটা বানিয়েছিল।”

“তা-হলেই হবে,” স্বধা লঘু গলায় বলে উঠল “রাত্রে কোনও হিংস্র প্রাণীর পেটে যাওয়ার ভয় আমাদের রইল না। নিরুপম, তোমার গাড়ির ক্যারিয়ারে অন্তত কিছু ফল, রুটি, ডিম, এসব আছে তো। খিদের চেয়ে হিংস্র প্রাণী কিছু নেই, মনে রেখো।”

সেই কথা শুনে নিরুপম বলল “স্বধা, সব হিংস্র প্রাণীর খবর কি তুমি রাখো। তোমার হিসেবের বাইরেও কোন জন্তু যদি, তুমি জানো না, যদি—”

নির্বিকার গলায় স্বধা বলল “সে দেখা যাবে।”

এতক্ষণে সময় হয়েছে, নিরুপম পেশ করল সেই কথাটা, যেটা সারা সকাল থেকে এ-পর্ষন্ত বলি-বলি করেও বলা হয়নি। বলল “স্বধা, এখন বেলো তো কাল রাত্রে তুমি ওখানে চমকে উঠেছিলে কেন। তুমি ভেবেছিলে উৎপল আশেপাশে কোথাও আছে, হঠাৎ এসে পড়তে পারে, তাই নয়?”

স্বধা বলল “না। অল্প কথা মনে হচ্ছিল। বড্ড নোংরা মনে হচ্ছিল আমার, পায়ের নখ দিয়ে খুঁচিয়ে কারপেটের ধুলো তুলছিলাম, তুমি দেখতে পাওনি? গা

ধিন ধিন করছিল। মনে হচ্ছিল এ সেই জায়গা, যেখানে খালি আমি না, ভাবছিলাম, ধার-ধার স্বামী টুয়ে কিংবা ইন্টারভিউ পেয়ে দূরে যায়, এমন কতজনকে তুমি নিয়ে আস। উৎপলের ভয় নয় নিরুপম, তোমাকে ওখানে বড্ড বেশি স্মার্ট আর অভ্যস্ত মনে হচ্ছিল। যে স্মার্টনেস দেখে তুলেছি, সেই স্মার্টনেসকেই ঘণা হচ্ছিল। খালি ভাবছিলাম, তুমি ওখানে আরও অনেক—অনেক-বার এসেছ।”

“তাই কি সূধা বিষ হয়ে গেল?” ধরা গলায় বলল নিরুপম।

“সূধা বিষ হয়ে গেল”, সূধা সংক্ষেপে বলল।

নিরুপম বলতে গেল “কিন্তু সত্যি কথাটা এই—”, হাত তুলে সূধা বলল “থাক। সত্যি কথা এখানে এনে কাজ নেই। রোজ তো সত্যি নিয়েই আছি। যা সত্য তা খুব ছোট, পোস্টকার্ডের পিঠে লেখা চিঠির মতো। মিথ্যে যেহেতু কল্পনা, তাই তাকে পাতার পর পাতা জুড়ে ফেনিয়ে দিতে পারি। প্রেমপত্রের মতো।”

গাড়ির পিছন থেকে ওরা খাবার যা ছিল বার করে আনল। একটা শতরঞ্চিও ছিল, সেটা পাতা হল দীর্ঘতমা ঝমিসম কোনও বৃক্ষের তলায়, বার শাখা-প্রশাখা অসংখ্য পাখির কলরবে মুখরিত হয়ে ছিল। অতল ঝিলটা ঠিক সামনেই, যেখানে ঘাস পোড়া সেই ফাঁকা জায়গাটা একটু দূরে, পাশে।

“এই স্থানে” নিরুপম বলে উঠল, আর তৎক্ষণাৎ তার গলায় গলা মিলিয়ে সূধাও বলল “এই স্থানে। আশ্চর্য।”

বিকালের হঠাৎ হাওয়ায় বালি উড়ছিল তার সব ঔদাস্ত নিয়ে। বিকালের নরম রোদে সূধার কর্ণমূল, গ্রীবা সব কমনীয় হয়ে উঠেছিল। একটা টিল তুলে নিরুপম ছুঁড়ল ঝিলের জলে, যেখানে নানা অজানা উদ্ভিদ জটলা তৈরী করেছে। নিরুপম বলল “রাত্রে এখানে বোধ হয় বিবিধ জন্তু জল খেতে আসে।”

সুনে সূধা ভয় পেল কি পেল না কিন্তু কাছে ঘেঁষে এল। মুখখানি একদিকে কাত করে তুলে বলল, “আমরা দেখতে পাব?”

সূধা কখন পা টিপে টিপে ঝিলের একেবারে ধারে চলে গেছে নিরুপম খেয়াল করেনি, তার একটু ঝিমুনি এসেছিল, দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ছুটে এল। সূধা ঠোঁটে আঙুল রেখে নিষেধ করল ওকে—“এখানে চিংকার করতে নেই। সব কেমন চূপচাপ দেখছ না?”

নিরুপম দেখছিল। ঢালু জায়গায় একটু পিছনে যেখানে সে দাঁড়িয়ে, সেখান

থেকে ছুটি স্থধাকে দেখা যায় : এক স্থধা ঝুঁকে আছে জলের উপরে, অল্প স্থধা জলের তলায় !—“মুখ দেখছ ?” নিরুপম বলল, স্থধা জবাব দিল “হ্যাঁ, আয়নায় । চেহারাটার কী চেহারা হয়েছে অনেকক্ষণ দেখতে পাইনি কি না ।” বলেই স্থধা পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে দিল জলে, পরীক্ষায়লকভাবে । ওর ছায়া ভেঙে ভেঙে আরও ছড়িয়ে পড়ে, তবু জলের নিচেই কস্পিত হতে থাকল ।

ছু'হাতে শাড়ির দুটি দিক আলগোছে তুলে ধরছে স্থধা, ফলে শাড়িটা কতকটা ঘাঘরার ডৌল নিয়েছে, পায়ের গোছ অসংকোচে, নিস্পাপত, উন্মুক্ত হয়ে গেছে, নিরুপমের পলক পড়ে না, কিন্তু স্থধার খেয়াল নেই, আরও ছুয়ে পড়ে সে যেন কী তুলে আনতে চাইছিল, নিরুপম বলে উঠল, “স্থধা, আর যেও না”, কিন্তু স্থধা শুনে তো । তরল গলায় সে বলছিল “আমি এইভাবে একটু একটু তলিয়ে বিসর্জনের প্রতিমা হয়ে যাই, নিরুপম ?”

নিরুপম তাড়াতাড়ি গুকে ধরে ফেলল । স্থধার মুঠোয় তবু উঠে এসেছিল কয়েকটা পাতা সমেত একটি লতা, তাতে লালচে ছোপ ধরা ছু'তিনটে ফুল ফুটে ছিল । স্থধা ফুল ক'টিকে ওর নাকের কাছে ধরল । “গন্ধও আছে খুব মুহু । আর পদ্মও আছে, ঝিলের মাঝখানে । পদ্মই তো, না ? পদ্ম না শালুক ?”

“পদ্ম”, নিরুপম এমন স্বরে বলল, যেন ঘোষণা । “যদি বলো তুলে আনতে পারি । কাঁটা দেখেও ক্রান্ত হব না ।”

“হঁস্ ।” স্থধা অল্প হেসে বলল, একটা আঙুলে নিজেরই গাল ছুঁয়ে । “তবে আমার নিজেরই কিন্তু ইচ্ছে করছে নেমে যাই । যদি সাঁতার জানতাম । ছাখো, ছাখো, পাড় দিয়ে দিয়ে ছোট ছোট গর্ত কত । আর মাটির উপর দিয়ে সরু সরু যেন লাইন টানা—”

“কাঁকড়ার ।” ওরা ওই রেখা টেনে টেনে জল থেকে উঠে আসে ।

“জল থেকে উঠে আসা”, স্থধার মনে অল্প একটা ছবি মনে পড়ে গিয়ে সে ঝেংঝেং আনমনা হয়ে গেল । “মেয়েরাও উঠে আসে, না ? কলসী কাঁখে নিয়ে গ্রামে, ছবিতে দেখেছি । চমৎকার লাগে ।”

নিরুপম হাসছিল । “কলসী নিয়ে মেয়েরা কিন্তু—” সে কী বলবে যেন আন্দাজে ধরে নিয়েই স্থধা বলল, “জানি । মেয়েরা ডোবেও !”

উপরে তখন আসন্ন সন্ধ্যায় যেন রাজসভা বসে গিয়েছিল । যত বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি, তারা দ্বিপ্রহরে যদি-বা নিরাসক্ত নির্বাক থাকে, যত বেলা পড়ে ততই পল্পিরের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্কে লিপ্ত হয় । অনিশ্চিত কিছু কিছু পাখি আগে থেকেই

ফিরে আসে বাসায়, অথবা কেউ কেউ হয়ত বেরই হয় না, সারাদিন ডালে ডালে পাতায় পাতায় বসে, ফল ঠুকরে ঠুকরে খায়, চারদিকে ছড়ায়। যেখানে ওরা উঠে এল, সেখানে শালের মঞ্জরীও ছড়িয়ে ছিল। আর বহুবর্ণ একটি শব্দের বিমিশ্র বিচিত্র নকশা দৃশ্যপট হয়েছিল।

“এই, বলা তো এই বনটার নাম কী?”

কিছু না ভেবেই নিরুপম বলে দিল, “নন্দনকানন।”

টিপ টিপ জল চুঁইয়ে পড়ছে স্বধার শাড়ির পাড় থেকে। স্বধা নীচু হয়ে বলল, “চোখটা অন্ধদিকে ঘোরাও দেখি। আমি জল নিংড়ে ফেলব।” ফলে দৃষ্টি আরও সকৌতুকে বিস্মারিত করে নিরুপম বলল, “ইভা, নন্দনকাননে কিন্তু লজ্জা ছিল না।”

“এই নন্দনকাননে আছে কী?”

“বিশ্বাস”, তদুত্তর কঠে উচ্চারণ করল নিরুপম!—“আর সাহস! স্বধা, বোধ হয় সমর্পণও।”

“এখনও লোভ?” স্বধা ভ্রুকুটি করে বলল।

“এই ঝিলটা”, একটু পরে স্বধা বলছিল নিজে-নিজেই। “আশ্চর্য, এত ওপরে, এই পাহাড়ের গায়ে—”

“সে এমন কিছু অবাধ ব্যাপার কি? কৈলাসেও তো আছে মানস সরোবর, শোন নি? কৈলাস তো আরও উঁচুতে। পৃথিবীর সর্বত্র সব কিছুর সংস্থান থাকে।”

“আর এই ঝরনা? কোথায় গিয়ে পড়েছে?” তিরতিরে একটা স্রোত দেখিয়ে স্বধা বলল। আর পরম জ্ঞানীর মতো উত্তর দিল নিরুপম “নিশ্চয়ই নিচে কোথাও। সমতলে।”

“আর ঝরনাটা ধরে ওপব দিকে যদি যাই? কোথায় গিয়ে পৌঁছব! হিমালয়ে?”

“বোকা মেয়ে” মূহু তিরস্কার করে ভাঙ্গা গলায় নিরুপম বলল “হিমালয় এখানে কোথায়?”

“আমি ভুগোল জানি না”, স্বধা বলল, অম্লানবদনে। তার পরেই সহসা জোরে চোঁচিয়ে উঠে বলল, “এই—এই!” সে কাকে ডাকছিল। সেই ডাকে বাঁধের উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে কে এগিয়ে এল। কাছে আসতেই দেখা গেল, একটি বালক। খালি গা, সে মাটিতে আস্তে আস্তে একটা ঝুঁড়ি নামিয়ে রাখল। তালশাঁস।

“এখানে এখনও শাঁস আছে? সব পেকে তাল হয়ে যায় নি?”

ছেলেটা কথা বলল না। স্বধার চোখের ইশারায় অল্পমতি পেয়ে খোলস ছাড়িয়ে



এক-একটা শাঁস সে তুলে দিচ্ছিল পদ্ম পাতায়। সবুজের তলাতেই অব্যাহত শুভ্র  
হৃদয়, ফেটে ফেটে ফিনিকি দিয়ে কোন-কোনটা স্খাধার করতল ভিজিয়ে দিল।  
নিরুপম বলল, “সাবধানে দাঁত বসাতে হয়।”

এতক্ষণে, অনেক নীচে সমতল দিয়ে প্রসারিত ছুটি লৌহরেখা ওরা লক্ষ্য করতে  
পেরেছিল। ছেলেটাকে পয়সা দিয়ে নিরুপম জিজ্ঞাসা করল, “ওই রেল লাইনটা  
কোথায় গেছে?” মাথা নেড়ে ছেলেটা বলল, জানে না।

“জানতে ইচ্ছে হয় না? কোনদিন রেলে চড়ে বসিনি তুই? কোথাও  
যেতে ইচ্ছে হয় না?”

“যাব কেন।” বিস্মিত, তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন একটি উত্তর—“যাব কেন!”

“বা-রে ছেলে”, অস্থির নাগরিক নিরুপম বলল, “ছুনিয়ার কোথায় কী আছে,  
দেখতে ইচ্ছে হয় না?”

“যাব কেন”, ছেলেটা বলল আবার, ওর হিন্দী-বাংলা মেশানো এক ভাষায়  
“এখানেই তো সব দেখি।” এক কথায় প্রশ্নটাকে খারিজ করে দিয়ে সে পয়সাটা  
কোমরে গুঁজে ধীরে ধীরে অপস্থত হল।

“আমিও জানি না”, নিরুপম আস্তে আস্তে বলল খানিক পরে, “ওই রেল  
রাস্তাটা গেছে কোথায়।”

“জান না বলেই তো ভাল লাগছে বেশি। উধাও লাইনটাকে রহস্যময় ঠেকছে।”  
স্খাধা বলল, “জানা থাকলে সবটাই জানা হয়ে যেত।” সায় দিয়ে নিরুপম বলল,  
“টিক। আমি নিশ্চিত যে, এই লাইনে সবচেয়ে কাছের যে স্টেশন, তার নাম  
কোনও টাইম-টেবলে লেখা নেই।” স্খাধা আরও একবার বলল, “আমি ভূগোল  
জানি না।”

ঠক্ঠক্, ঠক্ঠক্, অনেকক্ষণ ধরে শব্দ হচ্ছিল বনের গভীরে, নিয়মিত ষড়িতে আর  
লয়ে, যতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল, ততক্ষণ ওরা শুনতে পায়নি, থেমে যেতেই ঐকতানের  
মধ্যে কী একটার অভাব ঘটেছে, অনুভব করতে পারল। খানিকটা কান পেতে থেকে  
নিরুপম বলল, “কাঠুরেরা কাঠ কাটছিল বোধ হয়। চলে গেল।”

স্খাধা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঘাসে ঘাসে। একটা কাণ্ডি উঁচু করে ধরে কোথা  
থেকে পেড়ে আনল এক গুচ্ছ ফুল, পরল চূলে। “মানিয়েছে? কী ফুল  
বলো তো?”

নিরুপম চট করে বলে দিল, “নাগকেশর। কিন্তু এখানে জবা ফুল পরলেও

মানিয়ে যেত। এই পরিবেশে সবই মানিয়ে যায়।” এবার সূধা ছিড়ে আনল করেকটা লতা।—“কী লতা ?”

ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরছিল সে, কী ফুল, কী পাখি, কী গাছ, কী লতা, প্রাণে প্রাণে অস্থির করে তুলছিল নিরুপমকে। শেষে ছায়া যখন ঘনিয়ে এল, তখন নিরুপম আর পারল না, আত্মসমর্পণের মতো আর্ত, বলল, “সূধা আমি কিছুই জানি না। কোন্ লতার নাম কী, কোন্ বরনা কোথায় গেছে, কিছু জানা নেই আমার। এত জেনে কাজই বা কী।”

যখন ছোট ছিলাম, সে ভাবছিল, তখন কেবলই হাত দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম এটা কী, ওটা কী। সব শিশুই করে। শিশু তো, ভাবে এই উপায়ে জগতের সব কিছু জেনে ফেলা যাবে। বড় হয়ে আর কথায় কথায় কৌতুহল প্রকাশ করে না। কারণ, ততদিনে বুঝে ফেলে, যতই জাহুক, তার পরিমাণ না-জানা অংশের সামান্য ভগ্নাংশও না। ‘আমিও তাই’, নিরুপম নিজেকে বলছিল, ‘আজ প্রশ্নকে নিরস্ত রাখি! ফুল, লতা, পাতা, পাখি—শুধু দেখি। সে-পাওয়াও অপরাধ পাওয়া।’

প্রথম হিম পড়তে ওরা সেই কাঠের কুটিরের বারান্দায় উঠে এল। একটাই তারা উঠেছিল—আকাশের মল্লিকা বনে প্রথম ফোটা কলি—সেই তারাটিকে ওরা প্রথমে কিন্তু আকাশে নয়—দেখতে পেল বিলের জলে।

ঘরের ভিতরটা সূধা একবার দেখে এসেছিল। ফিরে এসে বলল, “কেউ নেই। মনে হল কেউ থাকে না। তবে কোনও কালে হয়ত কেউ থাকত। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আসে। অল্প-স্বল্প আসবাব—ব্যবহারের চিহ্ন আছে। একটা চারপায়াও দেখতে পেলাম।”

অঙ্ককার কখনও কখনও কালো কালো ফুলকির মত নামে, কালো অথচ তপ্ত, অজস্র, অজস্র, সেই অঙ্ককারে নিরুপম বুঝতে পারল না, সূধার চোখের মণি জ্বলছে কিনা। নিজের বুকে হাত দিয়ে টের পেল, হৃৎস্পন্দ দ্রুততর। আরও একটা পরীক্ষার সম্ভাবনা সে প্রত্যক্ষ করল। কী ঘটবে, এই রাত্রি কী দেবে, প্রাপ্তি কিংবা পুনরুপি বন্ধনা, নিরুপম যন্ত্রণায় মাথায় হাত দিল, সে আর ভাবতে পারছে না। বিকৃত, ভাঙা গলায় বলে উঠল নিরুপম, “সূধা তোমার ভয় করছে ?”

পা ঝুলিয়ে সূধা বসেছিল নীচের একটা ধাপে, দাঁতে শিকড়-টিকড় কিছু একটা কাটছিল, মুখ থেকে ফেলে দিয়ে সমতল গলায় বলল, “কই, না তো।” যেন নীড়ের পাখিদের ছায় ও নির্ভয় হয়ে ছিল।

বিশ্বাস, সমর্পণ, নিরুপম আরও একবার তাদের চাক্ষুষ রূপ প্রত্যক্ষ করল। অতঃপর কী, রোমাঙ্কিত হয়ে সে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিল : সমাপ্তি আর উদ্‌ঘাপন ? একটু ভালো হত সুধার মুখটায় কোন্ ভাবের খেলা চলছে দেখতে পেলে। নিরুপমের তখন মনে পড়ল একটা ছোট টর্চ তার পকেটেই আছে।

আর ঠিক তখনই কোটালের বানের মতো জ্যোৎস্না এল।

সেই জ্যোৎস্নায় তলিয়ে যাওয়া ঝিলটা আবার অপরূপ একটি সরোবরের রূপ নিয়ে উঠল ভেসে। নিরুপম অল্পভব করছিল, তার চার পাশেই এমন কিছু ঘটছে, কোনও আলোড়ন, কোনও বিপুল উন্মোচন যার ব্যাপ্তি, ব্যাস, বেধ আর পরিধি ধরাতলের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর আবৃত করেছে, শুধু দৃষ্টি দিয়ে যার কূল মেলে না।

আর আছে কী ? রাত জাগা অগোচর কোনও পাখি। এই মুহূর্তে তার সহচর লতা গুল্ম বৃক্ষ ইত্যাদি। আর ? নিশ্চয়ই কোনও রমণীও, কিন্তু সে শরীরিকী কিনা, সে-বিষয়ে এই মুহূর্তে তার কোনও চেতনা ছিল না। শাখা-প্রশাখা বোধের অতীত কোনও আনন্দে নিঃশব্দে আন্দোলিত হচ্ছিল।

“কী ভাবছ ?” কানের কাছে কেউ বলল ফিসফিস স্ববে।

হাত বাড়িয়ে নিরুপম একটি লতা স্পর্শ করল, দাঁওয়া ঘেষে, একটি সমর্থ খাম জড়িয়ে যেটা বিস্তারিত হয়ে ছিল।—“এই লতাটার কথা।”

“আশ্চর্য”। সেই ফিসফিস স্বর বলল, “আমিও তাই। অবাক হয়ে ভাবছিলাম ওরা মাটির কাছ থেকে সব কিছু শুষে নেয়, রস ইত্যাদি যা কিছু, অথচ নিজেকে খুলে দেয়, মেলে ধরে আকাশের কাছে। প্রতিটি লতা আর গাছ কি তবে প্রকৃতিগতভাবে অসৎ—অসতী ?”

“মেঘের আচরণেও তাই”, নিরুপম বলল, “গাখো, একই রীতি। মেঘ আকাশে ভাসে, কিন্তু চেয়ে থাকে মাটির দিকে। সব ঢেলেও দেয়, এমন কী নিজেকে ভেঙেচুরে নিঃশেষ করে।”

“কিন্তু আমরা এসব কথা বলছি কেন”, অতিপ্রাকৃত সেই সুরেলা গলায় বলল, “এ সবার কী অর্থ ?”

“কিছু নেই”, নিরুপম বলল, “তবু আমরা বলছি। যেহেতু আমরা এখানে বসে আছি, শুধু বসে আছি।”

“ভিতরে যাবে না ?” প্রতীক্ষিত সেই প্রশ্ন এসেছে এতক্ষণে, নিরুপম সটান হয়ে বসল। সতর্ক গলায় বলল, “যাব। সুধা, তোমার ঘুম পেয়েছে ?”

“পেয়েছে—হয়ত। কিন্তু আর একটু বসি ?”

“বোসো। কিংবা চলো আমরা ওই বিলটাকে আরও একবার ঘুরে আসি।”

“না এখানেই।”

যেখানে পোড়া ঘাস, সেখানে অল্প অল্প বাতাসে বালি উড়ছিল। সোজা হয়ে বসে সুধা বলল “নিরুপম, ওটা তো শ্মশান? ওখানে, ধরো, আজ রাত্রেই কেউ যদি শব নিয়ে আসে?”

“ভয় নেই। যেই আত্মক, জীবিত দুটি প্রাণীকে দেখবে জাগ্রত। তারা সরে যাবে।”

পা আরও ছড়িয়ে দিয়েছে সুধা, অলস, এলায়িত দেহের শেষ প্রান্ত মাটি ছুঁয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় কতগুলো পাতা কাঁপছিল শালের, সেগুনের বা অন্ত কোনও বন্য বৃক্ষের। সেদিকে ক্লান্ত চোখে চেয়ে সুধা বলল, “ওগুলো কি ছায়া?”

“না। ওদেরও শরীর আছে।”

“অথচ” হাই তুলে সুধা বলল, “মনে হচ্ছিল যেন ছায়া ছায়া।”

“এই জ্যোৎস্নায়, সুধা, সবই তাই মনে হয়।”

তার পরেই গুরু গুরু শব্দে সেই কুটির, ছায়া, জ্যোৎস্না, সব যেন প্রকম্পিত হতে লাগল। “মেঘ?” নিজেকে গুছিয়ে সুধা উঠে বসল। খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে নিরুপম বলল “না। ট্রেন। রাতের রেলগাড়ি। ঝাঞ্ঝা; ঝাঞ্ঝা, চলন্ত একটা আলোর তীর ছুটে যাচ্ছে, চেয়ে দ্যাখো।”

“ওই নীচ দিয়ে, না? নিরুপম আমরা কতটা ওপরে আছি?”

“বেশ কিছুটা। এখানে হাওয়া হালকা, দেখছ না ধুলো নেই, বোঁয়া নেই, কিছু না?” নিরুপম নিজের কথার সমর্থনে বুক ভরে নিশ্বাস নিল।

“এভারেস্টে যারা ওঠে, তারা আর কতদূর ওঠে?”

“আরও ঢের ঢের ওপরে।

“ওই বিলের কাছে যেতে বলেছিলে। যদি যাই নিরুপম, যদি স্নান করি, উঠে এলে আমাকে কি জলকন্ঠার মতো লাগবে?”

নিরুপম বলতে চেয়েছিল, ‘তারও দরকার নেই। এই উঠোনে নেমে একবার দাঁড়াও, তা হলেই স্নান হয়ে যাবে।’ কিংবা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, ‘সুধা, তোমার হাতে এখন একটা গ্লাস দিই, তুমি এখন ছুটে বাইরে গিয়ে এক গ্লাস জ্যোৎস্না ভরে নিয়ে আসতে পারবে?’

তার একটু পরেই প্রগাঢ় শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। পরিতৃপ্ত, প্রশান্ত। ওর কোলের কাছে মাথা এলানো সুধা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝুঁকে পড়ে নিরুপম ডাকল, “সুধা, সুধা!” একবার মাত্র কেউ বুঝি সাড়া দিল “উ!” সাড়া দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

সে একা, এই বোধটা তীরবেগে বিদ্ধ হল সত্য, তবু, কই কোনও বেদনা তো  
সে অনুভব করছে না! কোথাও একটা আশ্বাস অরূপণ বৃষ্টিধারার মতো ঝরছে,  
নিরুপম সামনে চেয়ে দেখল—জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না? চতুর্দশী? অথবা আজ কি  
পূর্ণিমা? যে শহরে বাস করি সেখানে সব একাকার, শুষ্ক অথবা ক্রম্ভ কোন্ তিথি  
কবে, আমরা মনেও রাখি না। সেখানে নষ্টক্রম প্রত্যহ, সর্ব অর্থে।

আর এখানে? বাইরে যতদূর চাওয়া যায়, ধূ-ধূ জ্যোৎস্না শুধু। সব সত্যকে  
আবৃত করে দিয়ে সেই জ্যোৎস্না এক স্নেহস্বীরা জননীপ্রতিমা।

মনিবন্ধে ঘড়িটা অবিরাম টিকটিক করে যদিও বলে চলছিল, ‘আর কখন, আর  
কখন?’ তবু কই কোনও তাগিদ সে তো টের পাচ্ছে না। এখানে শুধু বসে থাকা,  
নত হয়ে মাঝে মাঝে একটি করুণ কমনীয় মুখচ্ছবি দেখা, এ-ছাড়া সব অদরকারী  
ঠেকছে। স্বধার মুখ অল্প একটু খুলে গেছে, শরীরের বাঁধন শিথিল, আলগা, বতুলতা,  
উত্তমুতা, মসৃণতা সব চোখে পড়ে, ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে। একবার যেন কেঁপে  
উঠল স্বধা ঘুমের ঘোরে অশ্রুট। কী বলল। ওর কি শীত করছে? একটা চাদর  
নেই হাতের কাছে কোথাও? নিরুপম অসহায় বোধ করছিল। শেষে নিরুপায়  
স্বধাকেই সন্তর্পণে পাশ ফেরাতে চেষ্টা করল। স্বধা অস্পষ্ট স্বরে বলল, “কী?”  
নিরুপম—“তুমি ঘুমোও। তোমার গায়ের আঁচলটা একটু টেনে নিচ্ছি, তোমারই গা  
ভালো কবে ঢেকে দিতে। স্বধা, অল্প কিছু না।”

আরও প্রহর খানেক। নিরুপমেরও চোখ জড়িয়ে এসেছে, হঠাৎ ঝিলের জলে  
রূপ করে শব্দ হতেই সে চমকে উঠল। হাওয়া উতলা হয়েছিল হয়ত, শুকনো একটা  
ডাল পড়ে থাকবে জলে, তার অনুমান হল। এক দৃষ্টে তবু বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে  
থাকার পর সে স্থির করল, শুকনো ডালই। কোনও জন্তু ঝিলের ধারে জল খেতে  
আসে নি, সে নিশ্চিত জেনেছে, কোনও জন্তু আজ রাতে আসবে না।

সকালে ওরা আবার ফিরছিল। খানিকটা যেতেই রাঙা ধুলোর ভুল রাস্তা  
কাটিয়ে হাইওয়ে পাওয়া গেল। নিরুপম বলল, “স্বধা, একটা কথা বিশ্বাস করবে?  
কাল ইচ্ছে করে কিন্তু রাস্তা ভুল করিনি।”

“জানি।”

“তাহলে এ-ও শোন। ইচ্ছে হলে কালই কিন্তু ফিরতে পারতাম। আমার  
ক্লান্তি আধ ঘণ্টার মধ্যেই কেটে গিয়েছিল।”

“আমি জানতাম।”

“কিন্তু—আরও শোনো—আমার লোভ হয়েছিল।”

“আমি বুঝেছিলাম।”

“পাওয়ার রেশ আমাকে পাগল করেছিল।”

“পাওনি?” দৃষ্টি আয়ত করে সূধা স্নিগ্ধ গলায় বলল।

নিরুপম বলল, “পেয়েছি। আশারও বেশি। তুমি জানো না।”

“তা-ও জানি।”

“পাওয়ার চেহারাটাই বদলে গেল। অথচ সব আমাদের নাগালের মধ্যেই ছিল। ছিল, কিন্তু ঠেঁকে হল না। আমরা পাহাড়ে উঠে গেলাম যে, অনেক ওপরে, যেখানে বাতাস পালকের চেয়েও নির্ভার। সূধা, তুমি কাল একবার এভারেস্টের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, না? মূল একই ব্যাপার। প্রথমবার যারা ওখানে উঠেছিল সেই লঘু বায়ু, অকলঙ্ক, শুভ্র শূন্যতার একটা অশেষ কিছু দ্বারা তারা আক্রান্ত হল, সব হঠাৎ অদরকারী, জানো তাদের কেউ কেউ একটা সিগারেট পর্যন্ত মুখে দিতে পারল না। ইচ্ছেই হল না।”

অনেক পরে সূধা বলল “এখন আমরা কিরছি তো? কখন পৌছব?”

“বিকেলের মধ্যেই। কিংবা তারও আগে।”

একটা লোকালয় এসে পড়ায় একাগ্র ভাবে চালাতে হচ্ছিল, তাই বাকীটা বলা হল না। নইলে নিরুপমের আরও কিছু বলার ছিল। কাল শেষ রাতে শিহরিত সেই স্বপ্নের কথাটা। কোনও মারণাস্ত্রে পৃথিবীটা ধুলো ধুলো হয়ে গেছে কিন্তু আশ্চর্য, তখনও জ্যোৎস্না আছে, আর সেই আলোয় ভালোবাসাও পরিব্যাপ্ত ভাসছে। প্রলয়ের পরেও প্রেম থাকবে, কোনও স্নেহ ক্ষরিত হবে অবিরত, এই দৃষ্ট সত্য নিয়েই সে চাঁদের বন থেকে কিরছে বলা হল না।

কিন্তু ঘিঞ্জি বাজারের সংকীর্ণ সড়কে আর একটা সত্যও দেখা দিয়েই মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। সূধাকে সেটা হয়ত বলা যাবে। বারবার এখানে আসা যাবে না, কলকাতায় ফিরছি, ফিরবই তো হয়তো—এই সত্যটা একটু স্থূল—কখনও আবার কোনও হোটেলেও যাব। হঠাৎ তেষ্ঠা পেয়ে বসলে তাকে অসম্পূর্ণ ভাবে মেটাতে, হোটেলে; কিন্তু পরিপূর্ণ স্নানের জন্তে, এখানে। এখানেও ফিরতে হবে, মাঝে মাঝে ফিরব।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সে আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলো মোর্শেদের কাছে যাবে না। যদিও সন্ধ্যা মাত্র উত্তীর্ণ এবং তেমন তাড়া নেই, তবু একজোড়া চোখ তাকে অনিবার্য তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাসার দিকে। ফুটপাতে চোখ রেখে জনারণ্যে তার মন তখন সেই পবিত্রতা এবং নিজস্ব স্বপ্নের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ‘আমি যাবো না তাকে ডাকতে’ এ কথা নিজেকে অবিরাম বলেছে সে। কেনন্য তার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটছে। তবু প্রতিবার ‘আমি যাবো না’—প্রতিজ্ঞ হবার সময় একজোড়া কঠিন চোখ তাকে বিদ্ধ করছে।

মোর্শেদ ছিলো না বাসায়; তার বাসা থেকে বেরিয়ে এসেই দূর অন্ধকার শূন্যে সে মেঘ দেখলো। সেই তখন সে চমকিত হেসে ফেললো। ‘এই যৌবনবতী মেঘ আমাকে স্বপ্ন দেবে, স্বপ্নে ডুবিয়ে দেবে, ডুবিয়ে দেবে’ এই কথা তখন এক লাখ বার হাতে হাতে লোফালুফি করতে করতে সন্ধ্যায় সে ঘরে ফিরে এলো। স্বপ্নের বাহারী সজ্জাধনে আলিঙ্গনে বন্দী হয়ে দরোজা বন্ধ করে আনন্দিত হাসলো সে। অন্ধকার মর্গিময় চুমকিতে বিদ্ধ সেই হাসি স্বপ্নময় মনোরম ঘরটিতে সারারাত শিশির হয়ে জলে। বস্তুত বৃষ্টির রাতে একটি স্বপ্ন তার মনোজ খাঁচাটিতে স্নেহে ডানা ঝাড়ে, নিশিবিহারে অন্ধকারেও আফ্লাদে স্ননীল হয়। কিন্তু মেঘহীন রাতে তার সঘন্থ লালিত স্বপ্নেরা পালায়, তখন মুখখোলা সেই খাঁচার গায়ে সে ব্যাকুল মুখ ঘষতো; সজ্জারে নাড়া খেয়ে বিহ্বল তাকাতো শুধু, ছলছল রক্তেরা চমকাতো; তখন এক একবার বিদ্যুত বলকের মতো মনে হতো কেউ যেন দরোজায় কড়া নাড়ছে, সে সাড়া দিতো, দরোজা খুললেই শুধু অন্ধকার কাঁপিয়ে পড়তো তার মুখে, তখন তার স্বপ্ন খাঁচা উজাড় হয়ে কার কর্ণলয়, সে কোন উত্থানে ক্রীড়ারত। এইসব রাতে অচেতন সে দরোজায় পড়ে থাকে, মাতাল হাওয়ারা বিজ্ঞ প্রান্তরে উদ্দাম ঘোড়া

ছোটায় ; আর অবহেলিত চৈতন্যহীন নিমজ্জিত তাকে ঘিরে তারার চুমকি বসানো র্নাত বিজ্রপে মাতাল হয় ।

‘এই তো বিষ্টি নামলো’ বলে অঙ্ককারে শরীর হাতড়ে সে, রুহু অসংখ্য লেপটানো স্বপ্ন অহুভব করলো । তার গা বেয়ে, চুলের সফু রেখায় হেঁটে এসে তারা মেঝেয় ধরে অঙ্ককার অচেনা আলোতে নৃত্যে তাকে ভরে দিলো । রুহু জামার খোলশ থেকে বেরিয়ে এসে দরোজা খুললো । আর সেই সব শরীরহীন অস্তিত্বহীন তারা রুহুর ভেতরে-বাইরে দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি করে ব্যস্ত করে তুললো । তার কঠ-লগ্ন মাতাল বিষ্টিকন্নারা মুখখোলা মনোজ খাঁচার ভেতরে ঢুকলো । তারপর অশাস্ত হাওয়া, তার কপালে চুলে জড়িয়ে থাকা স্বপ্নদের স্ফুড়স্ফুড়ি দিয়ে পাগল করলো । এমন দমকা হাওয়ার কাঁপন, এমন বৃষ্টি শিরশির রাতে কতোবার সে চমক খেয়েছে তার কঠ শুনে । বৃষ্টি রুহুর মুখে আঁচলের ঝাপটা মারলো ; ঠোঁট চেপে ধরে চুপিচুপি হাসলো রুহু । ‘আজ কেউ আসবে না, বৃষ্টি হলো আজ....আজ সারারাত বৃষ্টি থাকবে । আজ এসো হেনা খালা, তুমি আমার পবিত্রতম স্বপ্ন, তুমি পবিত্র হও, শুভ্র হও হেনা খালা ।’ চুপি চুপি বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে আউড়ে গেলো রুহু । কার কঠ বাজলো চুপি চুপি, ‘রুহু মামা, আজ বৃষ্টি হলো, দেখো কেমন ভিজ্জে গেছি রুহু মামা ! জলের স্বাদ ; স্ফুতীত্র স্বাদ , দেখো কত জল ভেতরে বাইরে । চোখ খোলো রুহু মামা ।’

তখন চোখ খুলেছে রুহু, হেনা অঙ্ককার আলোতে । হেনা আলোছায়ায় জল, হেনা জল হয়ে গেছে, গলে গেছে, ঠোঁটেচোখেমুখে অজস্র বৃষ্টিকণায় হেনা তরল হয়ে গেছে । চুলের দীর্ঘ অরণ্যপথে কি নিটোল এক একটি স্বপ্নের ফোঁটা হেঁটে এসে, ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠোঁটের পাশে, হেনার ঠোঁট জল ।

সেই ছলছল তরলতায় ডুবতো রুহু, এক ডুবে ছ’কুড়ি বছর স্নানীল জলের স্বাদে কার বন্দী আত্মাকে উদ্ধার করতে বাক্য ভেঙে মনভ্রমরাকে ধরে আনতে যেতো ।

‘রুহু মামা, কাছে এসো, আমার গভীর তরলতায় ডুবতে এসো, এইখানে দেহের বৃকের মাঝে কতো জল, রুহু মামা ।’

তখন চারদিকে কি অদ্ভুত স্বপ্ন বিছ্যতের ফোঁটা, সব তরলতার নেশায় একাকার ; প্রতিটি কণা তখন অমূল্য হীরের অপরূপ ঝলকানি । সেই জল থেকে গন্ধ, সেই অতল থেকে ফিসফিস স্বর ‘রুহু মামা, আমাকে দেখো, তুমি শুনছো না রুহুমামা, দেখো ।’



। দুই ।

নীলআলো বন্ধ ঘরে সে চিং হয়ে শুয়ে ; নীল আলোর সঙ্গে সিগ্রেটের জলন্ত অবশিষ্ট থেকে একটি শিখা তার নাকে ধাক্কা দিচ্ছে। পাশে সরিয়ে রাখা তার দেহাবরণের ওপর দিয়ে সে বিক্ষার চোখে তাকিয়ে ; হেনার নিরাবেগ চোখ কিছূক্ষণ আগের সেই আবিল মুহূর্তের দিকে বেড়ালের মতো ক্রমাগত গুটি গুটি পায়ে এগুচ্ছে। একপাশে শুয়ে থেকে দেয়ালসানালাহাদ পরিক্রম করে এখন তার চোখ তীক্ষ্ণ নিবন্ধ ঘরের কোণে রাখা একটা ছাতার উপর, যা এইমাত্র মোর্শেদ বুগ্গিতে ভিজে যাবে বলে ফেলে গেলো। হেনার গায়ে সেই সূখ আবার স্ফুড়স্ফুড়ি দিচ্ছে, তার স্বপ্নময় রক্তিম সড়কে কার চমকিত গতয়াত আগুন হচ্ছে। সে, হেনা উদ্ভাস হাসিতে ভরে গেলো, সারাঘরময় হাসির চুমকি ছিটিয়ে দিলো। ছাদদেয়াল-জানালায় ঠোকাঠুকি হয়ে সেই হাসি আবার ফিরে এলো তার কাছে। খোলা-চোখে বিক্ষারিত সে তাকিয়ে থাকলো সেই ছাতার বাঁটে। একবার নড়লো না, চোখ বুঁজে যেন অতল থেকে ফিশফিশ করছে তেমনি উচ্চারণ করলো, ‘আমি আবার যেতে চাই, কেউ আসুক, কেউ, যে কেউ এসে আমাকে বিদ্ধ করুক।’ তার শিরদাঁড়া বেয়ে কিছূক্ষণ আগের সেই উষ্ণ শ্রোত ক্রমাগত তাকে স্ফুড়স্ফুড়ি দিলো ; নাড়া খেয়ে মুচড়ে উঠে ভেঙে দুমড়ে যেতে থাকলো সে, ক্রমাগত মোচড়াতে থাকলো ; কেউ যেন আগুন বুলিয়ে দিচ্ছে বুকে পিঠে, সারা গায়ে। সমস্ত বিছানাটা উত্তপ্ত স্পর্শ দিচ্ছে—উত্তপ্ত আদরে গলে তরল হচ্ছে হেনা। এই সন্ধ্যায় সে আর একবার নিবেদিত হতে চাইলো। দুই বাছ বাড়িয়ে চোখ বুঁজে কাউকে ধরতে চাইলো, গ্রাস করতে, আমূল বিদ্ধ হতে চাইলো, বাতাসে উধাও কোন সুরভিকে দুহাতে ধরতে চাইলো প্রাণপণে। ততক্ষণে সিগ্রেটের জলন্ত অবশিষ্ট ভস্মীভূত হয়েছে, শেষ ধোঁয়াটুকু পাকিয়ে পাকিয়ে দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠে যাচ্ছে। হেনা পাশবালাশটাকে সজোরে আছড়ে ফেললো বৃকের উপর, ‘তুই কোন রক্তপথে পালিয়ে যাবি, পাখি তুই কোন স্ফুদ্রে যাবি।’

হেনা হাসিতে বঙ্কিম হলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো মেঝেয়, হেঁটে গিয়ে ঘরের কোণ-থেকে ছাতাটা তুলে এনে খাটের সাথে ঠেস দিয়ে একপায়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো। ‘সে আবার আসবে আজ রাতে, আবার...আর একবার মোর্শেদ আসুক এখানে তার ছাতাটা নিভে, আর একবার আসুক।’ হেনা দরোজা খুলে

শোবারঘর সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকলো, কিন্তু তখন জল ফুরিয়েছে। উঠে দাঁড়াতেই বাথরুমের ভাঙা শার্শিপথে তিন ফোটা যৌবনবতী বৃষ্টি তার চোখেমুখে ধাক্কা খেলো। তখন হেনার মনে পড়লো রুমুর কথা, বাইরে ইতিমধ্যে বাতাস মাতাল হয়েছে, বৃষ্টিকণারা তুমুল ছোটাছুটিতে হেনার উদ্ভিত নগ্ন বুকে মাথা আছড়াচ্ছে। হাওয়া এবং বৃষ্টির তুমুল মাতলামী হেনাকে ঠেলে নিয়ে গেলো শোবার ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে উঠোনের অন্ধকারে, বৃষ্টির আলিঙ্গনে আবদ্ধ মাতাল হেনা উদ্ভাসিত হলো উঠানে, উর্ধ্বমুখে নিবেদিত হলো হেনা, সর্বাঙ্গ গলে খণ্ড খণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো বৃষ্টিতে। উর্ধ্বমুখে সেই অগ্নিবৃষ্টিকে আলিঙ্গনে ধরতে থাকলো হেনা, সেই আশ্বিন আবার জ্বললো তার বুক, তার দেহে, সর্বাঙ্গ দগ্ধ হলো। বৃষ্টির নীচে নিবেদিতপ্রাণ সে একটা সর্বনাশা শিখায় জ্বলতে থাকলো।

। তিন ।

সন্ধ্যার আকাশে আজ মেঘ ছিলো। আকাশে বর্ষণবতী মেঘ দেখে অল্পান আনন্দিত হয়েছিলো রুমু। বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে দু'এক ফোটা বৃষ্টিতে মুখ ঘষতে তার ভালো লাগে, আসলে শুধু বৃষ্টিই তার ভালো লাগে না; ভালো লাগে বৃষ্টির রাতে হেনার কাছে কেউ আসে না, আসতে পারে না বলে। কেউ এসে কড়া নাড়ে না বৃষ্টির রাতে, তাকে চুপি চুপি বাইরের দরোজা খুলে দিয়ে ঘৃণিত শত্রুদের মুখ দেখতে হয় না এই সব রাতে। সে জানে নিরুপায় হেনা বৃষ্টির রাতেই শুধু আসে তার কাছে। আর এ জন্মেই বৃষ্টির রাতকেও রুমুর ভয়। হেনাকে সে পবিত্র দেখতে চেয়েছে, এখনও চায়। কিন্তু হেনার অর্ধবধ বন্ধুদের যেমন অনিবার্ধ গত্যাত এ বাড়িতে, তেমনি হেনাও যথেষ্টাচারে লিপ্ত। রুমু তার শত্রুদের উপর শুধু ঘৃণিত দৃষ্টিই ছুঁড়ে দিতে পারে, তাদের ভীক্ত নখে ছিন্নভিন্ন করতে পারে না, আক্রোশে ফেটে পড়তে পারে না। 'আমি ওদের ঘেমা করি হেনাখালা এবং নিজেকেও।' আঠিকেশোর এই ভাবনা রুমুকে ঘৃণিত জীবনে ঠেলে দিয়েছে।

রুমু তখন সবে কলেজে ঢুকেছে, হেনাখালা (দূরসম্পর্কের আত্মীয় হেনাকে তখন খালা বলতো রুমু, হেনা আদর করে শুকে রুমুমামা বলতো) তখন দু'বছর ওপরে পড়ে। একই বাড়িতে থাকতো, হেনাখালার ঘরের একটা ঘর পরে, মাঝের ঘরে হেনাখালার দাঁহু থাকতেন।

একবার কলেজের এক ফাংশন শেষে অনেক রাতে ফেরার পথে গা ঘেঁষাঘেঁষি

করে হাঁটতে হাঁটতে হেনাখালাকে দেখে মন কেমন করে উঠেছিলো রুহুর। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে রুহুর গলা জড়িয়ে ধরে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল হেনা, 'উহ মাগো !'

'ভয় পেলে হেনাখালা ?'

'হঁ কেমন ভয় করছে।' হেনা আরো জোরে জড়িয়ে ধরেছে রুহুকে। হেনার সাম্নিধ্যে রুহু তখন রোমাঞ্চিত, শরীরের ভেতরে সে টগবগ করে ফুটেছে। রক্ত চমক খেয়ে উখাল পাখাল হল ফুটাচ্ছে শরীরে। ঠিক তখন রুহু তার রক্তের এই মাতাল নগ্নতায় শিহরিত হলো। 'ভালবাসায় আমি পবিত্র বিশ্বস্ত থাকবো', প্রাণপণ শক্তিতে সে বলতে চাইলো 'ভয় কি হেনাখালা আমি তো রয়েছি।' সে কিছু বলতে পারলো না। তার চোখ বুঁজে এলো, কণ্ঠ বুঁজে এলো। হেনা তার ঠোঁটে চোখে মুখে অলৌকিক উত্তপ্ত ঠোঁট ঘষতে ঘষতে আগুন ছড়িয়ে দিলো। সে তখন প্রাণপণ শক্তিতে উচ্চারণ করলো, 'আমাকে ছেড়ে দাও হেনাখালা, আমি মরে যাবো।'

তখন একটা দূরগত গাড়ি মোড় নিলো এ রাস্তায়, তার আলোতে হেনাখালার ভয় পালালো। হাঁটতে থাকলো সে। তার পাশে পাশে। একবার মাত্র হেনার চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে রুহু ঘাড় গুঁজে চলতে আরম্ভ করলো।

সেই প্রথম রুহু হেনাকে ভালবাসলো, ভালবাসলো এবং ঘৃণা করলো। সেই রাতেই রুহুকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়েছিলো হেনা। হেনার চোখের জাহুতে মুগ্ধ হয়েছিলো রুহু। সেই নীলকালো অতলজলভারনত আহুরে চোখে ডুবতে ইচ্ছে করলো রুহুর। চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হয়েছিল সে কেঁদে ফেলবে। তখন হেনা তার চিবুকে হাত রাখলো, আর রুহু চোখ নামিয়ে ফিশফিশ করে বললো, 'তোমাকে ভালবাসি হেনাখালা।' সেই ফিশফিশ হেনার কণ্ঠেও ধ্বনিত হতে শুনলো রুহু। তারপর চেয়ার হেঁলে সে উঠলো, হেনা ডাকলো, 'শোনো রুহু।'

রুহু আর শুনলো না, নিজের ভেতর ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে যেতে নিজের ঘরে চুকলো। বেশ কিছুদিন ঘর পালালো রুহু, কলেজ পালালো, একটা পবিত্রতা তাকে শুধু পীড়া দিতে লাগলো। কিছু একটা অচেনা স্বরভি হেনার চুল থেকে এসে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যেতে থাকলো।

সেই হেনাখালা, হেনার সর্বনাশা গভীরে ডুবতে থাকা রুহু একাদিন গভীর রাতে

হেনার দরোজায় টোকা দিলো। দরোজা ফাঁক করে হেনা তাকে দেখলো, তাকে দেখে ঘরে টেনে নিয়ে দরোজা বন্ধ করে দিলো।

উজ্জল আলোর নীচে হেনার বিস্ফারিত উলঙ্গ যৌবন দেখে রুহু কাঁপলো, প্রাণপণে পালাতে চাইলো। কিন্তু ততক্ষণে আলো নেভা ঘর। রুহু হুমড়ে ভেঙে গেলো, গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে গেল হেনার ঠোঁটের চাপে, হেনার আলিঙ্গনের চাপে নিজেকে নগ্ন আবিষ্কার করলো রুহু, শ্রায় অচেতন রুহুকে হেনা বিছানায় ছুড়ে দিলো। হেনা তাকে নিপুণ ধারালো অস্ত্রে চিরে ফেললো, রক্তাক্ত রুহু সর্বাঙ্গে লাখ লাখ স্ফূচের জ্বালা নিয়ে ডুবলো।

রুহুর সমস্ত কিছুকে—সমস্ত রুহুর অণুপরমাণুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলা করতে করতে আলো জ্বাললো হেনা। খাটের বাজুতে মাথা রেখে কান্নারত রুহুকে টেনে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো এবং ঠোঁটের কিনারে তীক্ষ্ণ হেসে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলো গালে, বললো, ‘যাও, আর এসো না।’

## । চার ।

জানালায় দাঁড়িয়ে হেনাকে উদ্বাহ উঠোনের অতলে ডুবতে দেখলো রুহু। সন্ধ্যোর সেই বোধ স্মরণ হয়ে, ধ্বনি হয়ে জ্বলতরঙ্গ বাজাতে বাজাতে আবার ফিরে এলো তার কাছে। রুহু স্বন্দর হাসলো, ‘আজ সে আসবে, তার অতল সাগরে আমাকে ডুবিয়ে দিতে, ধ্বনিত করতে, চমকিত নৃত্যে মাতাল করতে। আজ অগ্র কেউ আসবে না।’ ফিশফিশ করে নিজেকে এই কথা শোনাতে শোনাতে রুহু বেদনাময় বিস্মিত হলো নিজের কাছে। ‘কোন অবেলায় সে এসেছিলো, আমি তাকে দেখতে পাই নি, আর সে পরিপূর্ণ আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছে মোর্শেদ, কবীরের কাছে, যারা পালাক্রমে তার নিত্য শয্যা-সঙ্গী। হেনার অমোঘ চোখ আমাকে দিয়েই এদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠায়।’ রুহু নিজেকে নগ্ন বোধ দেখলো, ‘আমি তাকে ছুঁয়ে দেখি নি, জ্বালাতে পারি নি তার কাছে সেই পবিত্রতম আলো।’ রুহু যেন আছড়ে পড়লো আকাশ থেকে, ‘আমি তাকে ডাকতে পারতাম’, রুহু ঘর ছেড়ে উঠোনে নামলো। একটা স্থির কিছু আলো হয়ে জ্বলতে থাকলো তার সর্বাঙ্গে, হাত বাড়িয়ে সে ছুঁয়ে ফেললো হেনাকে। একটা সর্বনাশা সুনীল শিখাকে রুহু তুলে আনলো হাতে রু মুঠোয়। ‘হেনাখালা আমি তোমার তরলতায় ডুবতে চাই, আমি জ্বলতে

চাই, আগুন হতে চাই।’ বৃষ্টিবিদ্ধ রুম্ব নিমজ্জিত হলো হেনার ঠোঁটে, ঠোঁট রাখলো হেনার উচ্ছ্রিত বৃকে।

এমন সময় খোলা দরোজায় কার ছায়া হেঁটে এলো ঘরের মধ্যে। দীর্ঘ ছায়া দাঁড়ালো হেনার সামনে, তাকে ঢেকে দিলো, দেয়াল তুললো কহুর চোখে। রিনরিন বাজলো হেনার কণ্ঠ ‘এ্যাতো দেবী করলে কবীর?’

কবীর একহাতে জড়ালো হেনার কণ্ঠ, তারপর অলস উচ্চাবণ করলো, ‘চলো তোমার ঘরে।’

একটি দীর্ঘ সরলরেখা বর্ষা হয়ে আমূল বিদ্ধ হলো হেনার পাজরে, বিদীর্ণ-তার মনোজ খাঁচার দরোজা খুলে স্বপ্ন-বিদ্যুতেরা পালিয়ে গেলো, একটি স্ননীল শিখা ঘর ছেড়ে ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে এগোলো কহুর আর্তনাদের ওপর পা ফেলে ফেলে।





হারামজাদীকে পেলে হয়...

অন্ধকার ঠাণ্ডা-ক্যান্টিনের এক কোণে রাখা পাতলা কাঠের টেবিলটা যেন আর্তনাদ করে উঠল। চায়ের জঞ্জলে বাড়তি চিনি রাখার সবুজ প্র্যাষ্টিকের বাটিটা উল্টে পড়ল মেঝের উপর... হারামজাদীকে একবার পেলে হয়... আমি ভান্সা ফ্যাস-ফেসে কর্কশ গলায় প্রায় ছফার ছেড়ে চেয়ারে বসলাম। সারাটা ক্যান্টিন থৈ থৈ করছে ভীড়ে, কিন্তু একটি বেয়ারা চোখের পলকে আমার টেবিলে হাজির হ'ল। এটি মধুদার চার-নব্বরী আমদানী—নামটা বড় দরবারী—বীরবল! টেবিলের কাঠে রীতিমত একটা চড মেরে বললাম, গোটা চারেক কলা, একটা পেস্তি আর আইস-কোল্ড ফান্টা এক বোতল! অর্ডার নিয়ে ছোঁড়া কাউণ্টারের দিকটায় এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি আবার ওকে ডেকে বললাম, এই শোন, পাচটা ক্যাপস্টান সিগ্রেটও আনিস সবার শেষে, বুঝলি? —বুঝলাম! এই রকম একটা অন্ধভঙ্গী করে বীরবল চলে গেল—সম্ভবত ক্যান্টিনের ভাঁড়ার ঘরের দিকে।

গোলাপফুল আঁকা কভারের খাতাটা যেন দড়াম্ করে আছড়ে পড়ল টেবিলের ওপর। জুতোর সোলের তলায় প্র্যাষ্টিকের স্নগার-পটখানা পট পট করে গুঁড়িয়ে যেতে থাকল। ক'টা অঞ্জলি কথা বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। মেজাজটাই আমার খিঁচড়ে গেছে আজ। পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্লাস থেকে একটা ছুঁড়ে মারা চাকুর মতই বেরিয়ে এসেছি। কান দুটো কাঁকা করছে। খুলির ভেতরকার মগজটুকু যেন গলে যাওয়া সীসের মত টগবগ করে ফুটছে। যেন একটু পরেই দুই কানের দুটো ফুটো দিয়ে বেবাক মগজ ছড়ছড় ক'রে বেরিয়ে আসবে।

এত বড় সাহস ঐ খান্‌কির? ঐ ভরা ক্লাসের মধ্যে জ্যাঠা আবুল দেখায়

মন্নান মজুমদারকে । ছি ছি ছি । কী লজ্জার কথা, কী ঘেম্মার ব্যাপার । কে জানে কেউ এই বিশ্রী দৃশ্টা দেখে ফেলেছে কি না !

জীনাৎ, মানে জীনাৎ স্মলতানা আমার পাশের বেঞ্চের মেয়েদের অংশ বসেছে । কাজেই বাঁ দিকে সামান্য মুখ বোরালেই তার চোখ আমার মুখের ওপর পড়তে বাধ্য হ'লও তাই । নতুন মাস্টারটা আধ ঘণ্টা ধরে রোল কল্ করে যাবার পর পরই পেছনের দিকে বসা ছোঁড়াগুলো হাওয়া হয়ে গিয়েছিল । বাজেই গোলমাল ক্লাসে প্রায় হচ্ছিলই না । জীনাৎকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম আমি । সে তার গোলাপী গালের ওপর রং করা নখ ঘবছিল কেবল । স্মার তখন শুরু করে দিয়েছে ম্যালথেসিয়ান থিয়ারি অব পপুলেশন । আমার পাশে বসা নোয়াখালির মোলবি আর জামিয়ান ছোঁড়াটি টুকটুক করে নোট দিচ্ছে খাতায় । কথায় কথায় সডেরিং-সডেরিং করে বলে এই নতুন প্রফেসরের লেকচার আমার কাছে কুইনিনের মত তেতো লাগে । তাছাড়া আমি খুব শুদ্ধ করে ইংরিজি লিখতেও পারি না । তাই, স্মারকে দেখাবার জন্তে মাঝেমাঝে ভান করছিলাম লেখার । যেন দারুণ ব্যস্ততার সঙ্গে সমানে লিখে যাচ্ছি । তা যাই হোক আমার নজর তখন আঠার মত আটকে আছে জীনাৎ স্মলতানাব ঘোর গোলাপী গালের চামড়ায় । জীনাৎ তা টের পেয়েছিল । কিন্তু টের পেলে কি হবে, এমন ভাব সে করছিল যেন কোথাকার কোন নবাবজাদী দয়া করে এসে মার্জ রেখেছেন একরাশ বাজে ছেলেমেয়ের দঙ্গলে । কিন্তু রংবাজি সে যতই দেখাক, এই শ্রীমান, এই মন্নান মজুমদার জানে, চোরা চোখে তাকাবার ব্যাপারে দারুণ চৌকশ ঐ ধারাল মেয়েটি । তাকাচ্ছিল । মাঝে মাঝেই আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল জীনাৎ । ক্লাস শেষ হবার মিনিটখানেক আগে তৃতীয়বারের জন্তে ওর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ'ল । আমি চোখ মারলাম । আর সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্রী ঘটনা । বই খাতা গোছাতে গোছাতে জীনাৎ সোজাহজি আমার দিকে তাকাল । তারপর ভয়ানক খারাপ মুখভঙ্গি করে আমাকে জ্যাঠা আঙ্গুল দেখাল ।

তার অর্থ এই যে, জীনাৎ স্মলতানাকে চোখ মারবার রাইট নেই মন্নান মজুমদারের । আধা পয়সা দাম নেই । ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ল । আমি প্রায় বাহু-জ্ঞানশূন্যের মত বাইরে বেরিয়ে এলাম । দেমাগটা জ্বর গরম হ'য়ে গেছে । অস্ত্রদিন ক্লাস ফুরলে শেয়াল-ডাক ডাকি, শিস্ মারি অথবা করিডোরের মালমেয়েদের পাছার মাপ নিই । আজ আর কিছু ভাল লাগল না আমার । পেছনের সিঁড়ি দিয়ে প্রায় চোরের মত পালিয়ে এসে মধুতে বসলাম ।

টিফিন সেরে শূদ্ধ ফান্টার বোতলের মধ্যে সিগ্রেটের ধোঁয়া ভয়ছি এমন

সময় কলিমুল্লা এল।—কী হীরো, বোতলডারে উড়াবা নাকি? বসতে বসতে বলল সে।

হারামজাদীটাকে একবার—আমি দোজা হ'য়ে বসে বলি—আচ্ছা ঠিকঠাক বল তো, বডিবিলাডিং নিয়ে থাকি বলে আমার চেহারাটা কি ভিলেনের মত লাগে?

—ক্যান? একথা ক্যান হঠাৎ! কলিমুল্লা অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকায়।

আমি এক সিগ্রেটের আগুনে আরেকটি ধরিয়ে অল্প একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে ধরি ওর দিকে। এক মুখ ঘোঁয়া মাথার ওপর উড়িয়ে দিয়ে আবার বলে কলিমুল্লা—এনিথিং রং—আই মীন—সাংবাদিক কিছু ঘইটা গেছে মালুম হইতেছে।...জবর উত্তেজিত মনে হইতেছে তরে?

—ইংলিশের জীনাতে স্থলতানা আমাকে ইন্সান্ট করেছে। আমি এবার বললাম খুব আস্তে আস্তে।

—ইন্সান্ট করেছে!

—হঁ!

—তরে!

—হুম।

—ক্যান?

কলিমুল্লার সওয়ালের কায়দা দেখলে গা জ্বলে যায় আমার। কথায় কথায় কেবল ক্যান—ক্যান—ক্যান!

আমি চূপ করে বসে সিগ্রেট খেতে লাগলাম। আমার মনের অবস্থা টের পেয়ে গেল কলিমুল্লা। এই নীরবতার গূঢ় অর্থ যে কি কলিমুল্লার তা অজানা নয়। আমি আচমকাই যে ওর যাত্রার রাজার মত চুলের ঝুঁটিটা ধরে বেধড়ক পিটুতে শুরু করে দিতে পারি তাতে বিন্দুমাত্র অসম্ভব নেই। আমার মত ও-ও তাই নীরব হ'য়ে গেল। এমনকি সিগ্রেটও যে খেতে লাগল তাও প্রায় নিঃশব্দে। আমি কি ভেবে ওর কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলব; ঠিক কোনখান থেকে আমার বক্তব্য শুরু করব তাই চিন্তা করছিলাম। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কলিমুল্লা। বলল, এক্সকুজ মী মনান, টিউটোরিয়াল এখন। বুঝবারই পারস। অল রাইট—আবার দেখা হইব।

কলিমুল্লা যেন প্লেন ফেল করছে—এই রকম তাড়াতাড়ি ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল। ক্যান্টিনটা ভীষণ ফাঁকা হ'য়ে গেছে এখন। আমি কি উঠব এখন? চিন্তা



করে দেখলাম—বসে থাকাই ভাল। ভীড় থাকলে মধুদার চোখ ফাঁকি দিয়ে ইজিলি কেটে পড়া যেত। কিন্তু টিফিন-পিরিয়ডের শেষে আবার শুরু হয়ে গেছে ক্লাস। সারাটা ক্যান্টিনে পাঁচ-ছজনের বেশী ছেলে নেই। আড়চোখে মধুদা আমায় দেখছে। জবেদ আলি আর বীরবল তাকিয়ে আছে শকুনের মত। নাঃ—টাকা দেড়েকের মত গচ্চা দিতেই হচ্ছে!—

এই মুহূর্তে, এই মধুর রেস্টোর'ায় বসে মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল আমার। আরে ধেং, এর কোনো মানেই হয় না। ঠিক এই মুহূর্তে, নিজের ওপর, নিজের বাপ-মা ভাই বোনের ওপর দারুণ রাগ হ'ল আমার। আমাকে কেউ দেখতে পারে না, কেউ চায় না। কেউ না। আমার পোস্ট-মাস্টার বাপের ক টাকাই বা মাসিক মাইনে; তবুও গৈয়ো কলেজ থেকে আমি যখন সেকেণ্ড ডিভিশনে আই. এ. পাশ করলাম—তখন সেই-ই খুশি হ'ল সব চাইতে বেশী। বলল—বাসু, এবার ইউনিভার্সিটিতে পড়বি ঢাকা গিয়ে। মেজ ভাই পশ্চিম পাকিস্তানে মিলিটারির চাকুরী করে। ছুটিতে দেশে এসেছে। বলল, কি দরকার ইউনিভার্সিটির? এখানকার কলেজেই বি. এ.-তে ভর্তি হ'য়ে যাক। ইউনিভার্সিটির খরচ না হাতির খরচ। এত টাকা কোথায়?—সেজ ভাই বি. এস.সি. পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে আছে—বলল—তোমরা সবাই বড় বাজে কথা বলতে পার। একটা ছেলে ভাল শিক্ষা নেবে, তার জন্তে তাকে উৎসাহ দাও। খামকা খরচার জন্তে ভেবে মাথা গরম করছ। আমি বলি—মন্নান সোশিওলজিতে অনার্স নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে অ্যাডমিশান নিক; হলে যাতে সিট পায় সে চেষ্টা আমি করব। মাসে ওকে একশ করে টাকা পাঠালেই তিনটে বছর ওর হেসেথলে কেটে যাবে!—

রাবা খুশি হ'ল সেজ ভাইয়ের কথায়। বলল—ঠিক ঠিক। মাসে আমি দেবো পঞ্চাশ আর মেজ ভাইকে বলল—তুই দিবি পঞ্চাশ!—এই ভাবে বন্দোবস্ত করে তারা তো আমায় টাকা পাঠাল। কিন্তু কসম খেয়ে বলছি—ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে বিদ্যার জাহাজ হবার ইচ্ছে আমার কস্মিনকালেও ছিল না। ছেলেবেলা থেকে ডনবৈঠক করি, মুণ্ডর ভাঁজি। ভোরে বাড়ির সবাই যখন মাখন রুটি সহযোগে চা খায়, আমি তখন খাই ভিজ়ে ছোলা আর আখের গুড়। একটা কথা আমি গোড়া থেকেই বিশ্বাস করি যে, গতরে ক্ষাপা মোষের মত তাগদ্ না থাকলে এই ছুনিয়ায় আমার দাম নেই এক নয়। পয়সাও। বাচ্চু ওস্তাদ বলত : শরীরটাকে শানের মত শক্ত রাখবে, ডঙ্কা মেরে ঘুরে বেড়াবে তামাম ছুনিয়া।

জলে-জলে যেখানেই যাও কদর তোমার সর্বত্র। শরীরকে গড়ে পিটে লোহার গভ  
শক্ত বানাব, এর চেয়ে গভীর পরিকল্পনা সত্যি আমি কখনো করিনি।

কিন্তু পাড়াগাঁয় কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রায়  
জোর করে ঢাকা পাঠান হ'ল পণ্ডিত বানাবার চেষ্টায়।

ঢাকা এলাম। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। কথা দুটি শুনতে খুব সহজ  
লাগে তাই না? কিন্তু ইউনিভার্সিটির খাতায় নাম তুলতে গিয়ে আমাকে যে  
ঝকঝকি পোয়াতে হ'ল—সে যাতনা বোঝাতে গিয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা ছাড়া আর কোন  
জুসই শব্দ আমি আজও পর্বন্ত হাতড়ে পাইনি। যা হোক ঢাকার এসে টি অ্যাণ্ড টি  
কলোনিতে বাবার বাল্যবন্ধু বাসায় উঠেছিলাম। সেখান থেকে শুরু হ'ল ভর্তি  
হবার পায়তারা। আই. এ-র সার্টিফিকেট তখনো দেয়নি। শুনলাম বোর্ডের দপ্তর  
থেকে টেস্টিমোনিয়াল আনতে হবে। যাহোক তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি,  
টেক্সটমোনিয়াল, ইন্সট্রাক্টর হেডমাষ্টার, কলেজের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে আবেদন  
প্রচুর হাবিজাবি এইসব জোগাড় করতে প্রাণান্ত। এ সময়কার দুটি মজার ব্যাপার  
আমার সারা জীবন মনে থাকবে। এক—বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জগ্রে অপরিহার্য,  
নিজ এলাকায় যে চেয়ারম্যানের কাছে থেকে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট আনতে হল  
—তার মত চরিত্রহীন লোক আমি দুটি দেখিনি। দুই—ভর্তির আগে ডিপার্টমেন্টের  
অধ্যাপকদের সামনে যে ইন্টারভিউ দিলাম তাতে এক বেঁটে মোটা ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা  
করেছিলেন : তোমার নাম মনন মজুমদার না হয়ে যদি প্রাণনাথ মুনশী হত তবে  
তুমি কি করত?

আমাদের কলেজ থেকে আরো বেশ ক'জন ছেলেমেয়ে ভর্তি হল বিভিন্ন বিভাগে।  
ক'জন অনায়াসেই হলে সীট পেয়ে গেল। কি করে পেল তা তারাই জানে,  
কিন্তু আমি কোন সীট পেলাম না। কেন পেলাম না, তা আমি জানি না। তবে  
কয়েকটি আশ্চর্য হবার মত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম আমি ইউনিভার্সিটিতে। আগে  
জানতাম ফার্স্ট-ডিভিশন আর হায়ার সেকেন্ড-ডিভিশনের ছেলেমেয়ে ছাড়া কোনো  
মতেই এখানে ভর্তি হওয়া যায় না। কিন্তু, দেখলাম, আমার চেনাজানা বেশ ক'টি  
ছেলেমেয়ে থার্ড-ডিভিশনে আই. এ. পাশ করলেও বেশ ডাঁটে ভর্তি হয়ে গেল।  
কেউ কেউ এদের মধ্যে আবার ভাল সীটও পেয়ে গেল—ফাউ।

ছাত্র হিসেবে আমি খুব যে একটা, কি বলে—মেধাবী—এমন বাজে কথা আমি  
কখনো বলব না। তবে জীবনে ফেল করিনি কোনো পরীক্ষাতেই। একবার একটা  
স্কুল-মাষ্টারকে ঠ্যাঙ্কানো ছাড়া আমার তেমন কোনো খারাপ রেকর্ডও নেই। কিন্তু

কি জানি কেন, একটি পুরনো হলের স্বদর্শন প্রভোস্ট আমার দিকে না তাকিয়েই ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল—সীট নেই!—অ্যাপ্রাই করে রাখো, পরে দেখা যাবে।

অথচ কী আশ্চর্য আমি জানতাম—তখনও বেশ কিছু সীট সে হলে খালি আছে। আরো জানতাম, ছাত্র নয়—এমন প্রায় এক ডজন লোক হলে বসবাস করছে বিনে ভাড়াটে হয়ে প্রায় আবহমান কাল ধরে। আরো অনেক খবরই রাখতাম সেই হলের ; কিন্তু সীট হলনা আমার।

তা বাই হোক, ক্লাশে যাতায়াত শুরু করলাম দারুণ ফুঁতির সঙ্গে। বাপরে, যাঁতা কথা নয়,—ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। রক্ত যেন টগবগ করে ফোটে। টি অ্যাণ্ড টি কলোনী থেকে যখন বাসে চাপি, সাংঘাতিক স্নো মনে হয় বাসগুলোকে। মনে হয়, মনে হয়, একটা জেটপ্লেনের মত শাঁ করে উড়ে চলে বাই নীলস্কেতের মোড়ে। কলোনীর আটসাঁট সালোয়ার কামিজ পরা ইস্কুলের মেয়েগুলো আমার দিকে ইঁ করে তাকিয়ে থাকে সকালে-বিকালে। দেখতে খুব একটা উত্তমকুমার না হলেও স্বাস্থ্যটা তো আর ডার্টবীনে ফেলে দেবার মত নয়। আর সতেরো থেকে সাতচল্লিশ বছরের মেয়েরা তো আগে দেখে পুরুষের বুক তার পরে মুখ। কাজেই সারা-কলোনীর রংবেরঙের মেয়েদের সাথে জান্নাবাজিটা আমার বেশ জমেই উঠল। একদিন এক ঘুঁষিতে এক রিকশাওয়ালার একটা দাঁত খসিয়ে দিয়ে পাড়ার রকবাজ হোঁড়াদের সর্দারও পেয়ে গেলাম। তিন মাসের মধ্যে পাড়ার এবং আরো তিন মাসের মধ্যে ইউনিভার্সিটির হীরো বনে গেল নহকত নগরের ছাবেদালি পোস্টমাস্টারের হেলে মন্নান মজুমদার।

দেশ থেকে বাবা চিঠি লেখে—বাবা মন্নান, ভালভাবে পড়াশোনা করিও। রমজান ভাইয়ের সঙ্গে বেয়াদবি করিও না। বাবা আমার, তুমি সর্বদাই স্মরণ রাখিও যে তোমাকে মাহুয হইতে হইবে।—বাবার সব চিঠিই সেই এক ভাব আর এক ভাষায় লেখা। দিন-তারিখ বদলে দিলে তার আগের চিঠিকে পরের এবং পরের চিঠিকে আগের বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তাই, দেশ থেকে বাবার চিঠি এলে আমি তা পড়তাম না। বাবার ঐ এক বুলি হয়েছে—তোমাকে মাহুয হইতে হইবে।—মাহুয হইতে হইবে—এ রকম তাজ্জব কথা মাইরি আমি আর কখনো শুনিনি।

সবকিছু বেশ ভালই চলছিল ; কিন্তু মহকত নগর থেকে জাহাঙ্গীর নগরে এসে আমি বদ হয়ে গেলাম। ঢাকার বাতাস গায়ে লেগে ইতিমধ্যেই বদলে গিয়েছিলাম দারুণ। প্যান্ট-জামা আঁটো হতে শুরু করল ; চুলকে ছোট করতে করতে এমন

পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি এখন, যে চিরুণীর দরকার হয় না। স্বাস্থ্যটি তো আগে থেকেই ভাল। এখন রাজধানীর জলে বাতাসে তাতে যেন আলাদা জেঞ্জা ধরতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগেও কথায়বার্তায় ছিলাম ভীষণ গ্রাম্য। এখন ঢাকার চলতি ভাষাকে মার্কিনি-স্ল্যাংএর সঙ্গে মিশিয়ে এমন মিক্‌চার-জবান্ শিখে ফেলেছি যে নিজেই একেক সময় আশ্চর্য হয়ে যাই। জড়তার লেশমাত্র এখন আমার মধ্যে নেই। এখন আমি লাইব্রেরির ছাড়া-বাগানটার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে পেছাব করতে পারি।

আরো অনেক কিছুই আমি করতে পারি, কিন্তু তার দরকার হয় না। এমনিতেই সবাই বেজায় খাতির করে আমাকে। রোজকার বাসভাড়া ছাড়া আমার—বলতে গেলে—আর কোনো খরচার বালাই নেই। সীট যদিও কোনো হলেই মেলেনি কিন্তু সব হলেই আমার অবাধ গতি। ইয়ার গজিয়েছে এস. এম. হল থেকে শুরু করে জিন্না হল পর্যন্ত। বড়ির দৌলতে টাকা হলের ডাইনিং রুমে যখন ইচ্ছে খাই—কেউ কিছু বলে না। এক এইচ হলের লগ্নীতে কাপড় ধোয়াই—ফ্রী, জিন্না-হলের সেলুনে চুল কাটাই—সেখানেও পয়সা খরচ নেই।

অবশি বলাকার মোড়ে কিংবা নিউ মারকেটে যখন ফিল্ডিং মারতে বেরোই, জুতো জোড়াটা তখন পলিশড্ না হলে জমে না। তখন পলিশঅলাকে দক্ষিণা দিতে হয় পাকির পনেরো নয় পয়সা। সঙ্গে ইয়ার-দোস্তু যদি থাকে তবে পয়সাটা তাকেই দিতে হয়। কিন্তু সুবিধে শুধু এইটুকুই নয়; মাসল শো করে সাংঘাতিক রকমের ক'টা বড়লোকের ছেলের সাথে খাতির হয়েছে আমার। সকালে যদি কালো রঙের অঙ্গিনে করে ক্লাশে আসে তো বিকেলে আসবে টকটকে লাল ফোক্স গুয়াগেনে। মাঝে মাঝে হেথায় হোথায় লিফট দেয় অবশি; কিন্তু ওসব দামী গাড়ির নরম গদিতে মাথা এলিয়ে ভুস করে পাচ দশ মাইল চলে যাওয়ার মধ্যে কোনো খীল নেই। ইসপাহানী-হাউসের মালাঠি আমার নতুন বন্ধু। ওর ভেসপাটা যেদিন পাই সেদিন মনে হয়—হেঁটে চলা তেল চিটচিটে হাজার মানুষকে ধুলো ছিটিয়ে বেহেশতের দরজার দিকে উড়ে চলেছি আমি। তাছাড়া রশিদের বিলেত থেকে আনা বুশশার্ট, কাহারের গগল্‌স, সান্ট্রিদের টেট্রনের প্যাণ্ট আর আবুর দেড়শো টাকা দামের পুলোভারে দিনগুলো আমার প্রিন্সের মতই কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু শাহ্ আমাকে ফাসিয়ে দিলে। ব্যাটা নিজে এক বিশ্ব-বদমাশ—; আমাকেও অল্পদিনে এক নম্বরের লম্পট বানিয়ে ছেড়ে দিল। ছেলেবেলায় যখন বাচ্চু-ওস্তাদের আখ্‌ড়ায় গিয়ে বুকডন দিতাম, দৌড়ঝাঁপ করতাম তখন ওস্তাদজী

বলত : হাঁশিয়ার। মদ আর মেয়েমানুষ—এই দুই জিনিস থেকে হাঁশিয়ার! এই দুই সর্বনেশে জিনিসকে হারাম করতে না পারলে কস্মিনকালেও তোমার বাড়ি হবে না।—কিন্তু ঢাকায় এসে এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মদ আর মাগিতে পাকাপাকি ভাবে আসক্ত হয়ে পড়লাম।

মহকত নগরের বন্ধুরা, দেশে থাকতে কি যেন একটা নাম দিয়েছিল আমার? কি যেন,—ঐ যে হ্যাঁ—নারীবিমুখ। ঢাকা এসে, বিশেষ করে শাহরিয়ারের সাথে দোস্তি হয়ে একেবারে উন্টেই গেলাম। শাহর সঙ্গে চলাফেরা করে আমার কি হ'ল? না, কারো বাড়ির ছাদে—কানিণে মেয়েদের সালায়ার-কামিজ, শাড়ি-ব্লাউজ অথবা পেটিকোট বুলতে দেখলেই বৃকের ভেতরটা গুড় গুড় করে ওঠে। মনে হয়, ইশ্—মনে হয় রোববার সন্ধ্যায় সারা জিন্মা-অ্যাভিহুয়াতে যতগুলো মেয়ে বেড়াতে বেরোয় তাদের সবকটাকে বগলদাবা করে নিয়ে বুড়িগঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। চিন্তা করি আমার কপালটাই খারাপ। এই যে তোমাম ঢাকা শহরে লাখ লাখ টেডি মেয়ে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এগুলোর সবকটাকে কোনোদিনই আমি চুম্বো খেতে পারবনা। ফিউচারে বিয়ে-শাদী করলেও হালার একটা মাত্র মেয়েকে বউ বানিয়ে সংসার করতে হবে পুরো জীবন। অথচ, যেদিকে তাকান যায়, গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে, দঙ্গলে দঙ্গলে মেয়ে। ধুং! এর কোনো মানে হয় না। ভাবি আর ভাবি। আর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি। শাহর সাথে খাতির হবার পর এমন কত লক্ষ দীর্ঘনিশ্বাস যে আমার বাজে-খরচা হয়ে গেছে, তার হিসেব আমি রাখিনি।

মদ আর মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ আর মদ। ছেলেবেলায় একবার এক সাধুর আখড়ায় গিয়ে গাঁজা খেয়েছিলাম। আট আনা পয়সা দিতেই সাধুবাবা পরম নিষ্ঠা সহকারে একটা সিগ্রেটের সব মশলা ফেলে দিয়ে তাতে গাঁজা ভরে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। বলে দিয়েছিল—কষে টানো। ধোঁয়া বের করে দিও না! বাড়ি গিয়ে এক বাটি গরম দুধ খাবে তাহলে খোয়ানি হবে জোর। কিন্তু কিসের নেশা কিসের কি? দিব্যি রোজকার মত বাড়ির সবার সঙ্গে রাত্রির খাওয়া সারলাম। সেজ ভাইয়ের দেরাজ থেকে ত্রাংটো-মেয়ে লোকের ছবিঅলা ইংরিজি পত্রিকা চুরি করে পড়লাম। নেশাও না, কিছুই না। গাঁজা ভাঙেও ভেজাল চলেছে নাকি কে জানে। যাহোক সেইদিন সেই গাঁজা খাবার পর থেকে ওসব জিনিসের প্রতি আমার রাগ বা বিরাগ কিছুই ছিল না।

শাহ্ একদিন আমাকে হেনরিয়েটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সে ধানমণ্ডির এক খান্‌কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এবং হেনরিয়েটার ঘরে ঢুকেই বয়ে গেলাম আমি। শালি বাংলা মদের বোতল পেলে বাপ দাদার নাম ভুলে যেত। প্রথম প্রথম টাকাটা আশ্‌টা ধরে দিতাম হেনরিয়েটাকে। পরে কেবল এক বোতল দ্বিশি মাল আর প্যাকেটগানেক পলমল সিগ্রেট দিলেই বিছানায় চিং হয়ে করসেটের ফিতে খুলতে শুরু করত। মাগির চেহারাটা বেশ ডগ্‌মগানো? ফিগারটাও ওয়েস্ট পেপার ব্যাঙ্কেটে ফেলে দেবার মত নয়; কিন্তু ওর পা থেকে মাথা অন্ধি এক রকম বোঁটকা গন্ধ ভুর ভুর করত। তবু চুমো খেতাম শুকে। চিং হয়ে শুয়ে বুকোর ওপর রেখে আদর করতাম ওর উলঙ্গ শরীরকে। আদর করতাম আর মদ খেতাম। মদ আর যিস্তি।

কি করে যে কি সব হয়ে গেল আমি বুঝতেই পারলাম না। একদিন বাথরুমের খাটো আয়নায় নিজের মুখখানাকে দেখে আঁতকে উঠলাম আমি। চোখের নীচে আমার এত কালি জমেছে কবে? গালের ওপরকার ঐ ফুঙ্কুড়িগুলোই বা কবে গজাল? কিন্তু একটা কথা আমি বেশ ভালই বুঝতে পারলাম, ফেরার পথ আর আমার নেই। কারণ শাহ্ আমাকে নামার পথেই চলতে শিখিয়েছে—উঠবার পথেব ঠিকানা দেয়নি। মনে করলাম, ফেরার পথ আর আমার নেই। দেখতে দেখতে সাব্‌সিডিয়্যারি পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এল।

শাহ্‌কে বললাম—ওস্তাদ, পরীক্ষা তো এসে পড়ল। এখন উপায় কি? শাহ্‌ বলল, নোট বইয়ের খাতা কাটুম। আমি বললাম, ধূস্‌?—ধরা পড়লে লটকে দেবে। জিন্দেগী বরবাদ। শাহ্‌ বলল,—তাহলে ফুতি-ফাতির খুরে শালুট মার্‌ কিছুদিনের লাইগা। কিছু স্টাডি-উডি কইরা দেখা যাউক। সাবসিডিয়্যারিতে তিরিশ মার্‌ক উঠলেই তো পাস্‌; একটা ঘোড়াও বি-এ পাস করবার পারে। হেনরিয়েটার ঘরে বসে মদ খেতে খেতে একদিন আমরা ওইসব কথাবার্তা বলছিলাম। কিন্তু আমার মনে ছিল অল্প চিন্তা। শাহ্‌ আর যাই করুক—পার্সেন্টেজে টাইট রেখেছে। আমার বোধ করি টেনে হিঁচড়েও চলিশের বেশী উঠবে না। অথচ পরীক্ষা দিতে গেলে কমসে কম পাঁচাত্তর পার্সেন্ট থাকতেই হবে শতকরা। সেদিন সন্ধ্যায় ঝড়বাদলা মাথায় করেই টি অ্যাণ্ড টি কলোনীতে ফিরলাম। আস্তানায় এসে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা পাঠ্যপুস্তকগুলোয় হাত দিতেই গুড়-গুড় করে উঠল বুকখানা। কতদিন এগুলো ছুঁইনি!

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে গুলি মারো—ডিপার্টমেন্টের কেয়ানিটা বদামি শুরু করল। ভেবেছিলাম চা-সিগ্রেট খাইয়ে ফায়দা ওঠাবো ; কিন্তু ব্যাটা ভায়ি ত্যাঁদোড়। বলল—মাপ চাই। এতবড় অন্য় আমি করতে পারব না। কত কাকুতি মিনতি, কত অনুরোধ উপরোধ। নরম হয় না তো হয়ই না। শেষে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। পকেট থেকে ড্যাগার বের করে বললাম—ওসব ছেঁদো কথা শিক্যে তুলে রাখ। পার্সেন্টেজ মেকাপ করে রাখ—টাকা পাবে। বাড়ি যাচ্ছি তোমার টাকার জন্ত। এসে যেন দেখি ঠিকঠাক নাম বুলছে বোর্ডে। নইলে—ড্যাগারটা আবার আমার হাতে ঝিকিয়ে উঠল।—কেরানী ব্যাটা ম্যালেরিয়াব রোগীর মত কাঁপতে লাগল সমানে। আমি ফৌজি-স্টাটা হেঁটে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মহবত নগরে—মানে বাড়িতে এসে ভেবেছিলাম, নিশ্চিন্তে ক'টা দিন পড়াশোনা করে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ঢাকা ফেরা যাবে। কিন্তু পড়াশোনাতে মন বসাতে পাবলাম কৈ। পার্সেন্টেজের আতঙ্ক একটা অতিকায় মাকড়শার মত আমার মগজের মধ্যে এক ভয়ানক জাল বুনতে লাগল। অথচ কি নিদারুণ ব্যাপার ছাখো, বাড়িহুক মানুষ জানে, আমি পরীক্ষার জন্তে খুব ভাল প্রিপারেশান নিচ্ছি। ঢাকায় পড়াশোনা বিঘ্নিত হ'তে পারে মনে করে আমি দেশগায়ের নিরিবিলিতে চলে এসেছি নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করবার জন্তে।

এইপত্র সঙ্গে কিছু ছিল। ছিল কিছু নোট আর টিউটোরিয়ালের বাসি খাতাও। সকাল সন্ধ্যা সেই সব নাড়াচাড়া করি অকারণে। মন বসাতে পারিনা বইয়ে। বাবা একদিন বলল, কি হয়েছে তোর। মুখখানাকে সব সময় অমন গম্ভীর ক'রে রাখিস কেন? কেমন ঠাণ্ডা, ভেজা, চূপচাপ। আমি শ্লান হেসে তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় প্রায় ঘামতে থাকি। হয়ত, মা এসে আমার মুখ রক্ষা করেন হঠাৎ। বলেন, কিসের আবার গম্ভীর হয়ে থাকবে; সমানে এতবড় একটা পরীক্ষা তাই পড়াশোনার কথা চিন্তা করে। তোমার যত বেহুদা কথা গো!—

সামনে এতবড় একটা পরীক্ষা। ভালমন্দ একটু না খেলে এসময়টা চলবে কেন? তাছাড়া আরো কত খরচ। টাকা যাবার আগে মা চূপ করে ডেকে নিয়ে একশ' টাকার তিনটে নোট আমার প্যাণ্টের পকেটে গুঁজে দিল। বলল, নিত্যা ভোরবেলা এটু মাখন খাস, এটু ছানা খাস, মগজটা ঠাণ্ডা থাকবে। এ টাকার কথা যেন তোর বাবা জানেনা—! শেষের কথাটি মা উচ্চারণ করল প্রায় ফিসফিস ক'রে।

কিন্তু ঘাপলা ছাখে ; ঢাকায় পৌঁছে প্রথমে টি অ্যাণ্ড টি কলোনীতে না গিয়ে ধানমণ্ডিতে গেলাম। তখন সকাল। হেনরিয়েটা তখনও একটা কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। এইমাত্র, বাবুঁচি বোধকরি বেড়ুটি দিয়ে গেছে তেপায়ার ওপর। আমার জুতোর শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল হেনরিয়েটা।—  
 গুডমর্নিং হেনরি!—আমি কাঁধে ফেলে রাখা স্নেজারথানা চেয়ারের হাতলের ওপর রাখতে রাখতে বললাম।—মর্নিং! হেনরিয়েটা বিছানার ওপর জোড়াসন করে বসল। চোখ কচ্চাতে-কচ্চাতে বলল : তাহলে বেঁচে আছ দেখছি। আমি ভাবলাম গুণ্ডামী করতে গিয়ে কোথায় কার ড্যাগার পেয়ে ফিনিশ হয়ে গেছ!—

আমি হেনরিয়েটার হাত ধরতে গেলাম। সরে গেল সে। বলল—আমাকে ছুঁয়োনা ডারলিং—প্লীজ!— কেন, ছুঁলে জাত যাবে নাকি?—আমি হাসতে হাসতে বলি। কিন্তু আমার হাসির সমর্থনে হাসির রেখা ফুটে উঠল না তার কালো চোঁটে। বাবুঁচিকে ডেকে আমার জন্তে চা-নাশ্তা দিতে বলে হেনরিয়েটা আমাকে লক্ষ্য করে বলল—শাহ্ বলল তুমি বাড়ি চলে গেছ। তা কবে এলে?—আমি বললাম— এই তো মাত্র!—এইমাত্র?—হ্যাঁ, এই তো রেলস্টেশন থেকে সোজা আসছি তোমার এখানে। কথা শেষ করে আমি পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করলাম। একটা নিজে ধরিয়ে অল্পটা বাড়িয়ে ধরলাম ওর দিকে।—খ্যাংক ইউ, এখন সিগ্রেট খাবো না। হঠাৎ বিরস হয়ে উঠল হেনরিয়েটার মুখ। চায়ের খালি পেয়লাটা পাশের তেপায়ার ওপর রাখতে রাখতে আবার বলল—ভাল ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করেছ?

হো হো করে হেসে উঠলাম এবার আমি। নিশ্চয়ই এ রাত্তিরে কোনো কালো মায়েবের গলা জড়িয়ে ধরে পেগের পর পেগ্ খেয়েছে। নিশ্চয়ই বেশি গিলেছিল— সারা রাতেও তাই নেশা কাটেনি। আমি চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে হেনরি-য়েটাকে ধরলাম। তারপর দু'হাত ধরে কোলে তুলে নিলাম ওর বোঁটকা গন্ধ ভরা হালকা দেহখানা। প্রাণপণে চুমো খেতে গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে আমার কোল থেকে ছিটকে পড়ে গেল সে খাটের ওপর। তারপর টেঁচিয়ে বলল—তুমি কি কাল, তুমি কি কোনো কথা শুনতে পাও না?—বলছি যে আমাকে তুমি ছুঁয়োনা। কানে যায় না আমার কথা?

তার মানে?—আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবার। আরে, এ বেশা মাগির আবার কি হল। ছুঁতে দিচ্ছেনা কেন? বাড়ি যাবার আগের রাত্তিতেও তো একদম ঞাংটা হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল আমার কোমর জড়িয়ে ধরে। আজ আবার



এমন আজগুবি আচরণ কেন ? সিগ্রেটটা পর্ষস্ত খাচ্ছে না । বললাম—এসবের মানে ? হেনরিয়েটা তখন বিছানা থেকে উঠে স্লিপিং গাউনের ফিতে বাঁধছে অথগু মনো-যোগের সঙ্গে । আমার কথা ক’টা যেন তার কানেই যায়নি । কিছুক্ষণ পরে বলল—শোনো মজুমদার, বলি বলি করেও কথাটা এতদিন তোমায় বলিনি । বলিনি তার আরো কারণ—ব্যাপারটা বুঝতেও আমার দেরি হয়েছে । শাহ যেদিন খুলে বলল সেদিনই তো সব কিছু বুঝতে পারলাম !—কী বুঝতে পারলে ?—কী বলছ তুমি এসব ? আমি চায়ের কাপখানা সশব্দে টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম । আমি তোমার আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম ।

আমার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হেনরিয়েটা বলল—তুমি আমার বন্ধু । চিরদিনই আমার বন্ধু । কিন্তু বন্ধু শুধু তুমিই , তোমার ঐ সর্বনাশা ব্যাধি আমার বন্ধু হতে পারে না !—কী এসব আবোল তাবোল বকছ তুমি ?—আমি প্রায় আয়তায় আয়তায় করে বলি ।

—তোমার ঠোঁট, গাল আর দু’হাতের ফুল্ফুলিগুলো যাকে একজিমা বলে এতদিন চালিয়ে এসেছ, তা আসলে সিফিলিস্ ছাড়া আর কিছুই নয় ।

: সিফিলিস্ ?

: ই্যা !

: কে বলল ?

: প্রথমে আমার মন—তারপর তোমার বন্ধু—শাহ্ ।—শাহরিয়ার খাঁ !

একবার আমার মনে হয়েছিল—একটা প্রচণ্ড লাথি মেরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বেশাটার পাছা খেঁতলে দিই । কিন্তু কিছুই করলাম না । একটা বেত-খাওয়া ঘেয়ো কুত্তার মত বেরিয়ে এলাম বাইরে !

ধানমণ্ডি থেকে টি অ্যাণ্ড টি কলোনী—তারপর সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি । কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেন কয়েকটা বছর পেরিয়ে এলাম আমি । ডিপার্টমেন্টে এসে দেখি—কী তাজ্জব, কী তাজ্জব,—কেরানী ব্যাটা আমার পার্সেন্টেজ মেকাপ করে রেখেছে টায়ে টায়ে । বেজায় খুশি হয়ে ওকে দশটা টাকা বের করে দিলাম । ঘুঘু পেয়ে ব্যাটা এক গাল হাসল । কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারব—এ আনন্দ আমার মিলিয়ে গেছে অস্ত্র আতঙ্কে । আতঙ্কে আর ঘেরায় ।

ঠোটার, গালের আর হাতের ফুস্কুড়িগুলো আমি ডক্টর করিমকে দেখিয়েছি তিন মাস আগে। কে না জানে ডক্টর বাসিতের মত চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ সারা দুনিয়াতেই এক ডজনের বেশি নেই। ও তো আমার পায়খানা, প্রস্রাব, খুঁ, কাশি সব পরীক্ষা করে দেখে সাফ বলে দিল—এক্জিমা।—অথচ শাহ্, হেনরিয়াটা—দাঁতে দাঁত চাঁপলাম আমি তারপর প্রায় ভুল করেই পলিটিক্যাল-সায়েন্স ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। আগেকার অনার্স-এর ডক্টরী ক্লাস মিস্ করেছিলাম। এখন এই ক্লাসে এসে সেই খাবস্বরত ছেমরিটাকে দেখতে পেলাম। দেখি—একেবারে আমার পাশাপাশি মেয়েদের এলাকা আলো হয়ে গেছে মার্গির জেলায়।

নিজের চোখ দুটির মধ্যে পেছাব করে দিতে ইচ্ছে করল আমার। সত্যি, আমি একটা জানোয়ার হয়ে গেছি। ভাল জিনিস, সুন্দর জিনিস আমার চোখে পড়ে না। এই যে সারাটা আর্ট্‌স-বিল্ডিং জুড়ে হাজারটা মেয়ে মাজা নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এগুলো আমার নজরে পড়েনা কেন! শুনেছি,—না না শুনবো কেন—নিজের চোখেই দেখেছি—এদের মধ্যেও কয়েক ডজন ভাড়াটে মেয়ে আছে। একবার নয়, অনেকবার দেখেছি রোকেয়া হলের ক’টা ভূতুড়ে-চেহারার মেয়ে শাহর গাড়ীর মধ্যে ছটোপুটি করছে। টাঙ্কাইলের একটি বেঁটে মত মেয়েকে তো শাহ্ একদিন সন্ধ্যার সময় লাইব্রেরির বাগানেই জড়িয়ে ধরল। তারপর—; কিন্তু যাই বল না কেন, ঐ মেয়েটি মানে ঐ জীনাৎ সুলতানার মত মেয়ে কখনো নষ্টামী করতে পারে না। শুনেছি ডজন ডজন গুড্‌বয় নিজেদের গাড়ি নিয়ে রোজ গুর গাড়ির পেছনে পেছনে গেগারিয়া পর্যন্ত এগিয়ে যায়; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আসলে ঐ চশমা পরা ছোঁড়াগুলো একদিনও, একটু কথা পর্যন্ত বলতে পারেনি জীনাৎ সুলতানার সাথে।—ঠিক! ঠিক!—প্রেমেই যদি পড়—তো এই রকম ডাঁটের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা উচিত।

আর তাতেই তো আজ এতদিন পর ক্লাশে এসে টপাটপ চোখ মারতে শুরু করলাম জীনাৎ সুলতানাকে। ও আমার পাশের বেঞ্চের মেয়েদের অংশ বসেছে; কাজেই বাঁ দিকে সামান্য ঘোরালেই তার চোখ আমার মুখের ওপর পড়তে বাধ্য। ছল ও তাই।...নতুন প্রফেসরটি মাপের মস্তরের মত ম্যালথেশিয়ান থিয়োরি-অব পপুলেশন বোঝাচ্ছিল। আমার পাশে টুপিপরা নোয়াখালির মৌলবি আর জাখিয়ান ছোঁড়াটি টুকটুক করে নোট নিচ্ছিল। ও পাশে বর্শার ফলার মত রড্ডিন নখ দিয়ে গাল খুঁটোছিল জীনাৎ সুলতানা। ক্লাপ ফুরোবার মিনিট খানেক আগে তৃতীয় বারের জন্তে গুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হ’ল। ব্যাস্—আমিও চোখ

মারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশিষ্ট ঘটনা।—জীনাৎ সুলতানা আমাকে তার জ্যাঠা আব্দুল দেখাল ভয়ানক খারাপ মুখভঙ্গী করে।

অর্থাৎ? অর্থাৎ জীনাৎ সুলতানার মত ধনী, রূপসী, মক্ষণ মেয়েকে চোখ মেরে প্রেম নিবেদন করার রাইট্‌ নেই মহাবত নগরের মন্নান মজুমদারের। অর্থাৎ তোমার বড়ি যত নকরাই হোক না কেন, জীনাৎ সুলতানার মত মেয়ের কাছে তুমি একটা ঘেয়ো-কুত্তা ছাড়া আর কিছুই নও।

কী তোমার দাম? কীসের তোমার অধিকার? হেনরিয়েটার মত বাজারে-মেয়েই যাকে খারাপ রোগের রোগী সন্দেহে ভিথিরির মত ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে, জীনাৎ সুলতানাকে সে চোখ মারে কোন্ অধিকারে!

বড় বড় পা ফেলে করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে পেছন দিকে মধুর ক্যাণ্টিনে চলে এলাম আমি। জীনাৎের ধারাল, রংকরা নখঅলা জ্যাঠা আব্দুল দেখে রাগে দুঃখে লজ্জায় মধুব দোকানে বসেছিলাম। হাজারে হাজারে লাখে লাখে নষ্ট-চিস্তার ঘায়ে ফাটা বেলনের মত চূপসে যাচ্ছিলাম। বিকেল হয়ে এসেছে। আর্টস-বিল্ডিংয়ের চারধার ভীষণ ফাঁকা। লাইব্রেরির পেছনে কুলি-বস্তীতে রান্নার ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে। ক'জোড়া স্নাতানো, ঠাণ্ডা, নিরক্ত ছোকরা-ছুকরি তেতুলতলায় দাঁড়িয়ে পিরিতের আলাপ করছে।—মধুদার রেস্টোর'রায় আবার হু'জন চারজন করে খদের আসতে শুরু করেছে এখন। এখন, এ বেলা ফার্স্ট-ইয়ার সেকেন্ড-ইয়ারের কোনো ছাত্রই আর মধুতে আসবে না। এখন আসবে তারা, যারা বছর দুয়েক আগে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছে। নতুন কলেজের প্রফেসর, কোনো সাহিত্য পত্রিকার নবীন সম্পাদক, কবি, আঁকিয়ে—এমনি সব মানুষে একটু পরেই প্রায় ভরে যাবে সারাটা রেস্টোর'।

সত্যি বলতে কি, এই রাইটার আব আর্টিস্টগুলোকে দেখতে পারিনে। কি সব মাথামুণ্ডু আঙড়ায়—কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু আজ আমার কি হয়েছে, ক্যাণ্টিনের এক কোণে রাখা চেয়ার ছেড়ে একটুও উঠতে ইচ্ছে করছে না। কে যেন, কারা যেন, একটা প্রকাণ্ড গায়েবী শিকল দিয়ে—আমার সবল-শক্ত পা জোড়াকে মেঝের শাদা পাথরের সঙ্গে চিরতরে এঁটে দিয়েছে। আবার আরো এক পেয়লা চা দিতে বলব কিনা ভাবছি, এমন সময় কলিমুল্লা টুকল—রেস্তোর'রায়। কলিমুল্লার সঙ্গে এ কে?—কী আশ্চর্য!—কলিমুল্লার পেছনে রেস্টোর'রায় প্রবেশ করল জীনাৎ সুলতানা আর—আসরার চৌধুরী। প্রায় পাশাপাশি হেঁটে আসতে আসতে তারা আমার তিন দিকে দাঁড়াল।—





তাতেই মনে হয় কোনো কালে এ লাইনে গাড়ি আসে না। সব চূপচাপ-নিরুদ্ভ। ইলেকট্রিক খুঁটির আগায় ফিঙ্গে বসে রোদ পোহায়, কুল ঝোপের ভিতর শালিক শালিকনী সঙ্গোপনে রতিক্রীড়া সেরে নেয়। এপারের ধানক্ষেতে চাষীরা কাজ করে, ওপারের সরষে ক্ষেতে ফড়িং ওড়ে। মনে হয় একটা বিরাট আলশ্র, প্রাগৈতিহাসিক মন্থরতা নিয়ে জায়গাটা ধুঁকছে, আকাশে রোদ থাকলে একটু যদি হানে, মেঘলা দিনে বড় বড় হাই তোলে। কুয়াশা থাকলে অবশ্র আর চেমাই যায় না, তখন মনে হয় একটা অচেনা অনামা বালিয়াড়ি কিভ্রুতকিমাকার চেহারা নিয়ে আড় হয়ে শুয়ে আছে, কোথায় গেল এত এত থাম খুঁটি লোহা তার কাঠ পাথরের হুড়ি, সব ধোঁয়া হয়ে গেছে, পাক খেয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠছে, আর কিছু না।

সে যাই হোক, সেদিন শ্রুচুর রোদ ছিল, কাঁসার বাসনের মতন আকাশ ঝকঝক করছিল, হাওয়ায় একটা বসন্তের ভাব ছিল, মাঘের শেষ, মাঘের দুপুর, ফিঙ্গেটা নাচছিল, শালিক দুটো ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সরষে ক্ষেত ছেড়ে ফড়িংএর ঝাঁক রেল লাইনের ওপর এসে ওড়াউড়ি করছিল।

একটা বিশেষ দিনের ঘটনা, আর বেছে বেছে ব্যাপারটা কিনা ঠিক এখনটায় ঘটে গেল। এই জগ্গই জায়গাটার এত ভূমিকা। ওদিকে পোল, পোলের নিচে খড়বোঝাই নৌকো ও একটা ভান্সা লঞ্চ নিয়ে খালের জল বালির বিছানায় লেপটে গিয়ে ফিকফিক করে হাসছিল, রোদালো দিন বলেই এই ছেনালি হাসি, মেঘলা দিনে কি করত ঝঞ্ঝর জানে। হাঁ, খাল, খালপোল আর বাঁয়ে ডালের বড়ির মতন একরঙি স্টেশন, তা আকারে এইটুকুন হলে কি, ভয়ানক নামডাক উন্টাডান্সা রেল স্টেশনের, মেলাই মালিমালা ঘটনা অঘটনের সাক্ষী হয়ে তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিন্তু ঘটনাটা স্টেশনে ঘটল না, পোলের কাছেও না, ঘটল এই ফাঁকা লাইনের ওপর, হয়তো শালিক দুটো দেখেছে, ফিঙ্গেটা দেখেছে। আর—

আর কে দেখবে। যদি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে থাকে তো ট্রেনের মাহুঘ ?

গাড়িটা হয়তো দাঁড়ায়নি। খোলা দরজা দিয়ে একটা বোঁচকা পড়ে গেল কি একটা মাহুঘ পড়ে গেল আর সব যাত্রীদের তা জানতে বয়ে গেছে। যেমন সাঁ সাঁ করে গাড়ি ছুটে আসছিল, ছুটে চলে গেছে। হয়তো ভিতরে গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁটি মাহুঘ তখন তাস খেলছিল, তাদের দিকে চোখ ছিল তাদের, কেউ টুপ করে পা ফসকে কি হাত ফসকে মাঝপথে খোলা দরজা দিয়ে গাড়ি থেকে পড়ে গেল কিনা তারা খেয়ালই করেনি।

বা ওই বগীতে আর কোনো প্যাসেঞ্জারই হয়তো ছিল না, একলা এই মাহুঘটাই

ছিল—অফিস টাইম হলে তবু কথা ছিল, এখন ডরডুপুর, কত ফাঁকা ট্রেন হরদম যাচ্ছে আসছে।’

‘কিন্তু কোন্ গাড়িটা?’ সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রশ্ন তুলল। ‘এইমাত্র তো ডানকুনি চলে গেল, তার দু মিনিট আগে ডাউন শাস্তিপুর লোক্যালটা ওদিক থেকে ছুটে এসেছিল।’

‘মশাই, তার ঠিক এক মিনিট আগে নৈহাটি পাস করেছে।’

‘কিসহু খবর রাখেন না আপনারা।’ তিনজন কথা বলছিল। আর একজন এসে তখনি কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াল। বয়স্ক মাহুস, কাঁচা পাকা চুল নিয়ে এক বুড়ো বলল, ‘আপ ডাউন দুটো গাড়িই তো উল্টাডাঙ্গায় ক্রশ করল। শাস্তিপুর দাঁড়ায়নি। নৈহাটি দাঁড়িয়েছে। আমি নৈহাটির ট্রেন থেকে টুপ করে এখানে নেমে পড়লুম।’

‘ডব্লিউ টি নাকি।’ পিছন থেকে এক ছোঁড়া টিপ্পনী কাটল। একটি না, তিনটি ছোঁড়া কোথা থেকে ছুটে এসেছে।

‘এই, ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।’ বুড়ো চোখ লাল করার মতন করে ওদের দিকে তাকাল। কিন্তু ঘোলা চোখে তেমন একটা রক্ত জমল না, এই জগুই বেশি করে কেবল মাথাটা ঝাঁকাল। ‘দেখলেন, শুনলেন মশাইরা, এদের কথাবার্তার আগল আছে কিছু।’ প্রবীণরা কিন্তু চুপ করে রইল।

‘প্ল্যাটফর্মের গেট দিয়ে না বেরিয়ে এদিক দিয়ে এসেছেন তো, তাই সন্দেহ হচ্ছে।’ আর এক ছোঁড়া সঙ্গে সঙ্গে বলে বলল।

‘শুনলেন, শুনলেন মশাইরা।’ বুড়ো আবার তিনটি প্রবীণ ভদ্রলোকের দিকে ঘাড় ফেরাল। ‘সন্ট লেকে আমার প্লট কেনা আছে, ভাবলুম গেট দিয়ে বেরোলে অনেকটা রাস্তা ঘুরতে হবে, তাই সোজাসুজি লাইনের ধার ধরে চলে এসেছি, এখন মাঠ পার হয়ে আমার জমিতে চলে যাব।’

‘যান মশায়, আপনার জমিতে চলে যান।’ একজন সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করল। ‘একটা লোক কাটা পড়েছে, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে বগড়া শুরু করলেন।’

তাই তো, লোকটা কাটা পড়েছে, কখন কাটা পড়ল? কখন আবার পড়বে এখনই পড়েছে, এই মাত্র তো ফিনিকি দিয়ে রক্ত ছুটছিল, এখন টিপটিপ করে বয়ছে, এখনও মাহুসটা চেয়ে আছে, কালোয় খয়েরীতে মেশান চোখের তারা।

‘শরীরটা এখনো নিশ্চয় গরম আছে, হয়তো শ্বাস পড়ছে।’ ছোকরাদের একজন আর একজনের কাঁধ ধরে কাঁকুনি দিল।

‘দূর দূর, খাস পড়বে কি, দেখছিস না বৃকের পাজর খেঁতলে গেছে, একটা হাত উড়ে গেছে। এর পর আর খাস পড়তে পারে!’

‘ডানকুনি লোকাল থেকেই পড়ে গেছে।’

‘শাস্তিপুর থেকে পড়তে পারে।’

‘উছ’ উছ’, নৈহাটির গাড়ি থেকে মাহুঘটা পড়েছে।’

‘না না, নৈহাটির গাড়িতে আমি ছিলাম।’ সেই বৃড়া হঠাৎ গলা উচু করে বলল, ‘বেলঘরিয়া থেকে আমি জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে এসেছি কখন উল্টাডাঙ্গা স্টেশন আসে, একটা প্যাসেঞ্জার দরজা দিয়ে গলিয়ে নিচে পড়ে গেলে ঠিক আমার চোখে পড়ত।’

সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়াদের একজন মন্তব্য করল, ‘আপনি হয়তো ওপাশটা দেখতে দেখতে আসছিলেন। লাইনের এপাশে লোকটা পড়েছিল, দেখতে পাননি।’

‘মোটাই না, আমার চোখ ছিল ইদিকটায়। এ পাশের জানলা দিয়েই আমি বরাবর মুখ বাড়িয়ে ছিলাম।’

‘মুখ বাড়িয়ে থাকলে হবে কি, চোখ ছিল মাঠের দিকে, কখন সল্ট লেক আসে, গন্ধার বালি দিয়ে ভরাট করা জমি আসে, জানলা দিয়ে তাই তাকিয়ে দেখছিলেন। গাড়ি থেকে কেউ ছিটকে নিচে পড়ে গেল কিনা আপনার চোখে পড়বে কেমন করে।’

‘দেখ, আমার সঙ্গে তরু করো না ছোঁড়া।’ আবার চোখ লাল করতে চেষ্টা করল ‘নৈহাটির ট্রেন থেকে কোনো প্যাসেঞ্জার পড়ে গিয়ে এই অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, আমি হলফ করে বলতে পারি।’

‘ঘোলা চোখ দিয়ে সব কি আর আপনি দেখতে পেয়েছিলেন দাদু, নৈহাটির গাড়ি থেকেই লোকটা ঠিক পড়েছে।’ পিছনের ছোঁড়া তার সঙ্গীদের দিকে চোখ ফিরিয়ে ঘাড় কাত করল। ‘কি বলিস জগা, কি বলিস হারু?’

‘বটেই তো, বটেই তো।’ জগা হারু একসঙ্গে মাথা নাড়ল, তারাও এক সঙ্গে তখন বলল, ‘ঘোলা চোখে সব কিছু কি আর দেখা যায় দাদু, ব্র্যাকের পয়সায় কেনা নিজের জমি ছাড়া আর কিছু নজরেই আসে না।’

‘এঁ্যা, আমার ব্র্যাক মানি, আমার ঘোলা চোখ, আমার...আমার আইসাইট এখনো যে কোনো যুবকের চেয়ে তেজী, আমি কালোবাজারী ব্যবসা করি না, আমি অ্যাডভোকেট, উকিল, সারা জীবন ওকালতি করে...’

‘মশাই, আবার আপনি ছেলেছোকরাদের কথায় নাচানাচি শুরু করলেন, এখানে একটা জীবন নষ্ট হয়ে গেল, মাহুঘটা মরে পড়ে আছে, আর আপনি কিনা—’



উকিল বৃড়া চূপ। ছেলেছোকরারা আর কথা বলল না। সকলের চোখ লাইনের দিকে। কাটা মাহুঘটার মাথাটা স্লিপারের উপর, শরীরটা এ পাশের পাথরের খোয়ার ওপর, পা দুটো নিচে ঘাসের ওপর ছড়ান। পায়ের এক পাটি চটি ছিটকে এখায়ের তারের বেড়ার কাছে চলে এসেছে। আর একটা চটি পায়ের লেগে আছে। ডোরা-কাটা ছিটের শার্ট গায়ে, পরনে আধময়লা ধুতি, নাকের ছিদ্র দুটো বেশ মোটা, নস্ত্রি নেওয়ার অভ্যাস থাকলে যেমন হয়, নাকের ভিতরের সাদা কালো চুল দেখা যাচ্ছিল, খুব একটা বড় শরীর না, বেঁটেখাটো, এখন কাটা পড়েছে বলে না, যেন আগে থাকতেই চোখে মুখে একটা ক্লান্তি, একটা বোর দুশ্চিন্তার ছাপ বুলছিল। অর্থাৎ চেহারা ছবি দেখে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল, আর্থিক অনটন মানসিক কষ্ট হতাশা আত্মপ্লানি শূণ্যতাবোধ ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ে যেন লোকটা ভুগছিল।

তাকিয়ে থেকে থেকে সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা মৃত্যু সামনে নিয়ে ক'টা মাহুঘ স্থির নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে জায়গাটা যেন আরো নির্জন, শ্মশানের মতন ভয়াবহ মনে হতে লাগল। অথচ কয়েক পা এগিয়ে গেলেই উন্টাডাঙ্গা স্টেশন, সেখানে যাত্রীর ছুটোছুটি করছে, চা পান সিগারেট নিয়ে ফেরিওয়ালারা হাঁকাহাঁকি করছে। এখানে এই ভরদুপুরেই যেন মধ্যরাত্রির নিস্কৃত্য নেমে এসেছে। ইলেকট্রিক খুঁটির মাথায় ফিল্ডেটা সুরু গলায় একবার কিরকির শব্দ করে আবার থেমে আছে। মাঘের জলজলে রোদে ফড়িংগুলিই যা একটু ব্যস্ততা নিয়ে মাথার ওপর ঘোরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু তারা তো আর কথা বলতে পারে না। বোবা হয়ে শূণ্য পাখা নেড়ে নেড়ে নিচে লাইনের কাটা মাহুঘটাকে দেখছিল।

এদিকে দর্শকের সংখ্যাও বেড়েই চলল। একটা কিছু হয়েছে বুঝতে পেরে মাঠের কাজ ফেলে চাবীরা ছুটে এসেছে। দূরে পোলার কাছে কুলিরা কাজ করছিল। গাঁইতি শাবল ফেলে রেখে তারাও চলে এসেছে। উন্টাডাঙ্গার সড়ক ধরে যারা হাঁটছিল, লাইনের ওপর ভিড় দেখে ব্যাপার কি জানতে পড়িমরি করে রেল লাইনের উঁচু পাড়ের ওপর উঠে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। ছিল আটজন, তিন-চার মিনিটের মধ্যে একশ' মাহুঘের এক বিরাট জনতা একটাও কথা না বলে ফ্যালফ্যাল করে রেলের চাকায় কাটা পড়া হতভাগা মাহুঘটাকে দেখতে লাগল।

যেন সবাই ভাবছিল রেলগাড়ি আমাদের যেমন সুখসুবিধা দিচ্ছে, তেমনি কষ্টও কম দেয় না। বিশেষ, ইলেকট্রিক হবার পর, গাড়ির যেন পাখা মেলেছে। এমন সাঁই সাঁই করে ছুটে চলে—একটু অগ্রমনস্ক হয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছ কি হাওয়ার টানে তুমি

কখন যে বাইরে ছিটকে পড়বে টেরও পাবে না। আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সড়াং করে চাকার তলায় চলে যাবে। এর মধ্যে আর কিছুটিই নেই।

ভাবছিল তারা, হঠাৎ বাতাসের গুমগুম শব্দ তুলে ভূমিকম্পের মতন পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে ও-পাশের লাইন দিয়ে একটা গাড়ি, সবুজ সাদায় রং করা, উষ্কার বেগে ছুটে চলে গেল। ‘দার্জিলিং মেল’, গাঢ় চাপা গলায় ভিড়ের মধ্যে একজন বলল, ‘উন্টাডান্কার মত ক্ষুদ্রে ইন্টিশনে এ গাড়ি দাঁড়ায় না।’

কেউ শব্দ করল না। কেন না দার্জিলিং মেল নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। সবাই ভাবছিল এই মানুষটার কথা।

‘কোথা থেকে আসছিল কে জানে।’ একজন মিনমিনে গলায় কথা বলল।

‘যদি টিকেট কেটে গাড়িতে উঠে থাকে তো জামার পকেটে ওটা থাকবে।’ আর একজন তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করল। ‘টিকিট দেখলেই বোঝা যাবে কোথা থেকে আসছিল, কোথায় যাচ্ছিল।’

‘তা তো আর আমরা পারছি না, মেটা পুলিশের কাজ।’

‘পুলিশ এখন এসে যাবে।’

‘সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কিনা কে জানে।’

‘মনে হয় নেই, যেমন না খেতে পাওয়া চেহারা, যেমন জামা-কাপড়—’

‘মাপ করুন মশাই, ওকথা বলবেন না। ওই চেহারায় ওই পোশাক নিয়ে হাজার টাকার নোট ট্যাঁকে গুঁজে চলাফেরা করে এমন বহু দেখা গেছে।’

‘ঠিক বলেছেন দাদা, ওপর দেখে কিছু বোঝা যায় না। পকেটে একটা নয়া পয়সা নেই, গায়ে টেরিলিনের জামা, এমন গণ্ডায় গণ্ডায় বাবু চোখে পড়ে। কি বলিস জগা, কি বলিস হারু।’ সেই উঠতি বয়সের ফচকে ছোঁড়াদের একজন তার সঙ্গীদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে হি-হি করে হাসল।

‘আঃ, যেমন হাঁ করে আছে, মনে হয় প্রাণটা ষখন বেরোয় জল খেতে চেয়েছিল।’

‘মরবার সময় সকলেই জল চায়।’ উন্টাডান্কার সড়ক থেকে যে মানুষগুলি উঠে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন মুখ খুলল। ‘কথায় বলে না, শেষ সময়ে মুখে জল দিতে তার কেউ ছিল না।’

‘হঁ জল দেয়, কানের কাছে মুখ নিয়ে কেঁটনাম শোনায়। কি বলিস তোর? জগা-হারুদের দলের সবচেয়ে ঢালা চেহারার ছোঁড়া, গাঁফের রেখা উঁকি দিলেও যার মুখের কচি ভাবটা এখনও ভাল করে কাটেনি, আগু বাড়িয়ে উকিলের সঙ্গে যে তর্ক করছিল, নতুন উৎসাহ নিয়ে এখন হো-হো করে হাসল।

উন্টাডাঙ্গার সড়ক থেকে যারা উঠে এসেছিল তারাও হাসল। চাবীর দল হাসল না, গম্ভীর হয়ে রইল। কুলিরা, যেন লাইনের ওপর এই জিনিস তাদের অনেক দেখা আছে, একটুখানি ঠাঁড়িয়ে দেখা শেষ করে তখনি আবার কাজে ফিরে চলল, কিন্তু সকলের আগে যারা এসেছিল সেই প্রবীণের দলটা গুজগুজ করে নিজেদের মধ্যে কিছু একটা বলাবলি করতে লাগল। ধমক খেয়ে মুখ কালো করে উকিল বুড়ো দাঁজিলিং মেলটা ছুটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নেমে সন্টলেকের জমির দিকে চলে গেছে।

‘কি দাদা, আমাদের সম্পর্কে কিছু বলছেন নাকি।’ এবার জগা সকলের আগে ভদ্রলোকদের দিকে ঘাড়টা ঝুঁকিয়ে দিল। ‘উকিল মশায় তো জমি দেখতে মাঠে নেমে গেলেন।’

‘না ভাই, তোমাদের সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে না।’ প্রবীণের দল হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে কথা বন্ধ করল।

‘না, বন্ধা বলল কিনা, মরবার সময় কানে কেটনাম দিতে হয়, ভাবলাম এতে আপনারা কিছু মনে করলেন।’ বোঝা গেল এদের দলের ঢাঙ্গা ছোঁড়াটার নাম বন্ধা। বন্ধার সঙ্গে চোখাচোখি হতে জগা ঠোঁট বঁকিয়ে একটু হেসে নিয়ে আবার প্রবীণদের দিকে ঘাড় ফেরাল। ‘উকিল মশায় থাকলে অবিশ্তি এখনি ঝগড়া শুরু করে দিতেন।’

‘না না, এতে ঝগড়া করার কি আছে, মনে করারও কিছু নেই’, ভদ্রলোকদের একজন বেশ গম্ভীর গলায় বলল, ‘সত্যি তো, এমন অজায়গায় অপঘাতে মাহুঘটা মরল, শেষ সময়ে মুখে জল দিতে কেউ ছিল না, একটু ঠাঙ্কুরদেবতার নাম শোনাতেও ধারে-কাছে কেউ ছিল না।’

‘তবেই বুঝে দেখুন, মাহুঘটা কেমন কষ্টের যাওয়া গেল।’ জগার মাথার পিছন দিয়ে এবার হারু গলা উচিয়ে ধরল। ‘আর এমন একটা কষ্টের দৃশ্য চোখের সামনে দেখেও কিনা উকিলবাবু আমাদের সঙ্গে খামকা ঝগড়া করে গেলেন।’

‘না না, বুড়োর ঝগড়া করা ঠিক হয়নি।’ প্রবীণদের একজন মাথা নাড়ল।

‘আমরা তাঁকে কী বলেছিলাম, বলা হচ্ছিল বিনা টিকিটে রেলগাড়ি চড়নেওয়াল। অনেক প্যাসেঞ্জারই চেকারের ভয়ে প্ল্যাটফর্মের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে এভাবে লাইন ধরে ধরে সোজা হেঁটে চলে আসে, তাতে কিনা তিনি ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন—’

হারুর কথা শেষ না হতে বন্ধা বলল, ‘কেননা তিনি একটা উকিল, ভাল

জামাকাপড় পরে বেরিয়েছেন, সন্ট লেকে জমি কিনেছেন—এই গর্বে ফেটে পড়ছিলেন, কেমন ?’

‘তিনি স্বখে আছেন, মস্কলের ঘাড় ভেঙ্গে পয়সা লুঠছেন—কাজেই’, এবার দু হাত নেড়ে জগা বোঝাতে লাগল, ‘সংসারে কিছু মানুষকে দুঃখে পড়তে হয়েছে—হুনিয়ার এই হাল, পাঁচটা স্বামী মানুষ যেখানে আছে সেখানে দশটা দুঃখী মানুষ তৈরি হবেই—আপনারা লেখাপড়া জানা মানুষ, অস্বীকার করবেন কিনা জানি না।’

‘না না, কথাটা ঠিক, খুবই সত্য।’ এক সঙ্গে ভদ্রলোকেরা ঘাড় কাত করল।

বন্ধা বলল, ‘র‍্যাকমানি বলতেই তিনি খটাং করে রেগে গেলেন, গরীব মস্কলের ঘাড় মটকে পয়সা উসুল করা কালোবাজারী ব্যবসার চেয়ে কম হল কি, বলুন আপনারা।’

‘ঠিক কথা, ঠিক কথা।’ উন্টাডাক্তার সড়ক থেকে উঠে আসা মানুষদের দুজন সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে দিল। ‘উকিল মোস্তার ডাক্তার—সব বেটাদের চেনা হয়ে গেছে, গরীবের রক্ত চুষে সব পেট ফোলাচ্ছে—দেশের এই ছরবছার জন্ত এরা কম দায়ী নয়।’

‘কথাটা অবিশ্বি আমরা মুখে বলি, কারো ওপর দেখে কিছু বোঝা যায় না।’ জগার পিছনে না থেকে হারান এবার ভদ্রলোকদের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, ‘গায়ে টেরিলিনের জামা—পকেটে একটা নয়া পয়সা নেই, আবার হাঁটু কাপড় পরা ছেঁড়া ময়লা জামা গায়ে—এমন মানুষের ট্যাঁকে হাজার টাকার নোট লুকোনো থাকে—কিন্তু কম, মশাই, খুব কম, পাঁচ শ’ মানুষ খুঁজলে এমন একজন আজকের দিনে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আসলে এই মানুষটা দুঃখী ছিল, চোখ মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন না? চটির তলটা ক্ষয়ে গিয়ে কত জায়গায় ফুটা হয়ে গেছে দেখুন, এমন একটা জুতো পায়ে দিয়ে কেউ রাস্তায় বেরোয়?’

কাটা মানুষটার পায়ের দিকে আর একবার চোখ রেখে সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

‘আর যেন রক্তটা ঝরছে না।’ মিনমিনে গলায় একজন বলল।

‘কত রক্ত ছিল ঐ শরীরে বুঝতেই পারছেন।’ আঙুল দিয়ে মরা মানুষটাকে দেখিয়ে বন্ধা বলল, ‘হাড্ডি চামড়ায় একশা হয়ে আছে। তিনি যদি উকিল হতেন ডাক্তার হতেন, দেখতেন আপনারা, এখনো পাইট পাইট রক্ত চুঁইয়ে পড়ত কাটা জায়গাগুলো থেকে।’

‘না না দুঃখী ছিল, দেখলেই বোঝা যায়, খেতে না পাওয়া চেহারা।’ উন্টাডাকার সড়ক থেকে উঠে আসা মানুষদের একজন ফোস করে একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলল। ‘ঐ যেন একটা রেশনের ব্যাগ ওখানে পড়ে আছে।’

‘রেশনের ব্যাগ, রেশন ধরবার খলে।’ একসঙ্গে এতগুলি গলা শব্দ করে উঠল। একটু দূরে লাইনের গা ঘেঁষে পাথরের খোয়ার ওপর তিন জায়গায় তালি দেওয়া একটা ময়লা চটের খলের ওপর সবগুলি চোখের দৃষ্টি ছমড়ি খেয়ে পড়ল।

‘তবে তো বোঝা যায় এখানকারই মানুষ। লাইন পার হয়ে ধারেকাছে কোনো রেশনশপের দিকে যাচ্ছিল।’ যেন বেশ ভেবেচিন্তে ভদ্রলোকদের একজন মস্তব্য করল।

‘তার কি মানে আছে।’ বন্ধা জগা হাক একসঙ্গে উত্তর করল। ‘এখানকার মানুষ হোক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু মানুষটা যে চলতি গাড়ি থেকে টুপ্ করে পড়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।’

ভদ্রলোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর তাঁরা জগু ও হারানের দিকে ঘাড় ফেরাল।

‘তোমরা কোথায় ছিলে তখন? তোমরা কি ধারেকাছে ছিলে?’

‘আমরা ওই গাছতলায় বসে তাস খেলছিলাম।’ আঙুল দিয়ে পোলের কাছে পাকুড় গাছটা দেখিয়ে দিল বন্ধা।

‘তা হতে পারে।’ উন্টাডাকার ওদিক থেকে ছুটে আসা মানুষগুলির মধ্যে একজন মাথা ঝাঁকাল। ‘হয়তো এখানকারই লোক, হয়তো টাকার অভাবে গেল হুগায় রেশন ধরতে পারেনি, বাইরে সস্তায় চালটাল কিনতে গিয়েছিল, কলকাতার চালের বাজারের যা অবস্থা, গরীব মানুষের খোলা বাজারে ওই জিনিস কিনতে যাওয়া আর জেনেওনে আঙুনে হাত দেওয়া এক কথা।’

‘আমরাও এখন তাই অল্পমান করছি।’ জগাও মাথা ঝাঁকাল। ‘হয়তো বাইরেও চাল কিনতে সুবিধে না পেয়ে খালি ব্যাগ হাতে নিয়ে ডাউন ট্রেনে মানুষটা ফিরে আসছিল।’

হাত নেড়ে বন্ধা বলল, ‘আর উকিল মশায় কিনা আমাদের সঙ্গে তুয়ল ঝগড়া করে গেলেন, আপ শাস্তিপূরের গাড়িতে ছিল মানুষটা, ডানকুনির গাড়িতেও থাকতে পারে। কিন্তু নৈহাটি ডাউনে নাকি কিছুতেই ছিল না।’

ভদ্রলোকদের চোখে চোখ রেখে হারান বলল, ‘অথচ দেখুন, সেই সকাল থেকে তিন বন্ধু গাছতলায় বসে তাস খেলছি, কলকারখানা লক আউট হয়ে তিনজনই আজ

চার মাসের ওপর বেকার, কাজেই একটা কিছু করে তো সময় কাটান চাই, হুঁ, তিনজন ওই পোলের ধারের পাকুড়তলায় বসে খেলছিলাম। হঠাৎ যেন দেখলাম নৈহাটির গাড়িটা পাস করার সঙ্গে সঙ্গে লাইনের ধারে সাদামতন কিছু একটা পড়ে আছে। তখনি হাতের তাস ফেলে রেখে আমরা এখানে ছুটে এসেছি।’

‘না না, তোমরা যখন নিজের চোখে দেখেছ, এটাই রাইট, নৈহাটির গাড়ি থেকে মানুষটা পড়ে গেছে।’ ভদ্রলোক ক’জন একসঙ্গে ঘাড় নাড়ল। ‘আমরাও অবিশ্বি তখন হেঁটে এ পথে আসছিলাম, প্রথমটা লাইনের দিকে চোখ ছিল না। পরে দেখলাম একটা মানুষ কাটা পড়েছে।’

‘আমার তো মনে হয়।’ হারান আবার বলল, ‘উকিলমশায় যে-কামরায় ছিল, এই অভাগাও সেই কামরায় ছিল, অভাবে অনটনে এমনি তো মানুষটার মাথার ঠিক ছিল না, তা ছাড়া এক আধ কেজি চালের জন্তে কত জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল তার ঠিক কি, হয়তো গাড়িতে উঠে একটু বসতে চেয়েছিল, কিন্তু উকিল মশায়ের জন্ত সুবিধা করতে পারেনি, তিনি একাই তিনজনের জায়গা দখল করে ছড়িয়েটুড়িয়ে বসেছিলেন, হয়তো বেলঘরিয়া থেকে এইটুকু পথ আসতে লাটসাহেবের শোবার দরকার হয়ে পড়েছিল।’

‘তাই তো’, উন্টাডাঙ্গার রাস্তা থেকে উঠে আসা দলের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল। ‘এই জগতে যখনই একটা মানুষ বোল আনা সুবিধা ভোগ করবে, তখনই বুঝতে হবে বাকি তিনটা মানুষ কষ্টভোগ করছে, হয়তো বসতে না পেয়ে বেচারি খোলা দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, অভাব নিয়ে দুঃখ নিয়ে রোগা শরীরের ক্লান্তি নিয়ে অল্পমনস্ক হয়ে পড়বে জানা কথা, তারপর এক সময় গাড়ির একটু ঝাঁকুনি লাগল, আর টুপ করে নিচে পড়ে গেল।’

‘ইলেকট্রিক ট্রেন’। তাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ মস্তব্য করল, ‘অসম্ভব স্পীড, কাজেই বাইরে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার টানে মানুষটা চাকার তলায় চলে গেল।’

‘চাকার তলায় চলে গেল।’ জগা বন্ধা উত্তেজিত হয়ে উঠল। ‘কাজেই আপনারাও এখন বুঝে দেখুন, যদি বলা হয় ওই শকুনিটা, স্বার্থপর উকিলটাই মানুষটাকে মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছিল তো কি ভুল বলা হবে।’

‘মোটাই না, মোটেই না।’ স্লোগান তোলার মতন আওয়াজ করে উঠল উন্টা-ডাঙ্গার রাস্তার মানুষগুলি।

হাতের বন্ধমুষ্টি শৃঙ্গে নাচিয়ে হারাণ বলল, ‘অভাব নিয়ে দুঃখ নিয়ে মানুষটা হয়তো আরো কিছুদিন যুদ্ধ করে যেত, কিন্তু একটা শয়তান ষোল আনা নিজের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে অকালে মানুষটাকে—’

ঠিক এই সময় হারানের গলার স্বর চাপা পড়ে গেল। ছেঁড়া কাগজের কুচির মতন হাওয়া উড়িয়ে উড়িয়ে, ঝড়ের শব্দ করে মাটি কাঁপিয়ে বারাসত লোকাল পার হচ্ছিল। গাড়ি অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দু’মিনিট তিন মিনিট কি পাঁচ মিনিটের জন্তু সেই ভয়ঙ্কর থমথমে ঝিমোনির ভাবটা ফিরে এল। কারো মুখে শব্দ ছিল না। যেন এত বড় একটা শক্তি, তার অবিশ্বাস্য উদ্দাম গতি দেখে সব কটা মানুষ বোবা বিমূঢ় বিষন্ন হয়ে রইল।

ফিঙেটা আর একবার কিরকির করে ডেকে উঠল। ফডিংগুলো মাথার ওপর থেকে সরে গেছে। যেন ঝড়ো হাওয়ায় বাড়ি খাবার ভয়ে তারা আগেভাগে পালিয়ে গেছে। ছুটো মাছি কাটা মানুষটার কপালের কাছে ওড়াউড়ি করছিল। এর আগে মাছি ছিল না।

‘আপনারা আর ভিড় করে থাকবেন না, সরে যান, পুলিশ আসছে।’ ভত্রলোক-দের মধ্যে একজনের চাপা গম্ভীর গলার স্বর শোনা গেল।

‘তাই তো, পুলিশ! সকলের চোখ একদিকে সরে গেল। স্টেশনের ওদিক থেকে সাদা পোশাকপরা ভুঁড়ি মোটা দুই যুঁতি লাইনের ওপর দিয়ে বুটের ঠকঠক শব্দ করে স্লিপারের গায়ে হাতের লম্বা লাঠি ঠুঁকে ঠুঁকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

‘চৌদ্দ ঘণ্টা পর কর্তাদের টনক নড়ল।’

‘হু’, চাপা গলায় আর একজন বলল, ‘আবার চৌদ্দ ঘণ্টা পার হলে ইন্সপেক্টার আসবে খাতাপত্র বগলে নিয়ে।’

‘কেন খাতাপত্র কেন?’ উল্টাডাকার দলটার মধ্যে একজন আর একজনকে প্রশ্ন করছিল।

‘বাঃ, লোকটা কে, কোথা থেকে এল, কি নাম, কোথায় বাড়ি, কেউ চেনে কিনা বা গাড়ি থেকে পড়ে যেতে কেউ দেখেছিল, না কি শক্রতা করে মানুষটাকে কেউ ধাক্কা দিয়ে চলতি ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল, না এঞ্জিনের মুখে নিজেরই লাফিয়ে পড়েছিল, সব লিখেটিখে নিতে হবে যে।’

‘তাই তো’, আর একজন গম্ভীর হয়ে বলল, ‘কতভাবেই তো মানুষ ট্রেনে কাটা পড়ে, কাজেই সঠিক খবর জানতে পুলিশকে সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করতে হয় বইকি।’

‘হ’, নিয়মটিয়ম যা আছে সবই পালন করা হবে, নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে না—  
তবে কিনা গতি বড় মন্থর’, বলতে বলতে একজন নাকের নিচে হাসল। ‘সাক্ষী-  
সাব্দ জোগাড় হবার পর আবার চৌদ্দ ঘণ্টা পার হবে, তারপর যদি লাস তুলে নিয়ে  
মর্গে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, মানে রোদটুকু আর থাকবে না, তখন আকাশে  
তারা উঠবে।’

‘থাক, আপনারা আর ভিড় করে দাঁড়াবেন না, আমরা কেউ যখন কিছু জানি না,  
কিছু চোখে দেখিনি, সরে পড়া ভাল।’ বলে ভদ্রলোক ক’জন সোজা একদিকে  
হাঁটা ধরল। উর্নটাডান্ডার সড়ক থেকে যারা উঠে এসেছিল তারাও আর দাঁড়িয়ে  
থাকল না। লাইনের উঁচু শাড় ছেড়ে নিচে নেমে গেল। চাষীরা আগেই মাঠে  
নেমে গিয়েছিল, সেই বারাসত লোক্যাল যখন চলে যায়।

‘আয়।’ বন্ধার হাত ধরে জগা টানল।

হারান বলল, ‘বড্ড ভলতেষ্টা পেয়েছে রে।’

লাইনের পাশের বনভুলসীর ঝোপ ঠেলে তিনজন পাকুড়গাছের ছায়ায় এসে  
দাঁড়াল।

হারান ও জগা গাছের মোটা গুঁড়িটার ওপর বসে পড়ল। বন্ধা বসল না।  
মুখটা ঘুরিয়ে রেখেছে, সেই লাইনের দিকে তার চোখ। চোখের পলক  
ফেলছিল না।

‘এখান থেকেই হাত তুলে পেনাম কর, চলে যখন গেছে তুই আর করবি কি।’  
বন্ধার দিকে চোখ তুলে জগা বলল, ‘ওখানে বৃড়োর পা ছুঁতে গেলেই কিন্তু লোকে  
টের পেয়ে যেত। কি বলিস হারান?’

‘তাই তো।’ হারান খুঁতনি নাড়ল।

কিন্তু বন্ধা কপালে হাত ঠেকাল না। গুম হয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। যেন  
মনে হল একটা কান্না, কান্নার সঙ্গে রাগ, একটা আক্ৰোশ তার বৃকের ভিতর থেকে  
ঠেলে উঠে গলার কাছে এসে ঠেকে আছে। চোয়াল দুটো শক্ত করে রেখেছে।

‘বিড়ি খা, বন্ধা।’ হারান হাত তুলে তাকে বিড়ি দিতে গেল। বন্ধা শুনল না।  
এদিকে মুখ ফেরাল না।

জগা হারানের দিকে তাকাল। ‘এখন বুঝি বনগী লোক্যালটা আসছে।’

‘হ, শব্দ শোনা যাচ্ছে।’ হারান কান খাড়া করে রাখল।

কিন্তু ট্রেনটা চলে আসার আগেই বন্ধা এদিকে ঘাড় ফেরাল। তার চোখ দেখে



জগা ও হারান ঘাবড়ে গেল। জল ছিল না চোখে, জালের বাড়ি খাওয়া কাতলা মাছের চোখের মতন চোখ দুটো লাল হয়ে আছে, চকচক করছে।

‘বুঝলি’, তার গলার স্বর শুনে বোঝা গেল—কান্নার চেয়ে অভিমানটাই বেশী বৃকের ভিতর জমা হয়ে আছে। কিন্তু কথা আরম্ভ করেও বন্ধা থেমে গেল। বনগী লোক্যাল তখন পার হচ্ছে, এখানের মাটি কাঁপছিল, গাছের গুঁড়ি নড়ছিল।

শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর বন্ধা বলল, ‘এভাবে লাইনে গলা দিয়ে মরার কোনো অর্থ আছে? কিন্তু তুমি তো গেলে, আমার মুখে যে চুনকালি পড়ল, আমার যে নাক-কান কাটা গেল—এ আমি এখন কাকে বোঝাব তোরা বল।’

জগা কথা বলছিল না। একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে হারান কান চুলকাচ্ছিল।

‘বুঝলি’, বন্ধা আবার বলল, ‘যেন তিন চারদিন ধরেই জিনিসটা বুড়োর মাথায় ঘুরছিল। এখন আমি বেশ টের পাচ্ছি। পরশু রাত্রে আমায় বলছিল, ঘরের একমাত্র রোজগেরে ছেলে জোয়ান ছেলে, তুই আজ তিন মাস বেকার বসে আছিস, গোপীমুদ্র উপবাস করছে, এদিকে পেটে আলসার নিয়ে আমিও এমন ঠেঁকা ঠেঁকে গেছি, না পারছি কোন কাজ করতে, না পারছি এক ফোটা ওষুধ খেতে—আর কষ্ট সহ্য হচ্ছে না, কোনদিন হয়ত ট্রেনের তলায় গলা দিয়ে আমিই শেষ হয়ে যাব।’

‘তো বুড়া থলেটা সঙ্গে এনেছিল কেন?’ ভুরু কুঁচকে হারান প্রশ্ন করল।

‘কি করে জানব, কি করে বুঝব বল?’ ভেংচি কাটার মতন চেহারা করে রেগে বন্ধা চুপ করে রইল। তারপর একটু ভেবে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ‘হয়তো কারো কাছে ধারকর্জ করতে গিয়েছিল, ভেবেছিল দুটো একটা টাকা পেলে বাজার নিয়ে ঘরে ফিরবে, না পেয়ে সোজা রেল লাইনের কাছে ছুটে এসেছে।’

‘তুই বেকার, জেনেশুনে বুড়োকে আর কেউ এখন ধার দেয়!’ হারান একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

‘তবু তো তোর বাবা বুড়া হয়েছিল’, জগাও লম্বা করে নিশ্বাস ফেলল। ‘আমি যে শালা বিয়ে করে আরো ঠেকে গেলাম। বাচ্চাগুলো কান্নাকাটি করে, বোঁ বলছে, গলায় দড়ি দেব, পেটের সম্ভান খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে, এ আর আমি চোখে দেখতে পারি না।’

‘আমি তো শালা এই ভয়ে বাড়িতেই চুকি না’, নাকের সামান্য শব্দ করে হারান হাসল। ‘মা কান্নাকাটি করে, বাবা গালে হাতে দিয়ে বসে থাকে, কলাগাছের মতন বেড়ে উঠে দুটো বোন রাতদিন ছটকট করছে।’

জগা চুপ। বন্ধা চুপ।

‘অথচ ছাখ বন্ধা’, হারান আবার বলল, ‘যদি উন্টাডাঙ্গার ওই দলটা টের পেয়ে যেত, ভদ্রলোক ক’জন জেনে যেত যে, এই তোর বাবা—তখন কত বক্তিম আরম্ভ হয়ে যেত। হুঁ, সিঁদ কাটতে পারতে বাপু, পকেট মায়তে পারতে, গতর ছিল, রিক্সা টানতে দোষ ছিল কি—না হয়, ওয়াগান ভাঙ্গিয়েদের দলে ভিড়ে যেতে, তবু তো বুড়োটা এভাবে বিনি আহারে বিনি চিকিচ্ছেয় কষ্ট পেয়ে এঞ্জিনের তলায় গলা দিতে আসত না।’

‘ওপর থেকে এসব বলা সহজ।’ চোখ তুলে জগা গাছের পাতা দেখল। ‘বাইরে থেকে সব ব্যাটাই এমন উপদেশ দেয়।’

হারানের পাশে বসে বন্ধা বিড়ি টানছিল। গুমগুম শব্দ করে লালগোলার গাড়িটা যাচ্ছিল। হঠাৎ পিঠ টান করে হারান মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

‘ছাখ ছাখ, কে আসছে !’

‘শকুনটা, উকিলটা।’ জগা ঘাড় সোজা করে ধরল। ‘জমি দেখে ফেরা হচ্ছে।’

‘যাব নাকি ছুটে ? গিয়ে টুঁটি টিপে ধরব ? পকেট হাতড়ে হু পাঁচ টাকা যা পাওয়া যায়।’ হারান হি-হি করে হাসল।

‘যা না’, অল্প হেসে জগা একদলা থুথু ফেলল। ‘মনে হয় কিছু নেই সন্দেহ, ফতো উকিল, ওপরেই যা একটু ভড়ংভড়ং।’

‘তা হলেও হাতে একটা ঘড়ি আছে।’ হারান চোখ টিপল। ‘কি রে বন্ধা, যাব ?’

‘পারবি না পারবি না।’ হাতের পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে বন্ধা বড় করে নিশ্বাস ফেলল। ‘এসব আমরা মুখেই বলি, কাছে গিয়ে যখন হাত মুখ চেপে ধরব, আর চোখ ঘোলা করে বুড়ো মানুষটা মুখের দিকে তাকাবে, তখন একটা মায়্যা এসে যাবে, তখন তোর বাবার চেহারাটা তোর মনে পড়বে, আমাদের ঘরের বুড়োটাকে আমার মনে পড়বে, বুঝলি, এসব তোর আমার কস্ম নয়। ঠিক কিনা জগা ?’

‘তা ছাড়া কি।’ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে জগা আর একটু ঢিলেঢালা হয়ে বসল। চোখ বুজে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, ‘এই জন্তই আমাদের কিছু হবে না, আমরা মরে যাচ্ছি।’





আনোয়ার আলি সহাস্ত্রে বললে—অ্যাকটিংটা খুয়ে দে শালা, পিছন ফেরালেই তো জানোয়াব আলির মুখে কালি বলে গাল পাডবি। আমি যা বলবো সাফ সাফ মুখের ওপর, ওসব তোমো তোমো কথা আমার ছাড়া কখনো হবে না। তোরা গুলতানি মেরে নরক গুলজার কর, আমি ডেরায় চললুম!

আমার সঙ্গীর নাম কানা সাড়ে তিন পাঁট। কানা এবং সাড়ে তিন বোতল দেশীমদ একাসনে পান করতে অভ্যস্ত বলে লোকটি ওই নামেই বিখ্যাত। আনোয়ার আলিও সঙ্গের তার সম্পর্ক বা যোগাযোগের সূত্র আমার অজানা, যতোদূর মনে হয় দুজনের পরিচয় বহুদিনের এবং বহু কীর্তির সঙ্গ উভয়ে জড়িত। কানা সাড়ে তিন পাঁট জিভ উন্টে নাকের ডগা চেটে উরুর উপর একটা হালকা খাবড়া মেরে দুলতে দুলতে বেশ একটু তোষামোদের সুরে বললে—অই শোনো, তুমি চলে গেলে এঁড়ে বাছুরের মতো বাঁ বাঁ করতে করতে গলা দিয়ে খুন বরবে যে। দোহাই তোমার ওস্তাদ, একেবারে আঁধারে চুবিয়ে মেরে রেখে যেও না—ধর্মে সইবে না!

আনোয়ার আলি কি মনে করে আবার বললো। মনে হলো আমাকে কিছু বলবে। পরক্ষণেই ভাবাস্তুর মুখে খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বললে, শালার সারা গতরটা যা টাটান টাটাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এক হস্তা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবো না!

কানা সাড়ে তিন পাঁট রসিকতার সুরে বললে—ওসব ভালো করেই বুঝি। মাহুরে শোওয়া গা ডবল তোশক পেলে টাটাবে না তো টাটাবে কিসে। ইস্ শালার ঝাকে বলে একদম ফেটে পড়া স্বাস্থ্য, উথলে গুঠা স্বাস্থ্য, চলকে পড়া স্বাস্থ্য, থমথমে টাটানো বোবন!

—বেশী কপচে কাজ নেই, থাম ! কারো গতর টাটানি কারো চোখ টাটানি !  
আবে শালা কানা, তোর নোলা দিয়ে বুঝি নাল বরছে, না রে ? মাল ছেড়ে  
দেখ না, তোর গলাতেই যদি ওই জাম্বাতি কবচ লটকে না দিয়েছি তো একবাপের  
বেটা নই ।

—এহ, একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেলুম আর কি ।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ বগল চুলকাতে চুলকাতে বললে,—মুফ্তে হলে একবার  
টেন করে দেখতে পারি !

আনোয়ার আলি মুখ ভেংচে বললে,—ওরে আমার লাভ জামাইরে ! শালার  
ব্যাটা শালা কানা বলে চক্ষুলজ্জাটাও কি ধুয়ে খেয়েছিস ? তবে শোন্ তিনটে  
জিন্নামার্কী পর্যন্ত দাম উঠেছে, আমি পাঁচটার কমে ছাড়বো না, তার চেয়ে বরং  
দোলাই খালে ভাসিয়ে দেব । ভেবেচিস মুফ্তের মাল, ভাগাড়ের শকুন কোথাকার !  
এ রকম খাটি জিনিস দু' দশ বছরে এক আধটা শিকে ছিঁড়ে পড়ে ! আবে শালা  
কানার মরণ, রা কাড়ছিস না কেন ?

সাড়ে তিন পাঁচ বিমর্ষ হয়ে বললে,—তোমার মুখের ট্যাকসো থাকলে আর  
এভাবে বলতে পারতে না । যাই বোলো তুমি ওস্তাদ বড্ড স্বার্থপর । সাধ্যে কুলায়  
তোমার এমন কোন কাজটা না করে দিয়েছি বোলো, অথচ আমরা কিছু আবদার  
করলে অমনি বোলো আনা হিসেব কমতে বসবে । এমন নয় যে নিকে করা বউ,  
কোথাকার পাখি কোথায় চলে যাবে । আমরা চিরকাল নামেই ইয়ার-বন্ধু থেকে  
গেলাম !

—ওপ, দুঃখে একেবারে পেটের পিলে ফেটে যাচ্ছে বুঝি ! আজ কি সাড়ে তিন  
পাঁচের বেশী হয়ে গিয়েছে ?

খালি বোতলটা দূরে ঘাসের ওপর সজ্বরে ছুঁড়ে দিয়ে কানা সাড়ে তিন পাঁচ  
তিরিকি মেজাজে বললে—যাও যাও, নিজের ধান্দায় যাও । বেশী ফ্যাচোর  
ফ্যাচোর করো না । তোমার কথাগুলো মনের ওপর পেট্রলের টিন উপড় করে  
দিয়েছে ।

তুলনাটা ভালো লাগলো আমার । কানা সাড়ে তিন পাঁচের মুখে বলেই ভালো  
লাগলো । আনোয়ার আলি পকেট থেকে একটা রেশমী রুমাল বের করে স্বস্ত্র করে  
মুখটা মুছলো তারপর পেশীবহুল হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে আড় ভেঙে জড়িয়ে  
জড়িয়ে বললে—তাহলে উঠলাম হে, একটা বৈঠক আছে আবার

—বিদেয় হও না, কে তোমায় পাজাকোলে করে ধরে রেখেছে ।

তারপর প্রকাণ্ড আনোয়ার আলি চলে যেতেই আমার পাশে আরো খানিকটা সরে এসে বললে,—শালার জানোয়ার আলির মুখে কালি। দেখলেন তো কেমন অখাচ্ছ!

আমি বললাম—ঠিক বুঝলুম না।

—কেন গুরু, অল্প জগতে বিচরণ করা হচ্ছিল বুঝি?

বললাম,—কোনো একটা কিছু ভাবছিলাম নিশ্চয়ই, আবার তেমন কিছু না। তোমার কথা বলো, চূপচাপ ভালো লাগছে না।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ বললে—নির্লজ্জ বেহায়া কি আর গাছ থেকে পড়ে। হুমানটার কথা শুনলেন, শালার ব্যাটাকে আচ্ছামতো হুরমুশ করা যেতো। কতো জায়গায় যে টিট হয়েছে তার হিসেব নেই, একটা জ্যাস্ত শয়তান। মেয়ে মানুষ বেচে শালা লাল হয়ে গেলো।

আমি তার মন রক্ষা করার জন্তে বললাম—লোকটাকে আমারও খুব অসহ্যে ঠেকেছিলো। তুমি যে রকম তোয়াজ করছিলে প্রথমটায়।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে বললে,—ইস আপনার চোখ একেবারে লাল জ্বাফুলের মতো হয়ে গিয়েছে, রক্ত ফেটে পড়ছে, বরং স্টপ করে দিন।

আমার বলতে ইচ্ছা করছিলো, এখন ও ছুটো আর চোখ নয় ও ছুটো আমার টুকরো করা হৃদপিণ্ড, কিন্তু লোকটা বুঝবে না, স্ততরাং চূপ থাকতে হলো। আমার মনে যা তোলপাড় করছিলো তাকে পাত্রে ধরে রাখা যায় না, কেননা মধ্যরাজির শিকার ভাটিখানার নিঃসঙ্গ এক মাতাল হুমড়ে মুচড়ে একাকার শীৎকার চীৎকার... গলিত শবের মাংসভক্ষণ এবং কাফন সংগ্রহ শেষ করে ধূর্ত শৃগাল ও নির্বিকার তস্কর কবরখানার বাইরে শীতরাজির কৌমার্ধে আশুন ধরাবার তুঙ্গ অভিপ্রায়কে উসকে দিয়েছে। কেননা মৃত্যুর মতো ভালোবেসে, হৃদাস্ত দস্যুর মতো উপভোগ করে গুটিকতক জন্মান্ন খল অবিশ্বাস ও কান্নার মতো স্নিগ্ধ আচ্ছন্ন এবং হুজ্জ নগরে গম্ভীর হুর্ভাগ্যের বীথি হুপাশে ফেলে জলস্ত বাহুড়ের মতো প্রকীর্ণ চিছে নিশ্চিহ্ন। কেননা পৃথিবীতে সব মোৎশাটই মৃত, প্রত্যাহের আটলাটিক ডাকাতিয়া নদী, বিজ্ঞান বিমর্ষ, ঠিক তেমনি ভ্রষ্টা ইছদী রমণী আজ কোথায় যেমনটি জান ছাড়া! কোথায় কোন অনিশ্চিতই না ভাসমান রুগ্ন অবিস্কারের স্রোতে। আর পাপের যন্ত্রণা চীৎকার আর্তনাদ দংশনে হস্তে কুকুরের স্বজাতি তথাপি চন্দন কাঠের মূল্যবান প্রাচীন শেত কোটায় সাজিয়ে রাখতে বলো কি রহস্যময় স্তোমাদের বাহুধরে কাঁচের স্বচ্ছ কফিনে।

পাঁপে দন্ধ আমার সর্বাঙ্গ। পাঁপে দন্ধ আমার—দন্ধ দন্ধ দন্ধ। দগদগে শরীর ছাল ছিলে অর্ধ-উন্মাদের মতো নিজেই খাই। তারা যখন কালো পাপের, অতি অস্তরঙ্গ অতি স্তন্যদ স্তপের—রক্তপ্রবাহী চিহ্নগুলো কালো কালির আচড়ে লিখে নেয় তখন অতি স্বার্থপর নিঃসঙ্গ এবং স্তম্ভিত শয়তানও চীৎকার করে ওঠেন, আমাকে অন্ধত্ব দাও, আমাকে অন্ধত্ব দাও, আমাকে অন্ধত্ব দাও।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ বললে,—তুমি গুরু দেখে নিও, ও শালা বাদরমুখো জানোয়ার আলির মোষের মতো শরীর আমার ট্রাকের তলায় পড়ে একদিন ছাতুছানা না হয়ে যাবে না। শালার যে সে ট্রাক নয় একেবারে সাতটনি মার্শেলাইজ বেনচি! গুরু একটা কথা বলি কিছু মনে কোরে বসো না যেন আবার, আমি কিন্তু তোমাকে তুমি বলেই বলছি—আচ্ছা তোমরা তো সব লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক, এ সব নোংরা আন্তাকুঁড়ে পা রাখতে তোমাদের সংকোচ হয় না?

আমি বললাম,—শিক্ষিত লোকদের ওই একটা মস্তবড় গুণ, হুনিয়ার সব জায়গাই তাদের চেনা হয়ে যায়, সহজে সব জায়গাতেই গা ছেড়ে বসতে পারে। তোমাদের হুনিয়ার বাইরে তোমরা অচল!

—তা যা বলেচ গুরু। একবার চ্যাং চ্যাং চ্যাং হোটলে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলো তোমারই মতো একজন, আমার সে কি কাঁপুনি ভিতরে ঢুকে, কিছুতেই আর মুখ তুলে বসতে পারিনে। তা গুরু চলো উঠি। হারামখোরের ব্যাটারী পাতভাড়ি গুটোতে শুরু করে দিয়েছে।

আমি অহুনের সুরে বললাম,—এখনই ঘরে ফিরতে চাই না, আরো কিছুক্ষণ থাকো না আমার সঙ্গে। অল্প কোথাও চলো যেখানে সারারাত কাটানো যায়, খরচ আমি দেবো।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ বললে—আজ অনেক খসেছে, আবার কেন?

—ওসব কিছু নয়।—আমি বললাম,—এই যে তুমি আমাকে সঙ্গ দিচ্ছ, আমার কাছে কিন্তু এটাই বড়, আর কাছে আছে বলেই ওড়াচ্ছি, যখন থাকবে না তখন আসবো না।

—যাই বলা গুরু, তোমাদের বুঝতে যাওয়াটা একটা মস্ত ফ্যাসাদ। চলো কোথায় যাবে।

সব দৃশ্যকে তখন চাঁদ গিলে খাচ্ছে। স্থখ নামক অদ্ভুত এক রোগের মড়কে সারা ঢাকা শহর উজাড় হয়ে গিয়েছিলো বহু আগেই। শ্রাণ্ডেলের গোড়ে গোবর লেপটে যাওয়ায় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো বুঝিবা পৃথিবীর কাঁচা মাংসের ওপর দিয়ে হেঁটে

চলেছি। রসালো রাত্রিটাকে কারা যেন নিংড়ে তার সবটুকু রস বের করে নিয়ে চারপাশে ছত্রাখান করে রেখে গিয়েছে শুধু নীরস আঁশ।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ বগলার ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—বুলে গুরু, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে শালার হাড়-হাবাতে জানোয়ার আলিটার কলজে বের করি। কাফেরটার ধর্ম বলে কিছু নেই, পয়সা তো রাস্তার হাজা মজা হুলো ভিখারীগুলোও রোজগার করে, অমন পয়সায় আমি মুতে দেই। গাঁ-গেরামের মেয়েমানুষকে গায়েব করে বেমালুম দু'একশো টাকায় বেচে দিচ্ছে, লাখ টাকা দিলেও আমরা বাপু অতোটা নিচে নামতে পারবো না, হ্যাঁ।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ এই ভাবে অনর্গল বলা শুরু করলো। আনোয়ার আলিকে নিয়ে তার কথার তুবড়ী যেন আর ফুরোতেই চায় না। আমি ভাবছিলাম সন্ধ্যাবেলার কথা যখন আমার ভিতরটা এমন ভাবে গুমরে উঠেছিলো যে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। মনে হয়েছিলো কষ্টের একটি করুণ শীর্ণ নাম-না-জানা নদী আমাকে ভয়ংকর অনিশ্চিতের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, আমি এমন অসহায় এমন নিরুপায় এমন রুগ্ন যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তেমন শক্তি নেই। কি করবো, কোথায় যাবো, যেন বিদীর্ণ হতে চাই, যেন এক খাবলা আকাশ ছিঁড়ে নিয়ে কারো মুখে ছুঁড়ে মেরে শাস্তি পাবো, এই সব মনে হয়েছিলো। সন্ধ্যাদেবী দরোজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমি বের হতেই রহস্যময় আবরণের ভিতর থেকে তার অপরূপ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু না বলে আকাশের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলতে চাইলেন এক একটি তারার এক একটি স্বতন্ত্র অর্থ আছে, ওই সব অর্থ জানতে যেও না। তারপর আমাকে তাঁটিখানায় পৌঁছে দিয়ে নিঃশব্দে নিজের পথে চলে গেলেন। তখন কানা সাড়ে তিন পাঁচ, আনোয়ার আলি, ফৈজুদ্দিন কাওয়াল কেউই সেখানে ছিলো না। আমার কি যে মনে হয়েছিলো, মনে হয়েছিলো—আমাদের দাদীমারা নিকোনো উঠানের কোণে প্রাচীন পিঁড়িতে উপবেশন করে গনগনে উলুনে চেলাকাঠ প্রবেশ করিয়ে জাড় ভাঙছিলেন আর ফিসফিসিয়ে ভয়ংকর শিরা-উপশিরাগুলিকে কিছু বলছিলেন, হাসছিলেন অর্থহীন, উদ্যম রাত্রি, কি মাংসল তার শরীর, পিষ্ট হতে চায়, আগুনের চঞ্চল শিখা থেকে থেকে কাঁপছে রাত্রির নরম মন্থন স্নগোল বাহুতে, ভাষা দাও! আমাদের দাদীমারা নিকোনো উঠানের কোণে প্রাচীন পিঁড়িতে, হে রূপসি তাড়না তোমার আনাজ কোটার কি শেষ নেই? গলে পড়া চাঁদ, গলে পড়া অঙ্কার, গলে পড়া বাতাস,

গলে পড়া আকাশ, গলে পড়া বয়স, গলে পড়া অবসাদ, গলে পড়া হিম, গলে পড়া স্বর্গ—গভীর থমথমে নাভীর গায়ে জমা লবণ জলের সৌন্দর্যে নিহত যে, ভাষা দাও ভাষা দাও! আমাদের দাদীমারা সব মৃত। প্রাচীন মন্থণ পিঁড়ি, অলস উপবেশন, নিকোনো উঠোন, তাঁদের অর্থহীন প্রলাপ—স্বর্গীয় স্বগতোক্তি বৃষ্টির বিস্তার মতো স্মৃতির অতলে, ভাষা দাও!

—শালার ব্যাটা শালা বাস্তুঘুঘু, তোমায় একদিন ঘুঘুর ডিম খাইয়ে ছাড়বো। না হলে কান কেটে কুকুরের পায়ে ঝোলাব।—কানা সাড়ে তিন পাঁচ বললে—বুলে গুরু, ওই একটা কথা আছে না বেশী বাড় বেড়ো না বড়ে পড়ে যাবে, শালার ঠিক তাই হবে। একদিন শালাকে নর্দমার পানি না খাইয়ে ছেড়েছি তো নামই বদলে দেব। চিরতে জানলে একটা ধান দিয়েও কারো পেট চেরা যায়। তা গুরু কাছাকাছি একটা তিন তাসের আড্ডা আছে, যাবে নাকি সেখানে, রাত কাবার করার জন্তে খুবই যুতসই।

আমি বললাম—ওই ব্যাপারটা আমার ছুচোখের বিষ। চলো নদীর দিকে যাই, এই সময় খুব আশ্চর্য মনে হবে নদীটাকে।

—আই মেরেছে। তোমার যতো সব অনাসৃষ্টি কথা গুরু, ওখানে ঘোরাঘুরি করতে গেলে সেপাইরা সন্দ করে টানা-হ্যাঁচড়া জুড়ে দেবে, ভাববে আমরা জানের খারাবি করতে গিয়েছি। তার চেয়ে চলো যে যার নিজের ঘরের দিকি ফিরি, আমার আবার কাল সন্ধ্যা সন্ধ্যা খ্যাপ মারতে যেতে হবে সেই কড্ডায়।

বললাম—সেই ভালো, আমি তাহলে চলি, আবার দেখা হবে।

। দুই।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সারা শরীর অদ্ভুত বরবরে হয়ে গিয়েছে। মনে মানির আঁচড়টুকু পর্যন্ত উধাও। সবকিছু ভালো লাগল। দুদিন পর সময়মতো অফিসে ছুটলাম। সারাদিন যেন নেশার ঘোরেই বৃন্দ হয়ে থাকলাম কাজের চাপে।

তারপর অফিস থেকে নিজের আস্তানা। আবার সেই সন্ধ্যা। আবার মন খারাপ হয়ে যাওয়া। আবার বেরিয়ে আসা ছুটে। একটা রাস্তা ধরে পাগলের মতো শুধু হাঁটতে লাগলাম। মনে পড়ে, এক এক সময় নিজের অস্তিত্বকে মনে হতো খেত পাথরে মোড়ানো মসজিদের একটি প্রাচীন চৌবাচ্চা যার ফোয়ারা অকারণে



স্বক হয়ে আছে। যেখানে সহজে পোষ্যমানা, আমার রক্তের লাল আর সাদা মাছেরা নির্লিপ্ত হুখে হাঙরের হাঁ, বন্দোপসাগরের গভীরতা আড়িয়লখাঁর বৃকে মেঘের উদাস থা থা ছায়ার কথা অনন্তকালের জন্তই বিশ্বত হয়েছে। প্রতিদিন নির্বিকার অভ্যন্ত শিকারীর দল সম্তর্পণে শেষ করে দশ আঙ্গুলের চাঞ্চল্যে বলে গিয়েছে, ফিরিয়ে নাও ফিরিয়ে নাও তোমার লবণাক্ত সমুদ্র, ফিরিয়ে নাও তোমার অরণ্য দীঘির করুণ জল আর শোকার্ত নগ্ন আকাশ, দাঁও সোনার হরিণ। তারপর সাইরেনের আতঙ্ক শুরু হয়ে শোনে ক্ষয়িষ্ণু জিজ্ঞাসা। প্রয়োজন হয়েছে জানাজার। আবার আমার স্বচ্ছ শরীরে ছায়া পড়েছে তাদের করুণ ম্লান সংকল্পচ্যুত ভয়ংকর বীভৎস সারি সারি মুখের। কখনো নিজের অস্তিত্বকে মনে হয়েছে জুর উল্লাসে ফেটে পড়া ভূমধ্যসাগরীয় ঝড় কবলিত একজন নিঃসঙ্গ নাবিক—জলাতঙ্ক আক্রান্ত, স্মৃতি বিশ্বত বিকৃতমুখ দংশন-লোভী, যার ভিতর নেই কোনো আটলাটিক, নেই কোন আলোকসুন্দর, কোনো প্রবালদ্বীপ, দিকচক্রবাল। মনে হয়েছে জনহীন বিশাল এবং নির্দয় পৃথিবীতে আমি পতিত আদম—নিঃসঙ্গ, নির্বোধ এবং নীরোগ, যার চোখে স্বর্গের স্মৃতি, নিসর্গ ভয়ংকর।

এখন ঠিক কি মনে হয় তা জানবার আর উপায় নেই। খোলা পাত্রে স্পিরিট ঢেলে রাখলে যা হয় ঠিক তেমনি করেই যেন যাবতীয় চিন্তাধারাগুলি চিরকালের জন্তে উঠে গিয়েছে। এক বোতল যৌনক্রীড়া পান করে যারা নিখাসের মনে অসংখ্যবার কামারশালার হাপর হবার জন্তে জন্মেছে তাদের বিকৃত ও আক্রান্ত চিন্তা-গুলি নিদ্রার চেয়ে মূল্যবান নয়।

এখন আমি কোথায় যাবো। পৃথিবীর বাইরে কোনো নির্বাসনই স্থনির্দিষ্ট নয়। ঘনে হয় আমি অন্ধ বধির। কোনো শব্দ আমার কর্ণপটেহে স্পর্শ করে না। আমার চোখের সামনে নেই কোনো খোলা মাঠ, নেই কোনো নদী, আমাকে ডাকে না একটি দরোজাও, পৃথিবীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সব জানালা।

এক সময় আমাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়াল একটা, লম্বা ঘনদানব, আগে থেকেই ঘন ঘন হন বাজছিল, ড্রাইভারের আসন থেকে কানা সাড়ে তিন পাঁচ চেঁচিয়ে বললে—উঠে এসো গুরু, উঠে এসো।

আমি উঠে তার পাশে বসতেই বললে—তুমি অনেকদিন বাঁচবে গুরু, এইমাত্র তোমার কথা মনে হয়েছিলো। আজ তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

বললুম—কি ব্যাপার কি ?

—পরে সব বলবো, আগে ক্রী হয়ে নেই। শালার এই মার্শেলাইজ বেনচি আমায় না ডুবিয়ে ছাড়বে না। তোমাদের দোয়ায় যা বাঁচা বেঁচে গেছি আজ।

পথে আর কোনো কথা হলো না। কানা সাড়ে তিন পাঁচ মুখ অঙ্ককার করে গাড়ী চালিয়ে সোজা তার গ্যারেজে ঢুকলো। তারপর গাড়ী থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছে ফুকফুকে বললে, শালার নিকুচি করি আমি ড্রাইভারীর, কি খারাবি যে লেখা আছে তিন তক্তোই জানে।

তারপর কি মনে করে বললে—গুরু তুমি ততক্ষণ বাইরের চৌকিটার ওপর বসো, আমি গাড়ীটার চাকা ধুয়ে সাফ করে নেই।

কানা সাড়ে তিন পাঁচকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন খুব সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে এসেছে লোকটা। আমার যথেষ্ট কৌতূহল হচ্ছিল, কিন্তু জোর করে পেটের কথা আদায় করা স্বভাব নয় বলেই কিছু জানতে চাওয়ার সাহস হলো না। গামছা দিয়ে মুখ হাত মুছতে মুছতে একসময় সে এসে বললে—চলো গুরু।

তারপর যেখানে নিয়ে হাজির করলো সে জায়গায় আর কখনো আসি নি। খুব অচেনা জায়গা, গলিগুলোও গোলকর্ধাধার মতো। আমরা দুজন একটু আলগা হয়ে ছাদের এক কোণে বসলাম। বোতলের ফরমাস দিয়ে কানা সাড়ে তিন পাঁচ বললে—সত্যি বলছি গুরু, আজ তোমার সঙ্গে দেখা না হলে দুঃখে মরে যেতুম। ফিরতে ফিরতে শুধু ভাবছিলুম গ্যারেজে গাড়ীটা রেখেই তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবো। একটা কথা গুরু, আজ কিন্তু আমাকে সাড়ে তিনের বেশিতে কিছুতেই ধেতে দিও না। সাংঘাতিক কিছু ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। বেসামাল অবস্থা হয়ে গেলে অগোচরে সব বলে ফেলতে পারি। তুমি আমাকে একটু সামলে রেখ।

সাহস করে বলেই ফেললাম—ব্যাপারটা কি কোনো মতেই বলা চলে না ?

—কোন মতেই না।—এই বলে আমার কানের পাশে সরে এসে ফিসফিস করে বললে—কিন্তু তোমাকে সব বলবো, সেই জন্তেই তো তোমাকে নিয়ে আসা। বিশ্বাস কর গুরু, খোদার কসম বলছি, যতক্ষণ না তোমার কাছে ব্যাপারটা বলতে পারছি ততক্ষণ ভিতরের পাথরটা কিছুতেই সরছে না।

তারপর এক নিঃশ্বাসে পুরো একটা গ্রাম সাফ করে বললে—আজ দু'দুটো মাহুষ সাবাড় করে এসেছি, একটা অসাবধানে অপরটা ইচ্ছে করে।

আমি চমকে উঠে বললাম—তুমি বলছো কি !

—যা বলছি ঠিকই বলছি। আজ সারাদিন ফুরসত ছিল না, ভোর থেকে শ্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত মাল টেনেছি, পঞ্চবটি থেকে কড্ডা আবার কড্ডা থেকে পঞ্চবটি, শালার ইট বওয়ার নিকুচি করি আমি।

জানতে চাইলাম—তা মাহুষ মারলে কি করে ?

—হুকুর বাঁচাতে গিয়ে একটু সাইড নিয়েছি অমনি একজনের গায়ে লাগল ধাক্কা । এ তো শালা আর বুটিশ আমলের তিনটনি বরবারে ছ্যাকড়া ফোর্ড নয়, যার নাম মার্শেলাইজ বেনচি, চাকার তলায় পড়ে একেবারে চিড়ে চ্যাপটা । ময়েচে এখন কি করবো । সটকাবার ফন্দি করছি, এমন সময় দেখি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে এক শালা পাতিবাবু ঝুঁকে ঝুঁকে লম্বর দেখছে । তক্ষুনি সাব্যস্ত করে নিলুম এই আপদ-টাকে শেষ করে রেখে না গেলে নসিবে অনেক মন্দ ঘটবে । ব্যাস, সিধা এসে একেবারে গায়ের উপর চাপিয়ে দিলুম, ব্যাটাচ্ছেলে কেটে পড়বার মতলবে ছিলো, চলে গেল পায়ের ওপর দিয়ে । ভয় হলো যদি কোনোমতে ধুঁকতে ধুঁকতে কিছু-ক্ষণ টিকে থাকে তাহলে নির্ধাৎ কাউকে না কাউকে লম্বর বাতলে যাবে । মাহুঘ-জন তখন কেউ কোথাও নেই, ব্যাক করে অনেকটা পিছনে এসে এবারে একেবারে চড়া স্পীডে নাড়িভুঁড়ি, মাথামুণ্ডু সব কিমা বানিয়ে রেখে সোজা ঢাকার দিকে চলে এলাম !

আমি বললাম—কিন্তু খুব বড় রকমের অস্তায় করলে এই শেষেরটা !

—কি করবো গুরু, ওটা আমার ওস্তাদের হুকুম । মাহুঘ খুন করে দোজখে যাওয়া ঢের ভালো কিন্তু আইন-আদালত, ভুলেও ও পথে পা বাড়িয়েছ কি তোমার রক্ত চুষে একেবারে গরম পানিতে চোবানো ক্যাকাসে হাঁস বানিয়ে ছাড়বে ।

আমি আর কোনো প্রশ্ন না করে অতৃদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপচাপ বসে থাকলাম । গোটা দৃশ্টি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো । একবার মনে হলো কি ভয়ংকর এই মাহুঘটা, কি ঘৃণ্য । কি জানি, এরকম কতো মাহুঘের ভিতরে যে মাহুঘ নেই কে তার হিসেবের ধার ধারতে যায় ।

—গুরু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মনে মনে গাল পাড়ছো, কিন্তু বিশ্বাস করো গুরু, সেই থেকে আমি নিজেও ছটফট করছি না । ভিতরে যে কি রকমের অশান্তি তার আর কি বোঝাবো । যাহোক একটা ভালো কাজ করে ওটার শোধ দিয়ে দেবো একদিন ।

আমি বললাম,—এইসব অস্তায়ের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, বুঝলে !

এরপর সাড়ে তিন বোতল হবার অনেক আগেই সে ছটফট শুরু করে দিলো । বার বার একই কথা—না হে গুরু, আজ আর বেশীদূর এগুবো না, গতরটাও যেন মানা করছে, কতো হলো আমার ?

আমি বললাম,—সবে দেড় !

—বাকিটা তুমিই মেয়ে দাও !

আমি বললাম—এতো ঝাবড়াছো কেন ?

—কি যে বলো ! ঝাবড়ালুম কোথায় । রোজ কি আর একরকম যায় ।

কানা সাড়ে তিন পাট কিছুতেই আর গ্রাস ছুলো না । ভাবটা এইরকম যে আমি যেন তাকে ইচ্ছে করেই সাড়ে তিনের ওপর নিয়ে যাবো এবং সে ভয়ংকর রকমের একটা বিপদে পড়বে । কোনো পীড়ানীড়িই শুনলো না সে । বললে—না গুরু, আজ আমাকে জোর কোরো না, আমার গতরে যেন ঘূর্ণ ধরেছে, যদি বলে সারারাত তোমার সঙ্গে থাকতে হবে তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু ওইটে হচ্ছে না—হ্যাঁ !

তারপর রাত্রি অনেক দূর গড়ালো । একটা অস্বস্তি সারাক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিলো আমাকে । কানা সাড়ে তিন পাটকে আমি কিছুতেই সহ করতে পারছিলুম না, মনে হচ্ছিলো লোকটার মুখে থুঁ ছুটিয়ে দিয়ে উর্ধ্ব্বাসে ছুটে পালানো । কিন্তু থুঁ না দিয়ে এমনি পালানোরও কোনো সাহস আমার ছিলো না । কেবলই ভয় হচ্ছিলো যে কোনো অজুহাতে আমি উঠলেই কানা সাড়ে তিন পাটের সন্দেহ-প্রবণ চরিত্র একটা জাস্তব কোপ নিয়ে ছায়ার মতো আমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করবে । মাঝে মাঝে সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলো যার অর্থ আমার কাছে দুজের । ভয়ে ভয়ে স্বাপ্নুর মতো ভাসতে থাকলুম, যেন আমি এই ক্ষীণকায় নিস্তরু মাহুঘটির কেনা দাস, সে হুকুম না করলে আমার উঠবার কোনো উপায় নেই । সে যদি আমাকে তার পা-ও চাটতে বলে প্রাণভয়ে আমি তাতেও অমত করবো না । একটু সহজ হবার জগ্গেই আমি বললাম—আজকের রাত্রিটা কিন্তু চমৎকার লাগছে । একটা গান ধরো দিকি ।

কানা সাড়ে তিন পাট খুশীতে গলে গিয়ে বললে—গুরুর যেমন কথা । আমি গান শোনাবো কোথা থেকে ।

এর মধ্যে ছায়ার মতো দুটো মাহুঘ তার পাশে এসে বসলো । তারপর একজন কানের পাশে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে কি কোথায় সব বললো । আমার কানে গেলো শুধু এইটুকু যে সন্ধ্যা থেকে তাকে গল্পখোঁজা করা হচ্ছে ।

কানা সাড়ে তিন পাট খুশীতে ভেঙ্গে পড়ে লাফ মারার মতো ঠিকরে উঠে বললে—বলিস কি, এই ব্যাপার ?

—তবে আর বলছি কি ।

—আমি কিন্তু একা যাবো না, আমি যদি যাই সঙ্গে আমার গুরুও যাবে । গুরুকে ছেড়ে আমি একা যেতে পারবো না ।

—নিয়ে চলো না, বাদ সাধছে কে । বরং ভালোই হলো, আরো একটা লোক বাড়লো ।

লোক দুটি চলে যাবার উপক্রম করতেই কানা সাড়ে তিন পাঁচ তাদের আট-কালো । বললে,—সবুর করো, একসঙ্গে যাই মিলেমিশে ।

তারপর গড়গড় করে পয়সা-কড়ি যাবতীয় মিটিয়ে দিয়ে আমার একটা হাত ধরে টেনে তুলে বললে—চলো হে গুরু, আজ তোমায় ছুরিভোজ দেবো, একেবারে এক লম্বব জিনিস ।

বললাম—একটু খোলাসা করে বলো না, ব্যাপার কি ?

—রাস্তাঘাটে গুসব আলাপ না করাই ভালো । চলোই না, গিয়ে চক্ষু একেবারে ছানাবড়া হয়ে যাবে, হ্যাঁ ।

পথে আর কোনো কথা হলো না । খুব তাড়াহুড়া করে সে বেবি ট্যান্ড্রি নিলো । আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাতে উঠে সিগ্রেটে ঘন ঘন টান মারতে মারতে বাইরের আবছা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো মুখ বুঁজে । আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার মাথা হুলছে, হাত-পাগুলো আলগা হয়ে গিয়েছে, যে কোন সময় বমি করে ঢাকা শহর এবং মহান রাজ্জিটাকে ভাসিয়ে দিতে পারি ।

আমরা যখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম তখন রাজ্জি বারোটা থেকে একটা হবে । কানা সাড়ে তিন পাঁচ আমার হাত ধরে নামতে সাহায্য করলো । বললে,—খানিকটা হাঁটতে হবে সামনে, পারবে তো ?

বললাম—খুব পারবো । আর তেমন কিছু হলে তুমি তো আছোই ।

—তা আর বলতে । গুরুর জন্তে জানও হাজির আছে, আমি থাকতে একটা আঁচড়ও লাগতে দেবো না তোমার গায়ে ।

কতোগুলো এলোমেলো গলিঘোঁজ চুঁড়ে সে আমাকে যেখানে নিয়ে তুললো সে দিকটায় মাহুযজনের বসতি খুবই কম । এমন একটা রহস্যময় অন্ধকার সেখানে হিংস্র প্রাণীর মতো ঠুঁৎ পেতে আছে যা শহরের আর কোথাও নেই ।

একটা বাড়ীর ভিতর ঢুকে, উঠোন পার হয়ে সে কড়া নাড়লো । জানালা খুলে কে একজন দেখলো, তারপর দরোজা খুলে দিয়ে বললে—সঙ্গে কে ?

—আমার নিজের লোক ।

—চলে এসো ।

ভিতরে বড় রকমের দুটো তক্তাপোষ ও ঢালাই বিছানা । ইতোমধ্যে প্রচুর বোতল ভাঙা হয়েছে বোঝা গেল । সব মিলে এগারো জন মাহুয যাদের সবাই

একটা বিশেষ শ্রেণীর। কারো চোয়ালের পুরু শক্ত হাড় বিশ্রীভাবে ঠেলে উঠেছে কারো মুখে তারের বৃক্ষের মতো দাড়ির জঙ্গল, ডূরে শামুকের মতো কারো চোখ কারো পুরু ঠোঁট ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। এক নজরেই খুব একরোখা এব মারমুখী ধরনের মানুষ বলে সনাক্ত করা যায় তাদের।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ খ্যাক খ্যাক করে হেসে একজনকে জিজ্ঞাসা করে,—  
শালার ব্যাটা শালা বোধহয় ঘরে ছিলো না সে সময় ?

—ঘরে থাকলে কি আর রক্ষে ছিলো।

একজন বলতে থাকল—এইবার শালার খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছি।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ বললে—কজনের হলো ?

একজন বললে—এখন ছ নম্বর চলছে।

কানা সাড়ে তিন পাঁচ বললে—আমার গুরুকে কিন্তু সিরিয়ালে ফেললে চলবে না, এর পনের বারেই গুকে চান্দ দিয়ে দাও।

এবং কিছুক্ষণ বাদে পাশের ঘরের দরোজা খুলে হাসতে হাসতে গুদের একজন ফিরে আসতেই কানা সাড়ে তিন পাঁচ আমাকে গুঁতো দিয়ে উঠিয়ে বললে—যাও গুরু যাও, সিধা ঢুকে গিয়ে খিল দাও। সিগন্ডাল দিয়েছে।

আমি ভিতরে ঢুকে প্রথমে দরোজাটা ঠেলে দিলাম, তারপর চেষ্টা করলাম খিল দিতে, কিন্তু অক্ষকারে হাতড়ে হাতড়ে কিছুই খুঁজে পেলাম না। শেষে পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালতেই সবকিছু নজরে পড়লো। খিল আটকে দরোজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে বাতি জ্বলে দিলাম, এক কোণে মাদুরের ওপর তালগোল পাকানো শাড়ী কাপড় চোপড় ইত্যাদির পাশে সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে। শুয় আছে না পড়ে আছে বুঝবার উপায় নেই। সাহস সঞ্চয় করতে একটু সময় লাগলো। প্রথমে কাছে গিয়ে দাঁড়লাম, তারপর উঁবু হয়ে বসলাম, তারপর চেষ্টা করলাম চুমু খেতে। আমার পা টলছিল। আমার মাথা ঘুরছিলো; ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো আমি তার পা থেকে মাথা অবধি বারবার চাটলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে মাথার ধাক্কায় ঠেলতে ঠেলতে তার নগ্ন দেহটাকে মাদুর থেকে মেঝের নিয়ে গেলাম। কতোগুলো অসংলগ্ন প্রলাপের স্রোতে ভাসমান আমার শরীরটা এক সময় অতল রক্তাক্ত আর্দ্রনাদে তলিয়ে গেল।

ঠিক কখন বেরিয়ে এসেছিলাম হিসেব করে বলতে পারবো না। আমার মাথার ঠিক ছিলো না। বেরিয়ে এসেছিলাম প্রচণ্ড শব্দে দরোজা খুলে। কানা সাড়ে তিন পাঁচ হেসে বললে—গুরু আমার মতো খার্ড গিয়ার পছন্দ করে দেখছি !

আমি বললাম—আমি চলে যেতে চাই, তুমি একটু এগিয়ে দাও।

—সেকি কথা। একা তো যেতেও পারবে না, যে রকম টলমল করছে!

বললাম—খুব পারবো। তুমি শুধু একটু এগিয়ে দাও। আর কিছু চাই না।

রাস্তায় নেমে বললে—কেমন জিনিস বলে দিখি এখন?

বললাম—ভালো। সকাল পর্যন্ত টিকলে হয়।

—না টেকে না টিকবে, আমাদের কি। বাজ পড়লে পড়বে শালা ওই জানোয়ার আলির মাথায়।

তারপর এক সময় আমি একা হয়ে গেলাম। কানা সাড়ে তিন পাট ফিরে যাবার জন্তে খুবই উদগ্রীব দেখে তাকে ছেড়ে দিলাম। মনে হলো তার মন থেকে দুটো মাল্লু খুন করবার গ্লানি এক অভূত রশ্ময়ে সবটুকু উবে গিয়েছে। কিন্তু আমি? কানা সাড়ে তিন পাট সন্ধ্যায় মনে যে গ্লানি নিয়ে হুঁহাতে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলো এই মধ্যরাতে সেই একই গ্লানিতে আক্রান্ত হয়ে আমি কাকে জড়িয়ে ধরবো। সারাপথ হেঁটে, বারবার পুলিশের কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়ে প্রায় শেষরাতে ধরে পৌঁছলাম। আমি আগের মতোই আবার সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সবকিছু শুনতে পাচ্ছি, অথচ আমার সবকিছু হারিয়ে গিয়েছিলো। ধরের বাধ্য দেওয়ালগুলো আমার গায়ে যেন কিসের একটা গন্ধ পেয়ে ধমকে আছে।

‘আমার নাম হেনা।’

‘হাসনা হেনা।’

‘আমার বিয়ে হয়নি। আমার বিয়ে হয়নি।’

‘আমাকে মেরো না এমন করে।’

‘আমাকে চুরি করে এনেছে।’

‘আমার দেশ বিক্রমপুর।’

‘আমি কোনো অস্ত্র্য করিনি।’

‘আমার ওপর অস্ত্র্যাচার করেছে অনেকগুলো মাল্লু।’

‘আমি উঠতে পারি না।’

‘রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে।’

‘আমাকে তুমি মেরে ফেলো।’

‘আমার ভাই আছে।’

‘আমার ভাই পড়ে।’

‘তুমি আমার ভাই ।’

‘তুমি আমাকে মেরে ফেলো ।’

‘তোমরা হাসনা হেনাকে মেরে ফেলো ।’

‘তোমরা হাসনা হেনাকে জ্যান্ত কবর দাও ।’

‘রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে ।’

‘তুমি আমার ভাই ।’

‘রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে ।’

‘তুমি আমার ভাই ।’

‘রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে ।’

‘রক্তে আমার পা ভেসে যাচ্ছে ।’

‘রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত ।’

আমি বিছানার ওপর বসে পাশের টেবিলে মাথা রাখলাম । বধির হয়ে জন্মাইনি কেন । কেন স্মৃতিভ্রষ্ট হয়না আমার শ্রবণ । আমি কাউকে চিনিনা, কাউকে চিনতেও চাই না । আমি জানি আমার কোনো বোন নেই, না কোনো হেনা, না কোনো হয়েনা । আমি চাইনা কারো রক্তাক্ত পায়ে শোকের নদী হয়ে বয়ে যেতে । আমি জানি আমার শরীরেও ছ’জনের অভ্যাচারের রক্ত লেগে গিয়েছে, কিন্তু রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত বলে হেনার মতো ছ’বার তা উচ্চারণ করতে চাই না । মনে হলো আর একটু পরেই স্মরণীয় হবে, আমি মাথা তুললাম টেবিল থেকে, নিজ হাতে জানালা খুলে দিলাম, ভোরের অপেক্ষমান অদ্ভুত বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকলো । আমি জানালার ঠাণ্ডা লোহার শিকে কপাল ছুঁইয়ে বললাম,—‘হে প্রভাত, তুমি আমার জনক হও, যেহেতু আমি জারজ, গোত্র পরিচয়হীন, আমি চাই তোমার পরিচয়ে সন্তান হতে । হে প্রভাত, হে আমার পিতা, আমাকে আলোড়িত হতে দাও, আমি জানিনা কি করে উন্মথিত হতে হয়, ভাষা দাও ভাষা দাও ভাষা দাও !’

‘মাগো ।’

‘আজরাঈল তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছ ?’

‘মাগো ।’

‘আমাকে শেষ করে দাও, আমাকে শেষ করে দাও তোমরা ।’

‘মাগো ।’

‘তোমাদের হেনা যে মরে গেল মাগো ।’

‘মাগো ।’



‘এরা মানুষ নয় এরা শকুন এরা শকুন এরা শকুন ।’

‘মাগো ।’

‘আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি ।’

‘মাগো ।’

‘মা—আমার মা—মা, মা, মা, এসে দেখে যাও রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত ।’

আমি আমার টেবিলের পাশে আবার এলাম । মনে হলো আজ বছরের প্রথম দিন, স্বচ্ছন্দে অনেক কিছুই বাদ দিতে পারি, ইচ্ছে করলে স্বর্ষ্যোদয়ের পর থেকে হিসেব করতে পারি নিজের । আমি ভুলতে চাই হেনার কথা । মুছে ফেলতে চাই মন থেকে । আসলে হাসনা হেনা এমনই একটা ফুল যার সৌরভে শুধু ভ্রমরই আসে না, আসে কালশাপও । মনসা, মাগো ।

তারপর স্বর্ষ্যোদয় হলো ১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারীতে । বাসিমুখে একটা বগলা ধরাবার পর সন্তর্পণে খুব নরমভাবে আমার মনে হলো—এক একদিন আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে । সব ছেড়ে, সব ফেলে, সব মুছে দিয়ে এক একদিন আমার ইচ্ছা করে চলে যেতে অনন্তকালের জন্তে । এক একদিন আমার কানে বুষ্টির তাণ্ডব, জলের উচ্চল কলরোল, চোখের নিস্তন্ধ ক্লোরোফর্ম, সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো নিভৃত শ্রেয় কি দুঃসহ যে হয়ে ওঠে । আর একদিন হৃদয় চিরে হৃদয়কে আবিষ্কার করার পাশাপাশি আয়োজন সারি সারি কষ্টের ফলক ছড়ানো কবর-খানা মনে হয় । মনে হয় যা কিছু দেখেছি—খোলা চোখে কিম্বা স্বপ্নে, যা কিছু অনুভব করেছি—রক্তের বিনিময়ে অথবা স্বভাবের তাড়নায়, তার সব কিছুর অন্তরালেই আছে আমাকে প্ররোচিত করা, চলে যেতে । একদিন আমার ভিতরে আলো জ্বলে দেয় ভয়াবহ অন্ধকার । একদিন আমার গুপরের চামড়া হিংস্র স্বর্ষ্যালোকে পুড়ে কালো হয়ে যায় । এক একদিন আমি ময়ূর সিংহাসনে সমাসীন কাপুরুষ অথচ লম্পট সম্রাটের মতো ভয়াবহ দিবাস্বপ্নে শিউরে উঠি, যেন মরকত খচিত বিশাল প্রাসাদ অত্যন্ত বিস্ফোরণে বিপুল নীলিমায় নিক্শিপ্ত । এক একদিন শিউরে উঠি পেশম মেলা ময়ূর দেখে, মনে হয় তার পায়ে পাক খেয়ে জড়িয়ে আছে বিবধর সোনালী সাপ । এক একদিন মনে হয় চলে যাই, মনে হয় বঙ্গোপসাগরীয় বাতাসে, বিশাল বিস্তৃত আকাশের কোথাও, কিম্বা স্তম্ভীর্ণ সবুজ ধানক্ষেতে মৃত্যু তার নাম লিখে গিয়েছে চূর্ণমাড়ে । মনে হয় গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত আকাশের গা থেকে ভয়াবহ আলো খসে পড়ছে, মনে হয় পৃথিবীর সব আগ্নেয়গিরিই সচল আর তাদের গানে নাক হবে পাক খেয়ে খেয়ে হু হু করে মানুষের দিকে তেড়ে এসেছে বাতাস,

জলাস্তীর্ণ ধানক্ষেতের গোশনে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত কোন শিল্পীর ভাসমান লাশ ভয়ংকর স্ফীত। এক একবার মনে হয় চলে যাই যখন অতিরিক্ত মুখশুলোও শাণিত বস্ত্র কুপাণ হয়ে ওঠে, যখন সত্যের নাভি থেকে জ্বলনে অভ্যস্ত মায়াবী বসন জলপ্রপাতের মতো ভূমিতে আছড়ে পড়ে। ইচ্ছে করে চলে যেতে যখন আমার কষ্টের অ্যাসিডে মৃত থরপড়া চোখে ধর্ষিতা হেলেন বিশ্বস্ত ট্রয়ের স্মৃতি রোমন্থন করে আর সমুদ্রের নীলরক্ত ক্রুর উল্লাসে শুক নীলিমার দিকে ফিরিয়ে দেয় বজ্রনির্নাদ, চলে যেতে ইচ্ছা করে, চলে যেতে ইচ্ছা করে। আর সেদিন চলে যেতে ইচ্ছা করে যখন সারা দেশকে মনে হয় ক্ষত জর্জর মৃত আমার পাগলিনী মায়ের মতো নিরুত্তর পড়ে আছে, যেদিন আমি আক্রান্ত হই শকুনের—রক্তের এবং চীৎকারের ভয়ে, যেদিন ভিতরের সব নদী অকস্মাৎ শুক পাষাণে পরিণত, সেদিন ইচ্ছে করে আমি আমার সব নাম নিজের হাতে মুছে দিয়ে চিরকালের জন্তে আমার কঠিন পিতা সরল পিতামহ নির্বোধ প্রপিতামহ ও হ্যাজপিঠ পলায়নপটু একটি জাতির মতো—তার সভ্যতার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই।





ইদানীং আমি খুব স্মৃতিবিলাসী হয়ে উঠেছি ; নানান রকম স্মৃতি-সম্বন্ধির কল্পনা কবতে ভালো লাগে ; এভাবে আমার সময় বেশ কেটে যায় । এখন রাত্রি, ঘড়িতে আটটা বাইশ, আমি নিজের ঘরে, বিছানায় শুয়ে আছি । আজকাল মাঝে মাঝে আমি অফিস থেকে ফিরেই বিছানায় শুয়ে পড়ি, ক্রমে এটা আমার মজ্জাগত অভ্যেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে ; কেন না অফিস থেকে ফিরে বেশীক্ষণ মেকুদণ্ড সোজা করে বসে থাকতে পারি না, শরীরে ক্লান্তি আসে, আমি বিছানায় লুটিয়ে পড়ে চোখ বুঁজে অনেক দেখা-অদেখা মুখ প্রত্যক্ষ করি, এসময় এলোমেলো স্মৃতি কল্পনা আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ।

এখন আমার মনে পড়ছে জিনাত আরাকে । জিনাতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল প্রায় বছর তিনেক আগে আজিমপুরায় এক বন্ধুর বাড়ীতে । কী যেন কাজে ও ঢাকায় ছিলো । সেই পনেরো দিনের পরিচয়ে আমাদের মব্বে বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিলো । জিনাত তখন কুমিল্লায় থাকতো । ওখানে ফিরে যাওয়ার পর সে হঠাৎ আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলো । কোনো মেয়ের কাছ থেকে চিঠি পাওয়া জীবনে প্রথম । আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিলো, জিনাতকে একটা দীর্ঘ চিঠি দিই । কয়েক দিন আচ্ছন্ন মত কাটিয়েছিলাম । কিন্তু জিনাতকে আজও কোনো চিঠি লেখা হয়নি । আমার মনে হয়েছিলো, ও হয়তো উত্তর না পেয়ে একটা রিমাইণ্ডার দেবে । রোজ পোর্টম্যানের অপেক্ষায় থাকতাম । কিন্তু আজো জিনাতের বা অন্ত কোনো মেয়ের চিঠি আমার কাছ আসেনি । এখন আমার মনে জিনাতের সেই প্রথম ও শেষ চিঠির অনেক শব্দ জেগে উঠছে । আমার ভালো লাগছে ওর নখর শব্দগুলি, বা পৌনে তিন বছর আগে লেখা হয়েছিলো, নিয়ে খেলা

করতে। আমার ভালো লাগছে ওর স্নিক শ্রামল মুখ স্মরণ করতে। আমি অহুমান করছি, ওর বিয়ে হয়ে গেছে, যুবতী এখন সহজ স্নখ ও শান্তির খোঁজ পেয়ে গেছে। জিনাত, আজো তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। তুমি কি এ ব্যাপারে মনে আঘাত পেয়েছিলে? কিন্তু আমি কেমন করে জানাই, এই পোনে তিন বছরে মনে মনে কতোবার তোমাকে চিঠি লেখা হয়েছে! আমি কেমন করে জানাই এই মুহূর্তে দীর্ঘ স্মরণ-বিস্মরণের পর আবার তুমি স্মৃতিময় জেগে উঠেছো! তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে? তুমি কি এখন স্বামীর সংসারে? কোন্ শহবে আছো তুমি? এখন আমাকে দেখলে চিনতে পারবে?

অফিস থেকে ফিরে ছুটুকরো বাটার টোস্ট খেয়েছি, এখনো চা খাওয়া হয়নি; এতক্ষণ চা না খাওয়ার জন্তে এখন কপালে মূহু যন্ত্রণা বোধ করছি। নীচে গিয়ে চা খেতে হবে, কিন্তু শরীরে বড়ই আলশ, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। কয়েকদিন আগে রাহাতের কাছ থেকে খান-চারেক বই এনেছি, মুসা ভাইয়ের অনেক পত্র-পত্রিকা টেবিলে দীর্ঘদিন ধরে জমে আছে, এখনো একটিও পড়া হয়নি। বই-পত্রগুলো যথাযথ ফেরত দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু সে ব্যাপারেই এত আলশ! কেন দিন দিন এত অলস হয়ে উঠেছি! এই মুহূর্তে এইসব প্রশ্ন আমাকে বিপন্ন করে তুলছে। এখন টেবিলের দিকে চেয়ে থাকার মাঝেই আমার তৎপরতা খোঁজা হচ্ছে, আমি কী এখন 'কল্পনার আমি' পড়তে পারি!

এখন আর কবিতা ভালো লাগবে না। কিন্তু রবিবারের সকালে মাণ্ডুর রহমান চৌধুরী আসবেন, ওর প্রথম কবিতার বই 'কল্পনার আমি' সম্পর্কে ঐদিন নিজস্ব মতামত জানানো উচিত। আজ শুক্রবার, মাঝে একটা দিন। কী করা যায়! বইটা পড়বো? কিন্তু আমার যে কিছুই পড়তে ভালো লাগছে না। আজকাল গল্প উপন্যাস সব সাজানো কাহিনী মনে হয়, কবিতাও যেন অর্থহীন প্রলাপ! এককালে এইসব গল্প উপন্যাস কবিতা আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অন্তর্গত ছিলো। ক্রমে যেনো সব কিছু থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে সব ব্যাপারেই এক রহস্যময় নিষ্ক্রিয়তা আমাকে গ্রাস করেছে! এই স্ববিরতা অসহ্য হয়ে উঠছে। কতোদিন আমি খোলা গলায় গান গাইনি! কতোদিন আমি খোলা গলায় গাইনি! কতোদিন আমি বর্ষার নদীতে সাঁতার কাটিনি। সব কিছুই যেন গতভয়ের। অথচ সবই একদিন রক্তের অন্তর্গত ছিলো। কেন আমার পুন্নো স্বভাব আর ফিরে আসে না! কেন ওই গান গাওয়া নদীতে সাঁতার কাটা বৃকের আড়াল করে; হায়, নিশেষে হারায়!

ভাবতে ভাবতে বিরক্ত নিজের উপর, অ্যাসট্রেতে আধ খাওয়া সিগারেট গুঁজে দিলাম। এসময় নিজের ওপরই ভীষণ রাগ হচ্ছিলো; ইচ্ছে করছিলো, নির্মম আঘাতে নিজেকে অর্জরিত করি; ইচ্ছে করছিলো, তেতলার ছাদ থেকে রাস্তায় ঝাঁপ দেই; ইচ্ছে করছিলো, গোটা গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বলে দেই...।

কিন্তু কিছুই না করে পাশ ফিরে শুয়ে ক্লাস্ত চোখ বুঁজলাম।

আমি একটা আধা সরকারী অফিসে চাকরি করি। সামান্য মাইনে তবু রোজ দশটায় অফিসে যাওয়া আর পাঁচটায় ফিরে আসা—আর ভালো লাগে না ছাই। আমি এক নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিকতায় ক্রমেই জড়িত হয়ে যাচ্ছি। আমি বেদিকে তাকাই শুধু অচেনা মানুষ; সকলেই যেন ঠিকঠাক বেঁচে বর্তে আছে শুধু আমিই যেন নিজের শব্দেহ কাঁধে নিয়ে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো হাঁটছি; কেন আমাকে এভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে! আমি কী নিজের জীবন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি?

আমাকে যেন আরো দূরে কোথায় যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? কোথায়? তুই কোথায় যাবিরে ভাই? কোথাও তুই স্বীয় স্থনির্দিষ্ট কেন্দ্রাভিলাষে যথাযথ পৌঁছে যেতে পারিস না, তুই মহাকাল নিয়ন্ত্রিত, তুই অসহায় সমর্পিত আপন ভবিষ্যে —যেখানে গূঢ়তম অঙ্ককার গহনে আপনাপন ভবিষ্যত রচিত হয়, তুই সেই অসীম শক্তির অধীনে—যে চিরদিন প্রতিটি মানুষ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে, এবং অদৃশ্য শক্তি তোকে এক রহস্যময় অজানায় নিয়ে যাচ্ছে, এবং একদিন তুই অস্তিমে পৌঁছে যাবি। সেই মহাশূন্যে অনন্ত অঙ্ককার, অঙ্ককারে তোকে আর আলাদা করে চেনা যাবে না, সেখান থেকে আর তোর ফিরে আসা হবে না, অনন্ত অঙ্ককারে তুই অগুতম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি...

তবে তো দু'দিনের জন্তে এই পৃথিবীতে আসা। অনন্ত মহাকালের বৃকে কতো সামান্য সময় আমরা এই পৃথিবীতে আছি! একদিন চলে যেতে হবে; চলে যেতে হবে বলে কেন সব কিছু নিরর্থক হয়ে যায়! কেন সহজ আনন্দে জেগে উঠতে পারি না! কেন সব কিছু নিরর্থক, কেন সব কিছু উদ্দেশ্যহীন—কেন সব কিছু আমাকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে! কোন কিছুই আমি সঠিক ভেবে উঠতে পারি না, শুধু মনে হয়, একদিন চলে যেতে হবে...

আজ আমার মনে পড়ে, তিতাসের জলে সেই প্রথম অক্ষুট যৌনচেতনা বালক বয়সে—তিতাসের জলে সঁতার কাটছি—সেই আমার প্রথম—সেই প্রথম—আমি বোধহীন অসীম রহস্যে—আমি তিতাসের জলে সন্তরণ কালে সহসা জীবনের চরমতম পুলকে—ভারপর থেকেই আমার সর্বনাশ—ক্রমাগত যৌন প্রহার আমাকে

তিলে তিলে অস্বথী করতে থাকে—আমি জানি, তুই-ই আমার সর্বনাশের মূল, তুই ক্রমশ আত্মার কাছে থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিস, আমি তোর কাছ থেকে—শরীরের অধিকার থেকে উর্ধ্ব চলে যেতে চাই ; কিন্তু ক্রমাগত যৌনগ্রহণ—এবং এখন আমি নদীর জলে—সস্তরগকালে প্রথম অশ্রুট যৌনচেতনা—তখন আর বালক বয়সে—অসহ পুলকে আমি তখন সমগ্র শরীরে—বিবশ হতচেতন—আজ আমার মনে পড়ে, নদীর জলে সস্তরগ কালে—আজ সকালে আমি কিঞ্চিৎ মূড়ে ছিলাম, মোরাভিয়ার একটা গল্প গতরাত্রে শুরু করেছিলাম, সকালে, ঘড়িতে সাড়ে সাত আট হবে, শেষ করেছি ; একটি কিশোর, সমুদ্রের ধারে বিধবা মার কাছে থাকে সেই বালক, তার প্রথম যৌনচেতনা, মায়ের সঙ্গে অল্প এক পুরুষের রহস্যময় আচরণ, একটি যুবক ও ধীবর বালকদের সঙ্গে ওই কিশোরের আলাপ ও মেলামেশা, জীবনের এক গূঢ় রহস্য ক্রমে স্বচ্ছ হচ্ছে, ব্রথেল—মা, আমি তো আর সেই ছোট্ট শিশুটি নেই, আমি যে বড় হয়েছি ; তুমি কেন তা মানতে চাও না। তুমি কেন আজো—আজ আমার মনে পড়ে, তিতাসের জলে—তখন আমার বালকবয়সে—তীব্রতম পুলক—মনে পড়ছে—সস্তরগকালে—মনে পড়ছে—হায়, তারপর থেকেই আমার সর্বনাশ, তারপর থেকেই আমি তিলে তিলে অস্বথী, তারপর থেকেই আমি তিলে তিলে গহন নিঃসঙ্গতায়—অথচ আমি জীবনকে উপভোগ করতে চাই।

আসলে অনেক কিছুই এখনো আমার করণীয় আছে, অনেক কিছুই বাকী থেকে গেছে, কোনো অসম্পূর্ণতা আমার আর সহ হবে না, এবার আমাকে প্রতিটি কাজ নিপুণ ভাবে সমাধা করতে হবে, আমার হৃদয়ে কুয়াশা ও তুমার ও মৃত্যু ও অন্ধকার জমে আছে, রৌদ্রে সব বিছুই সম্পূর্ণ ঝরে যায়, মুছে যায়, প্রচুর সূর্য চাই—সূর্য চাই...

একদিন কুমিল্লায় যাবো। সেখানে জিনাতের খোঁজ করতে হবে। ও এখন কেমন আছে, বিয়ে হয়েছে কিনা, না কী কুমারী জীবনে এখনো লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে, কতোদূর পড়াশোনা হলো, বি. এ. পাশ করেছে কিনা—সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিতে হবে। দেখা হলে ওকে বলতে হবে, একদিন রাত্তার ভিড়ের মধ্যে তোমার মতন একটি আশ্চর্য সুন্দর মেয়েকে দেখে চমকে উঠেছিলাম, আমি ডাক দিতে উত্তত, সহসা দেখলাম, অল্প মেয়ে ; তখন তোমাকে খুব বেশী করে মনে পড়ে গিয়েছিলো, তখন আমি শুধু তোমার কথা ভাবছিলাম।

কিন্তু কোনোদিন জিনাতকে এসব কথা বলা হবে কি! আমি তো কত

জায়গায় যাওয়ার কথা ভাবি, শেষ পর্যন্ত প্রায় কোথাও যাওয়া হয় না। হয়তো কুমিল্লায়ও যাওয়া হবে না, হয়তো আর কোনোদিন জিনাতের সঙ্গে দেখা হবে না। যা কিছু এতোকল্প ভাবলাম—সবই অলস ভাবনার জন্ম, একদিন সব স্মৃতিহীনতায় চলে যাবে, এই সব শব্দ কোনোদিন স্নিগ্ধ উচ্চারিত হবে না, শুধু জনতায়, মাথুয়ের ভিড়ে মাঝে মাঝে ভিন্ন নারীর মুখে জিনাতের ইম্প্রেশন দেখে চমকে উঠবো, আমি ডাক দিতে উদ্বৃত্ত হবো, কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখবো, অস্ত্র মুখ উদাসীন স্তূরতায় ভেসে যাচ্ছে। অথচ পরমুহূর্তে আমি সেই নারীর শরীর দেখে উত্তেজিত হবো, শুধু শরীর—শুধু যুবতী শরীর তখন আমাকে সমগ্র অধিকার করবে, নিমেষের মধ্যে জিনাত ও যাবতীয় স্নিগ্ধ অম্লভব বিশ্বত হয়ে আমি তখন শরীরময় সেই যুবতী শরীরে; অসহায় মনে হবে, ওই যুবতীর কাছে স্বপ্ন ও শাস্তির খোঁজ পাওয়া যাবে, আমি স্বপ্নী হবো; কিন্তু হায়, স্থির জানি, দেহের প্রতি উপযুপরি আঘাত ও অগ্নিদহনে রক্তাক্ত প্রতিদিন ঝরে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো ভবিতব্য নেই, শরীরের হাত থেকে আমার আর কোনো উদ্ধার নেই, অথচ উদ্ধার চাই, শাস্তি চাই, অথচ প্রতিদিন সমগ্র শরীরে নিঃশেষে ঝরে যাই, কোনো উদ্ধার নাই...এ প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগের স্মৃতি মনে আসছে,—বিকেল বেলা আমি রাস্তায়, এলোমেলো এমন হচ্ছে, চারপাশে অনেক লোকের যাওয়া আসা, আমি সকলের মুখভাব লক্ষ্য করছিলাম। এ সময় লক্ষ্য করলাম, একটি যুবতী, তন্বী শরীর, আমি ওকে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি, প্যাসোনেটলি হেঁটে যাচ্ছে। ওর ওই গমনভঙ্গি ভীষণ উত্তেজক, আমি মোহাবিষ্ট, তীব্র আকর্ষণ অম্লভব করছিলাম। অতঃপর আমি অসহায় অম্লসরণে, কোনোমতেই বিপরীতে চলে যেতে পারছিলাম না। বিকালে আমি সাধারণত ছুটির দিনে, বাসার আশপাশেই ঘোরাফেরা করি, প্রয়োজন না থাকলে দূরে যাই না। কিন্তু সেদিন মেয়েটিকে অম্লসরণ করে অনেক দূরে চলে এসেছি, এতো দূরে—বাড়ি-ঘরগুলো, এই রাস্তা—সব আমাকে ভিন্ন অম্লভবে—এক অপরিচয়ের মুখোমুখি টেনে আনছিলো। তখন বিকেলের শেষ আলোটুকুও নিভে আসছে, আমি মেয়েটিকে অম্লসরণ করে একটা নির্জন গলিপথে এলাম। তারপর সেই গলি পার হয়ে আরেক গলিতে, তারপর আবার ভিন্ন গলিতে বাক; তখন সেখানে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে, অথচ রাস্তায় আলো জ্বলছে না, শুধু নক্ষত্রের রহস্যময় যুহু আলোয় আমার চুঁচোখ ওই অস্পষ্ট নারীদেহে সমর্পিত অম্লসরণ করছিলো। গলিতে কোনো আলো জ্বলছে না! কেন আশপাশের 'বাড়িগুলো এত অন্ধকার! আমি অবাক ভাবছিলাম। আমার ইচ্ছে করছিলো, মেয়েটিকে ডেকে বলি, তোমাকে

এখন আমার ভীষণ প্রয়োজন ; আমি সহজ আনন্দে যেতে চাই, তুমি আমাকে স্বথ ও শাস্তির পথ নির্দেশ করে দাও । কিন্তু কিছু না বলে আমি, অন্ধকারে ওর শরীর ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চলার গতি ক্ষুণ্ণ করলাম । তখন আমার একমাত্র বাসনা, যুবতীর খুব কাছে যেতে হবে ; যেন কাছে গেলে ওর আত্মার সৌরভ পাওয়া যাবে, যেন কাছে গেলে ওর শরীরের অনেক খবর পাওয়া যাবে ; অসহায় আমি ক্ষুণ্ণ হাঁটছিলাম । ক্রমে ব্যবধান কমে এলো, তখন আমি এতো কাছে—হাত বাড়ালে ওর শরীর স্পর্শ করা যায় । আমার ইচ্ছে করছিলো, প্রচণ্ড আলোয় ওর সম্পূর্ণ অবয়ব দেখি । কিন্তু গলিপথে অন্ধকার, নক্ষত্রের মুহু আলো ছাড়া আর কোনো স্পষ্টতা নেই । এ সময় খুব অসহায় বোধ করছিলাম । মনে হচ্ছিলো, ওই রহস্যময় অন্ধকার পার হয়ে যুবতীর মুখ কোনোদিন স্পষ্ট দেখা যাবে না । দারুণ ক্ষোভ হচ্ছিলো । কী করা যায় ! কী করা যায় ! যুবতী এখনি হয়তো আরো গহন অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে ; হায়, কী করা যায় ! এ সময় আমি প্রায় আত্ম-বিশ্বৃত, সহসা টের পেলাম, বাসা থেকে বেরোনোর সময় হাতে একটা টর্চ নিয়ে এসেছি । বস্তুত সত্যিই তখন আমার হাতে টর্চ, বোতাম টিপতেই নিমেষ মধ্যে প্রবল আলো, সেই আলোয় যুবতী মুখ ফেরাতেই দেখলাম, বীভৎস এক মুখ— যেন পৃথিবীর ষাটতীয় রোগ ওই মুখে বাসা বেঁধেছে, অমন ভয়ঙ্কর মুখ আমি আগে আর কখনো দেখিনি ; হাত থেকে টর্চ পড়ে গেছে, আমি নিদারুণ আতঙ্কে ছ’হাতে মুখ ঢেকেছিলাম ।

এ ঘরে আমি একা । এলোমেলো স্মৃতিতড়িত ; সেই ভয়ঙ্কর মুখ এখন আবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি । তবু সেই অন্ধকার গলি পথের স্মৃতি থেকে সরে আসার মানসে উঠে দাঁড়লাম । টেবিলের কাছে আসতেই নজরে পড়লো, ষড়্ভিত্তে দশটা সাতাশ । অনেক রাত হয়ে গেছে । এখন আমাকে স্টোভ জালিয়ে র্নাতের খাবার তৈরী করে নিতে হবে । একথা মনে পড়তেই আমি ভীষণ বিরক্ত বোধ করলাম । ঘরের বাইরে এসে টের পেলাম, বায়ু চড়ে গেছে, আজ আর আমার চোখে একটুকুও ঘুম আসবে না । সারারাত জেগে কাটাতে হবে, সারারাত আমি সেই ভয়ঙ্কর নারীমুখ, জিনাত—বালক বয়সে তিতাসে সন্ধ্যর, যৌনপ্রহার, মোরাভিয়ার সেই বালক, সহস্র সুদূরতম মুখ ইত্যাদি সম্মিপিত ক্রমেই অপ্রকৃতি উন্মাদ হয়ে উঠতে থাকবো । কেন না কিছুক্ষণ আগে আমি আবিষ্কার করেছি, গতকাল আমার স্লিপিং ট্যাবলেট ফুরিয়ে গেছে ।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □





শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। বিমলা চোখ বুজলেন। তাঁর যেন স্পষ্ট মনে হল, পেটের মধ্যে কী একটা নড়ে উঠল। চোখ বুজে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, পেটের মধ্যে নড়ে গুঁঠাটা অসুভব করতে চাইলেন। সামনের উনোনে তরকারি চাপানো, চড়বড় করে শব্দ হচ্ছে। জল নেই, এখুনি কড়ায় লেগে পুড়ে যাবে। বিমলা তথাপি নডতে পারলেন না। সমস্ত অসুভূতি দিয়ে নিজের গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগলো, ‘বাদল! বাদল রয়েছে!’ ...পরমুহূর্তেই তাঁর শরীরটা আর একবার কেঁপে উঠল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো। চোখ খুলে উনোন থেকে কড়াটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যাকুল অস্থিরতা। বাইরের দিকে কান পেতে কিছু যেন শুনতে চাইলেন। তারপরে দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তরকারিটা ওভাবে ফেলে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। উনোনের কাছে নামানো কড়াটার দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু বিমলা স্থির থাকতে পারলেন না। নষ্ট হয় হোক। কাঁচা থাকুক, ছাই হয়ে যাক। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এলেন।

আকাশে ঘন মেঘ। পূবে বাতাস বইছে। উঠোনের এক ধারে টগর গাছটা বাতাসের ঝাপটায় হুয়ে পড়ছে। এক বছরের শিউলি গাছটাও মাটিতে হুয়ে পড়তে চাইছে। বাড়িটা নিম্নম। কাঠের ক্রেম, টিনের দেয়াল, মাথায় টিনের চাল। মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই। তথাপি বিমলা যেন পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলেন। পাশের বাড়িতে কণার মা যেন কাকে কী বলছে। বিমলা ফণিমনসার বেড়া ডিকিয়ে সেদিকে একবার দেখলেন। কণাদের বাড়িটা দেখা যায়। লোকজন দেখা যায় না। তিনি চোখ ফিরিয়ে আবার ঘরের দরজা খোলা বাড়িটার দিকে

তাকালেন। কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাতাসে তাঁর মাথার চুল কপালে পড়ছে। দূর থেকে দেখলে কাঁচা চুল বলে মনে হয়। কিন্তু পাক ধরেছে। চওড়া সিঁথেয় বাসি সিঁহুরের দাগ। হাতে শাঁখা নোয়া আর বিবর্ণ কয়েক গাছা সোনার চুড়ি। শেমিজের ওপরে খয়েরি পাড়ের সাদা শাড়ি। ময়লা হয়েছে, হলুদের দাগ লেগেছে। প্রোট বয়সেও শরীর বেশ শক্ত। মুখের রেখাতেই বয়সটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয়, অল্প বয়সে স্ত্রী আর সবল ছিলেন। এখন তাঁর চওড়া শরীর যেন শক্ত আর কঠিন।

বিমলা কয়েক মুহূর্ত উঠানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে সামনের দিকে না গিয়ে রান্নাঘরের পিছনে গেলেন। ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে বাড়ির পিছন দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরগুলোর পিছন দিকের সব জানালাই বন্ধ। ঘর যেখানে শেষ, কোণে একটা জবা ফুলের গাছ। বিমলা দাঁড়ালেন। সামনে রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কলোনির রাস্তা, পাকা না, ঘেস ছাইয়ের রাস্তা। বিমলা উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উত্তর দিকে রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই দিকে তাকালেন। যেখানে মোড়ের এক পাশে কয়েকটা ইঁট এক জায়গায় এখনো জড়ো হয়ে পড়ে আছে সেইখানটা দেখলেন। ওখানে শহীদ বেদী হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে ভাঙতে গোটা কয়েক ইঁটে এসে ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কারা বেদীটা ভাঙলো, ইঁটগুলো কোথায় গেল, কেউ জানে না। বিমলা দেখছেন, প্রথম প্রথম পাড়ার একটা কুকুর বেদীটার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকত। এখন থাকে না। গোটা কয়েক ইঁট ছাড়া এখন আর কিছু নেই।

বিমলা আপন মনে মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়লো। না, বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানেই দাহ করা হয়েছিল। মাস তিনেক আগে, বেদীটা যখন তৈরী হল তখন ওরা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। বাদলের মা বিমলা, শহীদের মা। তাই ওরা ডাকতে এসেছিল, বাদলের বন্ধুরা, পার্টির ছেলেরা। শুধু বিমলাকেই ওরা ডাকতে এসেছিল। এ বাড়ির আর কাউকে না। বাদলের বাবাকে না, বাদলের ছুই দাদাকেও না। বাদলের বাবা হরপ্রসাদ অল্প পার্টির লোক। ছুই দাদা কৃপাল আর দয়াল, দুজনেই ছুটে আলাদা আলাদা পার্টির মেথার। চারজন চার পার্টির লোক। বাদলের দলের ছেলেরা কেবল বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল। শহীদের মাকে।

বিমলা গিয়েছিলেন। ওইখানে, ওই একটু দূরে, পশ্চিমের মোড়ে, রাস্তার ধারে এখন যেখানে কয়েকটা ইঁট জড়ো হয়ে পড়ে আছে। শহীদ বেদীর শেষ চিহ্ন। কেন

গিয়েছিলেন বিমলা জানেন না। বাদলের পার্টির ছেলেরা এসে বলেছিল, ‘মাসীমা আপনি একবার চলুন।’ বিমলা গিয়েছিলেন ঘেন ঘোর লাগা আচ্ছন্নের মত। তার দুদিন আগে, আঠাবো বছরের বাদলকে ওইখানেই কারা পিটিয়ে মেরেছিল। বিমলার চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট। ক্ষতবিক্ষত বাদল। মুখে মাথায় শরীরের নানান জায়গায় রক্ত জমাট নিখর বাদলকে এ বাড়ির উঠানে ওরা নিয়ে এসেছিল। বাদল সব থেকে ছোট ছিলে। বিমলার শেষ সন্তান না। তারপরেও দুটি হয়েছিল, বাঁচেনি। বাদলের পরে আর কেউ ছিল না।

নিহত বাদলকে দেখে বিমলা চিংকাব করে কঁদে উঠেছিলেন। উঠানে পড়ে বাদলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপন মনেই কঁদে উঠে বলেছিলেন, ‘কে তোকে এমন করে মারল। ওরে বাদল।’ ..উঠান জুড়ে মাহুষের মেলা। কিছুক্ষণ পরে চালিতে করে ফুল ছড়িয়ে মালা জড়িয়ে ওরা বাদলকে নিয়ে গিয়েছিল। হবিবোল ধ্বনি দেয় নি। স্নোগান দিয়েছিল। ‘কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন।’ ..কিন্তু বিমলা আব ভাল কবে কঁদতে পারেন নি। ডাক ছেড়ে কারা যাকে বলে, তেমন কবে কঁদতে পারেন নি। সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, হঠাৎ চোখে জল এসে পড়েছে। জল মুছেছেন।

দু দিন পরে ওই বৌটা তৈরী হয়েছিল। বাদল যেদিন খুন হয়, সেদিন কলোনির স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল। অল্প কোন দলের সভা, বাদলদের না। সেখান থেকেই কী একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল। সঠিক কথা কেউ কিছুই বলতে পারে নি। সন্ধ্যার ঘোরে বাদলকে নাকি কারা তাড়া করেছিল। বাদল বাড়ির দিকে দৌড়েছিল। কিন্তু মোড় পেরিয়ে আসতে পারে নি। কেউ বলে, বাদল একলা ফিরছিল। ওর খুনীর আগে থেকেই মোড়ে অপেক্ষা করছিল। আরো অনেক রকম কথা। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা, বিমলা বুঝতে পারেন না। বাদলের চিংকারে লোকজন ছুটে গিয়েছিল। যখন গিয়েছিল, তখন সব শেষ। রক্তাক্ত নিহত বাদল ছাড়া, সন্ধ্যার ঘোরে সেখানে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় নি। পুলিশ এসেছিল। বাদলের পার্টির লোকেরা নাকি কার কার নাম বলেছিল। তাদের কাউকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। হত্যাকারী বলে ঘাঘের নাম করা হয়েছিল, তাদের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তারা এখন সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে খুরে বেড়াচ্ছে। কেস চলছে। কেস চলছে অথচ ঘেন ব্যাপারটা কিছুই না।

বাদল খুন হবার দুদিন পরে শহীদ বেদী তৈরি হয়েছিল। এই দু দিনের মধ্যেও

ছোটখাটো সজ্জ্বৰ হয়েছিল। একটা দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়েছিল। কেন, তা বিমলা জানেন না। বিমলা কেন শহীদ বেদীর কাছে গিয়েছিলেন তাও জানেন না। গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিলেন। পনের যোলটা ইট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুনসুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদীর গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পাটির ছেলেরা সেই একই স্লোগান দিয়েছিল, ‘কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন’ ইত্যাদি। কে একটি ছেলে যেন বাদলের নাম করে কী সব বক্তৃতা করেছিল। সব কথা বিমলার কানে যায় নি। তিনি আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়েছিলেন। আবাব আচ্ছন্নের মতই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসেছিলেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। হরপ্রসাদ, রূপাল, দয়াল থাকে, রান্না না করলে চলবে কেন। যেমন আচ্ছন্নের মত গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই এসে রান্নার কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলেন নি। রূপাল দয়ালের সঙ্গে না, হরপ্রসাদের সঙ্গেও না। হরপ্রসাদ নিজে এসে রান্নাঘরের দবজায় দাঁড়িয়েছিলেন। যেন খানিকটা আপন মনেই বলেছিলেন, ‘কত দিন বলেছি, ওই দলটার সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো।’

বিমলা কোনো জবাব দেন নি। হরপ্রসাদ তবু দাঁড়িয়েছিলেন। একটু থেমে, একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন, ‘এখনকার এ সব পাটি, খুনখারাপি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু যার গেল তার গেল, কেউ দেখতে আসবে না। বাদলকে তো আর ফিরে পাব না।’

হরপ্রসাদ চুপ করেছিলেন। বিমলা কোনো জবাব দেন নি। উনোনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। হরপ্রসাদ যেন একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ‘ঘাই হোক, মনকে শক্ত কর। এ ছাড়া আর কী করবার আছে। আমার দেহি হয়ে গেছে, অফিসে চলে যাচ্ছি। খাবার একদম ইচ্ছে নেই।’

হরপ্রসাদ চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোন কথা হয় নি। তবে এই তিন মাসে মাঝেমাঝেই ওই কথাটা বলেছেন, ‘মনকে শক্ত কর। বাদলকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না।’

বিমলা সে কথার কোন জবাব দেন নি। সংসারের কথা বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে, কী দরকার, কী আনতে নিতে হবে, এই সব কথা। কিন্তু বাদলের বিষয়ে কোনো কথা বলেন নি। রূপাল দয়াল কোনো কথাই বিমলাকে বলে নি। রূপাল চাকরি করে। দয়াল বেকার। ওরা ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক। বাড়িতে ওরা নিজেদের মধ্যে কম কথা বলে। গামছা তেল সাবান চান করার কথা বলে, সিনেমা

থিয়েটারের কথাও বলে। দলের কথা একেবারে না। খিদে পেলে বিমলার কাছে শুখু খেতে চায়। দোকান বাজার করে দেয়। কী আনতে হবে না হবে, জিজ্ঞেস কবে। বাদলের বিষয়ে কোনো কথা হয় না। যেন ওদের ভাই মরে নি। অল্প পার্টীর একটা ছেলে মরেছে। হয়তো নিজেদের পার্টীর লোকের সঙ্গে কথা হয়। বাড়িতে কোনো কথা নেই।

বিমলা জবা গাছের গা ঘেঁষে ভাড়া বেদীর দিকে দেখেছেন। বাদল ওখানে নেই। বাদলকে ঋণানে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু বাদল আজ বিমলাব সাবা শরীবে জেগে রয়েছে। আজ উনিশে শ্রাবণ। আজ সেট দিন। এখন এগারোটা বাজে। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এট সময়ে বাদল পৃথিবীর মুখ দেখবার জন্ত বিমলার পেটে অশান্ত হয়ে উঠেছিল।

বাড়িতে তখন কেউ নেই। বিমলা একলা। পূর্ণ গর্ভ, যে কোনো সময়েই বাদল ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এ সময়েই ব্যথা উঠেছিল। ডাক্তার কবিরাজের দরকার ছিল না। বিমলা নিঃশব্দ। তিনি সবই বুঝতে পারছিলেন। অভিজ্ঞতা তার শরীরের প্রতিটি অস্থিতির মধ্যে। ব্যথা উঠতেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেটা নিফল ব্যথা না। সময় আসন্ন। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এই সময়ে, উপরঝাঙ্কি বৃষ্টি পড়ছিল। একেবারে একলা থাকা উচিত না। বিমলা কোনো রকমে পাশের বাড়িতে কণার মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ব্যথায় রুদ্ধ চুপি চুপি স্বরে বলেছিলেন, 'দিদি, আর সময় নেই।'

কণার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সব কাজ ফেলে বিমলার সঙ্গে চলে এসেছিল। কণা তখন ছ' সাত বছরের মেয়ে। তাকে পাঠিয়েছিল মেঘুব মা বিধবা বুড়িকে ডাকতে। আজকালকার মত ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিমলাদের প্রসব হত না। মেঘুর মা-ই খালাস করাত। মেঘুর মা বুড়ি এসেছিল। বিমলাকে দেখেছিল। বলেছিল, 'হ্যাঁ, আসল ব্যথা। আর বেশি দেরি নেই।'

কণার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর খালি করে দিয়েছিল। সেই ঘরেই বাদল হয়েছিল। তখন এ বাড়ির চেহারা অন্তরকম ছিল। টিনের দেওয়াল ছিল না। পাকা মেঝে ছিল না। হেঁচা বেড়ার দেওয়াল। মাথায় তখনো টিনের চাল, কাঁচা মাটির মেঝে। বিমলা রান্নাঘরে মাহুরের ওপর শুয়ে বসে ব্যথার তীব্রতা সহ্য করছিলেন। কণার মা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তারও যেন ব্যথা উঠেছিল। বিমলা

নিশ্বাস বন্ধ করে ব্যথা খাচ্ছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির থাকবার চেষ্টা করছিলেন। তার মধ্যেও ভেবেছিলেন, কী আসছে। ছেলে না মেয়ে। হরপ্রসাদের সাধ ছিল, মেয়ে হয় যেন। হরপ্রসাদের সাধ, বিমলারও সাধ। দুই ছেলের পরে একটি মেয়ে। কিন্তু তাঁর শেষ গোঙানির সঙ্গে যে ভূমিষ্ট হয়েছিল, সে ছেলে। মেঘুর মায়ের হাত বিমলার পেটে চেপেছিল। তখনো ফুল পড়ে নি; আর একটি ব্যথার অপেক্ষা। তার মধ্যেই, বিমলা লহমায় দেখে নিয়েছিলেন। রক্তে আর লালায় মাখানো একটি ছেলে। তখনো গলায় কান্না ফোটে নি। ছোটখাটো এক আঁধাটা গোঙানি মাত্র। ফুল পড়ার পরে, প্রথম গম্ভীর স্বরে কেঁদে উঠেছিল, 'ঔয়া, ঔয়া।'

মেঘুর মা নাড়ি কাটতে কাটতে বলেছিল, 'কত বড়। যেন পেট থেকেই এক বছরের ছেলে বেরুলো। দেখে মনে হচ্ছে, মাতৃমুখী।'

মাতৃমুখী। বিমলা আবার তাকিয়ে দেখেছিলেন। বুঝতে পারেন নি। মেঘুর মায়ের কোলের দিকে তাকিয়েছিলেন আর হঠাৎ-ই নিজের কোলটা বড় ফাঁকা মনে হয়েছিল। মেয়ে না হোক, নাড়ী ছেঁড়া ধন। কোলে নিতে ইচ্ছা করেছিল। সে কথা বলতে পারেন নি। মনে মনে বলেছিলেন, 'মাতৃমুখী ছেলে সুখী হয়।'

বাইরে তখনো মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কণার মা বিমলাকে সাবাস্ত্র হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। দুধ গরম করে খেতে দিয়েছিল। মেঘুর না নতুন শিশুকে গরম জল দিয়ে ধুয়ে মুছিয়ে, কাঁথায় মুড়ে বিমলার কোলে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বুঝেছি রে বাপু। জলের তোড়ে এলি, বাপের যেন এরকম তোড়ে টাকা আসে। কী বাহুল্যে ছেলে বাবা, জগত ডোবানো বিষ্টি মাথায় করে এল।'

জগত সংসার ভাসানো বৃষ্টিই বটে। উঠোনটা জলে থৈ থৈ করছিল। তখন রান্নাঘরের অবস্থাই বা কী। এখন তো অনেক পাকা পোস্ত ব্যবস্থা। তখন মাথার ওপরে ক্যানেশারার গৌঁজামিলের চাল। ঘরের এখানে সেখানে টপ টপ করে জল পড়ে। বিমলা একটা কোণ বেছে নিয়ে, ছেলেকে বুকের কাছে ঢেকে শুয়েছিলেন। কণার মা চলে গিয়েছিল। তার তো সংসারের কাজ। মেঘুর মা ছিল। তার ওটাই কাজ। নবজাতককে বুকের কাছে নিয়েও, রুপাল দয়ালের কথা বিমলার মনে পড়েছিল। ওরা তখন স্কুলে গিয়েছিল। বিমলার হুশিষ্ণা, বা দুঃস্বপ্ন তাঁর ছেলেরা। বৃষ্টি মাথায় করে, স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কী না কে জানে। বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছে হলে মার্টারমশাইরা কি আর ধরে রাখতে পারবে। হরপ্রসাদের কথাও মনে পড়েছিল। অফিসে বাবার ইচ্ছা ছিল না। বিমলাই জোর করে

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ বাড়িতে থেকে কী করবে। খানিকটা ছটফট করা ছাড়া করার কিছুই নেই। তার চেয়ে অফিসের কাজে থাকলে ভাল থাকবে। এদিককার ব্যবস্থা যা করবার বিমলাই করে রেখেছিল। কণার মাকে খবর দেওয়া। মেঘুর মাকে ডেকে নিয়ে আসা। এমন কিছু হাতী ঘোড়া ব্যাপার তো নয়। গোয়াতি মেয়েমানুষ ছেলে বিয়োগে, তার জন্ম পাড়া দূরের কথা, বাড়ি মাথায় কবারও কিছু নেই। ভালভাবেই সব হয়ে গিয়েছিল। কাক পক্ষীতেও টের পায় নি। ঝঝঝ ঝুঞ্জির শব্দে আশেপাশের কেউ নতুন ছেলের কান্নাও শুনতে পায়নি।

বিমলা নবজাতককে স্তন চেনাবার চেষ্টায় মুগের কাছে ছুঁইয়ে দিচ্ছিলেন। প্রথমটা একটু ধরিয়ে দিতে হয়। শিশুর মুগেব দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, এটি আবার কেমন হবে, কে জানে। সকলের বেলাতেই এই কথাটি মনে হয়েছে। রূপাল দয়ালের বেলাতেও। সব মায়ের কি এমনি মনে হয়। কে জানে। রূপাল দয়ালের পরে আরও দুটি হয়েছিল। তারা বেঁচে নেই। এটি কী করবে, কে জানে। ভাবতে ভাবতে, বৃকের কাছে আরও চেপে ধরেছিলেন। মুগের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। মেঘুব মা বলেছে, মাতৃমুখ। বলেছে, খুব দুষ্ট হবে এই ছেলে। মাতৃমুখী ছেলে কেবল স্ত্রী হয় না, দুষ্টও হয়। কী দুষ্টমি করবে? বিমলাকে জ্বালাতন করবে?

বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন। কোন্ ছেলেটা না জ্বালিয়েছে। রূপাল দয়াল যে রকম দুঃস্থ, এও সেই রকম হবে। একই গাছের ফল তো। তা হোক, ছেলে-পিলে তো দুঃস্থ হবেই। তার জন্ম বকুনি খাবে, মার খাবে, আবার ভুলেও যাবে। রূপাল দয়াল যে-রকম করে। ওদের দৌরাস্ত্র্যে এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন না মেরে উপায় থাকে না। এও দুষ্টমি করলে মার খাবে।

নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'এখন তো মারছি না, কাঁদছিস কেন। বড হ, তখন দেখব।'

বলতে বলতে বৃকের কাছে তুলে, স্তন গুঁজে দিয়েছিলেন। সত্যোজাত শিশু তা নিতে পারেনি। তখন ছুঁতে পলতে ভিজিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। চুষে চুষে খেয়েছিল। বিমলা কোনো কথাই ভোলেন নি। এই তো যেন সেদিনের কথা। প্রত্যেকটা কথাই স্পষ্ট মনে আছে। রূপাল দয়ালের কথাও মনে আছে। ওরা জন্মেছিল পদ্মার ওপারে, নিজেদের ভিটেয়। বাদল এই বাড়িতে জন্মেছিল।

বৃষ্টি একটু ধরতেই, কাক ভেজা হয়ে, রূপাল আর দয়াল বাড়ি এসেছিল। ঝাঁতুড় মানতে চায় নি, আগেই ভাইকে দেখতে এসেছিল। দয়াল তো বায়না

ধরেছিল, সে ভাইকে কোলে নেবে। মেঘুর মা ধমক দিয়েছিল। বিমলা সশ্বেহে অনেক বুঝিয়ে স্বাভিমে ঔকে নিরস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কাল চান করবার আগে ভাইকে কোলে নিস।'

সন্ধ্যাবেলা হরপ্রসাদ বাড়িতে এসে আগেই আঁতুড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গলা খাঁকারি দিয়েছিল। দরজাটা বন্ধ ছিল, বিমলা বুঝতে পেরে মেঘুর মাকে বলেছিলেন, 'রূপার বাবা এসেছে, দরজাটা খুলে দাও।' মেঘুর মা দরজা খুলে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ বিমলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কেমন আছ?'

বিমলা সে কথার কোনো জবাব দেননি। হারিকেনের আলোর সামনে ছেলেকে তুলে ধরেছিলেন। হরপ্রসাদ গম্ভীরভাবে শব্দ করেছিল, 'হুম্!' তারপরে হঠাৎ হেসে বলেছিল, 'রূপবান ছেলে হয়েছে মনে হচ্ছে। এ ব্যাটা বাপের মত হয়নি।'

বিমলা ওসব কথা ভোলেন না। সব কথা মনে থাকে, আছেও। হরপ্রসাদ কেন ও কথা বলেছিল, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একবার হরপ্রসাদের মুগের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাপের খুশি মুখ দেখলে বোঝা যায়। হরপ্রসাদ খুশিই হয়েছিল। বিমলা একটু গর্ভ বোধ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, 'এই মুখ দেখে হরপ্রসাদ এখন আর মেয়ের কথা মনে রাখেনি।'

মেঘুর মা বলেছিল, 'রূপবান তো হবেই, মাতৃমুখ যে।'

তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। হরপ্রসাদ রান্নাঘরের দরজায় ছাতা মাথায় দিয়েই দাঁড়িয়েছিল। নামটা তখনই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'ব্যাটা জ্বর বাতুলে, একেবারে বাদলা।'

ইতিমধ্যে বীণা এসে পড়েছিল। কলোনীরই বিধবা মেয়ে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বিমলার প্রসব হলে সে রান্না-বান্না করবে। বীণা বড় ঘরের বারান্দায় রান্না চাপিয়েছিল। হরপ্রসাদ রূপাল আর দয়ালকে নিয়ে গল্পে মেতে-ছিল। সেদিন আর ওদের পড়তে বসতে বলা হয় নি। বিমলা সবই শুনতে পাচ্ছিলেন। এদিকে মেঘুর মা নানানখানা বকবক করছিল। বিমলা বুকে সস্তান নিয়ে, কেমন একটা নিবিড় স্বস্তি বোধ করছিলেন।

আজ সেইদিন। আঠারো বছর আগের সেই দিন, এখন বেলা এগারোটা। চূপ করে বসে, চোখ বুজলে, বিমলা চমকে চমকে উঠছেন। পেটের মধ্যে যেন কিছু নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল! -ঘরের কোণে, জবা গাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হ্যাঁ,



আবার, আবার মনে হচ্ছে, পেটের মধ্যে জ্ঞান নড়ছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করলেন। এ আবার কী, এরকম মনে হচ্ছে কেন। সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা তাঁর অনেককাল গত হয়েছে। আজ কে এমন করে তাঁর গর্ভের মধ্যে নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। বাদল কি তাঁর শরীরের মধ্যে মিশে আছে। তিনি মনে মনে ডাকলেন, ‘বাদল বাদল!’

‘মা! ও মা!’

রূপালের গলা। রূপাল ডাকছে। বিমলা সাড়া দিলেন না, নড়লেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন, তেমন দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরটাই শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। ছেলেদের ডাকে কোনোদিন সাড়া দিতে ভোলেন না। আজ বিমলার মুখে সাড়া নেই। আজ তিনি সাড়া দেবেন না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, আশ্বে আশ্বে তাঁর মনে পড়ল, রূপাল দয়াল ভাইকে নিয়ে ছেলেবেলায় কেমন খেলা করতো। রূপাল দয়াল পিঠোপিঠি ছিল। বাদলের বয়স কম ছিল। মাঝখানে ছ’জন মারা গিয়েছিল। দয়ালের প্রায় সাত বছরের ছোট বাদল। বাদলকে ওরা কোলে করে বেড়িয়েছে। মায়ের কাজের সময় দেখাশোনা করেছে। ছোট ভাইটিকে দু’জনেই ভালবাসতো। কাড়াকাড়ি করে খেলতো। ছোট ভাইকে কিছু না দিয়ে ছ’জনে মুখে তুলতো না। পিঠোপিঠি হলে তা হত না। রূপাল দয়ালের তো রোজ ঝগড়া মারামারি লেগে ছিল। ওরা দু’জনে ছিল সমানে! ওদের মারামারি থামাতে বিমলাকে লাঠি তুলতে হত। হরপ্রসাদও শাসন করতো। কিন্তু বাদলকে নিয়ে দু’জনেরই কাড়াকাড়ি। সব কথাই মনে আছে বিমলার। বাদল যখন কথা বলতে শিখেছিল, তখন রূপাল দয়াল জিজ্ঞেস করত, বাদল কাকে বেশি ভালবাসে। কার কাছে থাকতে চায়। বাদল দু’জনের কাছেই থাকতে চাইতো। লোভী শিশু, সে বুঝতে পারতো, কাউকেই সে হারাতে চায় না। দুই দাদারই মন জুগিয়ে কথা বলত। বিমলা আড়ালে মুখ টিপে হাসতেন, মনে মনে বলতেন, ‘এক ফোঁটা ছেলের চালাকি দেখ।’

হরপ্রসাদও ছোট ছেলেটিকে ভালবাসতো। রূপাল দয়াল যত না আদর কাড়তে পেরেছে, কোলে চাপতে পেরেছে, বাদল সব কিছুই বেশি পেয়েছে।

কিন্তু সে সবই ছেলেবেলার কথা। তখন সংসারের চেহারা ছিল অল্প রকম। হরপ্রসাদ চাকরি করতো, আর প্রকাশেই রাজনীতি করতো। অবসর সময়ে, নিজের দল নিয়ে মেতে থাকতো। বিমলার তাতে কোনোদিন কিছু যায় আসেনি। পুরুষ মানুষ, কত কী নিয়ে থাকে। মেয়েদের সে সব ভাবতে গেলে চলে না।

বিমলা বরং মনে মনে খুশিই ছিলেন। হরপ্রসাদ দশজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সভা সমিতি করছে। তবু নেশা ভাঙ করে বাজে আড্ডায় তো সময় নষ্ট করে না। টাকাও নষ্ট করে না। সবাই হরপ্রসাদকে বলে ডেকে নিয়ে যায়। পাড়ার একজন গণ্যমান্য লোক। বাইরে বাইরের মত, সংসারে সংসারের মত, স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে গবীব মধ্যবিত্তের জমজমাট পরিবার।

আস্তে আস্তে রূপাল দয়াল বড় হয়ে উঠতে লাগলো। ওদের পিছনে পিছনে বাদলও। যত বড় হয়ে উঠতে লাগলো, সবাই যেন কেমন বদলে যেতে লাগলো। বাদল দাদাদের সঙ্গে আর পাচ্ছিল না। ওরা তখন বাইরের জগত নিয়ে ব্যস্ত। ওদের কোথায় কী দল, বন্ধু, সে সব নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে ওদের দেখা পাওয়া ভার। বাদলও ওর জগত খুঁজে নিয়েছিল। ওরও বন্ধু ছিল, খেলাধুলা ছিল। বিমলা এসব দেখেছেন, বিশেষ করে কখনো কিছু ভাবেন নি। বরং মনে হয়েছে, এ রকমই হয়। সকলেরই হয়। বড় হচ্ছে তো সব। সকলেই যে যার আলাদা পথে ফিরছে।

কেবল হরপ্রসাদ বিরক্ত হচ্ছিল। কখনো রাগ, কখনো ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশেষ করে রূপাল আর দয়ালের ওপরে। বিমলা হরপ্রসাদের কাছেই শুনতেন, রূপাল দয়াল কলেজে ঢুকে নাকি রাজনীতি করছে। ছাত্ররা সবাই করে। রূপাল দয়ালের কী দোষ বিমলা ভেবে পেতেন না। একটা কথা বুঝতে পারতেন, হরপ্রসাদ যে রাজনীতি করে, রূপাল দয়াল তা করে না। বিমলা বলতেন, ‘কলেজে ওরা কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?’

হরপ্রসাদ রেগে জবাব দিতেন, ‘ওসব রাজনীতির নামে গুণ্ডামী। আমার পরিসায় কলেজে পড়ে ওসব চলবে না। তোমার ছেলেদের এ কথা জানিয়ে দিও।’

হরপ্রসাদের কথা ধরেন বিমলা মনে মনে রুগ্ন হতেন। আবার ভাবতেন, বাবা যে রকম বলে, ছেলেদের সেরকম চলাই উচিত। তাহলে আর সংসারে কোনো গোলমাল থাকে না। রূপাল দয়ালকে তিনি বলেছেন, ‘কলেজে যাসু পড়তে, সেখানে আবার ওসব কী। তোদের বাবা পছন্দ করে না।’

ওদের এক জবাব, ‘ওসব তুমি বুঝবে না মা।’

একমাত্র বাদলকে নিয়ে তখন কোনো হুশিষ্ণা ছিল না। হরপ্রসাদেরও কোনো অভিযোগ ছিল না। মায়ের সঙ্গেই বাদলের ভাব বেশী। সংসারের কাজে কর্মে বাদলকেই পেতেন। বকে ধমকেই করতে হত, তবু করত। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের চেহারাটা বদলে যাচ্ছিল।

রূপালের সঙ্গেই প্রথম হরপ্রসাদের লাগলো। বাইরের বিবাদ ঘরে এসে ঢুকেছিলো। কেবল তর্কাতর্কিতেই সব শেষ হত না। হরপ্রসাদ ক্ষেপে উঠত। ক্ষেপে উঠে যা তা বলতো। রূপাল মাথা নোয়াতো না। সে হরপ্রসাদের দিকে জলন্ত চোখে চেয়ে থাকতো। বিমলা এসে রূপালকে সরিয়ে দিতেন, 'সরে যা এখন থেকে। বাপের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জা করে না।'

বিমলা হরপ্রসাদের ওপর খুশি হতেন না। রূপাল তো ওর ছেলে, বাইরের শত্রু না। কিন্তু কথা শুনলে সেরকমই মনে হত। কেবল রূপালের সঙ্গে না, দয়ালের সঙ্গেও হরপ্রসাদের একই ব্যাপার ঘটতো। বিমলা মনে করতেন, রূপাল দয়াল একই দল করে।

বিমলার সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয়নি, যখন দেখেছিলেন, দুজনের মধ্যে তর্ক ঝগড়া। নিতান্ত বাড়ির মধ্যে আব বিমলা সামনে থাকতেন বলে ওরা মারামারিটা করতে পারতো না। এত দলাদলি কিসের, বিমলা বুঝতে পারতেন না। সবাই মিলে একটা দল করলেই তো সব মিটে যায়। কিন্তু বাড়িতে তখন তিনটে দল। হরপ্রসাদ, রূপাল, দয়াল। আর এক দলে বিমলা আর বাদল। তবে বাদল একেবারে নিরপেক্ষ ছিল না। ছোড়দা দয়ালের দিকে ওর টান বেশি। বলতো, 'ছোড়দা ঠিক বলে।'

বিমলা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন?'

বাদল বলতো, 'আমাদের স্কুলের সব ওপর ক্লাসের ছেলেরা ছোড়দাকে মানে। ছোড়দা গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে, সব ছেলেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।'

'তুই বুঝি ছোড়দার মত হবি!'

সে বিষয়ে বাদল কিছু বলত না। ওর জবাব ছিল, 'তা আমি কি করে জানব।'

বিমলা বলতেন, 'তুই ওসবের মধ্যে যাসনি। দেখছিস না বাড়িতে কী রকম অশান্তি।'

যত দিন যাচ্ছিল, অশান্তির চেহারাটা বদলে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ, রূপাল, দয়াল, কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলতো না। বিমলা রান্না-বান্না করেন, ওরা এসে খায়। রাত্রে শোয়। রূপাল দয়াল রোজ রাত্রে বাড়িতেও থাকতো না। পড়াশোনা হচ্ছিল না। রূপাল একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়েছিল। দয়ালেরও সেই অবস্থা। পড়া হবে না। কিন্তু কেবল পাঠি করলে চলবে না। ওরও একটা চাকরি চাই।

ইতিমধ্যে বাদল বড় হয়ে উঠছিল। ক্লাস টেনে পড়বার সময় ওর টাইফয়েড হয়েছিল। বিমলার ভেতরটা ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। নানা অশুভ চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। এতখানি বড় বয়সে কোনো সম্ভান তাঁকে হারাতে হয়নি। এমন ভারী রোগও কারোব হয়নি। তখন দেখা গিয়েছিল, কৃপাল ডাক্তার ডেকে এনেছিল। দয়াল বসে বসে বাদলের মাথায় ববক দিয়েছে। রক্ত বিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জ্ঞান নিয়ে গিয়েছে। হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে, বাদলেব বিছানাব সামনে বসে থেকেছে।

তখন তো বাদল কোন পাটি করে না। কবলে কী চেহারা হত, কে জানে।

বিমলার চোখের সামনে ভেসে উঠলো শ্মশানঘাত্রার ছবি। এ বাড়ির উঠোন থেকেই ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাদলকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহ ঘিরে ছিল বাদলের বন্ধুরাই, ওর পাটির লোকেরা। কৃপাল দয়াল সেখানে এসে দাঁড়ায়নি। বোধ হয় দাঁড়াতে পারেনি। হরপ্রসাদ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কেউ একটা কথা বলেনি। সেও বলেনি। বাদলকে ওর বন্ধুরাই কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নয়, ভাইয়েরা নয়, পাটির ছেলেদের কাঁধে বাদলেব মৃতদেহ শ্মশানে গিয়েছিল। হবপ্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। দাদারা বাড়িতে ছিল না।

টাইফয়েডের সময়, বাদল যদি পাটি করতো, তাহলে কী হত কে জানে। শ্মশানঘাত্রার মতই হয় তো, বাবা দাদারা দূরে সরে থাকতো। পাটির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পাটির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পাটি করা বলে, বিমলা বোঝেন না। বিমলা শুধু সংসারটা মাথায় করে রেখেছেন।

কিন্তু পাটিই তা হলে সব। বিমলার চোখে যেন আঙনের আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জ্ঞান তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহীদ বেদী থেকে। তিনি বাড়ীর দিকে ফিরে তাকান। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে গোটা বাড়িটাকে যেন একবার দেখে নেবার চেষ্টা করেন।

‘কোথায় গেলে, অ্যা? শুনছ।’

হরপ্রসাদের গলা। বিমলাকে ডাকছে। বিমলা সাড়া দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। তাঁর মনে পড়ল, আজ যেন কিসের ছুটি। কৃপাল হরপ্রসাদ কেউই কাজে যায়নি। কিন্তু বিমলা সাড়া দেবেন না। আজ আর এ সময়ে তিনি সাড়া দিতে পারছেন না। তাঁর

ভিতরে কী যেন ঘটছে। আঠারো বছর আগে, এই দিনে, এই সময়ে যা ঘটেছিল তাঁর সারা শরীরে যেন সেই ভাব। ওই বেদীতে না, শ্মশানে না, বাদল যেন তাঁর ভিতরে রয়েছে। বাদল পৃথিবীতে আসতে চাইছে।

বাদল যখন টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছিল, তখন ছেলেটা বড় রুগ্ন হয়ে গিয়েছিল। মনে হত ওকে শিশুর মত কোলে নেওয়া যায়। প্রায় একটা বছর পড়া নষ্ট হয়েছিল। তা হোক, তবু প্রাণে বেঁচেছিল, বিমলার সেটাই সাঙ্ঘনা। রুপাল দয়ালের অসুখ হলেও সেই রকমই হত। হরপ্রসাদের অল্পস্বল্প অসুখ করলেও বিমলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লোকটা যাই করে বেড়াক, শরীরের দিক থেকে খুব শক্ত না। তাছাড়া, হরপ্রসাদই তো একমাত্র কাণ্ডারী। স্বামীকে তিনি কখনো কোনো কারণে অযত্ন করেননি।

বাদল রুগ্নতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠেছিল। আগের মত স্বাস্থ্য না, তার চেয়েও যেন স্বন্দর হয়ে উঠেছিল। ও বরাবরই একটু কথা কম বলতো। বিমলার মত। বিমলা কথা কম বলেন। বেশি বলবার অবকাশ এ সংসার তাঁকে দেয়নি। সারাটা সংসার তাঁর মাথায়। স্বামী পুত্রদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনা। বাসন মাজা আর ঘর পরিষ্কার করা ছাড়া, সবই তাঁর নিজের হাতে।

বাদল কথা কম বলতো। বিমলা মনে করতেন, বাদল রুপাল দয়ালের পথ ধরবে না। বাড়িতে তিনটি পার্টির লোক। কারোর সঙ্গে কারোর সন্ধান নেই, কথাবার্তা বন্ধ। বাদল সব দেখেছে শুনেছে। দেখে শুনে ও আর ও পথে যাবে না।

বিমলা ভুল ভেবেছিলেন। কলেজে ঢোকবার আগেই বিমলার কানে এল, বাদল আর একটা পার্টিতে ঢুকেছে। বিমলা বলেছিলেন, 'তুইও ওসব পার্টি করতে যাচ্ছিস!'

বাদলের কথা কম। সে মায়ের কথার জবাব দেয়নি। কিন্তু হরপ্রসাদ ছাড়াই। রুপাল দয়ালের সঙ্গে যে রকম ঝগড়া করেছে, তেমন করেই বাদলকে বকেছে, ধমকেছে। বলেছে, 'তুই গিয়ে একটা খুনী পার্টির সঙ্গে জুটেছিস।'

বিমলা অবাক হয়ে শুনেছিল, বাদল ওর বাবাকে বলছে, 'আমাদের পার্টি খুনী পার্টি না।'

হরপ্রসাদ চিৎকার করে বলেছে, 'আলবৎ খুনী পার্টি। কতগুলো গুণ্ডা, বদমাইস, লোচা ছাড়া ও পার্টিতে কোন ছেলে নেই। তুই আমাকে শেখাতে আসিস না।'

বাদল বলেছিল, 'আমি কাউকেই কিছু শেখাতে যাচ্ছি না।'

বিমলার মনে হয়েছিল, বাদলকে তিনি চিনতে পারছেন না। ও শাস্ত আর গস্তীর ভাবে ওর বাবার কথার জবাব দিচ্ছিল। রূপাল দয়ালের মত গলা চড়িয়ে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলেনি। বিমলা অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, বাদল কবে থেকে ওরকম কথা বলতে শিখলো। ও যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে, কত কী বোঝে। অবাক হওয়ার সঙ্গে একটু একটু রাগও হয়েছিল। বাদল যদি ছেলেমানুষের মত চিংকার চেঁচামেচি করতো, তা হলেই যেন বিমলা খুশি হতেন। অথচ, আবার, বাদল ওরকম করে কথা বলেছিল বলে, একটা কেমন গর্ববোধও করেছিলেন।

কিন্তু হরপ্রসাদ দু রকম কথা জানতো না। ঠিক যেমনভাবে রূপাল দয়ালকে বলেছিল, তেমনি ভাবেই বাদলকে বলেছিল, 'ওসব কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে থাকতে হলে তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে।'

হরপ্রসাদের এ ধরনের কথা বিমলার কখনো ভাল লাগে না। মানুষটা কথায় কথায় বাড়িতে থাকার খোঁটা দেয় কেন। বাদল ওর বাবার সে কথার কোনো জবাব দেয়নি। সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ নিজের মনেই গজগজ করেছিল, 'যারা দেশ গড়তে জানে না, কেবল ধ্বংস করতে চায়, তাদের আমি আমার বাড়িতে চাই না। তারা যে যার নিজের রাস্তা দেখে নিক গিয়ে...' এমনি অনেক কথা বলেছিল। বিমলাও হরপ্রসাদের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন। লোকটা কেবল বকতে ধমকাতেই জানে। কখনো দেখা গেল না, মাথা ঠাণ্ডা করে ছেলেদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। যেমন রূপাল দয়ালের সঙ্গে করেছে, বাদলের সঙ্গেও সেই রকম করে কথা বলেছিল।

বিমলার বুকভরা অশান্তি আর উদ্বেগ। শেষ পর্যন্ত বাদলের ওপরেই তাঁর রাগ হয়েছিল। সংসারে এত কিছু থাকতে, পার্টি ছাড়া, আর কি কিছু করার নেই। বাদলটাও শেষ পর্যন্ত সেই একই পথে চলে গেল। তিনি বাদলকে বলেছিলেন, 'তুই লেখাপড়া করবি, খাবি দাবি, খেলা করবি। তুই কেন আবার পার্টি করতে গেলি?'

বাদল শাস্তভাবেই বলেছিল, 'আমি তো কারোর কোনো ক্ষতি করছি না।'

বিমলা রেগে বলেছিলেন, 'ওসব ক্ষতি টতি জানি না। একটা সংসারের মধ্যে তোরা সব এক একটা পার্টি নিয়ে থাকবি, নিজের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করবি, এসব আর আমি সহ করতে পারছি না। তুই ওসব পার্টি টাটি ছাড়।'

বাদল গভীরভাবে বলেছিল, ‘আমি বাড়িতে কারোর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারব না।’

বিমলা বলেছিলেন, ‘তা ছাড়বি কেন। তাহলে যে আমার একটু সুখ হয়। বুঝেছি রে, বুঝেছি, আমি না মরলে তোরা বাপ ভাইয়েরা কেউ পার্টি ছাড়বি না। এ আমি কোথায় আছি। এটা কি একটা সংসার। কতকগুলো পার্টি ছাড়া এ বাড়িতে কিছু নেই।’

বিমলার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। চোখে জল এসে পড়েছিল। আবার বলেছিলেন, ‘এবার আমাকেও একটা পার্টিতে গিয়ে ঢুকতে হবে।’

মায়ের কথা শুনে বাদল বোধহয় একটু বিচলিত হয়েছিল। বলেছিল, ‘তুমি এরকম করছ কেন। বলছি তো, আমি বাবা দাদাদের কারোর সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না।’

কিন্তু বাদলের সে-কথা ঢেঁকেনি। কখনো রুপাল, কখনো দয়াল, কখনো বা হরপ্রসাদের সঙ্গে, তর্কাতর্কি বিবাদ লেগেই ছিল। বাইরের অশান্তি বাড়িতে দানা বেঁধে উঠেছিল। বাইরের যত গোলমাল, বাড়িতে এসে তার বোঝাপড়া চলছিল। সকলেই আলাদা আলাদা করে বাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। বিমলা সেই সব কথা থেকেই বুঝতে পারতেন, বাদল রীতিমত পার্টির কাজ করছে। লেখাপড়া ওর মাথায় ছিল না।

প্রথম রুপালই একদিন বিমলাকে বলেছিল, ‘বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে। গুকে সাবধান করে দিও। কোনদিন একটা কী ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।’

বিমলা বলেছিলেন, ‘আমাকে বলতে এসেছিস কেন। নিজের ভাইকে নিজেরা বোঝাতে পারিস না।’

‘ও বোঝবার বাইরে চলে গেছে।’

বিমলা তিক্ত করেই জবাব দিয়েছিলেন, ‘আর তোরা বুঝি ভেতরে আছিস। তুই নিজে পার্টি ছাড়তে পারিস না?’

রুপাল বলেছিল, ‘আমার যা বলবার বলে দিলাম। বাদলা আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মাস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে।’

সকলেরই সকলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। বিমলার সামনে এসে রুপালই যে কেবল বাদলের বিরুদ্ধে শাসিয়েছে, তা না। দয়ালও একইভাবে শাসিয়েছে। বিমলার সব থেকে অবাক লেগেছিল, হরপ্রসাদও যখন এক রকম ভাবেই শাসিয়েছে। বলেছে,

‘তোমার ছোট্ট ছেলেকে বলে দিও, এখনো সময় আছে। ও যেন সাবধান হয়ে যায়। ওর বড় পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।’

বিমলার বৃকের মধ্যে সেদিন একবার কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদের ওপর রাগও হয়েছিল। বলেছিলেন, ‘নিজের ছেলেকে নিজে বোঝাতে পার না। তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও। তুমি পাটি ছাড়তে পার না। তারপরে ছেলেকে বলতে পার না? সবাই এসে আমার কাছে বলছ?’

হরপ্রসাদ বলেছিল, ‘তুমি ওসব বুঝবে না। আমার পাটি ছাড়ার কিছু নেই। আমি ওদের মত গুণ্ডা পাটি করছি না। কিন্তু বাদলা যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে, ও একটা কিছু না ঘাটিয়ে ছাড়বে না।’

বিমলা তিক্ত রাগে বলেছিলেন, ‘আমাকে ওসব কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাদের সংসারে একটা দাসী বাদী আছি। তোমাদের খেদমত খাটিছি। আর তোমরা লড়াই করছ। এবার আমাকে তোমরা রেহাই দাও।’

বিমলা হরপ্রসাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। শুনেছিলেন, তারপরেও হরপ্রসাদ আপনমনে বকবক করছিলেন, ‘বাদলার মরণ ধরেছে। পাটির নেতাদের উস্কানিতে ও নিজেকে কী একটা ভাবে আরম্ভ করেছে...’

বিমলার বৃকের মধ্যে আবার কেঁপে উঠেছিল। বাবা হয়ে হরপ্রসাদ কেমন করে বলেছিল, ছেলেটার মরণ ধরেছে। কেবল বাদলের বেলায় না। হরপ্রসাদ সকলের বেলাতেই ও কথা বলেছে। রূপাল দয়ালের কথাতেও বলেছে, ওদের মরণ ধরেছে। হরপ্রসাদ কি ছেলেদের বাবা নয়। পিতৃস্বের থেকেও পাটি কি বড়? ওদের কি ভ্রাতৃত্ব বলতে কিছু নেই। পাটি কি তার ওপরে। এই সংসারের মাঝখানে বসে এ কথাটা কোনোদিন তিনি বুঝতে পারেননি। কেবল ভেবেছেন, তাঁর ঘরে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেরা মিলে, একটা স্বথের সংসার কি ওরা ওরা গড়তে পারতো না। তার বদলে ওরা এক একজন এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মরণ ধরাটাই দেখতে পেয়েছে।

বিমলা বাদলকে বলেছিলেন, ‘তোমার বাবা দাদারা সবাই তোমার নামে নালিশ করছে। তুই কি একটা বিপদ আপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না?’

বাদল বলেছে, ‘বিপদ আপদ আবার কী। ওরা চায়, ওরা পাটি করবে আমি চূপচাপ বসে থাকব। তা আমি থাকব কেন? ওদের শাসনিকে আমি কাঁচকলা ভয় পাই। বেশি ট্যাগুই ম্যাগুই করতে এলে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।’

বিমলা তবু ধমকে বলেছেন, ‘তুই কেন ওদের সঙ্গে লাগতে যাস?’



বাদল বলেছিল ‘আমি কেন লাগতে যাব। ওরাই আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে।’

‘কেন, তুই বাবা দাদাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারিস না?’

‘বাবা দাদারা বুকি মিলেমিশে আছে? পার্টীর ব্যাশারে কারোর সঙ্গে কারোর মিল মিশ হবে না।’ একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছে, ‘পার্টীর সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না। তা বাবা আর দাদারা আমাকে যতই শাসাক। সবাই তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, আমার বেলাতেই খালি শাসানি। আমি কারোর পরোয়া করি না।’

বিমলা তারপরেও মোক্ষম কথাটি বলতে ছাড়েননি, ‘বাপের অমতে এসব করছিস। এর পরে যদি তোর বাবা তোকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে?’

বাদল অনায়াসে জবাব দিয়েছে, ‘বের করে দেয়, চলে যাব। তা বলে বাবাকে, বাবার পার্টীকে সমর্থন করতে পারব না।’

বিমলা যেন শাঁখের করাতির তলায় পড়েছিলেন। কোনোদিকে তাঁর শাস্তি ছিল না। স্বামী পুত্রদের কারোকে তিনি বোঝাতে পারেননি। সংসারের মধ্যে চারটে পার্টীর লড়াই চলছিল। একসঙ্গে বসে বাবা ছেলেদের খাওয়া উঠে গিয়েছিল। যদি বা কোনোদিন সবাইকে একসঙ্গে খেতে দিতেন, কেউ কারোর সঙ্গে একটি কথা বলতো না। কলের পুতুলের মত সবাই নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যেত।

‘মা। মা কোথায় গেলে?’

এখন দয়াল ডাকছে। এর আগে রূপাল ডেকেছে। হরপ্রসাদও ডাকাডাকি করেছে। বিমলা কোনো সাড়া দেননি। এবারও সাড়া দিলেন না। ওদের সকলের ডাকে চিরদিন সাড়া দিয়ে এসেছেন। আজ তিনি ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ওই মোড়ের অবহেলিত ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ওইখানেই বাদলকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। শনশন পুবে বাতাসের সঙ্গে এবার ইলশেণ্ড ডি ছাঁটের মত বৃষ্টি নেমে এল। জবা গাছটা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বিমলার গায়ে মুখে পড়তে লাগল। তিনি নড়লেন না। তিনি আর ওই রান্নাঘরটায় গিয়ে ঢুকতে পারছেন না। আঠারো বছর আগে বাদলের ওই ঝাঁতুড় ঘরে গিয়ে ঢুকলেই, তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন করছে। বিমলা স্থির থাকতে পারছেন না। তাঁর পেটের মধ্যে যেন কেবলই কী নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল কি এখনো তাঁর গর্ভে!

বিমলা চোখ বুজে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপলেন। ব্যথা উঠছে নাকি তাঁর পেটে। তাঁর চোখের সামনে বাদলের সেই চেহারাটাই আবার ভেসে উঠল। ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত মৃত বাদল। সেই মূর্তির নিকে তাকিয়ে, সকলের শাসানির কথা তাঁর মনে পড়েছিল। এই তিন মাস ধরে, বারে বারে মনে মনে জিজ্ঞেস করেছেন, কারা মেরেছে বাদলকে। রূপালের দল? দয়ালের দল, না হরপ্রসাদের দল? সবাই অস্বীকার করেছে, তাদের দল বাদলকে মারেনি। পুলিশ যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে, তারাও অস্বীকার করেছে, বাদলকে তারা মারেনি। অথচ সবাই শাসিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে। রূপাল দয়াল হরপ্রসাদের পাঁটি ছাড়াও আরও পাঁটি আছে। কিন্তু কেউ স্বীকার করেনি, বাদলকে কারা মেরেছে। বিমলাও জানেন না, কাদের হাতে বাদলের রক্ত লেগে আছে।

যতই অস্বীকার করুক, কোনো না কোনো পাঁটির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন পাঁটি? রূপাল দয়াল হরপ্রসাদের কথাই আগে মনে আসে। ওরা সকলেই বলেছে, বাদলেব মরণ ধরেছে। অথচ, তারা বিমলাব স্বামী পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে ছিল না। রূপাল দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি একটা পাঁটির ছেলে। ওদের বিরুদ্ধ পাঁটির ছেলে একটা? বাদল কি এই সংসারে একমাত্র বিমলারই ছেলে। তা-ই যদি হয়, তবে বিমলা আজ ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না।

বিমলা শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে। রূপাল ডাকছে। দয়াল ডাকছে, হরপ্রসাদও ডাকছে। ওরা নিজেরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। আলাদা আলাদা ডেকে চলেছে।

‘মা, ও মা।’

‘মা কোথায় গেলে?’

‘কই গো শুনছে, কোথায় গেলে?’

বিমলা টের পাচ্ছেন, উঠোনে, ঘরে ঘরে, রান্নাঘরে, সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে। বৃষ্টির ছাঁটে ছুটোছুটি করছে। শুনতে পাচ্ছেন, দয়াল রান্নাঘরের কাছ থেকে, কণার মাকে চিৎকার করে ডাকছে, ‘মাসীমা, ও মাসীমা।’

কণার মায়ের জবাব শোনা গেল, ‘কী বলছিস রে দয়াল।’

‘মা কি আপনাদের বাড়িতে আছে?’

‘না তো। সকাল থেকে একবারও আসে নি তো। কোথায় গেল ভোর মা।’

‘কী জানি, দেখতে পাচ্ছি না। রান্নাঘরের দরজা খোলা কুকুর ঢুকে কড়ার তরকারি খেয়ে গেছে। রান্নারান্না কিছু হয়নি।’

কণার মায়ের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল, ‘সে কি রে। তোর মায়ের তো একরকম কখনো হয় না। আখ্ খুঁজে কোথায় গেল। আমিও দেখছি।’

কোথাও যাননি বিমলা। বাড়িতেই আছেন। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে দেখছেন। যারা বেদী তৈরি করেছিল তারাই বা আজ কোথায়। একটা শহীদ বেদী করেছিল। তিন মাসের মধ্যেই সেটা ভেঙে পড়েছে। তাদেরই বা কী হারিয়েছে। তারা সেই যে শহীদ বেদীতে বিমলাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরে আর আসেনি। তারা যেমন পাঠি করছিল, তেমনি করছে। এ বাড়ির বাবা ছেলেবাও করছে।

বিমলারই শুধু হারিয়েছে। দশ মাস বাদলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাঁর নাড়ি ছিঁড়ে বাদল এই পৃথিবীতে এসেছিল। আঠারো বছর আগে, এতক্ষণে মেঘুর মা বাদলকে ধুয়ে মুছে, তাঁর বৃকের কাছে তুলে দিয়েছে। গভীর স্বরে গুঁয়া গুঁয়া করে কাঁদছে। বিমলা তাকে স্তন চেনাবার চেষ্টা করছেন।

বিমলার গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠল। বাদলকে তিনি যেন বৃকের মধ্যে অহুভব করছেন। বাদল কোথাও নেই, শ্মশানে না, শহীদ বেদীতে না। তাঁর বৃকেই আছে।

‘বড় বো’—

হরপ্রসাদ ছাতা মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়াল। বিমলার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। চোঁটে চোঁটে টিপে রইলেন। হরপ্রসাদ তার ভাইদের মধ্যে সকলের বড়। পূর্ববঙ্গে, একান্নবর্তী পরিবারে, বিমলাকে বড় বো বলেই ডাকা হত। হরপ্রসাদ কখনো কখনো তাঁকে ওই নামে ডাকে। বিমলা কোন জবাব দিলেন না।

হরপ্রসাদ বলল, ‘আমরা তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?’

সে কথা হরপ্রসাদকে বলবার দরকার নেই। বিমলা জানেন, আজ বাদলের জন্মদিন, হরপ্রসাদের সে কথা মনে নেই। ছেলেদেরও কারোর মনে থাকে না। বিমলা ভুলতে পারেন না, কবে কোন ছেলেকে তিনি প্রসব করেছেন। মুখে কিছু বলেন না। কেবল তিন ছেলের জন্মদিনে ওদের একটু পায়ের রান্না করে খাইয়ে দেন। এতকাল দিয়ে এসেছেন। গত বছরও এই দিনে বাদলকে পায়ের রান্না করে খাইয়েছিলেন। বাদলের জন্ম আর তাঁকে পায়ের রান্না করতে হবে না।

হরপ্রসাদের গলায় অসহায় বিশ্বয়, কারণ সে বিমলার কিছুই বুঝতে পারছে না। বলেই চলেছে, ‘রামাবান্না কিছু করনি। আধকাঁচা তরকারি কুকুরে খেয়ে গেছে। কী ব্যাপার তোমার?’

হরপ্রসাদ ব্যাপার কিছুই বুঝবে না। বিমলা কিছুই বলতে চান না। তাঁর চোখের সামনে শিশু বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে। হরস্তু দুই হেলে ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপরে বাদল বড় হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্ম হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পাটির ছেলে। সম্ভান শুধু বিমলার।

হরপ্রসাদের গলার শব্দে রূপাল দয়ালও এসে দাঁড়াল। ওবা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ওরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারছে না। বিমলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ হয়ে গিয়েছে।

রূপাল বলল, ‘মা তুমি এখানে, কী হয়েছে?’

সবাই অবাক। সবাই বিমলাকে বুঝতে চাইছে। কিন্তু ওদের বোঝার কিছু নেই। এরা তাঁর স্বামী পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পাটি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।

হরপ্রসাদ বলল, ‘ঘরে চল বড় বো। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজো না।’

বিমলার দৃষ্টি মোড়ের ভাঙা বেদীর দিকে। স্পষ্ট করে বললেন, ‘যাব না।’

তিন পাটির লোক নিজেদের মধ্যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করল। রূপাল বলল, ‘রামাবান্না করো নি, আমরা খাব কী।’

বিমলা নিচু পরিষ্কার গলায় বললেন, ‘আজ আমি খেতে দিতে পারব না।’

তিনটে পাটির লোক অবাক। বিমলা তাদের কাছে, পাটির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে। দয়াল বলে উঠল, ‘আমরা তবে কী করব এখন?’

বিমলা বললেন, ‘তোরা আজ তোদের পাটির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।’

অস্বস্তহীন বিশ্বয়ে তিনজনেই চূপ। বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে, ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তিন জনেই দেখল। তিন জনের চোখেই অপরিচয়ের দৃষ্টি। যেন স্বামী চিনতে পারছে না স্ত্রীকে। ছেলেরা মাকে। অথচ

কোনো কথা বলতেও যেন আর তাদের সাহস হচ্ছে না। এই প্রথম, তারা শুধু অবাক না, বিমলাকে যেন তাদের কেমন ভয় করছে।

তিনজনেই আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের ঝাপটায় বুষ্টির ছাঁটে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনজনেই একটা অসহায় অস্বস্তি আর বিশ্বয় নিয়ে একে একে চলে গেল।

বিমলা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বুষ্টির ছাঁটে ধুয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বৃকের কাছে এখন কিছু ঠেলে উঠেছে, গলার কাছে উঠে আসছে। তাঁর চোখে এখন জল আসছে, বুষ্টির ডলে গাল ধুয়ে যাচ্ছে। তিনি বৃকের কাছে হাত রেখে, মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল, তুই আমার কাছেই রয়েছিস। আমার কাছে থাক।'...





আমাদের বড় মেয়েকে নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সে একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতিব, ছেলেবেলা থেকেই একটু বেশী লাজুক, এবং আমাদের ছুজনেরই খুব বাধ্য ছিল। তার বি এস-সি পরীক্ষার ফল বের হওয়ার আগেই হঠাৎ একটি ভাল যোগাযোগ হয়ে গেল, অরুণা বললে ছেলেটি চমৎকার, তার বাড়ির পরিবেশটাও আমার পছন্দ হয়েছিল, আমি অরুণার সামনেই একদিন কবিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এ বিয়েতে তোর মত আছে তো কবি? কবি বিষম লজ্জিত মুখ করে আমার সামনে থেকে পালিয়ে গেল। পরে অরুণার কাছে শুনলাম সে নাকি বলেছে, আমাব আবার মত কি, মেয়ের কিসে ভাল বাবা-মা ছাড়া আর কেউ বোঝে নাকি! শুনে আমার সত্যি খুব ভাল লেগেছিল। সৌভাগ্য আমাদের, ওরা স্ত্রী হয়েছে।

আমার একমাত্র ছেলে অস্তুর বয়েস এখন একুশ। অস্তুর ভাল নাম নিরুপম। ও যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলো তখন ওকে দেখে নিতাস্তই বালক মনে হতো অস্তুর কখনো কখনো আমাদের লুকিয়ে চুলকাটার সেলুনে দাড়ি কামিয়ে আসতো, আমরা বুঝতে পারতাম, এবং ওর এই বড় হওয়ার চেষ্টা দেখে আমি ও অরুণা চোখাচোখি ভাবে নিঃশব্দে হাসতাম। ঐ বয়েস তো একদিন আমারও ছিল, তখন কি করে যে নিজেকে পূর্ণবয়স্ক যুবক ভাবতাম জানি না। আমার যতদূর মনে পড়ে প্রায় ঐ বয়সেই আমি প্রথম প্রেমে পড়ি। এবং সেটাই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম। সে-সব দিনের কথা অরুণা কিছুই জানে না, জানলেও ও খুব একটা বিচলিত হতো বলে মনে হয় না। তবু আমার সেই কলেজ-জীবনের পরিচ্ছন্ন প্রেম-টুকুকে বিশুদ্ধ রাখার জন্তেই অরুণার কাছে তার আভাস কোনদিনই দিইনি। এমন কি আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে সেই পরম বঞ্চনা ও চরম আঘাতের কথা

কাউকে বলতে গেলে এই বাহান বছর বয়সেও হয়তো আমার চোখের পাতা ভিজে যেতে পারে ।

অন্তকে নিয়ে সে-জন্তেই আমার দুর্ভাবনার শেষ ছিল না। যৌবনের সেই হঠকারিতার পর থেকে প্রেম আমার কাছে একটি বিভীষিকা। তিরিশ-বত্রিশ বছর কেটে গেছে, সমস্ত স্মৃতি এখন বাপসা, কিন্তু প্রেমের মধ্যে, বিশেষ করে ব্যর্থপ্রেমের মধ্যে কি অসহনীয় কষ্ট, কি দুঃস্থ জালা, তা আমার আজও মনে আছে। আছে বনেই অন্তকে নিয়ে আমার এত ভাবনা।

কবি অন্তর চেয়ে দু' বছরের বড়। তাব ফলে কবির সঙ্গে কলেজে যে মেয়েরা পড়তো তাদের দু-একজন আমাদের বাড়ি আসতো। তারা কিন্তু কেউই অন্তকে গ্রাহ্যে মধ্যে আনতো না। আমাদের কাছে অবশ্য সেটুকুই ছিল সান্দ্রনা। আমি হাসতে হাসতে অকণাকে একদিন বলেছিলাম, ভাগ্যিস কবি ওর ছোট বোন নয়! শুনে অকণা অবাক হয়ে হেসে ফেলেছিল, কি যে বলো, প্রেম কি অত সম্ভা না কি!

আমি বলতে পারতাম না যে প্রেম খুব স্তলভ নয় বলেই আমার এত ভয়।

আসলে অন্তকে আমরা দুজনেই যে খুব ভালবাসি, দুজনেই যে তার জন্তে খুব গণিত, এটাই শেষ কথা নয়। আমরা তাকে কবির মতই সুখী দেখতে চেয়েছিলাম। এবং প্রেম সম্পর্কে আমার নিজের আতঙ্ক আমি নিশ্চয়ই অন্তর ওপর চাপিয়ে দিতে চাইনি। আমি মনে মনে এমন একটা উদার চিন্তাকেও লালন করেছি যে অন্ত যদি কোন মেয়েকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে আমি সম্মতি দেবো তো নিশ্চয়ই, এমন কি অরুণার মনে কোন দ্বিধা থাকলেও আমি তা দূব করে দেবো। প্রকৃতপক্ষে প্রেমে আমার কোন ভয় ছিল না, ভয় ছিল ব্যর্থপ্রেমে।

আমার সমবয়স্ক সহকর্মীদের কয়েকজনকে আমার রীতিমত বৃদ্ধ মনে হতো। অথচ আমি নিজে কিছুতেই আমার নিজের বয়সকে অহুভব করতে পারতাম না। সেজন্ত সমবয়স্কদের সঙ্গে আমার তেমন মেলামেশা ছিল না। তাদের আলোচনায় আমি কোন আকর্ষণ বোধ করতাম না, তাদের সুখ-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করতো না, কারণ চিন্তাভাবনা বা মানসিকতায় আমি এখনো যুবক। বাহান বছরের যুবক। চাকরি থেকে অবসর নিতে আর ক' বছর বাকী আছে সে হিসেব একদিন অস্তের মুখে শুনে আমি বিষণ্ণ বোধ করেছিলাম। তবে আমার সেই সহকর্মীর মত বিব্রত বোধ করি নি। কারণ লেখাপড়ায় অন্ত খুব উজ্জল না হলেও তার পরীক্ষার ফল

কখনো তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানিকে আমার চোখে নিশ্চয় করে দেয় নি। অস্ত্র চিরকালই অত্যন্ত উৎফুল্ল চরিত্রের ছেলে। এবং অত্যন্ত কোমল স্বভাবের। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত হবার কারণ ছিল না।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অস্ত্র স্বাভাবিক ব্যবহার করতো। সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কখনো কখনো সে রাস্তায় যখন কথা বলতো বা কোন বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করতো তখন তার মধ্যে কোন জড়তা থাকতো না। অল্পবয়স থেকেই সেই মেয়ে কটির সঙ্গে সে বড় হয়েছে, রাস্তায় ক্রিকেট খেলেছে, একদল হয়ে সরস্বতী পূজা করেছে। স্মৃতির তাগিদে তাদের মধ্যে কারো সম্পর্কে অস্ত্র কোন দুর্বলতা আছে কিনা আমি অকারণেই কখনো কখনো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। কখনো মনে হয়েছে তেমন কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারলে আমি খুশী হবো, অরুণার সঙ্গে ভাগাভাগি করে সেই মজাটুকু উপভোগ করবো।

অস্ত্র যেবার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হলো সেই বছর আমি প্রথম নিজে একটু বয়স্ক মনে করতে পারলাম। কবির বিয়ের সময় এই অল্পভূতিটা আসেনি, বরং মনে হয়েছিল কবির বিয়েটা আমাকে জোর করে বয়স্কদের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। কিন্তু ছেলে বড়ো হলে নিজেরই বড়ো হতে ইচ্ছে করে।

একবার অরুণার সঙ্গে পূজার বাজার করতে বেরিয়েছিলাম, সঙ্গে অস্ত্র কিছুতেই যেতে চায় নি, তবু অরুণা তাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল একালের জামাইদের পছন্দ জানতে এবং কবির জন্ম শাডি বাছার কাজে সাহায্য পাবে বলে। সেখানে ভিড়ের মধ্যে লাজুকভাবে ও যে দুটি মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখেছিল আমি সে-দুটি মেয়েকে লক্ষ্য করেছিলাম। এবং অস্ত্র রুচি ও পছন্দ দেখে খুশী হয়েছিলাম।

তাই প্রথম যেদিন গুর কাছে একটি মেয়ের টেলিফোন এলো, আমি ভয় পাই নি। ভীষণ মজা পেয়েছিলাম।

টেলিফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই একটি মধুর মেয়েলি কণ্ঠ জিগ্যেস করলো, নিরুপম আছে ?

আমি বললাম, না, সে একটু বাইরে গেছে, এক্ষুনি ফিরবে।

আমি প্রথমটা বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমাদের সময়ে কোন মেয়ে এভাবে টেলিফোন করেনি। মেয়েদের গলা শোনার অস্ত্র অস্ত্রের বাড়ি থেকে আমরা তিনটি বন্ধু একবার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সময় জানতে চেয়ে ফোন করেছিলাম, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অপারেটর মিষ্টি গলায় জবাব দিয়েছিল এইটুকুই মনে আছে।



সেকালে অটোম্যাটিক টেলিফোন ছিল না, অপারেটর বেশির ভাগই ছিল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

যে মেয়েটি নিরুপমের খোঁজ করছিল তার নাম জিগ্যাস করতে আমার সন্কেচ হলো, তা ছাড়া আমি একটু বেশী বেশী নরম গলায় উত্তর দিলাম। কারণ আমি স্নেহিলাম আজকাল ঐ বয়সের ছেলেদের অনেক মেয়ে-বন্ধু থাকে, আমি বিশ্বিত হয়েছি বা অপছন্দ করছি কোনক্রমে জানতে পারলে মেয়েটি নিশ্চয় কলেজে তা রাষ্ট্র করে নিরুপমকে লজ্জায় ফেলবে।

তাই আমি মেয়েটিকে জিগ্যাস করলাম, নিরুপম ফিরে এলে তাকে কি কিছু বলতে হবে ?

মেয়েটি এক নিমেষের জন্তে কি যেন ভাবলো, তারপর বললে, না, আমিই আবার ফোন করবো।

মেয়েটি নাম বললো না বলেই আমার মনে ঈষৎ খটকা লাগলো।

কিছুক্ষণ বাদেই নিরুপম এলো। আমি সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, তোর ফোন এসেছিল, এখনি আবার রিং করবে বলেছে।

আমার মনে হলো নিরুপম একটু অস্বস্তি বোধ করলো।

মিনিট পনেরো বাদে টেলিফোন বেজে উঠলো আবার। নিরুপম রিসিভার তুললো। আমি সে-ঘর ছেড়ে অগ্রত্ব চলে গেলাম, যাতে নিরুপম না মনে করে আমি তার দিকে কান পেতে আছি।

মেয়েটির এই ফোন করার ঘটনাটা আমার বাহান্ন বছরের মনে তোলপাড় আনলো। শুধু কৌতুকই নয়, রোমাঞ্চের স্পর্শও ছিল ঘটনাটিতে। আমি অরুণাকে এক সময়ে সে-কথা বললাম, যদিও আমার মনে দ্বিধা এবং ভয় ছিল যে অরুণা হয়তো ঘটনাটিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। অরুণা কিন্তু অবাধ হয়ে সশব্দে হেসে উঠলো, হাসি খামলে ওর মুখের ওপর একটা মুগ্ধভাব স্কুটে উঠলো। আমার মনে হলো ছেলের জন্ত অরুণার কোন দুশ্চিন্তা নেই, ও যেন একটু গর্বই বোধ করছে। এবং ঠিক তখনই আমার নিজেরও মনে হলো আমিও একটু গর্বিত বোধ করছি।

মেয়েটি টেলিফোনে অঙ্কে কি বলেছিল আমার জানার কথা নয়। তার নাম হয়তো অঙ্কে জিগ্যাস করলেই জানতে পারতাম। কিন্তু আমি কিছুই জানতে চেষ্টা করি নি, যদিও আমার সে-বিষয়ে ষথেষ্ট কৌতুহল ছিল। ফলে, কল্পনায় তিন চারটি একালের স্মরণ নাম নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছিলাম, এবং

ভেবে নিয়েছিলাম মেয়েটি নিশ্চয়ই অস্তুর সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করার কথা বলেছে। কারণ, আমার মনে আছে, তখন অস্তুর কলেজে পর পর তিন দিন ছুটি ছিল।

একটি মেয়ে আমার একুশ বছরের ছেলেকে বাড়িতে টেলিফোন করছে—এই ছোট্ট ঘটনাটি আমার মনে এমনই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যে আপিসের দু-একজন সহকর্মী বন্ধুকে না বলে পারি নি। তারা কেউ এ ঘটনার কথা শুনে বিশ্বাস প্রকাশ করেছে, কেউ একটি প্রেমোপাখ্যান শোনার মত মুগ্ধভাব করে তা উপভোগ করেছে এবং তাদের নিজেদের যৌবনকালে কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে তা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। বলা অশ্রয়োজন যে আমিও সেই কপট দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সুর মিলিয়েছি।

এর পর অস্তুর কাছে আরো কয়েকবার আরো ঘন ঘন মেয়েলি গলার টেলিফোন এসেছে। সে-সব সময়ে কখনো আমি নিজেই রিসিভার তুলেছি, কখনো অরুণা। তখন আর আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ‘মজা’ নয়, বরং কখনো কখনো মনে হয়েছে অস্তুর আমাদের যেন উপেক্ষা করছে, কিংবা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করছে না। তা না হলে সে নিশ্চয় তার বান্ধবীদের বাড়িতে ফোন করতে নিবেদন করে দিতো। অস্তুর যে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই সিগারেট খাওয়া ধরেছে আমি জানতাম, তার পকেটে একখানা চিঠি পোস্ট করার জন্তে রাখতে গিয়ে দেশলাই দেখেছিলাম একদিন। আরেকদিন ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পরই আমি ঢুকতে গিয়ে একরাশ ধোয়া এবং সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিলাম। এই বয়সে সিগারেট খাওয়াকে আমি খুব দোষের মনে করতাম না, কিন্তু সেজন্তে অস্তুর আমার চোখের সামনে টেবিলে সিগারেটের প্যাকেট রাখলেও সহ্য করতে হবে এতখানি উদার আমি হতে পারি নি। ও অবশ্য তা করেও নি কোনদিন এবং সম্ভবত ঐ বয়সে পুরো প্যাকেট সিগারেট কেনার ওরা অভ্যস্তও হয় না। আমি নিজে ঐ বয়সে খুচরো একটি সিগারেট কিনে দোকানের দড়িতে ধরিয়ে নিতাম। সে ঘাই হোক, ঘন ঘন টেলিফোন আসা আমার কাছে প্রায় চোখের সামনে সিগারেট ধরানোর সামিল মনে হতো।

প্রথম দিকে ব্যাপারটা উপভোগ করলেও অরুণার কাছেও এটা আর কৌতুক রইলো না। দেখতাম, অরুণাও বিরক্ত হতো, এবং আমি জানতাম বিরক্তিতা আসলে ওর রাগ ‘জানি না’, ‘নেই’ বা ‘বলতে পারি না’ গোছের উত্তর দিয়ে ও কোন কোনদিন রিসিভার নামিয়েও দিয়েছে।

আমি ঘরে বসে থাকলে অস্তুর টেলিফোনে কাটা কাটা কথা বলতো, অস্পষ্ট ভাবে উত্তর দিতো, এবং আমার তা শুনে বেশ মজা লাগতো।

—মেয়েটা কে রে ? বেশ বিরক্তির সঙ্গেই একদিন অরুণা ওকে জিগ্যেস করেছিল। আমি তখন অস্তুর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি।

কলেজের দু-একটি মেয়ের নাম অরুণার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, কারণ তাদের কথা অস্ত সেদিনই অরুণাকে হাসতে হাসতে বলেছিল। তাদের কথা বলার সময়ে অস্ত এমন ভাব করলো যেন তারা নিতান্তই নাবালিকা এবং নির্বোধ, বোকার মত কথা বলে এবং অস্ত যেন তাদের গ্রাহ্যই করে না।

অরুণা একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বললো, টুকটুক মেয়েটাই তো ওকে বেশী ফোন করে, জিগ্যেস করলাম কেনমন দেখতে, অস্ত নাক সিঁটকে যা বর্ণনা দিলো, কোন ভয়ই নেই।

টুকটুক নামটা আমি আগেও একদিন শুনেছিলাম। তার ভাল নাম যে ঋতা তাও অরুণা বলেছিল। আর আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, কলেজের মেয়েদের ডাক নামে পরিচিত হওয়া এ আবার কোন ধবনব আধুনিকতা। তাতে রুবি সেদিন এসেছিল, বললে, তুমি বাবা এক্কেবারে সেকলে। আমাদের সময়েও সব ছিল মিনি দত্ত, টুলি মিত্র, ফুচু সান্তাল।

কিন্তু অস্ত টুকটুকের রূপের যে বর্ণনা দিক না কেন, একদিন আপিস থেকে ফিরতেই অরুণা চায়ের কাপ রেখে হাসতে হাসতে বললে, ছেলের তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন ?

অরুণা হাসলো, বললে, সেই টুকটুক ! সে আজ এসেছিল।

তারপর একটু থেমে বললে, কি মিষ্টি চেহারা তুমি ভাবতে পারবে না, আর কি ভালো যে মেয়েটা ! অস্ত কিনা ওকে দেখেও নাক সিঁটকোয় ! ও ছেলের তা হলে কোন মেয়েই পছন্দ হবে না।

আমি বললাম, ছেলের বউ করার জন্তে তাকে রুবি তোমার খুব পছন্দ হয়েছে ?

অরুণা হেসে ফেলে বললে, তা বলছি না, কিন্তু সেদিন যে অস্ত বললে, টুকটুক দেখতে তেমন ভাল না ! এর চেয়েও সুন্দর মেয়ে কি ওর কপালে জুটবে নাকি !

আমার মনে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খটকা লাগলো। আমার মনে হলো টুকটুক সন্দেহে আমাদের যাতে কোন সন্দেহ না হয়, সেজন্তেই ঐ মিষ্টি চেহারার মেয়েটাকে অস্ত খাটো করে দেখাবার চেষ্টা করেছে। টুকটুককে দেখার জন্তে আমার তখন খুবই আগ্রহ, আমি ফিরে আসার আগেই ওরা ছুটিতে চলে গেছে শুনে আমার খান্নাপ লাগলো। ভাবলাম, আরেকটু আগে কেন আসিনি।

এর দিনকয়েক পরেই দুপুরের দিকে আপিস থেকে বেরিয়েছি ইঞ্জিওরেরের প্রিমিয়াম জমা দিয়ে আসতে, হঠাৎ মেট্রোর নীচে অস্ত্রকে দেখলাম, সঙ্গে রীতিমত স্ত্রী একটি মেয়ে। স্লিম চেহারা, এক মাথা শ্যাম্পু করা হালকা চুল। চোখ দুটি .....সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটিকে এক নজরে দেখে নিয়েই আমি উর্টেটা দিকে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলাম, পাছে অস্ত্র আমাকে দেখে ফেলে। অর্থাৎ, লজ্জা যেন আমারই।

আমি অরুণাকে এসে ফিসফিস করে বর্ণনা দিলাম মেয়েটির আর অরুণা বললো, বা রে, ঐ তো টুকটুক।

টুকটুককে ভালো করে দেখার, কাছে বসে তার সঙ্গে কথা বলার আমার ভীষণ ইচ্ছে হতো। এবং আমার সবচেয়ে বড় কৌতূহল ছিল তাকে দেখে বা তার সঙ্গে কথা বলে মেয়েটিকে যাচাই করে নেবার। আমার ধারণা ছিল, তার সঙ্গে কথা বলে আমি তার ভিতরের চরিত্রটি আবিষ্কার করতে পারবো এবং সেই সঙ্গে ধারণা করে নিতে পারবো সে সত্যিই অস্ত্রকে ভালবাসে কি না। কারণ টুকটুক যথেষ্ট স্ত্রী বলেই আমার সেই পুরোনো ভয়টা মাঝে মাঝেই বৃকের মধ্যে উঁকি দিতো। আমার কেবলই আশঙ্কা হ'ত, শেষ অবধি অস্ত্র না সেই চরম আঘাতটা পেয়ে বসে।

পুত্রসন্তান যুবক হয়ে উঠলে বাহান্ন বছর বয়সের বাপকেই সব সময়ে তটস্থ থাকতে হয়। আমি মাঝে মাঝে আপিস ছুটির পর সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে চৌরঙ্গীর দু' একটি রেফটোরেন্টে গিয়ে চা খেতে খেতে আড্ডা দিতাম, কোনদিন বা শ্রান্ত বোধ হলে তাদের সঙ্গে আউটরাম ঘাটের দিকে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে বায়ু সেবনের জগ্রে বেড়াতে যেতাম। অস্বীকার করবো না, বাহান্ন বছর বয়সেও আমার বৃকের ভেতরটা যুবক রয়ে গেছে বলেই আমি ঐ সব স্মৃশ্র জায়গায় বেড়াতে গিয়ে কখনো কখনো স্মৃশ্র রমণীর দিকেও কয়েক পলক তাকিয়ে দেখেছি। কিন্তু ঐ সব স্থানগুলি প্রেমের তীর্থস্থান জানতাম বলেই আমার বেড়ানোর জায়গাও সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। কারণ, আমার তখন একটাই আতঙ্ক, কোথাও না ওদের দুটিকে অর্থাৎ অস্ত্র ও টুকটুককে দেখে ফেলি। ওদের কোনদিন যদি লজ্জায় ফেলি, আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের সন্দর সন্ধ্যা যদি নষ্ট হয়, তাহলে আমার আর অনুশোচনার যেন শেষ থাকবে না।

এই সময়েই অস্ত্রদের কলেজে পুজোর ছুটি হলো। অরুণার কাছে শুনলাম টুকটুক তার বাবা-মার সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে যাচ্ছে। টুকটুক নিজেই নাকি তাকে বলে গেছে।

অরুণা বললে, ছেলেটা একেবারে অমাতুষ। আমার সামনেই টুকটুক বললে, নিরুপম চিঠি দেবো, উত্তর না দিলে দেখবে মজা। অস্ত্র কি বললে জানো? বললে, রিপ্লাই কার্ড দিও, আর নয়ত এখনই খাম পোস্টকার্ডের পয়সা দিয়ে ষাও। সত্যি সত্যি ওর কাছ থেকে দুটো টাকা নিলো, আমাব বকুনিতে কানই দিলো না।

টুকটুক যে দিল্লী চলে গেছে তা কয়েক দিন পবেই টের পেলাম। কারণ, অস্ত্র নামে যে চিঠিখানা এলো, তার ঠিকানা দেখেই বোঝা গেল সেটি কোন মেয়ের লেখা। আমি সে চিঠি নিজেই রেখে দিলাম, নিজেই অস্ত্র হাতে তুলে দিলাম, অরুণাকে জানতেও দিলাম না। কারণ আমাব ভয় ছিল, অরুণা সে চিঠি খুলে পড়তে পারে বা পড়ার পর ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে। ফলে, ওদের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে। এবং মা বা বাবা সে-চিঠি পড়েছে বা নষ্ট করেছে জানতে পারলে অস্ত্র তখন নিশ্চয় আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করবে।

কিছুদিন পবেই অরুণার কাছে শুনলাম টুকটুক ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই সে নাকি অরুণাকে ফোন করেছিল। অরুণা বললে, যাই বলো, টুকটুক আমাদের খুব ভালবাসে। চিঠি পায়নি ক'দিন অস্ত্রব কাছ থেকে, খুব ভাবনা হয়েছিল তার, বাড়ি ফিরেই ফোন করে জিগ্যেস করলো আমরা কেমন আছি।

সত্যি সত্যিই টুকটুককে একদিন দেখলাম। দেখলাম মানে তাকে আমিই ডেকে আনলাম।

আমাদের ফ্ল্যাটখানা তিনতলায়, সামনে একটুখানি ব্যালকনি আছে। সেদিন শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না, বছর শেষ হয়ে আসছে অথচ ক্যাজুয়েল লীভ পাওনা অনেক, ইচ্ছে করেই আপিস যাইনি। বিকলে হঠাৎ শুনলাম, নীচে রাস্তা থেকে কোন একটি মেয়ে চিৎকার করে কাকে ডাকছে। দুবার শোনার পরই যত্নে হলো মেয়েটি অস্ত্রকে ডাকছে। আমি ব্যালকনিতে বেরিয়ে দেখি নীচে রাস্তায় টুকটুক চিৎকার করে ডাকছে, অস্ত্র, অস্ত্র! ও তখন তিনতলাব দিকে চোখ তুলে ডাকছিল, আমাকে দেখেই লজ্জা পেল। ও হয়তো স্মৃতি করে সরে পড়তো, মাথা নামিয়ে নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে, তাই আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি ওপরে এসো, এসো না!

মেয়েটি সিঁড়ির দিকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখে হাসি আর লজ্জা ছড়িয়ে উঠে এলো, আমি তখন সিঁড়ির মাথায়।

আমি বললাম, তুমি টুকটুক, না?

টুকটুক ঝাড় কাং করলো। আর আমি বললাম, অস্ত্র না থাকলে ওপরে বুঝি আসা যায় না ?

অরুণাও ততক্ষণে এসে পড়েছে, হেসে বললে, সে কথা বলো না, আমার সঙ্গে তো ও কতদিন এসে গল্প করে গেছে।

আমি টুকটুককে সামনে বসিয়ে নানান গল্প শুরু কবে দিলাম। আমি প্রায় তার সমবয়স্ক হবার চেষ্টা করলাম। হাসলাম এবং হাসিলাম। আমি নিজেকে যথেষ্ট মর্দার্ন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলাম।

টুকটুক চলে যাবার পূর্বে আমি অরুণাকে বললাম, যদি সত্যি সত্যি তেমন কিছু হয়, ভালই হয়, কি বলো ?

অরুণা মূহু হেসে বললে, মেয়েটা ভীষণ ভালো, তাই না ?

আমরা রাত্রে অন্ধকাবে শুয়ে শুয়েও অস্ত্র এবং টুকটুককে নিয়ে কোন কোন দিন চাপা গলায় আলোচনা করেছি, আমাদের চোখকে ফাঁকি দেবার যখনই ওরা চেষ্টা করেছে, আমরা হেসেছি। কখনো কখনো আমরা স্বপ্নও দেখেছি।

এরপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। টুকটুক ফোন করলে আমি যদি রিসিভার তুলতাম তাহলে ও আগে আমার খবরাখবর নিতো, অরুণার, আর তারপর আমি নিজেই বলতাম, ‘ধরো, অস্ত্রকে ডেকে দিচ্ছি’, কিংবা ‘অস্ত্র তো এখনো ফেরেনি, কলেজে যাওনি তুমি?’ টুকটুক যখন বাড়িতে আসতো, আমি থাকলেও কখনো স্টান অস্ত্রর ঘরে চলে যেত, কখনো রান্নাঘরে অরুণার কাছে, আবার অস্ত্রর ঘরে যাবার আগে এক মিনিট দাঁড়িয়ে কোন কোনদিন আমার সঙ্গে কথাও বলতো।

মাঝখানে হঠাৎ কি যে হয়েছিল আমি জানি না, বেশ কিছুদিন টুকটুক আসতোও না, ফোনও করতো না। সেই সময়ে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। অরুণাকে জিগ্যেস করেছিলাম, টুকটুককে কি খবর বলো তো? অরুণা বললে, ঝগড়া করেছে, আবার কি। এত বলি, একদিন আসতে বলিস, কেবল এড়িয়ে যান।

শুনে আমার মনটা দমে গেল। আমার বিশ্বাস হলো না। আমি মনে মনে ভয় পেলাম। আমি ভাবলাম, যে আতঙ্কটা আমার মনের মধ্যে বরাবর উঁকি দিয়েছে, সেটাই বোধহয় সত্যি হলো। আমার কেবল ইচ্ছে করতো, আগের মতই অস্ত্রর ঘর থেকে ওদের দুজনের সশব্দ হাসি বা হট্টগোল বা তুচ্ছ ঝগড়াকাটা ভেসে আসুক। একটা কাঠের বাজনা শুনেছিলাম ছেলেবেলায়, ওদের কথা-কাটাকাটি ঠিক তেমনি মিষ্টি লাগতো।

আমি সে-সময় অস্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতাম। ও মাঝে মাঝেই কেমন অগ্রমনস্ক হয়ে যেত, একটু খিটখিটেও হয়েছিল। খাবার টেবিলে বসে আমি লক্ষ্য করতাম, ওর ক্ষিধে ঠিক আগের মত নেই। আমি কি করবো ঠিক করবে পারতাম না, আমি শুধু মনে মনে চাইতাম, ও যেন আঘাত না পায়, কষ্ট না পায়।

তখন গরম কাল, অস্তুর বললো, বাবা চলো না এবার দার্জিলিং যাই।

আমি ভাবলাম, কোলকাতা ওর কাছে এখন একটা যন্ত্রণা। ও এখান থেকে পালাতে চাইছে। পালাতে।

আমি অরুণাকে বললাম, তাই চলো, অস্তুর যখন বলছে.....

আমি অরুণাকে বললাম, দোষ তোমারই। তুমি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিলে, অথচ শেষরক্ষার কথা ভাবলে না।

অস্তুর জন্মে আমার ভীষণ কষ্ট হতো, অনেক রাত অবধি আমার ঘুম আসতো না। অরুণাও তার ব্যথা তার কষ্ট চেপে রেখেছিল, হঠাৎ একদিন রাত্রে কেঁদে ফেলে বললো, আমার কিছুর ভাল লাগছে না। একটু থেমে হঠাৎ বললে, আচ্ছা আমি যদি টুকটুকদের বাড়ি যাই? আমি নিষেধ করলাম। বললাম, ওঁদের কাউকে তো আমরা চিনি না। কি জানি কি মনে করে বসবেন ওঁরা, তাছাড়া অস্তুর জানলে রেগে যাবে, ওর হয়তো সম্মানে লাগবে।

শেষ অবধি তাই দার্জিলিঙেই আমরা গেলাম। ক্যাপিটল সিনেমার কাছেই হোটেল কুণ্ডতে গিয়ে উঠলাম। সেদিনই বিকেলে বেড়াতে গেলাম ম্যালের।

আমরা কেউই দেখতে পাইনি, টুকটুক ছুটে এলো একমুখ হাসি নিয়ে। অস্তুর, তুমি? গ্র্যাণ্ড হয়েছে, কাকাবাবু আপনারাও এসেছেন। বলে তার বাবা-মা ভাই-বোনদের দিকে ফিরে তাকালো। আমাদের ডেকে নিয়ে গেল।

আলাপ হল সকলের সঙ্গে। বোঝা গেল অস্তুরকে ওঁরা খুব ভাল করেই চেনেন, অস্তুর ওঁদের বাড়ি অনেকবার গেছে।

টুকটুকের বাবা খুব সজ্জন, মা বেশ মিস্ত্রকে।

প্রতিদিন সকাল বিকেল আমাদের দেখা হতো, কখনো ম্যালের বেড়াতে এসে, কখনো দোকানে বাজারে, কখনো দল বেঁধেই আমরা এখানে-ওখানে যেতাম। কিন্তু অস্তুর আর টুকটুক, সব সময়ে আলাদা। হয় ওরা আমাদের সকলের পিছনে গিচ্ছিয়ে যেত, কিংবা তড়বড় করে অনেক আগে আগে চলে যেত। আবার এক একদিন ওরা হুজুনেই একেবারেই দলছাড়া হয়ে কোথায় যেত কে জানে।

আমি অরুণাকে বললাম, যাক বাবা, ঝগড়া মিটে গেছে।

অরুণা বললে, বাগড়া না ছাই।

—তার মানে? আমি বুঝতে পারলাম না অরুণা কি বলতে চায়।

অরুণা হাসলো।—সব প্র্যান, সব প্র্যান করে এসেছে, বুঝতে পারছো না। তা না হলে হঠাৎ দার্জিলিং আসতে চাইবে কেন অস্ত্র।

ওদের দুজনকে দেখে আমরা দুজনে আবাব হাসাহাসি করলাম। আর অরুণা বললে, ছুটিতে বেশ মানায় কিন্তু।

একদিন আমরা অতটা ওপরে উঠতে পারিনি, মাঝপথেই থেমে গিয়েছিলাম, আব অস্ত্র-টুকটুক অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়ে একটা বিশাল পাথরের ওপর বসেছিল। ওদের দু'জনের বসার ভঙ্গিটি ছিল ছবির মত। ওরা খুব হাসছিল। আর গল্প করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে আমি ফিসফিস কবে অরুণাকে বললাম, ছাখো ছাখো, ঠিক যেন মেড ফর দ্বেচ আদার।

অরুণা হেসে উঠে বললে, সত্যি!

দার্জিলিং থেকে ফিরে এলাম খুব একটা খুশী মন নিয়ে। সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন ভরাট। মনে হল জীবনে এত সুখী আমি কখনো হইনি। অস্ত্রও ট্রেনে আসবার সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, ওয়াগারফুল, দার্জিলিং এত সুন্দর ভাবেই পারিনি! আমি আর অরুণা চোখ-চাওয়াচাওয়ি করে হাসি চেপেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে আবার সেই অসহ্য গরম, অল্প দিকে মন দেবার জোটা ছিল না। তবু এরই মাঝে আমি সহকর্মী বন্ধুদের কাছে দার্জিলিংয়ের ঘটনা সবিস্তার বলেছি, বলে আনন্দ পেয়েছি, আর কপট আক্ষেপের গলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, 'আমি মশাই, কি নির্লজ্জ, কি সাহস মেয়েটারও। আমরা যেন বাবা মা নই, স্রেফ অচেনা পাবলিক।'

বন্ধুরা মজা পেয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, এখনকার হালচালই ওরকম, কি আর করবো, আমরাও সহ্য করে যাচ্ছি। তাদের মধ্যে দু' একজন আবার গোঁড়া, বাহ্যিকভাবেই বৃদ্ধ, তারা দোষ দিয়েছে আমাকে, 'আস্কারা দিয়ে দিয়ে আপনারাই তো ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছেন।'

আমি মনে মনে হেসেছি। এবং আমি মনে মনে স্বপ্ন দেখেছি। তারা তাদের ছেলেদের জগ্রে অনেক কিছু চাইতো, ভাল রেজাল্ট, ভাল চাকরি, উন্নতি, আরো কত কি। আমার চাওয়া শুধু একটাই। অস্ত্র যেন সুখী হয়, অস্ত্র এই একুশ



বছরের স্বপ্নমাখা নরম বুকে যেন কেউ আঘাত না দেয়। এই বয়সেই সে যেন আমার মত ভেঙে না পড়ে। আমার একুশ বছরের মত।

অরুণার কাছে শুনেছিলাম, টুকটুক আবার এসেছিল একদিন, সারা হুপুর অস্তুর ঘবে বসে গল্প করেছে। অরুণা আচার রোদে দিয়েছিল, চেয়ে নিয়ে চেটে চেটে খেয়েছে।

সারা হুপুর ঘবের মধ্যে বসে গল্প করার কথায় আমার একটু ভয় হত, একটু অস্থিত। ঐ বয়েসটাকে বিশ্বাস কবতে পারতাম না আমি, ভাবতাম শেষে কিছু একটা...পবমুহূর্তে মনে হত, ওরা এত খারাপ হবে না, আমাদের মনটাই খারাপ।

কবি একদিন এসে বললে, জানো মা, তোমার জামাই বলছিল অস্তুর নাকি আজকাল খুব পাখা গজিয়েছে।

অরুণা হেসে বললে, তা আর কি করা যাবে, দিনকালই যে বদলে গেছে।

কবি বললে, আমার বেলায় তো খুব কড়া শাসন ছিল তোমার।

সত্যি কথা বলতে কি, রুবিকে আমরা একটু আগলে আগলেই রাখতাম। কিন্তু কবি তো সুখী হয়েছে।

পবে শুনলাম, কবি বলেছে অরুণাকে, তোমার জামাই দেখেছে, একটা ছিপছিপে মেয়েকে নিয়ে কি একটা হোটেল থেকে বেরুচ্ছে। (অরুণা বললে) তোমাকে বলিনি, ভেবেছিলাম চোখের ভুল, সেদিন হুপুরে...

অরুণা হঠাৎ অস্তুর ওপর রেগে গেল। আমাকে বললে, এভাবে বেশিদিন ভাল নয়, বিয়েটিয়েই যদি করতে চায় ককক না।

কিছু একটা ঘটে যেতে পারে এই ভয় তারপর থেকে আমাকে পেয়ে বসলো। যদি কিছু ঘটে আমি ভাবতাম, তা হলে আমাদের প্রশ্রয়ই তার জন্তে দায়ী। আবার ভাবতাম, অত ভয়ের কি আছে, ওরা বিয়ে করতে চাইলে টুকটুকের বাবা নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। তিনি তো আরো মডার্ন।

তবু ভয় হতো বলেই অরুণাকে বলেছিলাম, অস্তুরকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করতে। তবে পাস করার আগে, কোন চাকরি না পেয়ে ওর বিয়ে করার কথা আমি ভাবতাম না।

ঠিক সেইসময়ে টুকটুক একদিন এসে হাজির।—নিরুপম আছে কাকাবাবু?

আমি ওকে দেখে বেশ খুলী হয়ে উঠেছিলাম। বললাম, না।

টুকটুক সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম, নিরুপম ছাড়া কি আর কারো

সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভাল লাগে না? আমরা বৃড়া হয়েছি বলে কি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেও পারি না!

টুকটুক মাথা নীচু করে লাজুক হাসলো।

আমি বললাম, বসো এখানে।

ও চূপটি করে সামনের চেয়ারে বসলো। বড় লম্বা ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে।

আমি বললাম, কি খবর-টবর বলো তোমার। অস্ত্র এখনি ফিরবে, ওকে ওষুধ কিনতে পাঠিয়েছি।

টুকটুক মাথা নীচু করেই বললে, খবর একটা আছে কাকাবাবু। মৃত্যু সলজ্জ হেসে বলল, আমার বিয়ে।

বিয়ে? আমার বৃকের মধ্যে কেউ যেন ছুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলো! মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো।—কবে? কোথায়? কি করে ছেলেটি?

আমি ঠিক কি প্রশ্ন করেছিলাম, আমার নিজেবই মনে নেই।

টুকটুক ব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বের করে দিলো, আমি পড়লাম, কিন্তু কিছুই মাথার মধ্যে ঢুকলো না। সব অক্ষরগুলো ঝাপসা লাগলো। আমার বৃকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠলো। আমার ভিতরটা কেবল বলতে লাগলো, এ কি হলো, এ কি হলো।

কোনরকমে মুখে হাসি এনে বললাম, ভাল ভাল।

আর টুকটুক উঠে বলল, আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি। নিরুপমকে একটু থাকতে বলবেন কাকাবাবু।

টুকটুক চলে গেল, আর তখনই অরুণা এসে বললে, টুকটুকের গলা শুনছিলাম না?

আমি অরুণাকে সব বললাম, অরুণা আমার সামনে এসে বসলো, আমরা পরস্পরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হওয়ার পর নিঃশব্দে চোখ নামিয়ে বসে রইলাম। ফিসফিস করে বললাম, এই বয়সে, বেচারী, প্রথম থেকেই আমার এই ভয় ছিল।

অরুণা বললে, এইটুকু ছেলে, ও সহ্য করবে কি করে।

আমার সত্যি সত্যি কান্না পাচ্ছিল। আমার নিজের একুশ বছর বয়সের সেই আঘাতটার কথা মনে পড়ছিল। অস্ত্র ফিরে এসে ওষুধটা দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল, আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না। এমন কি টুকটুক এসেছিল বা থাকতে বলেছে সে-কথাও বলতে পারলাম না।

মিনিট কয়েক পরেই টুকটুক ফিরে এলো, আমি ওকে অস্তুর ঘর দেখিয়ে দিলাম ।  
ইশারায় শুধু বললাম, আছে ।

আমি আর অরুণা অস্তুর ঘরের দিকে তাকাতে পারলাম না । শুধু চুপ করে বসে  
বইলাম আতঙ্কে অপেক্ষায় । যেন এখনই একটা ভূমিকম্প হবে !

হঠাৎ একটা হট্টগোল ভেসে এলো ওর ঘর থেকে । চীৎকার উল্লাস, হৈ হৈ ।  
'তুমি একটা ইউয়িট,' অস্তুর গলা । 'নিকপম, ভাল হবে না বলছি, তুমি না হলে

আমি অরুণার চোখের দিকে তাকালাম । অরুণা আমার চোখেব দিকে  
তাকালো ।

একটু পরেই অস্তুর আব টুকটুক বেরিয়ে এলো ।

অস্তুর চিংকার কবছে, আচ্ছা বাবা, মা, তুমি বলো, স্টুপিড বলবো না ওকে ? ওব  
পবশু বিয়ে, একটা বন্ধুকেও এখনো নেমস্তন্ন করেনি ।

টুকটুক সাক্ষী মানলো অরুণাকে ।—আচ্ছা কাকীমা, আমি কাল পরশু দু-দুবাব  
কোন করিনি ? নিকপম, তুমি বাড়িতে থাকো নাকি কোন সমবে ।

ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল বন্ধুদের নেমস্তন্ন করতে ।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম । পবস্পবেব চোখেব দিকে তাকালাম একটু  
অবাক হয়ে ।

অরুণা হঠাৎ বললে, তুমি এবাব নিশ্চিত হলে তো ।

বললাম, জানি না, বুঝতে পারছি না ।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



অনেক দিন পর আলতাফ এসেছিলো আমার অফিসে।

আমার বন্ধু, স্কুলজীবনের বন্ধু। অবৈধ প্রেমের মতো যে বন্ধুত্বের আকর্ষণ অনিবার্য।

অনেক আনন্দ আর বেদনার স্মৃতিতে উজ্জ্বল আলতাফ। যদিও আমি আমার অল্পসব বন্ধুদের সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারিনি, তবুও অন্তত আলতাফের সঙ্গ আমার কাম্য। এখনো আমার উন্নতি হবে বা হতে পারে এ রকম আশা সে পোষণ করে।

অথচ সেই আলতাফের সামনেও আমি আমাকে সবটুকু প্রকাশ করতে পারি না। ওর প্রশ্নের উত্তরে আমি নিজেকে একজন বুদ্ধিমান বলেই জাহির করতে চাই। বাস্তব জীবনের উর্ধ্বে স্থাপন করে ওর চোখে নিজেকে এক সুউজ্জ্বল জগতের নায়করূপে প্রতিভাত করতে চাই।

তুমি পরীক্ষা দাওনি কেন?

আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে হাসলাম। বুদ্ধিমানের মতো হাসলাম। কিন্তু সে হাসি ওকে কি বোধ দিয়েছিলো জানি না।

সময় পাইনি এই আর কি। আর তাছাড়া পড়াশোনাও করা হয়নি। কী করে আর দেবো।

পর পর তিনটি বাক্যে আমার সবটুকু ওকে জানিয়ে দিলাম। অথচ অনেকেই তো চাকরী করেও বেশ পাস করে যাচ্ছে।

আলতাফ আমাকে আশাবিত্ত করতে চাইলো।

হাঁ, তা যাচ্ছে বৈকি। শুধু আমিই পারলাম না বন্ধু। যাক ওসব কথা। তার চেয়ে বল কি খাবে? সেভেন আপ, কোকা অথবা ফানটা?

একটা হলেই হলো ।

অতএব, আমরা অনেকক্ষণ ধরে কোকা কোলার তরল ঠাণ্ডা পান করলাম ।

যাবার সময় হাত ধরে কাঁকুনি দিয়ে বললো : তুমি যাবে কিন্তু ।

চেষ্টা করবো, বললাম আমি ।

চেষ্টা নয়, যেতেই হবে ।

বললাম অনেকদিন আগের মতো প্রাণের উচ্ছলতায় ও আমাকে অন্তরঙ্গ করতে চাইলো ।

এবার মনে পড়লো অনেকদিন হলো ওদের ওখানে যাইনি । আগে কতো যেতাম । ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পে, তর্কে আর হল্পোড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তাম ।

কই, আগের মতো আর বেহিসেবী হতে পারছি কই । সবকিছু ভেবে চিন্তে এবং বিচার করে করতে হচ্ছে । ওর অম্মুরোধের আন্তরিকতায় আমার মনে একটা হারানো আনন্দের আঁচল ঢুলে উঠলো ।

আমি বললাম, হ্যাঁ যাবো ।

পরদিন রোববার । অতএব অফিস বন্ধ । একটু দেরী করেই বিছানা ছাড়লাম । রেডিও থেকে গান ভেসে আসছিলো । ছুটির গান । আমরা সবাই কী ঝঙ্কর ভাবে ছুটি চাই । কিন্তু ছুটি, কর্মহীন ছুটি আমাদের মেলে না কখনো । তবুও আমরা আত্মীবন তেমননি একটু ছুটির অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করব ।

সকাল এগারোটার মধ্যেই কাপড় চোপড় পরে রওয়ানা হয়ে গেলাম । রবিবার বলেই বোধহয় তাড়াতাড়ি বাস পেয়ে গেলাম—ডবল ডেকার ।

ফার্মগেটে নেমে পড়ে ওদের বাসার দিকে হাঁটতে লাগলাম । সেকেণ্ড ক্যাপিটালের পার্কের পাশ ধৈষে । সবুজের বিনম্র আমন্ত্রণ সমস্ত পার্ক জুড়ে । লিচু গাছগুলির নীচে অনেকে বসে, আবার কেউ শুয়ে আছে । আর আমি সারি সারি রুক্ষচূড়া গাছগুলির নীচ দিয়ে ছায়ায়কে ভালবেসে হেঁটে যাচ্ছিলাম । শীতল বাতাস আমাকে ভালবাসলো । কেননা বাসের ভেতর অনেক লোকের ভীড়ে ঘর্ষাক্ত হয়ে পড়েছিলাম ।

স্কুলজীবনে এসব পথে কত হেঁটেছি । আর আমি এখন এই বিধ্বস্ত নগরের নষ্ট ভ্রুণে আমার আত্মন্য ভালবাসাকে খুঁজে মরছি ।

সেই তখন এতো রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তাঘাট আর সেকেণ্ড ক্যাপিটালের বিচিত্র চাক্ষুর্ষের কল্পনায় নূতন রাজধানী গড়ে ওঠেনি ।

যে আয়গায় এখন এতো দালান কোঠা তখন সেখানে তুট্টা আর জোয়ারের

ক্ষেতগুলো সবুজ টিয়াপাখির কলকাকলিতে মুখর ছিল। কতো লুকোচুরি খেলেছি  
ছুট্টার ক্ষেতে !

হাঁটতে হাঁটতে ওদের বাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। ওই তো এয়ারপোর্টের  
হ্যাঙ্গার দেখা যাচ্ছে। একটা জেটপ্লেন গর্জন করে উড়ে গেলো আমার মাথার  
ওপর দিয়ে।

রাস্তায় আলতাফের বড় মতি ভাইএর সঙ্গে দেখা। কি হে, কামাল নাকি ?  
জি, আমি।

আমি বাড়ীর সদর দরজা ফেলে ঘুরপথে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু মতি ভাই  
বললেন, এদিকে এসো।

অতএব, ছন্দপতনের মতো বকুন্ডের দাবিতে সদর দরজা দিয়ে আলতাফের ঘরের  
দিকে হেঁটে যেতে যেতে গুনলাম, নাজমা বলছে, বৈঠকখানায় বসুন, এখুনি আসছে  
ভাইয়া।

পেছন ফিরে তাকালাম।

সেই ছোট্ট নাজমা এক বৎসরে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। রীতিমতো স্কুদে  
মহিলা। লুইজা মে অলকট্-এর 'লিটল্ ওমেন'-এর স্কুদে মহিলার মতো। শালোয়ার  
কামিজ ছেড়ে শাড়ী ধরেছে নাজমা! আমার যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ হতে  
লাগলো।

আলতাফ আমাকে দেখে খুব খুশী হলো। ও তখন গোসল করতে যাচ্ছিল।

আমি বললাম—আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, কি বল ?

কেন একথা বলছো কেন ? আলতাফ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

এই তো ছপুর বারোটা বাজলো। এটা কী আর বেড়াবার সময়। আমি  
সবসময় অসময়ে এসে পড়ি, কী বলো ?

আলতাফ শুধু হাসলো।

ও এতো সুন্দর করে হাসতে পারে। এতো আন্তরিকতার হাসি। অথচ  
আমি পারি না।

ও বললো, তুমি একটু বোস, চট করে গোসলটা সেরে আসি আমি।

ভাই যাও, বন্ধু। তোমার দরকারী কাজগুলো সব সেরে নাও, আর আমি  
এই দুঃসময়ের ঘরে বসে একজন বন্ধুর প্রতীক্ষা করতে থাকি ; একজন মানসী?  
প্রতীক্ষা করতে থাকি। মনে মনে ভাবলাম আমি।

আলতাফ চলে গেলো। আমি অগত্যা ওর পড়ার বইগুলি অনিচ্ছায় হাতড়াতে

লাগলাম। অক্ষরগুলো আমার কাছে অজানা অজ্ঞাত। অক্ষরের গোলকর্ধাধায় আমি প্রবেশ করতে পারলাম না। কিন্তু তবু পাতা ওঁটাতে লাগলাম।

জানালার বাইরে তখন বর্ষার রোদ।

বাতাবিলেবু, আতা আর আম গাছের পত্রে তার কাঁঝালো সদস্ত প্রকাশ। সবুজ কচু গাছের ডগায় তার আন্তরিক আলিঙ্গন।

আমার সামনে বসে মতিভাই পত্রিকা পড়ছিলেন। চুপচাপ অনেকক্ষণ সময় চলে গেলো। আকারহীন নৈশকের ক্যানভাসটাকে হঠাৎ কথার ধ্বনিত্তে রঙিন করতে চাইলেন তিনি।

তারপর, তোমার খবরাখবর কী ?

আমার ? আমার তো কোন খবর নেই !

আমার এ ধরনের কাব্যিক ও দার্শনিক টাইপের উত্তরগুলোকে আমি ভালবাসি ! কেননা ওদের আঘাতে কেউ আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। আমার দৈন্যতাকে ঢাকার এর চেয়ে বড় কৌশল আর কী আছে।

আলতাফ এলো। বললো, চল ক্যারাম খেলি।

হ্যাঁ চল। আমি উৎসাহিত হলাম।

অতএব, খেলা চললো।

কিন্তু খেলা জমলো না। কেননা, আমি শুধু হেরে যাচ্ছিলাম। আগে হেরে গেলে এমন জিদ হতো, ওকে মনে হতো শত্রুর মতো। অগ্নায়ভাবে জিততে গিয়ে গুটি ছড়িয়ে রাগে শুধু জ্বলতাম। কিন্তু আগে আমি জিততামও। বেশীর ভাগই আমি জিততাম। নাজমা, জ্যোৎস্না'পা মতিভাই ওরা সবাই প্রশংসা করতো আমাকে। অথচ আজকে আমি হেরে যাচ্ছি।

কিন্তু হেরে যাবার দুঃখ বা জিতে যাবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আজ আর কোনোটাই অল্পভব করতে পারলাম না।

মতিভাই বললেন, আমি ওর সাথে একটু খেলি, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু পরাজিত হতে এবং পড়ে পড়ে মার খেতে দেখে তার পৌরুষ বোধ হয় জেগে উঠেছিলো।

মতিভাই-এর সঙ্গে আলতাফ ভালো পারছিলো না। তখন নাজমা এলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলো।

জ্যোৎস্না'পাও এলো।

আমি কম চেনার মতো হেসে বললাম, কেমন আছেন ?

চাকরী করে কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে, বাব্বা !

কই না তো। সহজ হতে চাইলাম আমি।

পরীক্ষা দাও নি কেন ?

পরীক্ষা ? মাছুষের জীবনটাই তো একটা চরম পরীক্ষা। আবার তেমনি করে হাসলাম।

ড্র্যাংস্মা'পা কি ভেবেছিলেন জানি না।

নাজমা খেলা দেখতে বসলো, এখন তোমাকে একটা নীল গেম দেয়। যেতো ভাইয়া !

এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললো : আপনি খুব ভালো পারেন, না ?

আমি ? এককালে পারতাম।

আমি চেয়ারে বসে বসে ওদের খেলা দেখছিলাম। আর হারিয়ে যাওয়া ক্যারামের গুটিগুলি চেয়ারের তলা, চৌকির কোণা, আলমারীর পেছন থেকে সংগ্রহ করে দিচ্ছিলাম শুধু।

আর তাকিয়ে তাকিয়ে বাইরেটা দেখছিলাম, কবে এই ছুপুরের ঝাঁঝালো রোদ কমে গিয়ে অপরাহ্ন আসবে—সেই বিকেল বিকেল প্রদোষ লগ্ন! নারকেল গাছের চিরল পাতার চিকণ বিলম্বিত ছায়া কবে রান্নাঘরের টিনের চালে আলিঙ্গন দেবে ?

আমার কানে শুধু ক্যারামের খট্ খট্ শব্দ, মারভেলাস, এক্সেলেন্ট, ফার্স্ট ক্লাস, শট্ শট্, এই আর একটু হলেই বাজী মেরে দিয়েছিলাম—ইত্যাকার শব্দগুলো যেন এক দেয়ালের ওপার থেকে গুঞ্জন ধ্বনির মতো ক্ষীণ হতে হতে কানে এসে আঘাত করছিলো। সবাই বাজী মেরে দিচ্ছে।

চমৎকার !

আমিই শুধু হেরে গেলাম।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □





আমি স্বপ্নের ভেতর থেকে উথিত হই, কিম্বা কোন গভীর বোধ থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ, আমি একটি কামজ যন্ত্রণার আর্তনাদ মগ্নিত, শয়তানের মত পবিত্র, ঈশ্বরের মত নির্বাসিত একক সত্তা। আমি এক এবং অভিন্ন আমার আত্মার ভিতর, আমার রক্তের ভিতর, গভীর শব্দের ভিতর। আমাকে বিচ্ছিন্ন থেকে সমন্বয়ের অতলাস্তে টেনে আনতে পারলে না, পৃথিবী হে—হে আত্মবদ্বিক পারিপার্শ্ব। আমি অবিস্থানীয় বিশ্বাসেব অমোঘ শক্তির ভ্রাস্ত দেবশিশু—স্বর্গ বিচ্যুতির ভয়াল গহ্বর—মাছুষ, যার দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ, দুই কান, এক নাক। স্বাতন্ত্র্যের অহুযজ্ঞ বিশ্বের আর আর জীব থেকে—প্রকৃতি থেকে।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমি প্রপাত সম যন্ত্রণার তাঁর আর্তনাদে দ্বিখণ্ডিত—আমার অবিচ্ছিন্ন সর্বাঙ্গ—অভিন্ন আত্মা—কুশ্রমের মত নির্মল: মাধবীর মত বোধির বিশ্বাস। আমি স্পষ্ট স্তনতে পাচ্ছি সহস্র লক্ষ দানবীয় পদধ্বনি আমার রক্তের ভেতর।

আমি স্তনতে পাচ্ছি, আমার মা, আমেনা নান্নী সেই মহিলা, যার দশমাস দশদিন যন্ত্রণার কারণ হয়েছিলুম একদা, তার অহুচচারিত কর্তৃত্বের। আমি সজাগ হলাম,—আমার সমস্ত সত্তার ভেতর—সমস্ত রক্তের ভেতর, দারুণ স্বেচ্ছাচারের বাসনায় উত্তেজিত এই ক/১ মিরাগুা লেনের আধা অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে, যার পাশের ঘরে আমার মা নান্নী সেই মহিলা শায়িত।

অর্থাৎ অপর একজনের শয্যার অহুযজ্ঞ, যাকে আমি প্রায়শই দেখি, যিনি আমার কোন কালেই জনক নন—অথচ অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী। আর যিনি আমার জন্মের ছবিসহ লগ্নে শুধুমাত্র পিতৃশ্বের পরিচয়টুকু দিতে স্বীকৃত হয়েছেন

এবং সেই মহিলাকে যার অহুগ্রহের গর্ভে আমার জন্ম, কেবল মাত্র আইনের ফাঁকটুকু পূর্ণ করে অবাধ যাত্রার স্বীকৃতি দিয়েছেন তার অর্থের যোগানদার হিসেবে। যিনি প্রথ্যাত চিত্রাভিনেত্রীর গৌরব অর্জন করেছেন পোস্টারের রঙ্গিন কলায়, যার পরিপুষ্ট স্তন্যভারে ( মা আমাকে কমা কর ) আমারও ইচ্ছা জাগে মুর্ছা যেতে। আমি এমনতর সত্যের ভিতর যেতে চাইনি। অথচ আমাকে যেতে হয়। এমন নির্ভুরতার ভেতর যেতে ছিলুম কুণ্ঠিত এবং ছিলুম এসব থেকে বিরোধী, অথচ, হে ঈশ্বর, পরম বজুর মত তোমার শত্রুতার ছুরি বসিয়ে দিলে শয়তানের মত আমার পবিত্র বিশ্বাসের বৃকে। জঘন্য পৈচাশিক উন্নততায়, নির্ভুরতার পরম নিষ্ঠায় ফেড়ে ফেললে আমুণ্ড। আমি দেখলুম তাল তাল অঙ্ককার নগরী ও রক্তাক্ত সত্যের উজ্জ্বল শহর।

বাইরে এখন অবিশ্রান্ত বর্ষণ। তাণ্ডব শব্দের বাজনা। হে ঈশ্বর, এই যে আমি, আবুল ফরহাদ নামক ষোল বছর বয়স্ক সচ ইন্সকুল ডিক্রিয়ে কলেজ পাওয়া যুবক, স্পষ্ট স্তন্যতে পাচ্ছি আমার এই পাশের ঘর থেকে উখিত খাটের অস্বাভাবিক, কর্কশ, অথচ ছন্দবদ্ধ শব্দ। তাকে তুমি ডুবিয়ে দাও। ভাসিয়ে দাও ঐ তাণ্ডব শব্দের বাজনে। আমি এসব থেকে বধির হ'তে চাই। ওহে আমার তৃষ্ণার্ত হৃদয়, আবুল ফরহাদ নামক ষোল বছর বয়সের যুবক যন্ত্রণা—তুমি কি পারনা বধির হ'তে শব্দগুঞ্জের ছন্দিত গীতি কুসুম থেকে ?

আমার কৌতুহল আমাকে টেনে আনল দেয়ালের পাশে, পাশের ঘরের দিকের জানালায়—যেখান থেকে পাশের ঘরের নীল আলো এ-ঘরের অঙ্ককারকে চুম্ব খাচ্ছে অনর্গল এবং ভরিয়ে তুলছে তীব্রতর যন্ত্রণায়। আমি চোখ বঁধলুম জানালার সেই ছোট্ট ফুটোয়, যেখান থেকে যন্ত্রণা হয়ে এক ঝলক নীল আলো আমাকে জাগিয়ে দিল অবলীলায়। আমি দেখলুম—আহ্! ঈশ্বর—আমাকে বিস্ময় করে দাও, পবিত্রতায় মুড়িয়ে দাও আমার ষোল বছর বয়সের যুবক যন্ত্রণাকে। মা, অর্থাৎ আমেনা নাম্নী সেই মহিলা তার উজ্জ্বল উদ্যম শরীরে ( মা, তুমি অত জ্বোরে তাকে চেপে ধরোনা, পারবে না তার বিশাল বপূর ভার বইতে ) অনাবিল শুয়ে আছেন। চোখ দুটো আধবোজা। তার দু'টো রাঙা অধর নিয়ে মুখটা দেয়ালের দিকে ফেরানো।

ঈশ্বর, আমাকে এই মুহূর্তে বধির কর এবং অন্ধ। আমার সমস্ত শরীর দগদগে ঝায়ে ভরিয়ে দাও। আমার সমস্ত সৌন্দর্যবোধ কুৎসিত বস্ত্রাবরণে ঢেকে রাখ। মা আমি তোমার বৃকের চপলতা মাপব এবং অধরের উষ্ণতা। ইস্! আমার

ঘোল বছর বয়সের যুবক যজ্ঞা—মা, তোমাকে কামনার কাদায় কেমন করে আমি সিন্ত করার ভাবনা ভাবতে পারি? শাহানা, ক/২ এর ওহে উজ্জল মহিলা, তুমিও কি এমন করে উজ্জল শাদা উরু দেখাতে পার? কিছা পার কি উরুতে লতিয়ে নিতে আর কাউকে?

গির্জার পেটা ঘণ্টিতে ভোর পাঁচটা শব্দ তুলল এবং পাখি জাগল শব্দের ভারে। আমি সরে এলুম মাথার দু'পাশের রগ চেপে। পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ জাগল। বাইরে কি এখনও বৃষ্টি আছে? হয়তো বেরিয়ে গেল বসন্তমুখে সেই ভদ্রলোক। (আমি কি যিশু হয়ে গেছি, হা ঈশ্বর!)

মা তোমার কষ্ট হয় না এমনভাবে বিশাল বপুব ভার সহিতে! আমাকে যিশু করে দাও ঈশ্বর, আমি মুক্তির বৃকে স্বাক্ষর আঁকবো। আমার ভাবনার চিত্রলেখা থেকে এই মুহূর্তে সরিয়ে দাও আমেনা নাম্নী উদ্যম শরীর জননী ও বসন্তমুখে সেই ভদ্রলোককে (?)।

আমি বেরিয়ে এলুম দরজা খুলে—বাত্যাবিধ্বস্ত। আমার সন্তায় ঘোল বছর বয়সের যুবক যজ্ঞা। শাহানা, এই মুহূর্তে তোমাকে পেল আমার কামনার কাদায় ভিজিয়ে দেবো অবলীলায়।

পাশের ঘরের দরজার সম্মুখ দিয়ে চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। বেশ কিছু আগে বেরিয়ে গেছে বসন্তমুখে সেই ভদ্রলোক (?)। চাপানো দরজার সম্মুখে দাঁড়ালুম।

ওহে আমার ঘোল বছর বয়সের যুবক যজ্ঞা তুমি দরজা মেলোনা। কেন না তুমি এখনও মাতাল, বোধের ভিতর, উষ্ণ তোমার রক্তের ভিতর। আমুণ্ড কামনার কাদায় সম্মুখে শায়িতা মহিলাকে ভিজিয়ে দিতে কুণ্ডা বোধ করবে না। তখন তুমি বিপন্ন হবে! বিপন্ন হবে!

আহা, আমি বিপন্ন হবো,—আমার কৌতূহলের কাঁপা হাত আলতো ঠেলা দিল দরজা। মুহূর্তে—আর্ত রক্তের চিংকারে স্তম্ভিত হতে হ'ল আমাকে।

আমার সম্মুখে শায়িতা—হা ঈশ্বর, আমাকে অঙ্ক কর এবং বধির—ক্রিপ্র হাতে শরীরের উপর টেনে নিলেন চাদর। সন্দেহের দুই চোখে অনর্গল বিদ্ব করতে লাগলেন। আমি অস্বস্তির ভেতর ঘামতে লাগলুম। কেননা আমার রক্তের সমস্ত উষ্ণতা ভেসে যাচ্ছে। অবশ হলে যাচ্ছে আমার বিদ্রোহের সত্তা। প্রজ্বলনের শিখারা।

হা ঈশ্বর আমি কি শয়তানের দ্বার হয়ে গেছি? আমার শরীরের রক্তের

ভেতর কি একটুকরো আশুভ ছড়িয়ে দিতে পারে না মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনাকে ? আমার সম্মুখে শায়িতা, বিশ শতকের গৌরবান্বিতা অভিনেত্রী, যে আমার পবিত্রতায় ভরিয়ে দিয়েছে মৃত্যুময় পাপ ও স্বপ্ননের সমস্ত সম্ভাবনা। মা আমাকে ক্ষমা কর! আমার এ হাত যদি হঠাৎ সামর্থ্যে বলিষ্ঠ হয়ে ছুটে যায় তোমার রূপালী কণ্ঠের কাছে, যদি হঠাৎ শিলা অক্টোপাণের মত জড়িয়ে ধরে তোমার কণ্ঠনালী এবং তোমার শরীর যদি বরফের মত হয়ে যায়, তবে ক্ষমা করে দিও। কেননা আমার নিরবধি বোধের অভ্যন্তরে তোমার ঐ মুখাবয়ব ছবিসহ।

আমার এবং সম্মুখে শায়িতা আমিনা নাম্নী জননীর মধ্যের দূরত্বের নিঃশব্দ বিস্ময় একটি কালো সাপ হতে ক্রমাগতসরমান। তার বন্ধিমতায় ছন্দের সমাহার। লবলকে জীব। তীক্ষ্ণ চোখে দৃষ্টির বলিষ্ঠতা। শাহানা, যে সাপের শীতলতায় আমি কেঁপে উঠি তোমার বুকের নিষিদ্ধ অংশের কথা ভাবলে—তোমার বিস্মিত রূপালী মাছের কথা ভাবলে, আমাকে সেই সাপ জড়িয়ে নিতে চায় তার আপন কুণ্ডলীর মধ্যে। পাকানো বিড়ার প্রকোষ্ঠে।

: কি হয়েছে ফরহাদ ?

: কাল রাতে সারাক্ষণ ভীষণ বিষ্টি হয়েছে মা ?

পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেলাম। জানি তার সন্দেহের দুই চোখ আমাকে বিদ্ধ করছে অনর্গল। তবুও আমি এগুবো। হে আমার সামর্থ্যের হাত তোমার পেশীর গ্রন্থি থেকে তুমি উঠে এসো আমার হাতের মুঠোয়। ঐ কণ্ঠনালী থেকে তুমি কেড়ে নাও সমস্ত শব্দের ব্যঞ্জনা। সমস্ত ছন্দের স্পন্দন। ঈশ্বর এই মুহূর্তে আমার সমস্ত পাপবোধ থেকে উৎসারিত হও সত্যের সম্ভাষণে। ব্যাকুল প্রস্রাবনায়।

: হাঁ ! কিন্তু তাতে কি হয়েছে ?

: না, আমি তা তোমাকে বোঝাতে পারব না, কেননা আমার সমস্ত বোধ ধ্বংসনাল হয়ে গেছে। গাঢ় দৃষ্টান্ত নীল।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত শক্তি শীতল হয়ে গেছে। না, কোন শক্তিই আর নেই। পেশীর কোষে কোষে ব্যথা। এবং আমার সমস্ত সত্তা, বোধ, অক্ষমতার আর্তনাদে ভেসে গেল। কান্নায় গড়িয়ে গেল আমার রক্তের উষ্ণতা সরল শিশুর মত : আমি সারা রাত ঘুমতে পারি নি মা ! সারা রাত ঘুমতে পারিনি।

বিশ শতকের গৌরবান্বিতা হাত যেনো মাথার উপর নেমে এলো আশ্রয়ের ছায়া হয়ে, আমার রক্তের অক্ষমতায়, আমার সম্ভাব ব্যর্থতায়, আমার সত্যের পরাজয়ে। যে হাত শাহানা হয়ে ছায়া দেয় প্রতিদিন, প্রতি ক্ষণে, প্রতি পলে এই বিশ শতকের উপর, প্রতিটি মাহুঘের উপর, প্রতিটি বোধ ও সত্যের উপর ক্ষমাহীন।

আমি ভেসে গেলাম প্রতিকারহীন সেই নীতল সম্ভায়ণে, সত্যশবের মত।





অমিয়া বলল, পয়সা কি কামড়াছিল। কয়লাওলাব কাছে এখনো ছু মণের দাম বাকি। তাছাড়া, ওই কটা আলুতে কি হবে, ঘরে যা আছে তাও দিতে হবে দেখছি। এরপর সে বলল, টাটকা খুব, চর্বিও কম দিয়েছে। পুতুল বলল, রোববার বোঝা রেঁধেছিল তৃষ্টির নতুন বৌদি। খুব বেশি ঘি দিয়েছিল, তাই ক্যাটক্যাটনি শুরু করেছিল শাশুড়ি। এই নিয়ে সে কি ঝগড়া মায়েতে ছেলেতে। তারপর সে বলল, আমি কিন্তু রাঁধব বলে দিলুম, বাবুদা বলছিল পাঞ্জাবীর হোটেলের নাকি দারুণ রাঁধে, আজ আহুক না একবার দেখিয়ে দোবোধন।

চাঁদু বলল, আগে জানলে জোলাপ নিয়ে পেটটাকে রবারের করে রাখতুম। খানিকটা কাল সকালের জন্তে তুলে রেখে, চায়ে বাসি রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে তো জিভে চড়া পড়ে গেল। শেষকালে সে বলল, যেই রাঁধো বাবা, জবাবুলের রসের মতো রঙ হওয়া চাই কিন্তু।

রাধু এখন বাড়ি নেই। পাঁচ বছরের খোকন শুনে শুনে কথা শেখে, সেও প্রথমতর হাঁটু জড়িয়ে বলল, বাবা আমি খাব মাংস।

ওরা যাই বলুক প্রথম লক্ষ্য করছিল চোখগুলো। কিকোচ্ছে বরফ-কুটির মতো। ওরা খুশি হয়েছে। ব্যস, এইটুকুই তো সে চেয়েছিল, তা না হলে মাসের শেষ শনিবারে একদম পকেট খালি করে ফেলার মতো বোকামি সে করতে যাবে কেন। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথটা আরো ছোট হলে যায় শোভাবাজারের মধ্যে দিয়ে গেলে। বিয়ের পর কয়েকটা বছর বাজারের মধ্যে দিয়েই অফিস থেকে ফিরত, সেও প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। তারপর বাবা মারা গেলেন, দাদায়া আলাদা হলেন, প্রথমও এখনকার বাড়িটার উঠে এল। কবে উঠে এল সে

তারিখ পাওয়া যাবে ভব শ্রীমানির খাতায়। সেই মাস থেকেই অমিয়া মাসকাবারি সপ্তা বন্ধ করল, ওতে বেশি বেশি খরচ হয়। তারপর কালেভদ্রে দরকার পড়েছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার। আজ গরমটা যেন অগ্নিদিনের থেকে বেশি চড়ে উঠেছে, জুতোর তলায় পিচ আটকে যাচ্ছে, কোনোরকমে বাড়ি ফিরলে বাঁচা যায়।

ডাব বোঝাই একটা ঠেলা গাড়ি পথ জুড়ে মাল খালাস করছে, চারধারে যেন কাটামুগুর ছড়াছড়ি। তার ওপর বাজারের আন্তাকুড়টাও জিনিসপত্রের দামের মতো বেড়ে এসেছে গেট পর্যন্ত। পূর্ব দিকের গেট দিয়েই বেরোনো ঠিক করল প্রমথ। দুটো রকের মাঝখানের পথটায় থৈ-থৈ করছে জল। চাপা-কল থেকে জল এনে ধোয়াধুয়ি শুরু করেছে দুটো লোক। কাঁটার জল যেন কাপড়ে না লাগে সেই দিকে নজর ছিল। তাহলে আঁশটে দাগ তুলতে হয়তো ঘুম ভাঙিয়ে পুতুলকে কলতলায় পাঠাতে হবে, তাছাড়া সাবানের যা দাম।

আর দু'পা গেলেই মাছের বাজারটা শেষ হয়, তখুনি আচমকা জল ছুঁড়ল লোকটা খপাস করে। কাপড়ে লাগে নি, কিন্তু লাগতে তো পারত। বিরক্ত হয়েই সে পিছন ফিবেছিল, আর অবাক হল পিছন ফিরে।

বাজারের শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল প্রমথ, যতদূর দেখা যায় শ্রায় শেষ পর্যন্ত এখন চোখ চলে গেল। ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে, অদ্ভুত লাগল তার কাছে।

সকালে মাছির মতো বিজবিজ করে, তখন বাজারটা হয়ে যায় যেন কাঁঠালের ভূতি। ঘিনঘিন করে চলতে ফিরতে। আর এখন, চোখটা শুধু যা টক্কর খেল কচ্ছপের মতো চটমোড়া আনাছের টিপিতে, নয় তো সিধে মাছের বাজার থেকে ফলেব দোকানগুলো, দোকানে ঝোলানো আপেলগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আপেল না হয়ে গ্রাসপাতিও হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মীপূজার দিনটায় একবার ঔদিক মাডাতে হয়! ফুল, পাতা ওই দিকটাতেই পাওয়া যায়, আর তখনই চোখে পড়ে ঝোলানো আপেল, সবরি কলার ছড়া, আনারস আর শীতের সময় চুড়োকরা কমলা লেবু। শীতের কথা মনে পড়লেই কপির কথা মনে আসে, আগেকার দিনে সের দরে কপি বিক্রি হত না। নাকের সামনে বাঁধাকপি লোফালুফি করতে করতে সন্ন্যাসীচরণ হাঁক ছাড়ত, থোকাবাবু এই চলল পাঁচ নম্বরী ফুটবল, হোঁকা রেঁধে খাও, গোষ্ঠ পালের মতো সঠি হবে। সন্ন্যাসীটা যেন কি করে জেনে ফেলেছিল স্কুল টিমে প্রমথ ব্যাকে খেলে, আর গোষ্ঠ পালকে তো সে পূজা করত মনে মনে। আজকাল অনেকেই নাম করেছে চাঁদুর মুখে কত নতুন নতুন নাম শোনা যায়। ওই শোনা পর্যন্ত। মাঠে যেতে আর ইচ্ছে করে না। সন্ন্যাসী একদিন ফুটপাতে

মরে পড়ে রইল। আজ্ঞবাজে জায়গা থেকে রোগ বাধিয়ে শেষকালে বাজারের গেটে বসে ভিক্ষে করত। সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে কুলদাকে মনে পড়ল প্রমথর, চেহারা কি! যাত্রাদলে বদমাইসের পার্ট করত। বাজারে, শিবরাস্ত্রিরে যাত্রা শুনেতে আসার আগে হিসেব করে আসতে হত বাবার কাছ থেকে কতগুলো চড় পাওনা হবে। কুলদার হাতে আড়াইসেরী রুইগুলোকে পুঁটি বলে মনে হত। ওর মতো ছড়া কাটতে এখন আর কেউ পারে না। আজকাল যেন কি হয়েছে, সেদিন আর নেই। গুইরাম মরে গেছে, ওর ছেলে বসে এখন। ছেলেটা বখা। অথচ গুইরামের পানে, পোকা হাজা কিম্বা গোছের মধ্যে ছোট পান ঢোকানো থাকত, কেউ বলতে পারত না সে কথা। গুইরামের দোকানের পাশে এখন একটা খোঁটানি বসে পাতি-লেবু নিয়ে, অমিয়ার জন্ত রোজ লেবু দরকার, একদিন ওর কাছ থেকে লেবু কিনেছিল প্রমথ। মাস ছয়েকের একটা বাচ্চা, বয়স দেখে মনে হয় ওইটেই প্রথম, কোলের ওপর হামলা-হামলি করছিল, বৃকের কাপড়ের দিকে নজর নেই। ওর কাছ থেকে আর কোনোদিন লেবু কেনে নি সে, দুনিয়ায়ই মাছষের যেন হজমের গোলমাল শুরু হয়েছে, আর লেবুও যেন এতবড়ো বাজারটায় ওই এক-জায়গাতেই পাওয়া যায়। কতদিন সে মনে মনে গালাগাল দিয়েছে লেবুউলীকে। দিন দিন যেন কি হয়ে উঠছে। বৃড়োখাড়ীদের কথা নয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু কচিকাঁচারাতো বাজারে আসে, বাজার পাঁচটা লোকের জায়গা।

প্রমথর বেশ লাগছে এখন বাজারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। ছোট বেলার অনেক কথা টুকটাক মনে পড়ছে। পেছাপাখানার সামনে চুনো মাছ নিয়ে বসে একটা বৃড়ী, ওকে দেখলেই আবছা মনে পড়ে মাকে। বোকার, মতো হাসে, আর পায়ের আঙুলগুলো বাঁকা। ওখানটায় এখন থৈ-থৈ করছে চাপা-কলের জল। মাকে পুড়িয়ে গজায় চান করেছিল সে, সেই প্রথম গজায় চান করা। তখন কত ছোটই না ছিল, ষ্টিমারের ভেঁা শুনে জলে নামতে ভয় করেছিল তার। মাসের শেষে বাজারের ওইদিকটায় আর যাওয়া হয় না। তখন আলু, পান আর দু-একটা আনাজ কিনেই বাজার সারতে হয়। টাছুটাই শুধু গাঁইগুঁই করে, কেমন যেন বাঙালে স্বভাব ওর, মাছ না পেলেই পাতে ভাত পড়ে থাকে। খিটিমিটি লাগে তখন অমিয়ার সঙ্গে। চালের সের দশ আনা, পাতে ভাত ফেলা কেই বা সহ করতে পারে। পরসারোজগার করতে না শিখলে টাছুটা আর শোধরাবে না। রাধু একটা টিউশনি পেয়েছে। তবে আই এ-টা পাস করলে অন্তত গোটাকুড়ি টাকা মাইনে হত। ওর কিম্বা পুতুলের খাওয়ার কোনো



ঝামেলা নেই, অমিয়ারও না। পাতে বা পড়ে থাকে অমিয়া পুতুলকে তুলে দেয়, বাড়ের সময় মেয়েদের খিদেটাও বাড়ে। শিগগিরই আর একটা দায় আসবে। পুতুলের বিয়ে। মুখটা মিষ্টি, রঙটা মাজা, খাটতে পারে, দেখেওনে একটা ভালো ছেলের হাতে দিতে হবে।

হটিয়ে বাবুজী।

এবার এইখারটা ধোয়া হবে, পিছিয়ে এল প্রমথ। সেই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। একটা বুড়ো বসত ওখানে। পেয়ারা, আমড়া, কদবেল ছোট্ট ঝুড়িতে ঝুড়িয়ে বুড়োটা দুপুরে বসে বসে ঝিমোত। সে কি আজকের কথা! বাবা মারা যাবার অনেক আগে, বড়দাব তখন খার্ড ক্লাস, যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সর্ক চালের দর এগারো টাকা, কাপড়ের জোড়া বোধহয় আট টাকায় উঠেছিল, সে আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। স্কুলের টিফিনে একটা আধলা নিয়ে তিন-চারজন তারা আসত, পয়সায় আটটা কাঁচা আম পাওয়া যেত। আর এ বছর দশ পয়সা জোড়া দিয়ে একদিন মাত্র সে কাঁচা আম কিনেছে, তাও কুসিকুসি। আহা, সে কি দিন ছিল। প্রমথর ইচ্ছে করে বুড়ো যেখানটায় বসত সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। ওখানে তখন রক ছিল না, দেয়ালের খানিকটা বালি-খসা ছিল। দুটো ইঁটের ফাঁকে গর্তটায় দোক্তা রাখত বুড়োটা। গর্তটা এখনো আছে কিনা দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা খুব ছেলেমানুষের মতো। এত বছর পরেও কি আর গর্তটা থাকতে পারে, ইতিমধ্যে কতই তো গুলট-পালট হয়ে গেছে, ভেঙেছে, বেড়েছে, কমে নি কিছুই। তবু এই দুপুরের বাজারের চেহারাটা একরকমই আছে। ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, বুকটা টনটন করছে, তবু ঝরঝরে লাগছে গা-হাত-পা।

এই যে আস্তন বাবু।

প্রথম পিছন ফিরল। গোড়ার দোকানটা লক্ষ্য করে সে এগিয়ে এল। সত্বে ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়েছে। পাতলা সিল্কের শাড়ি-জড়ানো শরীরের মতো পেশীর ভাঁজগুলোকে রাঙ্কুসে চোখে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

কত করে দর যাচ্ছে।

তিন টাকা।

ভাবলে অবাক লাগে। চাঁদুর মতো বয়সে ছ-আনা সের মাংস এই বাজার থেকেই সে কিনেছে। তখন প্রায় সরই ছিল মুসলমান কসাই। ছেচল্লিশ সালের পর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

একসের দি ?

উৎসুক হয়ে উঠেছে লোকটার চোখ আর ছুরি। এর মতো মুন্নাও হাসত, তাব একটা দাঁত ছিল সোনার, তবে মুন্নাকে কিছু বলার দরকার হত না, গর্দানা থেকে আড়াই সের ওজন করে দিত। সেই মুন্না বৃড়া হল, তার ছেলে দোকানে বসল। তখন সংসার আলাদা হয়ে গেছে। দেড় সের নিত তখন প্রমথ। ঘোলাটে চোখে তাকাত বৃড়া মুন্না, চোখাচোখি হলে হাসত, চোখ বিকিয়ে উঠত। রায়টের সময় মুন্নাকে কারা যেন মেরে ফেলল।

একসের দি বাবু?

না তিন পো, গর্দানা থেকে দাও।

ওজন দেখল প্রমথ, যেন সোনা ওজন করছে। পাসানটা একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। থাকগে ওরা লোক চেনে। তিনটে টাকা পকেটে ছিল। বাকি বারো আনা থেকে আলু, পেঁয়াজ কিনতে হবে। মাইনে হতে এখনো ছ-সাত দিন বাকি। ট্রামভাড়ার পয়সাও রাখতে হবে। মাংসের ঠোঙাটা তুলে যাবার জন্তু পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল প্রমথ।

মেটুলি দিলে না যে, তিনটাকা দর নিচ্ছ, আমরা কি মাংস কিনি না ভেবেছ। লোকটা একটুকরো মেটুলি কেটে দিল। অনেকখানি দিয়েছে। অমিয়া দেখে নিশ্চয় খুশি হবে।

রাস্তায় পড়েই প্রমথর আবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। বাবার সঙ্গে ভবর জ্যাঠা হরি শ্রীমানির দোকানে এসেছিল এক সন্ধ্যায়। পাশেই ছিল মাটির খুরি-গেলাসের দোকান। তখন বিয়ের মরশুম, একহাজার খুরি-গেলাস কিনল কারা যেন। একহাজার লোক খাওয়ানোর কথা তো এখন ভাবাই যায় না। স্বদেশ কনফার্মড হবার পর বিয়ে করল। বরযাত্রী হয়েছিল আত্মীয়স্বজন, অফিসের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মিলিয়ে তিরিশ। কতাপক্ষ মাংস খাইয়েছিল। কায়দা করে রাঁধলে মাছের থেকে সস্তা হয়। স্বদেশের বিয়েও আজ সাতমাস হয়ে গেল। ছেলেও নাকি হবে। তবু তো সে সাতমাস আগে মাংস খেয়েছে। কিন্তু বাড়ির ওরা, অমিয়া, পুতুল! রাধু হত্তে হয়ে চাকরি খুঁজছে, একটা পয়সাও বাজে খরচ করে না। চাঁহু ভালো ফুটবল খেলে, হয়তো বন্ধুরা খাওয়ায়ও। ছেলেটা ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে, আর খেতেও পারে। এইটেই তো খাওয়ার বয়স। অমিয়ার খুড়তুতো বোনের মেয়ে শিলুর বিয়ের কথা শুনে কি লাফালাফিটাই জুড়েছিল। নেমস্তম্ভে অবশ্য যাওয়া হয় নি। অন্তত একটা সিঁহর-কোটোও তো দিতে হত। চাঁহুটা আজ খুব খুশি হবে, ওরা সকলেই খুশি হবে।

বড় রাস্তার ঠিক মধ্যখানেই কালীমন্দির। হাতে মাংসের ঠোঁড়। চোখ বন্ধ করে মাথা ঝুঁকিয়ে দূব থেকেই প্রণাম জানিয়ে প্রমথ রাস্তা পার হল। পর্দা-ফেলা রিক্‌শা থেকে গলা বার করে দুটি বৌ প্রমথর পাশ দিয়ে চলে গেল।

সিনেমা হলগুলো আজকাল এয়ারকন্ডিশন করা হয়েছে। প্রমথ ভাবতে শুরু করল, তা না হলে এই অসহ দুপুরে পারে কেউ বন্ধ ঘরে বসে থাকতে। তবু শখ যাদের আছে তারা ঠিক যাবেই, অমিয়ার কোনো কিছুতেই যেন শখ নেই আজকাল। অথচ মেজবৌদি, তার আপন মেজদা যিনি ডাক্তার হয়েই আলাদা হয়ে গেছেন, তার বৌ এখনো নাকি এমন সাজে বে ছেলের জন্তে শাড়ী দেখতে গিয়ে মেয়ে-বাড়ির সকলে গা টেপাটেপি শুরু করেছিল। মেয়েকে ফিরে সাজাতে হয়েছিল ওর পাশে মানাবার জন্তে। এ-খবর অমিয়াই তাকে দিয়েছিল। ওর শখ এখন এইসব খবর জোগাড় করাতে এসে ঠেকেছে। অথচ সাজলে এখনো হয়তো পুতুলকে হার মানাতে পারে।

গলিটা এবার দেখা যাচ্ছে, ওখানে ছায়া আছে। এইটুকু শখ জ্বোরে পা চালান প্রমথ।

ভাবনারও একটা মাথামুণ্ড আছে। অমিয়া বতই সাজগোজ করুক পুতুলের বয়সটা তো আর পাবে না। সতেরো বছরের একটা আলাদা জেলা আছে, দেখতে ভালো লাগে। অমিয়ার বিয়ে হয়েছিলো সতেরো বছরে, সেও পুতুলের মতো লাজুক আর ছটফটে ছিল।

হাড়গোড়সার ছেলের হাত-পায়ের মতোই স্নাতনো গলিটা। হলুকা বাতাস পর্যন্ত যেন সঁাতসেতিয়ে যায়। এ গলিতে ঢুকলে গায়ে চিটচিটে ঘাম হয়। কৌচাটা পকেটে থাকছে না আলু আর পেঁয়াজের জন্তে। পেটের কাপড়ে স্ত্রীজে দিতে একটুকু দাঁড়াল প্রমথ। ওপর থেকে উকিল বাবুর বিধবা বোন দেখছে। প্রমথ ঠোঁড়ার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ওপর থেকেও বোঝা যায় এর মধ্যে মাংস আছে। নন্দীবাড়ির সঙ্গে ওর খুব ভাব। ছোটমেয়ের শশুর বুঝি কোন এক উপমন্ত্রী বন্ধু। তাই নন্দীগিন্নি ধরাকে সরাসরি দেখে, অমিয় দুচক্রে দেখতে পারে না এই মাহুশগুলোকে। উকিলবাবুর বোনের দেখা মানেই পাড়ার সব বাড়ির দেখা। খবরটা শুনে অমিয়া নিশ্চয় খুশি হবে।

বাড়ি ঢোকান মুখে দোতলার মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা হল প্রমথর। এ বাড়িতে অন্নদিন এসেছে। মুখচোরা, ওর বৌদ্রর মতোই মেশে না কান্নর সঙ্গে। শুধু কবিতা আর রাজনীতির কথায় মুখে খই কোটে।

দেখেছেন তো আবার স্ট্রাইক কল করেছে, বেম্পতিবার ।

শুনছি বটে, আপিসে বলছিল সবাই, যা মাগ্‌গীগণ্ডার বাজার, আগের বার এগারো সিকে ছিল, এখন তিনটাকা ।

ঠোঙা-ধরা হাতটা দোলাল প্রমথ । কিন্তু মিহিরবাবুর নজর তাতে আটকাল না । এখন তবু তিন টাকা । এক-একটা ফাইভ ইয়ার যাবে আর দেখবেন দামও পাঁচগুণ চড়বে ।

অল্প সময় হলে মিহিরবাবু সঙ্গে একমত হত প্রমথ । কিন্তু 'সে যা চাইছিল তার ধার দিয়েও গেল না কথাগুলো । গত রোববার মিহিরবাবুদের মাংস রান্না হয়েছিল । গরম মশলা গুড়োবার জন্তে হামানদিম্বেন্টা নিয়েছিল । এখনো ফেরত দেয় নি । বোধহয় ভেবেছে, ওদের আর কিসে দরকার লাগবে, যখন হোক ফিরিয়ে দিলেই হবে । মিহিরবাবু লোক ভালো । তবু প্রমথর মেজাজ তেতে উঠল ক্রমশ ।

আরে মশাঈ স্ট্রাইক-ফ্রাইক করে হবেটা কি, তাতে পাঁচটাকার জিনিস এক-টাকায় বিক্রবে ?

কিছুটা তো কমবে ।

আপনাদের ওই এক কথা ।

প্রমথ ততক্ষণে উঠোনের কোণে রান্নাঘরের সামনের সকে ঠোঙাটা নামিয়ে রাখল । গলার আওয়াজে অমিয়া বেরিয়ে এল । তার পিছনে পুতুল আর চাঁহ । মিহিরবাবু ওপরে উঠে গেলেন । তারপর ওরা কথা বলল । ওদের চোখগুলো বরফ-কুচির মতো ঝিকিয়ে জুড়িয়ে দিল প্রমথকে ।

এইটুকুই সে চেয়েছিল । খুশি হোক অস্তুত আজকের দিনটায় । জিনিসের দাম বাড়ছে, স্ট্রাইক হবে, মিছিল বেরোবে, ঘেরাও হবে, পুলিশ আসবে, রক্তগলা বইবে—এ তো হামেশাই হচ্ছে । মানুষকে যেন একটা কামার তাতিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে বিরাট একটা ভারী হাতুড়ি দিয়ে । স্বপ্ন নেই, স্বপ্তি নেই, হাসি নেই ।

ওসব ভাবনা আজ থাক । খোকনকে কোলে নিয়ে হাসতে শুরু করল প্রমথ ওদের দিকে তাকিয়ে ।

রোদের কটকটে জ্বলুনি এখন আর নেই । বেলা গড়িয়ে এল । অমিয়া ভাড়া দিচ্ছে দোকানে যাবার জন্তে । ঘরে আঁদা নেই । ঝিট সন্নিয়ে উঠল প্রমথ । এতক্ষণ তার মাংস কোটা দেখছিল খোকন । চাঁহ বিকেলের শুরুতেই

বেরিয়েছে। কোথায় ওর ফুটবল ম্যাচ আছে। বাটনা বাটতে বাটতে পুতুল খোঁজ নিচ্ছে চৌবাচ্চার। দেরি হলে বালতিতে শাওলা স্কন্ধ উঠে আসে।

পাড়ার মুদির দোকানে আদা পাওয়া গেল না। তাই দূরে যেতে হল প্রথমথকে। ফেরার সময় খোকনকে দেখল রাস্তায় খেলছে। ওর সঙ্গীদের মধ্যে ভুবন গয়লার নাতিকে দেখে ডেকে নেবার ইচ্ছে হল। তারপরেই ভাবল, থাক, এখন বাড়ি গিয়েই বা করবে কি। তাছাড়া, ঘুপচি ঘরের মধ্যে আটকা থাকতেই বা চাইবে কেন। খোকনকে ভালো জামা-প্যান্ট কিনে দিতে হবে, উকিলবাবুর ছেলেদের সঙ্গে যাতে দিশতে পারে। উকিলবাবুর ছেলেরা বাসে স্কুল যায়, বেশ ইংরিজিও বলতে পারে এই বাচ্চা বয়সে।

নাংসে বাটা-মশলা মাখাছিল অমিয়া। প্রথমথকে দেখা মাত্রই ঝোঁঝে উঠল। এত দেরি করে ফিরলে, এখন বাটবে কে।

কেন, পুতুল কোথায় ?

বিকেল হয়েছে, তার কি আর টিকি দেখার জো আছে। সেজেগুজে বিবিটি হয়ে আড্ডা দিতে গেছে।

আচ্ছা, আমিই নয় বাটছি।

বঁটি পাতল প্রথম আদার খোসা ছাড়াবার জন্তে। অনেকখানি শাঁস উঠে এল খোসার সঙ্গে। সাবধানে বঁটির ধার পরীক্ষা করল, ভোঁতা। তাহলে অত পাতলা করে খোসা ছাড়ায় কি করে অমিয়া, অভ্যাসে! অভ্যাস থাকা ভালো, তাহলে সময় কেমন করে যেন কেটে যায়। অবশ্য আলু বা আদার খোসা ছাড়িয়ে কতক্ষণ সময়ই বা কাটে। তবু ঘর-সংসার, রান্নাবান্না, ছেলেপুলে মানুষ করা, এটাও তো একরকমের অভ্যাসেই করে যায় মেয়েরা, নাকি স্বভাবে করে। অমন স্বভাবে যদি তার থাকত, প্রথম ভাবল, তাহলে বাঁচা যায়। জীবনটা যেন ডালভাত হয়ে গেছে। ওঠানামা নেই, স্বাদগন্ধ নেই, কিছু নেই, কিছু নেই, তবু কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। আশ্চর্য, এই ভোঁতার মতো বঁচে থাকারটাও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বদ অভ্যাস।

থাক, তোমায় আর কাজ দেখাতে হবে না।

অমিয়া হাত ধোবার জন্তে একটা বাটি টেনে নিল, হাতে মশলা লেগে, জলভরা বাটিটা রেখে দিল সে। শিলের ধারে আনাগুলো ঘবে, বাটতে তরু করল অমিয়া। কত সহজে কাজটা করে ফেলল ও, প্রথম ভাবল, এটাও এসেছে ওই অভ্যাস থেকে। তার মানে, ভোঁতা বঁটিতে, চুলচেরা করে খোসা ছাড়ানোর

যন্ত্রণাভোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্তেই তৈরি করে নিয়েছে সহজ উপায়। অসহ্য হয়ে উঠলেই মানুষ স্বস্তি খোঁজে, সহজ হতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টাটাও কত অল্প সময়ের জন্তে। না হলে হাত-ধোয়া জলটুকু অমিয়া তো নর্দমাতেও ফেলতে পারত।

বাড়িতেই বসে থাকবে নাকি, বেরোবে না ?

কোনো কথা বলল না প্রমথ। অমিয়া আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে।

খোকনের একটা ভালো নাম ঠিক করতে হবে।

করো না।

উকিলবাবুর ছেলের নামগুলো বেশ।

ওরা সাহেবি স্কুলে পড়ে শুনেছি, ছোটটা তো খোকনের বয়সী।

হ্যাঁ, বড়োটা শুনেছি ইংরিজিতে কথা বলতে পারে।

রামগতির পাঠশালায় দিও না খোকনকে ভর্তি করে, ছুপুরে বড্ডো জালায়।

উঠে পড়ল প্রমথ। ভেবেছিল আজ আর বাড়ি থেকে বেরোবে না। মাংস ফুটবে, ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি জড়ো হবে, গল্প হবে এটা সেটার, আসন পেতে খালা সাজিয়ে দেবে অমিয়া, একসঙ্গে সকলে খেতে বসবে গরম ভাত, গরম মাংস। অমিয়া তাকিয়ে আছে; গলায় চটের মতো ঘামাচি। মুখ ফিরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল প্রমথ।

উকিলবাবুর রকে বসে ছিলেন গৌর দত্ত। প্রমথকে দেখে কাছে ডেকে বললেন, দেখেছ কেমন গরম পড়েছে, এবার জোর কলেরা লাগবে।

নাডেচডে বসলেন গৌর দত্ত। প্রমথ ঠুঁর পাশে বসল।

শুধু কলেরা, আবার ইনফ্লুয়েঞ্জাও শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখলুম জানো—

গৌর দত্ত প্রমথের গা খেঁষে ফিসফিসিয়ে শ্রায় বে-সুরে অনিল কুণ্ডকে তার সংসার থেকে বিধবা ভাজকে আলাদা করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই সুরে বললেন, লক্ষ্য করে দেখলুম জানো, বোমাটা ফাটার পরই এই ইনফ্লুয়েঞ্জা শুরু হয়েছে, গরমও পড়েছে, ঠিক কিনা ?

হ্যাঁ, গরমটা এবারে তিষ্টোতে দিচ্ছে না।

লক্ষ্য করেছে যে বোমা সব জাপানের কাছাকাছি ফাটাচ্ছে। তার মানে কি, এতক্ষণে ত খুব ফরোয়ার্ড বলেই তো ওদের এত রাগ। আমাদের পুত্র আপিসে

একটা জাশানি আসে, ভালো ংরিজি জানে না, কথা বলতে খুব অস্ববিধে হয় পুলুর, ওতো ফাস্ট ডিভিশনে বি এ পাশ করা। তা জিন্সেস করেছিল নেতাজীর কথা। ওরা আবার আমাদের চেয়েও শ্রদ্ধাভক্তি করে। কি উত্তর দিলে জানো, বোসের মতো কেউ থাকলে তোমাদের ফাইভ ইয়ার প্র্যানগুলোয় চুরি হত না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে !

ই্যা, জিনিসপত্রর যা আক্রা হচ্ছে দিনকে দিন। মাংস তিন টাকায় উঠেছে।

এনেছ বুঝি আজ ?

সামনের দিকে তাকিয়ে চূপ করে রইলেন গৌর দত্ত। অশ্রুমনস্কের মতো লাঠিটা ঘোবাতে ঘোরাতে আবার বললেন, কি গবম পড়েছে, টিকে নিয়েছ ? খাওয়া-দাওয়া সাবধানে কোরো। ছেলেপুলেব সংসাব, বলা যায় না কখন কি হয়।

হলে আর কি করা যাবে, সাবধানে থেকেও তো লোকে রোগে পড়ে।

ওই তো ভুল করো। আজ তোমার যদি, ভগবান না করুন, ভালো মন্দ কিছু একটা হয় তখন সংসারের অবস্থাটা কি হবে ভেবেছ ?

অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল প্রমথ। এসব কথা এখন ভালো লাগছে না। মনের এমন একটা অবস্থা আসে যখন এসব চিন্তা ভালো লাগে। বোধহয় সেটা সংসারে আর কিছু দেবার বা নেবার না থাকলেই মনে জাগে। আহা বুড়ো মানুষ।

একটু চাখবেন নাকি মাংস ?

কি এনেছ, খাসি ? রাঙ না সিনা ?

গর্দীনা।

এ হে, খাসির রাঙ দারুণ জিনিস।

গৌর দত্তর গালে যেন পিপড়ে কামড়াল। চুলকোতে চুলকোতে অশ্রুমনস্ক হয়ে গেলেন।

বুঝলে, আগে খুব খেতুম। সামনে জ্যান্ত পাঠা বেঁধে রেখেই হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত উড়িয়ে দিতে পারতুম। এখন ছেলেরা লায়ক হয়েছে, রোজগার করছে, বৌদের হাতে সংসার। পুন্টুটাও হয়েছে বৌ-স্তাওটা, তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ অবস্থাটা হত না।

টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে বাস বিকল হলে যাত্রীদের মনের অবস্থার মতো আন্তে আন্তে খেমে গেলেন গৌর দত্ত।

দুঃখ হচ্ছে প্রমথর। বুড়ো মানুষটার নিজের বলতে আর কিছু নেই। এখন কোনোরকমে টেনেটুনে চিতায় গুঠার অপেক্ষা। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন

তো আর সব জ্যান্ত মানুষের মতো ওর বৃকের মধ্যেও জীবনটা ধুকধুক করবে, সাধ-ইচ্ছে তৈরি হবে, পূরণ করতে চাইবে, অথচ পারবে না। আহা বুড়ো মানুষটা! মরবেই বা কেন।

চলুন গৌরদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক গদ্বার ধার থেকে।

সে বড় দূর ভাই, তার চেয়ে পার্কে বরং গোটা কতক চক্র দিয়ে আসি।

উঠে দাঁড়াল হুজনে। রাধু বাড়ি ফিরছে। প্রমথ তাকিয়ে থাকল তার দিকে। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে ওদের পাশ দিয়ে রাধু চলে গেল।

তোমার বড় ছেলেটি ভালো।

হাসল প্রমথ।

হাঁটতে হাঁটতে গৌর দত্ত বললেন, ওরা খুঁজবে হয়তো।

পার্কে ঢুকেও জের টেনে বললেন, খুঁজলে আর কি হবে, নিজেরাই গল্পোটপ্পো করবে। আশুর মেয়েকে নাকি মারধোর করেছে শাশুড়ি, আজ ওর যাবার কথা ছিল, কি ফয়সালা হল কে জানে। আমি তো বলেছিলুম হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে আসতে। খাট বিছানা টাকা তো এজন্মে দেবার ক্ষমতা হবে না আশুর। প্রমথর এসব কথায় কান নেই, সে তখন ভাবছে পুতুল এতক্ষণে ফিরেছে ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে। উম্মন ধরিয়েছে। অমিয়া ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে কেমন করে খুস্তি ধরলে মাংস কষতে সুধিধে হয়। ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমেছে মেয়েটার গালে, কপালে, নাকের ডগায়। চোঁটীহুটো শক্ত করে টিপে ধরেছে। চুড়িগুলো টেনে তুলেছে। দপদপে স্বাস্থ্য, বেশিদূর উঠবে না। পাতলা ভাপ উঠছে হাঁড়ি থেকে, না এখনই কি উঠবে; এখনো তো জলই বেরোয় নি। খুব উৎসাহ নিয়েই মেয়েটা রাখছে। আগে তো কখনো রাখেনি। নিশ্চয় বুক ছুরছুর করছে আর আড়চোখে তাকাচ্ছে অমিয়ার দিকে। অমিয়া কি করছে? পিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে বসে দেখছে। কি দেখছে, পুতুলকে? তাই হবে, হয়তো খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে ওর কচি মুখটা আর ভাবছে হয়তো যে-কটা গয়না আছে ভেঙে কি কি গড়াবে ওর বিয়ের জন্তে। এতক্ষণে গন্ধে ম-ম করছে বাড়িটা। ধোকন নাক কুঁচকে শুঁকছে। ভালো লাগছে পঙ্কটা তাই মিটিমিটি হাসছে আর গুটিগুটি হাঁড়ির কাছে আসার তাল খুঁজছে। পারবে না, অমিয়ার নজর বড় কড়া।

দুচার দিন হয়তো বলাবলি করবে, বলবে গল্পে লোক ছিল, বেশ জমিয়ে রাখত সন্দেশটা। তারপর একসময় ভুলে যাবে। যেমন নির্মললা কি নীলুকালা মরে যাবার পর আয় এখন কেউ নামই করে না। তোমরাও তেমনি ভুলে যাবে আমাকে।



দগদগে লাল হয়ে আছে কেইচুড়ো গাছের চিমসে-কাঠি ডালগুলো। ওদের ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে কেমন অস্ত রকম লাগে। লাগে, চোখ নয় মনটা। রাধু টিউশনিতে যাবার আগে নিশ্চয় দেখেছে। দেখে কিছু বলেছে কি? বড় কম কথা বলে ছেলেটা। তেইশ বছরেই বুড়িয়ে গেছে ওর শরীর-মন। ওকে দেখলে অশ্রুতি হয়। মনে হয় হাসি-খুশি-আনন্দ যেন কিছুই নয়। জীবনটা শুধু দুখ্য, দুখ্য আব দুখ্য কাটানোর চেষ্টাতেই ভরা। অথচ ওর বয়স তেইশ। ওর বয়সটা যেন চিমসে-কাঠি ডালে ফুল ফোটার মতো। বয়সের ফাঁকফোকর দিয়ে যৌবনটাকে কেমন বুড়োটে দেখায়।

রকে বসে থাকলে এতক্ষণে আরো পাঁচজন জুটে যেত। তখন শুধু আমাকে নয় চক্ষুসজ্জার খাতিরে ওদেরও বলতে হত। তার চেয়ে এই বরং ভালো হয়েছে, বেমালুম খিদেটাও বেশ চনচনে হল।

তখন থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর করছে বুড়োটা। বয়স বাড়লে হ্যাংলামোও বাড়ে। আঃ, কি ছড়োচাল্লি শুরু করেছে ছেলেগুলো, মাহুষ দেখে ছুটবে তো। লাগল হয়তো বুড়ো মাহুষটার। আহা ছেলেবোরা যত্ন করে না। ফাঁসির আসামীও তো শেষ ইচ্ছা পূরণের স্বযোগ পায়, অথচ মুখ ফুটে ওর ইচ্ছের কথা বলতে পারবে না কাউকে। গুমরে গুমরে মনের মধ্যে গুমোট তৈরি করবে। এবারের গরমটা অসহ্য, তবু নাকি বেতিয়াফেরত মাহুষগুলো হাওড়া ময়দানে ভাজাভাজা হচ্ছে। বাইরে-ভেতরে সবখানেই অসহ্য হয়ে উঠেছে মাহুষ। এই যে সকলে পার্কে বেড়াতে এসেছে, সেও তো গুমোট কাটাতেই। অমিয়াও আসতে পারে। কি এমন কাজ তার, ওইটুকু তো সংসার। না, এখন সংসারের কথা থাক, তার চেয়ে বরং ওই গাছটার দিকে তাকানো থাক। রাধাচুড়ো। একটাও ফুল নেই গাছে। থাকা উচিত ছিল। কেননা কেইচুড়োয় ফুল ধরেছে। এই হয়, একটা আছে তো আর একটা নেই, স্বখে জোড় বাঁধে না কোনো কিছুই। এখন তার খুশি থাকতে ইচ্ছে করছে। অথচ অমিয়া, কি জানি এখন হয়তো পুতুলকে বকছে হু পলা তেল বেশি দিয়ে ফেলেছে বলে।

চলুন গৌরদা, এবার ফেরা মাক।

এর মধ্যে? রান্না হয়ে গেছে কি!

রান্নার দেরি আছে। আপনাকে নয় বাঁড়িতে পাঠিয়ে দোবো চাঁহুকে দিয়ে।

তাই দিও, আমি বরং একটু ঘুরি, আর শোনো, চাঁহুকে বোলো আমার হাতে ছাড়া কাউকে যেন না দেয়, কেমন।

প্রমথ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটতে দেখেছে এই সেদিন, অনেকের সঙ্গে সেও রুদ্ধশ্বাসে, বোড়সোয়ার পুলিশের নাগাল ছাড়িয়েও ছুটেছে। তাই সে বোঝে অমিয়ার অবস্থাটা যখন উঠবে আশুন পড়ে। কোথায় পালাবে সে ওইটুকু বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে? যেখানেই যাক ধোঁয়া খেতে হবেই, এই সময়টার সকলেই উঠুন ধরায়। ছাদে যে উঠবে তারও ফুরসত নেই। ঘরে বিকেলে কেউ থাকে না। ভাড়াটে বাড়ির একতলা, সদর দরজা সব সময় হাট করা, মুহূর্তের জন্তেও ঘর ছাড়ার উপায় নেই।

আজও সেই রোজকার অবস্থা, তবু রক্ষে উঠুন প্রায় ধরে গেছে। নিজের মনে গজগজ করছে অমিয়া আর হাওয়া দিচ্ছে। সাহায্য করতে গেল প্রমথ। তিড়তিড়িয়ে জলে উঠল অমিয়া।

থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

অমিয়া চুল বেঁধেছে, গা ধুয়েছে, শাড়িটাও পরিষ্কার। প্রমথ বলল, তুমি পুতুলকে ডেকে আনো, ততক্ষণ আমি হাওয়া দিচ্ছি।

পাখাটা নামিয়ে দম-কাটা স্প্রিংয়ের মতো উঠে দাঁড়াল অমিয়া।

দাঁড়াও, মেয়ের আড্ডা শেষ হোক তবে তো ঘরের কথা মনে পড়বে। আমুক আজ, ওর আড্ডা ঘোচাচ্ছি।

তরতর করে ছাদে উঠে গেল অমিয়া। সেখান থেকে একটু গলা তুলে ডাকলে তৃপ্তিদের বাড়ি থেকে শোনা যায়। ছাদ থেকে অমিয়া নামল আর সদর তেঁলে পুতুলও বাড়ি ঢুকল। একটুও আভাস না দিয়ে অমিয়া এলোপাখাড়ি কতগুলো চড় বসিয়ে দিল পুতুলের গালে, মাথায়, পিঠে। পইপই করে বলি সঙ্গে হলেই বাড়ি ফিরবি, সেকথা গ্রাহ্যই হয় না মেয়ের, কি এত কথা হয় শুনি, ফিসফিস, গুজগুজ, তৃপ্তির মাস্টারের সঙ্গে হাসাহাসি, কেউ যেন আর দেখতে পায় না, না?

ঘরে, আমি হাসাহাসি করেছি নাকি?

যেই করুক, তুই ওখানে থাকিস কেন, ঘরে আমি একা, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে সে খেয়াল থাকে না কেন? হাঁড়িটা উঠলে বস।

অমিয়া ঘরে চলে গেল। উঠানে গৌজ হয়ে আঁচলটা মুঠোয় পাকাতে থাকল পুতুল। খামোকা মার খেল মেয়েটা। এইটুকু তো বয়েস, খাঁচার মতো ঘরে কতক্ষণ আর আটকা থাকতে মন চায়। উঠে এল প্রমথ রান্নাঘর থেকে।

মা যা বলল তাই কর।

ওর শিঠি হাত দিয়ে আশ্বে ঠেলে দিল প্রমথ। শিঠিটা বৈকিয়ে ঠেলাটা ফিরিয়ে দিল পুতুল। গলাজলের ছড়া দিতে দিতে ওদের দেখে গেল অমিয়া।

রাগ করতে হবে না আর, কি এমন অত্যাচার বলেছে? আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, হাসাহাসি না করলেই তো হয়?

আমি মোটেই হাসাহাসি করি নি, তবু মিছিমিছি—

ওর শিঠি হাতটা রেখে দিয়েছিল প্রমথ, তাই আঙুল বেয়ে উঠে এল বাকি কথাগুলো। খরখরিয়ে পুতুল কাঁপছে।

বিয়ের পর যত পারিস হাসিস, কেউ বারণ করবে না। বড় হয়েছিল, বুদ্ধি হয়েছে তোর, তুপ্তিদের যা মানায় আমাদের কি তা সাজে?

শাঁখ বাজাচ্ছে অমিয়া। পুতুলের কাঁপুনি যেন বেড়ে গেল। বিশ্রী শাঁখের আওয়াজটা। শুভকাজে শঙ্খধ্বনি দেওয়া হয়, অথচ এখন মনে হচ্ছে মাটি টলছে ভূমিকম্পে, তাই মেয়েটা কাঁপছে। মুহূ ঠেলা দিল প্রমথ। এক পা এগিয়ে তারপর ঘরে ছুটে গেল পুতুল।

দাও আরো আদর। দিন দিন যেন বীদরী তৈরি হচ্ছে। অনেক দুখু আছে ওর কপালে, বলে রাখলুম।

হাঁড়ি নিয়ে রান্নাঘরে যেতে গিয়ে অমিয়া মস্তব্য করল। প্রমথ নরম স্বরে বলল, আজকে না বকলেই হত।

কেন, আজ রথ না দোল যে বকব না।

শোবার ঘরে এল প্রমথ। পুতুল ফোঁপাচ্ছে। লুপ করা বিছানায় মুখ ঝুঁজে। শব্দটা সর্দি ঝাড়ার মতো শোনাচ্ছে। তার ওপর প্যাচপেচে গরম।

লক্ষ্মী মা আমার ওঠ, যা রান্নাটা শিখে নে। আরে বোকা শব্দরবাড়িতে যখন রাখতে বলবে তখন যে লজ্জায় পড়বি, আমাদেরও নিশ্চয় হবে।

পুতুলের ফোঁপানি থামল। একটা চোখ বার করে, স্বরটাকে নামিয়ে বলল, বিয়ে করলে তো।

হেসে উঠল প্রমথ, পুতুল মুখ লুকোল।

তোমার মাও বিয়ের আগে ঠিক অমন কথা বলত।

পুতুল আবার মুখ তুলল। চোখের কাজল ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। আহা, মেয়েটা কেঁদেছে। মেয়েকে কাঁদানো মানেই লক্ষ্মীকে কাঁদানো। কত ভাগ্য করলেই না ঘরে মেয়ে আসে।

তুমি কি করে জানলে, মা বৃষ্টি বলেছিল?

একই সঙ্গে দুজনে দরজার দিকে তাকাল। না অমিয়া নয়, খোকন এল।

চোখাচোখি হল পুতুল আর শ্রমথর, হাসল দুজনেই। মেয়েটা দারুণ ভীতু হয়েছে। ওব মাও অমন ছিল, খালি দরজার দিকে তাকাত। কিছুতেই কাছে আসত না। রাত্রে ছাদে উঠত, তাও কত ভয়ে ভয়ে।

বলো না, মা বুঝি সেসব গল্পো করেছিল ?

হেসে খোকনের চূলে বিলি কাটল শ্রমথ। সেসব গল্প কবে করেছিল অমিয়া, তা কি এখনো মনে আছে। চেষ্টা করলে টুকবো টুকরো হয়তো মনে পড়বে। কিন্তু সেকথা কি মেয়েকে বলা যায়। একদিন গলি দিয়ে গিয়েছিল একটা বেলফুলওলা, কত কাণ্ড করে মালা কেনা হয়েছিল। আব একদিন, ছাদের উত্তব-পুব কোণায় তুলসীগাছের টবটার পাশে একটা ছোট্ট পৈঠে ছিল, একজন মাত্র বসতে পারে। পাছে বাবার ঘুম ভেঙে যায় তাই চুড়িগুলোকে হাতে চেপে বসিয়ে, পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছুট দিয়েছিল অমিয়া রকটা লক্ষ্য করে। আচারের শিশি বিকেলে তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল, ছাদের মধ্যখানেই পড়ে ছিল সেগুলো। তারপর সে কি কেলেঙ্কারি। বড়বৌদি ছাদে উঠে এসেছিল, আর অমিয়া পাঁচিল ঘেঁসে বসে পড়েছিল লঙ্কায়, ভয়ে।

হাসছ কেন !

এমনি। একটা কথা মনে পড়ল তাই।

অমন কবে হাসলে কিন্তু তোমায় কেমন কেমন যেন দেখায়। বেশ লাগে দেখতে। চোখ নামিয়ে হাসল শ্রমথ। খোকন চলে গেল রান্নাঘরে। খুস্তি নাড়ার শব্দ আসছে, গন্ধও আসছে কষা মাংসের, রান্নাঘরে অমিয়ার কাছে এখন কেউ নেই। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে গালে, কপালে, নাকেব ডগায়। বার বার কাঁধে গাল ঘষার জন্তে ঘোমটা খুলে গেছে। দুহাত সঁকড়ি, ঘোমটা তুলে দেবার কেউ নেই কাছে।

বসেই থাকবি, নাকি রান্নাঘরে যাবি।

না, আমি শিখব না।

তাহলে কিন্তু খণ্ডরবাড়িতে আদর হবে না। প্রতিবেশিরাও খাতির করবে না। তোর মার কাছে শেখার জন্তে পাড়ার মেয়েবা আসত, বাটি বাটি মাংস যেত এবাড়ি ওবাড়ি।

অবস্থা ভালো ছিল তাই মা শিখতে পেরেছিল, আমি তো কোনদিন রান্নাখলুমই না।

মেয়েটা ভয় পেয়েছে বোধহয় খণ্ডরবাড়িতে আদর পাবে কি পাবে না সেই কথা

ভেবে। ওর বয়সেই মেয়েরা বিয়ের কথা ভাবে। অমিয়া বলেছিল সেও ভাবত, আর ভাবে বলেই একতলার ঘুপটি বরে জীবনটা সহনীয় হতে পারে। না হলে পাগল কিংবা আর কিছু হয়ে যেত। সচ্ছল ঘরে পুতুলকে দেওয়া যাবে না, টাকা কোথায়। মেয়েটা সেকথা ভেবেও হয়তো ভয় পায়। আসলে ভয় তো সকলেই পাচ্ছে, পুরুষ মেয়ে সকলেই। নতুন বৌ অমিয়ার সময় মাংসের সের ছিল ছানা আট আনা, পুতুলের সময় তিন টাকা। জিনিস-পত্রের দাম বাড়ার জগ্রে ফ্রাইক হবে, হোক। মিহিরবারু কবিতা লিখলেও বাজে কথা বলে না। খুস্তিব শব্দ আসছে, কষামাংসের গন্ধ আসছে, মেয়েটার মুখ শুকনো। অসহ লাগছে এই ঘরটা।

পুতুল আর প্রমথকে দেখে গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল অমিয়া। আলুব খোসা নিয়ে খেলা করছিল খোকন। পুতুল তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে কুটনোর ঝুড়িতে রেখে দিল, খোসা-চচ্চড়ি হবে।

গন্ধ উঠছে। এমন গন্ধ অমিয়ার হাতেই খোলে। ফুলফুল ভরিসে ফেলল প্রমথ। অমিয়ার গা ঘেঁষে পুতুল বলল, দাঁও না আমাকে।

উত্তর না দিয়ে অমিয়া শুধু খুস্তিটা নাকের কাছে ধরল। গনগনে আঁচ। একটুকু খুস্তি-নাড়া খামলেই তলা ধরে যাবে। পুতুলের কথায় কান দেবার ফুরসত নেই। পুতুল করুণ চোখে তাকাল প্রমথর দিকে।

দাঁও না ওকে, যখন রাঁধতে চাইছেই।

সবই যখন করলুম তখন বাকিটুকুও করতে পারব। খোকনের ঘুম পেয়েছে, শুইয়ে দে।

সত্যিই তো! এখন আর করার আছে কি। জল ভরা কাঁসিটা হাঁড়ির মুখে চাপা দেওয়া ছাড়া। মাংসের জল বেরোলে, কাঁসির উষ্ণ জলটা ঢেলে দেওয়া, সে তো একটা আনাড়িতেও পারে। তারপর সেক্কা হলে আলু, হুন আর ঘিয়ে রসুন ভেজে সাঁতলানো, ব্যস। হতাশ হয়ে তাকাল প্রমথ। হনুর গড়নের জগ্রে এমনিতেই পুতুলের গালতুটে ফুলো দেখায়, এখন যেন আরো টেবো দেখাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলল, তুপ্তিকে ওর বৌদি নিজে থেকে ডেকে রান্না শিখিয়েছে, গোটা ইলিশ কাটা শিখিয়েছে, এবার ওদের মাংস এলে তুপ্তি রাঁধবে, সেদিন আমরা খাওয়াবে বলেছে।

তাহলে তো তোকেও একদিন খাওয়াতে হয়।

হয়ই তো, আজকেই তো ওকে বললুম, আমাদের মাংস এসেছে, মা বলেছে আমি রাঁধব।

অমিয়্যার দিকে চোখ রেখে এরপর পুতুল কিস্ত কিস্ত করে বলল, ওকে আমার রান্না খাওয়াব বলেছি।

গৌরদাও আজ বলল, দিও হে বৌমার হাতের রান্না। অনেক দিন খাই নি, কোথেকে শুনল কে জানে, বললুম দেব পাঠিয়ে। আহা বুড়ো মানুষটার যা কষ্ট, ছেলেবৌরা তো একটুও যত্ন করে না।

হ্যা, পুন্দার বৌ কি ভীষণ চালবাজ, একদিন গেছলুম, সে কি কথাবার্তা, যেন কত বি-এ এম-এ পাশ, কারুর আর জানতে বাস্কি নেই দু-দুবার আই-এ ফেল, বলে বেড়ায় পাশ করেছে। আর রান্না দিয়ে হাঁটে যখন, তুমি দেখেছ বাবা, যেন সূচিভ্রা সেন চলছে।

বাকার মত হেসে প্রমথ বলল, কে বললে তোকে।

তুপ্তি। ও তো ভীষণ বায়স্কোপ ছাখে, তবে হিন্দী বই ছাখে না, খুব অসভ্য নাকি, মাস্টারমশাইও ছাখে না।

এমনি শুনে শুনেই মেয়েটা বায়স্কোপের খবর নেয়। ছুধের সাধ ঘোলে মেটায়। আহা, এখনই ফুটি করার বয়স। মনে পড়ছে না কোনোদিন বায়স্কোপে যাব বলে বায়না ধরেছে। সোনার মেয়ে, বাপের অবস্থা বুঝে সাধ-আফ্লাদগুলো চেপে রাখে, বাবা-মাকে লজ্জায় ফেলে না। এ একমাত্র মেয়েরাই পারে, পুতুলের মতো মেয়েরা। চাঁহুটা সামান্য হুজুগ উঠলেই পয়সা পয়সা করে ছিঁড়ে খেত, এখন আর পয়সা চায় না। টাকা নিয়ে এখানে ওখানে খেলে বেড়ায়। ভাড়া খাটলে মান-ইজ্জত থাকে না, কিস্ত কি করবে, উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে কখনো ফাঁকা পকেটে থাকতে পারে? রাধুর মত ছেলে আর কটা হয়, পানটুকু পর্যন্ত খায় না। ভালো, ওরা সবাই ভালো, আহা বেঁচেবর্তে থেকে মাহুশ হোক।

একদিন তোর মাকে নিয়ে যাস না বায়স্কোপে।

ধোকনকে কোলে নিয়ে উঠানে বেরিয়ে এসে গলা চেপে পুতুল বলল, হ্যা, মা আবার যাবে। বলে, কতদিন সাধলুম চলো চলো, সকলেই তো যায়। তা নয়, মার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। একমিনিট বাড়ি না থাকলে সে কি ডাকাডাকি, যেন পালিয়ে গেছি, এমন বিচ্ছিরি লাগে, সবাই হাসাহাসি করে। বাবুদার সামনেও মা অমন করে।

ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে অমন ডাকাডাকি সবাই করে, তোর মেয়ে থাকলে তুইও করডিস।

প্রমথ হাসল। তিত্তকুটে গলায় পুতুল বলল, তা বলে দিনরাত ঘরে বসে থাকব ?

বেরোতে ইচ্ছে করে না আমার ? ঘরকন্নার কাজ সব সময় ভালো লাগে ? তুমি হলে পারতে ?

শেষ দিকে সপসপ করে উঠল পুতুলের গলা। খোকনকে নিয়ে সে ঘরে চলে গেল। রকে পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। একতলাটা শান্ত। দোতলার সামান্য খুঁটখাট, তিনতলায় ছাদ, বলা যায় বাড়িটা চুপচাপ। শুধু গোলমাল করছে পাশের বাড়ির স্কুল ফাইনাল ফেল-করা ছেলেটা।

ঘরে থাকতেই ভালো লাগে না মেয়ের, বাইরেই বা বাবে কোথায়, গিয়ে করবেই বা কি। এবাড়ি ওবাড়ি বাওয়া আর আজ্জবাজ্জ কথা বলা—এতে লাভ কি ? দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রমথ ঘাড়ের জাড় ভাঙার জন্তে মাথা পিছনে হেলাল। ক্ষতিই বা কি, এমনি করেই তো বাকী জীবনটা কেটে যাবে। মেঘের নামগন্ধ নেই, শুধু ঝকঝক করছে গুচ্ছের খানেক তারা। অসহ্য গরম, অসহ্য।

হঠাৎ একদমক হাওয়া শেরেকে ঝোলানো বাসনমোছা স্নাতাটা ফেলে দিল। হাঁটু পর্যন্ত কাশড় তুলে গা এলিয়ে দিল প্রমথ। ছটকটে গরমের মধ্যে একটুখানি হাওয়া বড মিষ্টি লাগে। খোশবাই গন্ধ আসছে, হাঁড়ির ঢাকনাটা বোধহয় খুলল অমিয়া।

ঝিমুনি এসেছিল প্রমথর, ভেঙে গেল সদর দরজা খোলার শব্দে। চাঁদ এল। অমিয়ার সঙ্গে কথা হচ্ছে গুর, রাত্রে কিছু খাবে না বলছে। উঠে এল প্রমথ। খাবি না কেন ?

খাইয়ে দিল ওরা রেফটুরেণ্টে, সেমি ফাইনালের দিনও খাওয়াবে। দুটো গোল হয়েছে, দুটোই আমার সেন্টার থেকে !

ভালোই হল, কাল তো বাজার আসবে না।

অমিয়া কালকের জন্তে চাঁদুর ভাগটুকু সরিয়ে রাখল। আডডা দিতে বেরুচ্ছিল চাঁদ, ডেকে ফেরাল প্রমথ।

তোমার গোর-জ্যাঠাকে খানিকটা দিয়ে আয়।

কেন ?

বিরক্তি, তাচ্ছিল্য আর প্রশ্ন, একসঙ্গে তিনটিকে অমিয়ার মুখে ফুটতে দেখে দমে গেল প্রমথ।

ওকে যে বলেছি, পাঠিয়ে দেব।

দেব বললেই কি দেওয়া যায়, অমন কথা মাহুস দিনে হাজারবার দেয়। এইটুকু তো মাংস। একে তাকে খয়রাত করলে থাকবে কি, কাল বাজার হবে না, খাবে কি কাল ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবার দরকার কি, বলে দিও নয় ভুলে গেছলুম।

অমিয়া আর চাঁদুর মুখের দিকে তাকাল প্রমথ। একরকমের হয়ে গেছে ওদের মুখদুটো। ওরা খুশি হয় নি।

কিন্তু বুড়ো মানুষটা যে আশা করে বসে থাকবে।

থাকে থাকবে।

কথাটা বলে চাঁদু দাঁড়াল না। অমিয়া চূপ করে আছে। তার মানে, ওইটে তারও জবাব। আবার পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। আকাশে গুচ্ছের খানেক তারা। আচমক। তখন হাওয়াটা এসে পড়েছিল, আর আসছে না। পুতুল চূপিচূপি পাশে এসে বলল, দিলে না তো! জানি, দেবে না। তখন মিথ্যে বলেছিলুম, তৃপ্তিকে মোটেই বলি নি যে মাংস খাওয়াব। বেড়ালের মতো পুতুল ফিরে গেল। হয়তো তাই, বোকামি হয়ে গেছে। বুড়ো মানুষটা বসে থাকবে, বসেই থাকবে। ঝিমুনি আসছে আবার, দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল প্রমথ।

সদর দরজায় আবার শব্দ হল, প্রথমেই প্রমথর মনে হল গোরদা বুঝি। ফিটফাট, ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাবু সটান রান্নাঘরের দরজায় এসে চাঁদুর খোঁজ করল, তারপর নাক কুঁচকে গন্ধ টেনে বলল, ফাস্ ক্লাস গন্ধ বেরোচ্ছে কাকিয়া।

আঁচল দিয়ে শরীরটাকে মুড়ে পুতুল যেন ভেসে এল।

চেখে যাবেন কিন্তু।

তারপরই তাকাল অমিয়ার দিকে ভয়ে ভয়ে।

বাবারে বাবা, মেয়ের যেন তর সইছে না। খালি বলছে, বাবুদা কখন আসবে, ওকে দিয়ে চাখাব। নিজে রেঁধেছে কিনা।

যে কেউ এখন দেখলে বলবে, অমিয়া হাসছে। কিন্তু প্রমথর মনে হচ্ছে ও হাসছে না। হাসলে অত কুচ্ছিত দেখায় কাউকে? নাকি তার নিজের দেখার ভুল! প্রমথ তাকাল বাবুর দিকে। চোকো করে কামানো ঘাড়, চূড়ো করে সাজানো রুক্ষ চুল। বুক, কোমর, পাছা সমান। চোড়ার মতো আঁটসাঁট প্যান্ট, উলটে দিলেই গুলতির বাঁট হয়ে যাবে চেহারাটা, ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু হাসল না প্রমথ, ছেলেটা শ-খানেক টাকার মতো চাকরি করে।

মুখে আঁচল চেপে হাসছে পুতুল। অমিয়া জিজ্ঞাসা করল; কেমন হয়েছে।

ফড়ুত করে হাড়ের মজ্জা টেনে বাবু বলল, গন্ধ শুঁকেই তো বলেছিলুম ফাস্ ক্লাস।

অমিয়া ওর খাওয়া দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদুর সেই কাজের কি হল?



বাবুর জিভ বাটিতে আটকে রইল কিছুক্ষণ, তারপরই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। তবে বুঝলেন তো, ম্যাট্রিকটাও যদি পাশ করত তাহলে ভাবনা ছিল না। আজকাল বেয়ারার চাকরির জন্তে আই-এ পাশ ছেলেরাও লাইন লাগায়। তবে আমিও এঁটেলির মতো লেগে আছি সুপারভাইজারের সঙ্গে, রোজ ত্যালাচ্ছি।

চাঁহু না হয়, রাধুর জন্তে জ্বাখো।

না কাকিমা। রাধুটা আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে, চাকরিতে চুকে শেষকালে ইউনিয়নে ভিড়ুক আর আমায় নিয়ে টানাটানি শুরু করবে তখন। এর ওপর আবার যা গরম বাজার চলছে।

হ্যাঁ, মিহিরকাকু বলছিলেন বেস্পতিবার নাকি স্ট্রাইক হবে।

আরে ও তো খুচরো স্ট্রাইক। বেশ বড়োসড়ো অল ইণ্ডিয়া স্ট্রাইকের কথাবার্তা হচ্ছে নাকি।

হলে হয় একবার, ব্যাটা সুপারভাইজারটাকে বাগে পেলে আচ্ছাসে ধোলাই দিয়ে দেব। মেজাজ কি ব্যাটার, যেন মাইনে বাড়ানোর কথা বললে ওকেই গ্যাট থেকে টাকাটা দিতে হবে, পাবলিকের টাকা পাবলিক নেবে তাতে ক্ষতিটা কি হয়?

খালি বাটিটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল বাবু, পুতুল টেনে নিল হাত বাড়িয়ে, জলের নাসটাও এগিয়ে দিল সে। রুমালে ঠোঁট মুছে বাবু জিজ্ঞেস করল, চাঁহুটা গেল কোথায়, একটা কার্ড ছিল একস্ট্রা।

কার্ড কিসের, আপনাদের সেই অফিসের থিয়েটারের?

উহঁ, যুব উৎসব। বলেছিলুম না আমার এক বন্ধু গল্প-টল্প লেখে, এর মধ্যে আছে, পে-ই জোগাড় করে দিল কার্ডটা। চাঁহু বলেছিল সতীনাথের গানের দিন যাবে; তা সেদিন আর জোগাড় হয়ে উঠল না।

কোন গানটা গাইল? 'সোনার হাতে'টা গেয়েছে?

ওটা, তারপর 'আকাশপ্রদীপ জলে'টাও নাকি গেয়েছে।

আপনাকে তো সেধে-সেধে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, তবু গানটা লিখে দিলেন না।

বেশ চলো, এখুনি লিখে দিচ্ছি।

কয়লা দিয়ে উমুনো হাওয়া করছে অমিয়া। পুতুল আর বাবু যেন ভাসতে ভাসতে ঘরে চলে গেল। প্রথমতর গা ঘেঁষেই প্রায়।

চটপটে, চালাকচতুর ছেলে। ও কি বিয়ে করবে পুতুলকে? জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়। তবে ছেলেমানুষ, বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাবে। তার থেকে

ওর বাবাকে গিয়ে ধরতে হবে। মুশকিল বাঁধবে জাত আর দেনা-পাওনা নিয়ে। শ-  
খানেক টাকা তো মোটে মাইনে পায়। বাপের মুখের ওপর কথা বলার সাহসও  
হবে না। আশ্চর্য, বিয়ে করতেও আজকালকার ছেলে-ছোকরা ভয় পায়, অথচ  
বিয়েটা কত আনন্দের।

তুমি এখানে বসে রইলে কেন, ঘরে ওরা একা রয়েছে না ?

প্রমথ তাকিয়ে রইল অমিয়ার দিকে। কত সাবধানে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চাল-  
ধোয়া জলটা ফেলছে। অমন করে মনের কুংসিত সন্দেহগুলোকেও তো ছেঁকে  
ফেলে দিতে পারে। থাকলই বা ওরা একসঙ্গে একটুকুণ, ক্ষতিটা কি তাতে।

ঘরে নয়, ছাদে যাবে বলে উঠে দাঁড়ল প্রমথ। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে থামল। ঘরে  
কারা হাসাহাসি করছে, ছাদে গেলে অমিয়া রাগ করবে নিশ্চয়। আজ ওকে রাগাতে  
ইচ্ছে করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে গল্প করলে কেমন হয়, আগডুম-বাগডুম যা খুশি।  
মেজ-বৌদিকে সেদিন দেখলুম ধর্মতলায় গাড়ি থেকে নামছে, এখনও পেট-কাটা  
জামা পরে ; কিংবা, দক্ষিণাবাবু কি সব ওয়ুধ খাইয়ে বৌকে প্রায় মেরে ফেলার  
জোঁগাড় করেছিল। তবে কাজ ঠিকই হাসিল হয়েছে। পেটেরটা বাঁচে নি।  
কিংবা, একটা দিন দেখে গুরুঠাকুরের কাছে গিয়ে মস্তুর নেবার কথাটা পাড়লে হয়,  
ভাবছিল প্রমথ। পুতুল ঘর থেকে বেরিয়ে তার কাছে এল।

ছোড়দা তো নেই, কার্ডটা নষ্ট হবে, ওর বদলে আমি যাব ? বাবুদা বলছেন  
এমন উৎসব নাকি এর আগে হয় নি, না দেখলে জীবনে আর দেখা হবে না, নাচ,  
গান, সিনেমা, থিয়েটার সব নাকি দেখা যাবে, যাব ?

গেলে ফিরবি কখন ?

কত আর দেরি হবে, ঘণ্টাখানেক দেখেই চলে আসব।

কচি শশার মতো কব্জিটা যেন মুট করে ভেঙে ফেলবে পুতুল আঙুলের চাপে।  
এইটুকু কথা বলেই ও হাঁপিয়ে পড়েছে।

তোর মাকে একবার বলে যা।

রান্নাঘরের দরজা থেকে কোনোরকমে পুতুল বলল, ছোড়দা তো নেই। তাই  
আমিই যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি ফিরবখন !

একটা কাঁচা কয়লা বিরক্ত করে মারছে। সেটাকে তুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টাতে  
অমিয়া ব্যস্ত। প্রমথ কৈকিয়ত দেবার সুরে বলল, বাড়ি থেকে বেরোয়-টেরোয় না  
তো, হাক ঘুরে আসুক।

কে ?

সাঁড়াশিতে চেপে ধরে কয়লাটাকে উত্থন থেকে বার করে আনতে আনতে  
অমিয়া বলল, কে, পুতুল ?

ই্যা, কি যেন উৎসব হচ্ছে বলল।

চলে গেছে ?

না, কেন।

রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল অমিয়া। পথ আটকে দাঁড়াল প্রমথ।

কেন আবার, রাত্তিরে মেয়েকে ছেড়ে দেবে একটা ছেলের সঙ্গে !

দিলেই বা কি দোষ হবে। হাঁপিয়ে ওঠে না ঘরে বসে থাকতে ? শুধু ছাদ আর  
গল্প করা। এ ছাড়াও তো অনেক কিছু আছে। মারধোর করলেই কি মেয়ে  
ভালো হবে।

প্রমথ চূপ করল বুক ভরে বাতাস টেনে। দাঁত চেপে কথা বলতে বেশ কষ্ট  
হয়, কিন্তু উপায়ই বা কি, ওঘরে পুতুল আর বাবু রয়েছে। থমথম করছে  
অমিয়ার মুখ। ঘাম নামছে খুঁতনি বেয়ে কিলবিলে পোকাকার মতো, ফরসা গালে  
পেঁটে বসা উড়ো চুলকে চীনে মাটির ফাটা দাগের মতো দেখাচ্ছে। সত্যিই ফেটে  
পড়ল অমিয়া।

আমি যখন পারি, ও পারবে না কেন, কেন পারবে না। শুধু ওব কথাই ভাবছ,  
কেন ভাবার আর কিছু নেই তোমার ? বলে দিচ্ছি ওর যাওয়া হবে না।

চূপ, আস্তে, দোহাই আজ আর চেষ্টাও না।

আঙুল ঝাঁকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল প্রমথ। দপদপ করছে তার রগের  
পেশী। পিছু হটে এল অমিয়া। প্রমথর নখের ডগাগুলো ভীষণ সূক্ষ্ম।

চূপ করব কেন। আমি অত্নায় কথা বলেছি ? মেয়েকে কেন তুমি ছেড়ে  
দিতে চাও একটা পরের ছেলের সঙ্গে, তা কি বুঝি না ভেবেছ।

চোখে চোখ রেখে ওরা তাকাল। অমিয়ার চাউনি কসাইয়ের ছুরির মতো  
শান দিচ্ছে। মাংসের খোলা হাড়িতে চোখ পড়ল প্রমথর, থকথক করছে যেন রক্ত।

কি বুঝেছ তুমি, বলো কি বুঝেছ ?

দু হাতে অমিয়ার কাঁধ ধরে কাঁকানি দিল প্রমথ। খোঁপাটা খুলে পড়ল,  
চোখদুটো মরা পাঠার মতো খোলাটে হয়ে এল, ঠোঁট কাঁপিয়ে অমিয়া বলল, তুমি  
আমার গায়ে হাত তুললে !

অন্ধকার উঠোনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পুতুল আর বাবু। কোনো সাড়া  
নেই যেন ইন্ড্রিয়গুলোর। তবু ছাদে যাবার সময় প্রমথর নাকে চড়াভাবে লাগল  
পাউডারের গন্ধ। মেয়েটা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে, করুক। সকলেই তো

করছে, বা হোক একটা কিছুর জন্তে। মাথা নিচু করে প্রমথ ওদের পাশ দিয়েই ছাদে ঝাবার সিঁড়ি ধরল।

ছাদেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাধু ডেকে তুলল প্রমথকে। খালার সামনে বসে আছে অমিয়া। ঠাণ্ডা ভাত আর মাংস। ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়েছে।

পুতুলও শুয়ে পড়ল যে এর মধ্যে।

শরীর খারাপ, কিছু খায় নি।

শুকনো কড়কড়ে কথা হল দুজনের, তাছাড়া খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আর কেউ উচ্চবাচ্য করল না। মাংসের সবটুকুই খেল প্রমথ। শুধু মেটুলির টুকরোগুলো ছাড়া। মেটুলি ভীষণ ভালোবাসে অমিয়া, অথচ সবটুকুই সে প্রমথকে দিয়ে দেবে। প্রমথও না খেয়ে বাটিতে রেখে দেবে। একসময় এটা তাদের প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। তখন মিষ্টি ঝগড়া ভালো লাগত আর মাংসও আসত নিয়মিত। আজকেও প্রমথ মেটুলি রেখে উঠে পড়ল। কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে কষের দাঁত থেকে মাংসের ঝাঁশ টেনে বার করল। ভিজ্জে গামছা দিয়ে গা-মুছে যখন সে শুয়ে পড়ল তখনও অমিয়ার রান্নাঘর ধোয়া শেষ হয় নি।

অনেক রাতে উঠোনে বেরিয়ে এল প্রমথ। ঘরের মধ্যে যেন চিতা জ্বলছে। একটুও হাওয়া নেই, ঘুম নেই, মেঘও নেই। পায়চারি শুরু করল সে রকের এমাথা ওমাথা। একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। মুখ তুলে তাকাল প্রমথ। একটুখানি দেখা গেল, লাল আর সাদা আলোটা পালটা-পালটি করে জ্বলছে আর নিভছে। মাত্র কতকগুলো তারা দেখা যায় উঠোনে থেকে। ছাদে উঠলে আরো দেখা যাবে। দেখেই বা কি হবে। ওরাও তো দেখল আজ মাংস এসেছে অনেকদিন পর, কিন্তু তাতে হল কি। পাতে মেটুলি রেখে সে উঠে পড়ল আর নির্বিকার হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল অমিয়া। এখন মনে হচ্ছে অমিয়া যন্ত্রের মতো তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সেও তো যন্ত্রের মতোই শুধু অভ্যাস মেনে মেটুলিগুলো পাতে রেখে দিয়েছিল। এটা কি বদঅভ্যাস? পায়চারি থামাল প্রমথ। অমিয়াও উঠে এসেছে।

ঘুম আসছে না বুঝি?

না, ভয়ানক গরম লাগছে।

পিঠের কতকগুলো ঘামাচি মারল অমিয়া। দু-একটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল প্রমথ।

ছাদে যাবে?

কেন, এই তো বেশ।

বরাবরই তোমার কিন্তু ঘামাচি হয় ।  
অমিয়া পিঠের উপর কাপড় টেনে দিল ।

বসবে ?

পাশাপাশি বসল হুজুনায়ে ।

পুতুলের জন্তে ছেলে আঁখো এবার ।

ইঁা, দেখব ।

চাঁটুটাকেও একটা যা হোক কাজেকস্মে ঢুকিয়ে দাও, কদিন আর টো টো করে কাটাবে ।

ইঁা, চেষ্টা করতে হবে ।

বাধু বলছিল আই-এ পরীক্ষাটা দেবে সামনের বছর ।

ভালোই তো ।

শান্ত রাত্রির মাঝে এদের আলাপটা, কল থেকে একটানা জল পড়ার মতো শোনাল । ওরা অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, পাশাপাশি । কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না । হুজুনেরই চোখ সামনের শাওলা-ধরা দেয়ালটাকে লক্ষ্য করছে । তারপরই একটানা নিস্তব্ধতা ভেঙে কয়েকটা কথা বলল অমিয়া ।

কি দরকার ছিল মাংস আনার ।

অমিয়ার স্বরে ক্ষোভ নেই, তাপ নেই, অহুমোদন নেই । শুধু যেন একটু কোঁতুহল । তাও ঘামাচি মারার মতো নিস্পৃহ । মুখ না ফিরিয়ে প্রমথ বলল, কি জানি । তখন কেমন ভালো লাগল, অনেক কথা মনে পড়ল, মনটাও খুশি হল । ভাবলুম আজ সবাই মিলে একটু আনন্দ করব ।

চুপ করে রইল প্রমথ । মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল । অমিয়াও তার দিকে তাকিয়ে ।

আজ পুতুলকে দেখে বারবার তোমার কথা মনে পড়ছিল । আর ওকে কাঁদিও না ।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল প্রমথ, তারা জ্বলছে । একটা কামার মাছুষকে তাতিয়ে বিরাট এক হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে, তারই ফুলকিগুলো ছিটকে উঠেছে আকাশে । ছাদে উঠলে আরো অনেক দেখা যাবে । অমিয়ার পিঠে হাত রাখল প্রমথ । ধরধর করে কাঁপছে ওর পিঠটা ।

জানো, আমি, আমরা কেমন যেন হয়ে গেছি । মনে হচ্ছে আমি আর ভালোবাসি না, বোধহয় তুমিও বাস না । তা না হলে তোমার মনে হবে কেন আমি তোমার

গায়ে হাত তুলতে পারি। অথচ সত্যি সত্যি তখন ইচ্ছে হয়েছিল তোমার গলা টিপে ধরি।

অমিয়ার পিঠে হাত বোলাল প্রমথ। খসখসে চামড়া, মাংসগুলো ঝুলে পড়েছে আলাগা হয়ে, মেরুদণ্ডের গিঁটগুলো হাতে আটকাচ্ছে। মুখ তুলল প্রমথ, যে-কটা তারা দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে শাস্ত স্বরে বলল, কেঁদো না, মরে গেলেই মানুষ কাঁদে, আমি কি মরে গেছি।

তারপর ওরা বসে রইল অন্ধকারে, কথা না বলে।





ফাকা হুপুরে বাইরের খোলা প্র্যাটিকর্মে দাঁড়িয়ে দুজন চাষী অনাস্থি খরার কথাবার্তা বলছিল। বাজনা শুনে তারাও এগিয়ে এল। খুব সম্ভব কনসার্ট পাটির কোন খুব পরিচিত গং। শুনতে ভালই লাগছিল।

বাজিয়ে বাক্স বন্ধ করে লোকটি আমার কাছে একটি টাকা চাইল। দিলাম। তখন খুশি হয়ে পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে আমার হাতে দিল। খুলে দেখলাম তাতে ওসব লেখা রয়েছে।

কাগজখানার উলটো দিকে লেখা রয়েছে—To The Honble First Munseef of Baruipur, Sir, I wish to interview 2 minutes only kindly allow me, your valuable time west me. Excuse me for your trouble.

Your most Obedient Servant truly, polite, believe, sympathy.  
Sree Bepin Behary Biswas. (Rai Bahadur) M. A. Honour in English, Calcutta University. Vill. P.O. Dadarat, Biswaspara, D/24 Pargs., West Bengal.

পড়ে এই ক'টি জিনিস মনে হল :—

লোকটি ইংরেজিতে অনার্সকে খুব সমীহ করে মনে মনে। উপরন্তু রায়বাহাদুর হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। তাছাড়া সে চ্যালেঞ্জ ভালবাসে। এদিককার এমন কোন পাড়ায় থাকে—যেখানকার নাম বিপিনবাবুটির পূর্বপুরুষের পরিচয়ে হয়ত পরিচিত। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি তার স্বপ্নে একচ্ছত্র।

কিন্তু লোকটি এখন নিশ্চয় রিটায়ার্ড ও সংসারে বাতিল।

লোকটিকে পরের রবিবার আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতে বললাম। আরও বললাম, আপনার বাজনার হাতটি খুব ভাল।

খুব খুশি।

আমি একটি খালের পাড়ে থাকি। উপস্থিত অনেক কম সময়ে বেশি ধানের লোভে খালধারে আই আর এইট ধান চাষ করেছে। তাই খাল শুধা। হুপুরের রোদে রবিবার পুড়ে যাচ্ছিল। সেই খালধার ধরে ধরে বিপিনবাবু এলেন। সঙ্গে বেহালার বাস।

আমি প্রায়ই এরকম লোক ধরে ধরে আনি বলে আমার জী বিপিনবাবুকে খেতে দিতে রাজি হচ্ছিল না প্রথমে। কিন্তু খেতে বসবার পর দেখলাম বেশ এটা ওটা এগিয়ে দিল। খেয়ে উঠে বিপিন বিশ্বাস লম্বা একটা ঘুম দিল বসবার ধরে।



বিকলে উঠে চায়ের কথা মনে করিয়ে দিল। তারপর বাস্তু খুলে ছড় হাতে নিয়ে বেহালাটা জুং করে কাঁধে বসালো।

জানতাম না। সেদিন পূর্ণিমা ছিল।

আর কিছু হাওয়া ছিল। খুব জোর। আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যা হতে না হতেই হেরিকেন ধরানো হয়। চাঁদও উঠলো। কালো বাছুরটা পুকুরঘাটে দাঁড়ানো গুর মাকে খুব চুসোচ্ছে।

কাঁধে বেহালা সেট হয়ে গেছে। ছড় ঠেলে ঠেলে অনেক সুর ভেঙে ওপরে উঠছে আবার নীচে পড়ে কয়েক সেকেন্ডের জগু খাদে দাঁড়াচ্ছে। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো ফেলে এদিকেই কান খাড়া করে আছে।

এসব আমাদের বারান্দায় হচ্ছিল। বেহালার ধ্যা খো কারও বুক তুবড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছিল! বিপিনবাবুর মুখে ভাঙা পাটালির ধারা এক চিলতে জ্যোৎস্না পড়ে শাদা দাড়িতে, জ্বতে বকবক করছে। কাঁটা বোঝাই বাবলা গাছগুলো এখন কেমন নির্দোষ বৃক্ষ হয়ে দাঁড়ানো। খালধারের শেকুল কাঁটার যোপে হলদে ফুলগুলো জ্যোৎস্নায় হারিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ছড় খামিয়ে বিপিনবাবু বলল, ‘এই রাগিনী মাঝী পূর্ণিমায় সারারাত দিঘির পাড়ে বসে বাজাতে পারলে পরী নামানো যায়। একবার মিস্তিরদের কাছারিবাড়ির পুকুরে নামিয়েছিলাম। গুরা একখানা কঞ্চল দেয় শেষে।’

আমার ছেলেপিলের মা এতক্ষণ অবিশ্বাস করতে করতে তন্নয় হয়ে পড়েছিল বাজনা শুনে। পরীর কথায় ঠোঁট ওলটালো। নাও নাও এখন বিদেয় কর—এই ভাব নিয়ে উঠে গেল।

আমি বললাম, ‘কঞ্চল কেন?’

‘মাঝী পূর্ণিমের রাত। ঠাণ্ডা হবে না? আমার অবিশ্বি তখন জোয়ান বয়স। শীতবোধ বিশেষ ছিল না। তবে কিনা—একে মেয়েছেলে, ভায় পরী। শীত তো লাগবেই। ওদের তো বিশেষ জামা-কাপড় পরতে নেই।’

আমার জন্তে তালশাঁস, ডাবের জল ঢাকা দেওয়া ছিল। ঘরের থেকে এনে নিজেই বিপিনবাবুকে দিলাম। ব্রেন্ডওয়ার্ক হচ্ছে গুর।

‘উত্তর আকাশ থেকে নেমেছিল। রাত দু’টো নাগাদ। ঘাটলায় এসে পাখা গুটিয়ে বসে আমার বাজনা শুনছিল একমনে। সান্ধাৎ দেবী প্রতিমা। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম পাছে উড়ে যায়।’ তালশাঁস খেতে কিছু সময় গেল। ‘মিস্তিরদের স্মৃতিমা যেমন হাসিখুশি তেমনি সাহসী ছিলেন। শরীরে দয়ামায়াও ছিল। তিনিই

হৃষিকেশ থেকে আনানো পাহাড়ী ভেড়ার লোমের কবলটা শেষরাতে দোতলা থেকে বাটলায় ছুঁড়ে দিলেন।

‘পরী উড়ে গেল না?’

‘বড় ভাল ছিল মেয়েটি। শীত লেগেছিল। দৈববাণীর মত আকাশ থেকে কবল পেয়েই গায়ে জড়িয়ে ফেলল। তারপর আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। আমার ভেতরটা সেই ক’ সেকেন্ডের জন্তে—কি বলব গান্ধুলীমশাই, ধক্ করে উঠল। পরিষ্কার বাংলায় বলল—আরেকখানা বাজাও।’

‘বাংলায়?’

বিপিনবাবু একটু থমকে গেল, তারপর বেহালাটা কাঁধে তুলে নিল, খানিকক্ষণ ছড় ঘষাঘষি করে একটা খুব ভারী রাগের মধ্যে ছড়স্কন্ধ হাত, মাথা ডুবিয়ে দিল, ‘এই রাগটা বাজিয়েছিলাম।’

ছড়ের এক এক টানে হাওয়া স্কন্ধ নদীর জল উঠে আসছিল এক একবার। আবার তাঁটাও হচ্ছিল। খালপাড়ের ওধারে দূর দিয়ে কলকাতার গাড়ি গেল আলো জালিয়ে—লোকজন নিয়ে—আবার কয়েক গাড়ি লোক ফিরেও এল।

ছেলেমেয়েরা খেতে বসেছে। ওদের মা ভাত খেতে দিচ্ছে। হেরিকেনটা হাওয়ার জালায় দেয়ালের পাশে সরিয়ে দিল।

এক সময় বললাম, ‘পরী নেমে আসবে না তো?’

বাজনা না থামিয়েই বিপিনবাবু বললেন, ‘নামতেও পারে।’

আমার অবিশ্বাস এতই বেশি—প্রায় হো হো করে হেসে উঠছিলাম। পরী নামার অবস্থাই বটে। মডিফায়ড রেশনে আমাদের এই স্টেশনপাড়ায় চাল গম কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না ক’ সপ্তাহ। ডিলার গরুর গাড়িতে মাল পাঠিয়েছিল। বাটার মধ্যে দিয়ে পিচ রাস্তা ধরে তিন গাড়ি গম আসছিল। লুট হয়ে গেছে।

বিয়ের বরযাত্রী থেকে স্টেশনমাস্টার, পোস্টমাস্টার, হেডমাস্টার—সবাই চাল নিয়ে আলোচনা করে। স্নাগলারদের দাপটে ট্রেন রোজ লেট হচ্ছে। রাত হলে অন্ধকারে বসে বসে কত পরিবারের কর্তা হাওয়া খায়—বড় বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

আলাপ রীতিমত জমে উঠেছে। এমন সময় বড় ছেলেটা এঁটো হাতে উঠে এসে আমার সামনেই দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। ইনারায়ণ খামতে বলে এগিয়ে গেলাম।

ব্যাপার সামান্ত। ও এবেলা ওবেলা দুটো বেশি করে পষ্টি ভাত খেয়ে থাকে।

আরও খাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ওর মা তুলে দিয়েছে মাঝখান থেকে। বলেছে, সবাই খাবে তো ?

বিপিনবাবুর বেহালায় আলাপ জমে উঠেছিল।

চাষ উঠলে বছরকার ধান কেনা থাকে ফিবার। এবারই হয়নি! ট্রেনে, বাজারে যত পুলিশ বাড়ছে, ফ্রন্ট সরকারের ফতোয়া যত লম্বা হচ্ছে—চালের দামও তত চড়ছে। ফি রাতে ভ্রাণকাতি হয়। থানা এখান থেকে পাঁচ মাইল। পবর দিয়েও কোন লাভ হয় না।

বিপিনবাবু পরী নামানোর জন্তে বেহালাটা খুব জোরে কাঁধে চেপে ধরেছে। আমাদের বাগানের বেলফুল গন্ধ ছড়াচ্ছিল বাতাসে। চাঁদ সারা পাড়া জুড়ে টর্চ ফেলেছে। এ-বাড়ি সে-বাড়ির রেডিওগুলো জুড়িয়ে এল। শুধু স্টেশনের ধারের একটা দোকান—সারা বছরই ওদের হালখাতা থাকে।—মাইক বাজিয়ে দানাদার খাওয়ায়। বেয়াড়া খদ্দেরের বাকি টাকা তোলে। সেদিক থেকেই ভেসে আসছিল—  
‘আলেয়া! আলেয়া!! জীবনে নারী পেয়েছি অনেক—’

পরী নামাতে না পেরে পরাজিত হলে বিপিন কি আমাকে ৪০০১ টাকা পুরস্কার দেবে? ছেলেটা বাইরের খাটে শুয়ে বাজনা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হয়ত খানিক বাদেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পরী নেমে এসে আমাদের ওই বাগানে বেলফুলের সারির মাঝে পাখনা গুটিয়ে দাঁড়াবে। তারপর বলবে—

Honble Mr. Biswas Sir, I wish to interview 2 minutes only kindly allow me, your valuable time west me.

প্রথম আলাপের সেই চিরকুটখানা আমার টেবিলের ড্রয়ার খুললেই রোজ চোখে পড়ে।

কিন্তু সেসব কিছুই ঘটল না।

বিপিনবাবু বাজাতে বাজাতে শুয়ে পড়েছেন প্রায়। নারকেল পাতাগুলো জ্যোৎস্না ছিঁড়ে ছিঁড়ে হুলছে। পৃথিবীতে এখন কোনো অশান্তি নেই। অথচ জানি, এই আধা শহর আধা গাঁয়ের প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে নানা অবিচারের বিককে নায্য অগ্রায্য দাবি লেখা পোস্টার মেরেছে ছেলেরা। সব বদলে যাচ্ছে। মাটি, গাছপালা, খাল, আকাশ—এরাই শুধু পাল্টায়নি। এর মাঝখানে আমরা পরী নামাচ্ছিলাম। আমার বয়স চল্লিশ। বিপিনবাবু তো সত্তর হবে। লোকটা চিট হতে পারে—ক্র্যাক হতে পারে। জেহুইন কিনা কে জানে।

খড়ি-ওড়া শুকনো চামড়ার বিপিনবাবু দিবানিদ্রার পর খুব জম্পেস করে

বাজাচ্ছিল। এসব বাজনা কতকাল শুনিনি। তাল, লয়, রাগ—কিছুই জানিনা। তবু বেশ লাগছিল। শুধু আমাকে শোনাতেই একজন বাজনদার প্রাণপাত করে যাচ্ছে—অথচ আমি সভাসদ, পাত্রমিত্র, পাইক বরকন্দাজ সাজিয়ে রাজা হয়ে বসে নেই। সামান্য শ্রামল গান্ধূলী।

বড় ছেলোটাই বাইরের রোয়াকেই ঘুমিয়ে গেল। নয় পেরিয়ে দশে পড়েছে। ভাতটা খেতে বড় ভালবাসে। সবচেয়ে সস্তার জিনিস এমন আক্রা হয়ে যাবে একদিন কে জানত।

ছেলেমেয়েদের মা এখন সারাদিন পরে ফ্রি হয়েছে। মেয়েটাও এতক্ষণে ঘুমে হাল্লাট হয়ে গেল। অন্ধকার বারান্দায় আমি আর বিপিন বিশ্বাস। ভেতরের ঘরে আলোর সামনে গির্নি দাঁড়ানো। তাই গুর মুখ চোখ দেখা যাচ্ছে না। ঘোমটা শাড়ির চারধারে আলোর আউটলাইন। একবার মনে হল আমায় ডাকছে। উঠতে যাব। বিপিনবাবু ছড় ঘষতে ঘষতে আমাকে খুঁচিয়ে দিল। গুর দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে বিপিন বিশ্বাস চোখ দিয়ে ইশারায় আকাশে তাকাতে বলল। এনি মোমেন্টে পরী নেমে পড়তে পারে। সেই সময় কি আসন্ন? নড়া-চড়া বন্ধ হয়ে গেল আমার।

আলোর আউটলাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বউ যেন কি বলতে চাইল একবার। হাত নেড়েও খে খামিয়ে দেব সে সময় এখন নয়। এখন পরী নামে।

খট করে বিপিনের বাজনা থেমে গেল। আমি আর আকাশে তাকাতে পারছি না। যদি নামেই—আমি নির্ধাৎ সেন্সলেস হয়ে পড়ে যাব। বিপিন বাগানের দিকে নেমে যেতে যেতে বলল, ‘জল সরে আসছি। কখন থেকে একঠায় বসে বাজাচ্ছি।’ তাই বল। এমন ভাবে আচমকা বাগানে নেমে গেল—ঘেন পরী নেমেছে। হাত ধরে বারান্দায় তুলে আনবে এম্মুনি।

ছেলেমেয়েদের মা ঝড়ের বেগে ঢুকেই ঘুমন্ত ছেলোটাকে এক হাচকায় কোলে তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, ‘কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে! ক’পালি চাল আছে ঘরে শুনি? রোজ রোজ লোক ধরে আনা চাই—’

ছেলে কোলেই শোয়াতে চলে গেল। ষাবার সময় গুর পায়ের ধাক্কায় বেহালার বাস্কাটা হাটকে খুলে গেল।

বিপিন বিশ্বাস ফিরে আসার আগে জায়গার জিনিস জায়গায় রাখা দরকার। বন্ধ করতে পারি না। কিসে আটকে গেছে। আলোতে নিয়ে দেখি, বাস্কাটা নানান জিনিসে বোঝাই। তিনখানা নিমের দাঁতন। তেলচিটে গামছাও আছে একখানা।

একেবারে বিপিনের সংসার। রঙচটা নীল লুঙ্গিটাও কাগজে মুড়ে গুঁজে রেখেছে। তাড়াতাড়ি জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে দিলাম।

বারান্দায় উঠেই এক সেকেণ্ডে বিপিন বাজনার ছেড়ে আসা জায়গায় ফিরে গেল, ‘ষ্টিক এমনি চাঁদের আলো ছিল সে-রাতে—’

আর, কথা নয়। আমার পরিচিত বউ এখনো প্রায় তরুণী। অল্পদিন হল ড্র কুঁচকে কথা বলার সময় গুর নাকের পাশ দিয়ে দু’ধারে ভাঁজ পড়ে। যা দিনকাল। এসব দেখার সময় পাই—দেখে ভাবার সময়ও পাই—কেননা ব্যাক্ত আম্মার পাকা চাকরি। এখনো অনেককাল বেঁচে থাকলেই মাইনে পাব। শুধু অফিসে গিয়ে খানিকক্ষণ কলম নাড়তে হবে রোজ। খুব খারাপ লাগে। কোন মহং কাজ করি না। লোকে টাকা রাখে, তোলে, ধার নেয়, ফেরৎ দেয়—হুদ কবে সেসব তুলে রাখি লেজ্বারে। এজন্ত আজকাল পরীক্ষা করে বাজিয়ে টাটকা ছেলে ভর্তি করা হয়।

খুব জমাটি বাজনায় বিপিন নিজেই চোখ বুজে ফেলেছে। কাছাকাছি কোন বাড়িতে স্বন্দর করে মুহুরির ডাল রান্না হচ্ছে। সেই গন্ধে আমার বাজনা শোনার গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। জীবনে অর্ধেকের বেশি খরচ হয়ে গেল। আর বড় জোয় বিশ পঁচিশ বছর বাঁচবে।

বাগানের শুকনো পাতা মাড়িয়ে কে আসছিল। এই বারান্দার দিকেই। বিপিন এখন নিজের বাজনায় মাতোয়ারা হয়ে আছে।

আমার বউ। খুব সাবধানে এগিয়ে আসছে। কলমের পেয়ারার ডাল ধরে দাঁড়িয়ে গেল। সেই জায়গাতেই কিছু চাঁদের আলো ডালপাতার আড়াল খুঁড়ে ভেতরে নেমে পড়তে পেরেছে।

চোখাচুপি হল, সেখানে দাঁড়িয়েই ও হাতের ইসারায় বলতে চাইল, আর কেন? এবার বিপিন বিশ্বাসকে উঠতে বল।

হাত নেড়ে বিপিনকে তুলে দেওয়ার কথা বলল তিনবার। আড়াইসের চাল ন’ টাকা চোন্দআনা। কলকাতায় আরও বেশি। দশ বছর আগে বসানো খিরিশ চারা ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে গিয়ে মোড়ের মাথায় নানা লোকের সেন্টার। সেখান থেকে হরেক রকম কথাবার্তা ভেসে আসছে। আলাদা করে বোঝা যায় না।

আমিও সিগন্তাল দিলাম। খুব সাবধানে। বিপিন চোখ খুললেই ডেনজার। শেষে হাতজোড় করে অন্ধকারে নিজের মুখখানা ষতটা কাচুমাচু করা যায়—তাই করে, ষতটা মাথা নেড়ে বোঝানো যায়—তাতে বললাম, এবার তুমি দয়া করে গোয়ালের দিক থেকে ঘরে ফিরে এস।

মন বলছিল, সাপথোপ থাকতে পারে। উঠে এসো।

এত স্বন্দর দেখাছিল। পারলে বরণ করে বারো চোদ্দ বছরের পুরনো বউকে বারান্দায় তুলে নিতুম। কতকাল আলতা পরে না।

বউ তবু নড়ে না। আমাকে বিপদে ফেলে ওর কি আনন্দ।

ও শুধু মাথা নাড়লো। মানে ওখান থেকে যাবে না।

বিপিন এমন কিছু বেশি খায় না। ভাতটা যা কিছু লাগে।

কতকাল আগে কিনে দেওয়া জরিপাড় কালো শাড়িখানা পরেছে আজ। অনেকটা আগের দিনের নীলাস্বরী প্যাটার্ন। কাউকে বিপদে ফেলতে এমন সেজে কেউ বাগানে নামে। গালে জ্যোৎস্না পড়লেও বোঝা যাচ্ছে না—পাউডার মেখেছে কি না।

উঠে দাঁড়িয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, হেট্ হেট্। যেন গরু তাড়াচ্ছি। যেন কারো কালো গাইটা হঠাৎ বাগানে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ওঠা গেল না।

বিপিন উঠতে দিল না। বুকের ভেতরে কত রকমের পাহাড় পর্বত থাকতে পারে জানা ছিল না। ছড়ের এক এক টানে সে সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে শুধু স্বদূর সাইকেল রিকসার প্যাক প্যাক আওয়াজ। তাতে কোন অস্ববিধা হচ্ছিল না।

ঘস করে খোঁকার মা সরে গেল।

‘ওই যে। নড়বেন না। এসেছে—’, ছড় খামেনি বিপিনের।

বললাম, ‘কোথায়?’

‘বাগানে—’

বুড়ো মানুষ। কোনবেলাই পেট ভরে খাওয়া জোটে না বোধহয়। বাজিয়ে, নানারকমের ভুজুভাজু দিয়ে তবে অন্ন হয়। নিজের বানানো পরীর গল্পের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে একেবারে জলজ্যাস্ত পরী এসে বাগানে দাঁড়াবে এ ওর স্বপ্নেও ছিল না।

তাই বোধহয় হাত ফসকে টানের মাথায় ছড়খানা স্নিপ খেয়ে একেবারে বাগানে গিয়েই পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা বোঝাই সুর থেমে গেল।

‘দেখলেন?’

বললাম, ‘একদম স্পষ্ট।’

ছ’জনে চুপচাপ বসে রইলাম খানিক। এখন বাগান থেকে কে ছড় তুলে আনে। ব্যাপারটা অশরীরী। বুড়ো বিপিন আগে থেকে ভয় পেয়ে বসে ছিল। আমার

পাওয়া উচিত। তাই বেশ কিছুটা ভয় পেয়ে গেছি এইভাবে বললাম, ‘থাকগে কাল সকালে তুলে আনা যাবে! কি বলেন—’

‘তাই ভাল।’

যেমন ছিলাম তেমন আছি।

ছেলেপিলের মা জল দিয়ে, খালা সাজিয়ে ডাকতে এসেছে। পৃথিবী যেমন ছিল তেমন আছে। জ্যোৎস্নায় মেঘ কিংবা গাছপালার ছায়া লেগে কোথাও কোন ময়লা পড়েনি।





দরজা খুলতেই চোখে পড়ল, একরত্তি উঠোন, ভিজ্ঞে একসা হয়ে গেছে। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। সারা উঠোন সঁাতসঁাত করছে। আধ-খোলা কপাট দিয়ে চোখেমুখে ঠাণ্ডা হওয়ার বাপটা লাগে। কী শীতল পবন! গা শিউরে উঠল। আসন্ন শীতের মুদ্রধ্বনি। ঈস, কত বেলা হয়ে গেছে! উঠোন রোদে মাখামাখি। বৃষ্টিপাত একটি চমৎকার রৌদ্রালোকিত সকাল। পাঁচিলের পাশে কানা-ভাঙা একটা টবে বৃষ্টিভেজা দৃপ্ত গাঁদার সবুজাভ পত্রগুচ্ছ ঘিরে হরিদ্রাভ পুষ্পাবলি আসন্ন শীতের বাতাসে দোলে। কবে কে যে গাছটা লাগিয়েছিল! সদর দরজার একটা কপাট হাঁ-খোলা। রাস্তায় লোক চলাচল দৃষ্টিত হয়। রিক্‌সার ঠুং-ঠাং ঘণ্টাধ্বনি এবং ধাবন্ত স্কুটারের চাপা ধাতব কর্কশ শব্দও ভেসে আসে। খোলা দরজা দিয়ে কাদের সাহেব উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। ডান হাতে একটা থলে। বেশ ফোলা দেখাচ্ছে। সস্তাবত বাজার থেকে ফিরলেন। উঠোন দিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ছেলের দিকে তাকালেন। শাহেদ তাকিয়ে দেখল, বাবা রান্নাঘরে ঢুকলেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনিক কর্মে তাঁর দিনের সূচনা এ-প্রকম ভাবে হয়। এমনকি ছুটির দিনেও। তারপর মুখে কোনোরকমে দুটো গুঁজেই অফিসে দৌড়ান। আধভেজানো কপাটের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে শাহেদ এসব দৃশ্যাবলি অবলোকন করে। দুহাত দিয়ে দরজা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়। টেবিলের ওপর কয়েকটা বইগত্র অগোছালো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দেওয়াজ টেনে টুথব্রাশ আর পেস্ট বের করল।

ত্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত ঘসতে ঘসতে বারান্দায় এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, রাস্তার ওপাশে আজিম আহমেদের বাগানের দীর্ঘকায় উদ্ভিদ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টিতে ধুলোর আস্তরণ মুছে গেছে। কেবল সবুজাভ পাতার চালচিত্রে



বোগানভিলার রক্তিম সতেজ স্তবককে সকলের স্বর্ণাভ রোদে প্রবল লোহিতাভ মনে হয়। কী নয়নশোভন দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। কার প্রবছের পরিণাম! শাহেদ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। আজ রোববার, অফিস নেই। মুখ হাত ধুয়ে ঘরে বসে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে নাস্তা করল। তারপর একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। পাশের ঘরে শাহু পড়ছে চৈচিয়ে চৈচিয়ে। ঐ এক অভ্যেস। এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। তবু চৈচিয়ে পড়ার অভ্যেস গেল না। আনোয়ার সকাল থেকে বাসায় নেই। নতুন নতুন কলেজে ঢুকে কেবল ঘুরে বেড়ায়। হয়ত কোথাও বেরিয়েছে! সারাদিন কোথায় কোথায় যায়! মনে মনে রাগ হল শাহেদের এই অহেতুক বেয়াড়াপনার জন্তে। বইয়ের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে এক সময় দেখল ঝড়িতে প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। সকালের স্বর্ণাভ রোদ খরতর হ'ল। বইটা পড়তে পড়তে কেমন একটা ক্লান্তি অনুভব করে। কেবল ক্লান্তি, দুঃসহ দুপুরের অবসাদ। নিদ্রাহীনতার খোঁয়ারির মত সারা শরীরে লেপটে থাকে। আরো কিছুক্ষণ ধবল শয্যায় চোখ বুজে পড়ে রইল। খানিকক্ষণ পর আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানা থেকে উঠে স্নানঘরে ঢুকল। আঃ, অবগাহনের কী তৃপ্তি! অনেক সময় নিয়ে স্নান করল। আহারাতির পর সারা দুপুর ঘুমিয়েই কাটাল। পড়ন্ত বিকেলে ঘুম ভাঙল। বিছানায় বসে জানালা দিয়ে দেখল, উঠোনে রোদ নেই। কেবল বিকেলের নিম্প্রভ আলোয় গাঁদার সবুজাভ পাতার মাঝে ত্রিয়মান পুষ্পগুচ্ছ যেন গন্ধবিহীন শুকনো ফুলের মালা। হঠাৎ, কেন জানি, আবার খারাপ লাগতে লাগলো। সারা শরীরে একটা অপরাহ্নিক অবসাদ। যেন একটা নিস্তেজ ভাব লেপটে আছে। বৈকালিক চা পান করতে করতে দিনটা বুথা গেল, এ-রকম ভাবতে ভাবতে কাপড় পরে রাস্তায় এল। আর তখনি রফিকের কথা মনে পড়ল। অনেকদিন তার সাথে দেখা হয়নি। মোড়ে একটা রিকশা নিয়ে রফিকের বাড়ি যেতে বলল। ফুটপাতে পথচারীর ভীষণ ভীড়। রাস্তায় গাড়ীর। মাহুবজ্ঞন বোধহয় বেরুতে শুরু করেছে। রিকশা ভীড় ঠেলে এগোয়।

বাড়ীতে গিয়ে রফিককে পেজ না। হয়ত ক্লাবে পাবে এমন বাসনায় ক্লাবের দিকে রওয়ানা হ'ল। ফুটবল খেলায় এক সময় রফিকের ভীষণ স্নাম ছিল। এখন অল্প নেশায় মেতেছে। সন্ধ্যা হলেই ক্লাবে গিয়ে হয় হাউজি নয় তাস পিটোয়। একবার সিনেমা যাওয়ার কথা মনে এসেছিল। একা একা ভাল লাগলো না। ক্লাবে যখন পৌঁছুলো তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। রিকশা থেকে নেবে ক্লাবে গিয়ে ঢোকে। অনতি-প্রশস্ত ঘরটার কী ভীড়। অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় দিনান্তের উচ্চকিত আলো

যখন ক্রমশ নিশ্চল হয়ে আসে, আঁধারময় নিবিড় রাত নামে নগরীতে, তখন সব একে একে জমা হয় এখানে। শাহেদ চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে, সবাই আপনাপন আসনে গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত। মৃদু কলভাষণে সমস্ত ঘর উচ্চকিত। শাহেদ একটা হাউজি সিট কিনে এক পাশে বসে পড়ল। খেলা শুরু হবার আগে পুনরায় চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেলে দেখে। না, রফিক এখানে নেই। টু লিটল ডাক টুয়েন্টি টু। ওয়ান মোর টুয়েন্টি থ্রি। সেভেন এণ্ড... একটানা ছেদহীন গলায় বার বার হেঁকে যায় একটা বুড়ো লোক। এক হাতে গাণিতিক সংখ্যাবাহী টোকেনভর্তি বাক্সটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা টোকেন তুলে উচ্চকণ্ঠে ক্ষত সংখ্যাগুলো হেঁকে যাচ্ছে। আর কী গভীর আশা, উৎকণ্ঠা আর আকস্মিক প্রাপ্তির শ্রবল বাসনায় লোকগুলো অথও মনোনিবেশে তাকিয়ে আছে হস্তগত ছক কাটা সংখ্যাসমষ্টির ওপর। কখন কার ললাটলিপি প্রসন্ন হয়। নম্বর বলার সাথে সাথে সবাই কেবল সংখ্যাপত্রে দাগ কাটছে। দিস ইয়ার সিক্সটি নাইন। বুদ্ধের উচ্চারণের রেশ মিলোতে না মিলোতে পেছন থেকে কে একজন সোল্লাসে চৈচিয়ে গুঠে, 'হোল্ড অন।'

শাহেদের চেতনায় কে যেন শ্রবল আঘাত হানে। এই মুহূর্তটার জন্তে সবাই পরম প্রতীক্ষায় বিধাবিহিত। সে তাকিয়ে দেখে, অদূরে পেছনের সারিতে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে একজন। অকস্মাৎ প্রাপ্তিতে প্রোজ্ঞল তার আনন। টাকাটা পেয়ে গেল তাহলে। যাক গে। খেলাও শেষ। কয়টা টাকা হেরে গিয়ে এবার মনটা তার ভীষণ খাঁ খাঁ করতে লাগলো। এতক্ষণ যারা গভীর প্রত্যাশায় বসেছিল তারা সবাই ঘর থেকে নিজ্রাস্ত হয়। ঘোষক তখন পুনর্বীর সংখ্যাগুলো মিলিয়ে নিচ্ছে। মেঝের চেয়ারের নীচে অসংখ্য ছেঁড়া কাগজপত্র পড়ে আছে। কে পেল অতগুলো টাকা? ভাবল শাহেদ। সেই ঈঙ্গিত পুরুষকে দেখবার শ্রবল বাসনা মনের মধ্যে চকিতে উঁকি দেবার আগেই শাহেদ রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। বাইরে এখন ঘন অন্ধকার, কেবল দূরে দূরে লাইট পোস্টের মাথায় মুমূর্ষু বৈদ্যুতিক আলোগুলো কায়ক্লেপে জ্বলছে। একটা লাইটপোস্টের কাছে তার দীর্ঘকায় ছায়া পড়ে রাস্তায়। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে, আলোটার চারদিকে ঘন হয়ে আসা অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। কতকগুলো পোকামাকড় বাঘটার চারদিকে ওড়াউড়ি করছে। প্রাক-শীতের রাত। বাতাসে স্বচ্ছ কুয়াশা বাঁধের চারদিকে ঘিরে একটা চালচিত্র হয়।

রাস্তায় যান চলাচল ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দু-একটা বাস স্ট্যাণ্ডে যাত্রীদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। হেল্পার ছোকরাটা অবিরাম ভাঙা গলায় একটানা চৈচাচ্ছে গম্ভব্য স্থানের নাম। সিনেমা হলের সামনে কতকগুলো রিকশা শেষ যাত্রীদের প্রতীক্ষায়

শাড়িয়ে আছে। সারি সারি অনেক ঝকঝকে মটর গাড়ীও দেখা যায়। মঙ্গল গতিতে উন্নতির চিহ্নবাহী এইসব যানকুল। একটু পরেই সিনেমা ভাঙবে। লেভেলক্রসিং হাড়িয়ে নবাবপুৰ ধরে হাঁটতে থাকে শাহেদ। সামনে একটা বাড়ীর ছাদে কোনো প্রসাধন কোম্পানীর বিজ্ঞাপন অবিরাম জ্বলছে আর নিভছে। এদিকটায় লোক চলাচল এখনও ক্রিয়ালীল। হাঁটতে হাঁটতে শাহেদ ভাবল কিছু খেলে হতো। প্রচণ্ড ক্ষুধায় সমস্ত শরীরে একটা অবসাদ অল্পভব করে। ভাবতে ভাবতে একটা রেস্টোর'রায় ঢুকে পড়ে। সারা ঘরে একটা ভারী গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। সমবেত বাক্যালাপে উচ্চকিত চতুর্দিক। কোণের দিকে একটা টেবিল জুড়ে কয়েকজন তুমুল আলাপে মগ্ন। পাশেই অন্য এক টেবিলে দু'জন লোক দ্রুত আহারে মগ্ন। কেবল রেস্টোর'রায় এক কোণে কয়েকজন একটা টেবিলের চতুর্পার্শ্বে ঠাণ্ডা দারুণময় আসনে বসে বেহেড মাতালের মত অসংলগ্ন অতি বাচাল কবোষণ প্রত্যর্কে মত্ত। যদিচ কোনো বৈষয়িক গচ্ছন্দ্য নয়, জৈবিক প্রাণে লালিত নির্মল সমবেত বাক্যালাপই এদের একান্ত আরাধ্য। সমস্ত দিনের নিঃসঙ্গতা অপরাহ্নিক বিমর্ষতা হঠাৎ উদ্দাম বেগে শাহেদের মনের সমস্ত মালিন্য মুছে দেয়। অপরিচয়ের দূরত্ব সরে গিয়ে কখন জানিনা একাকার হয়ে যায়। আলাপরত মাহুঘণ্ডলোকে শাহেদের তখন পরম ঘনিষ্ঠ মনে হয়, অন্তর শরীরে নিজের আদল দেখে মাহুঘ যেমন বিস্মিত হয়, শাহেদ তেমনি শিহরিত, সমস্ত হুবন তার আলোড়িত হয়, কেননা, সামুদ্রিক বৃষ্টি এখনও ধ্বনি তোলে এবং বিজিতের মানসিক গ্লানি দূরীভূত হয়। শাহেদ আলাপরত মাহুঘণ্ডলোর পাশেই একটা ফাঁকা টেবিলে বসে, চেয়ারে বসতেই একটা ছোকরা এসে ভিজে ছাকড়া দিয়ে টেবিলটা মুছে দেয়। একজন বেয়ারাকে ডেকে শাহেদ খাবার আনতে বলে।

রেস্টোর'রায় আহালাদি সেরে সে পুনরায় রাস্তায় নামে। পেছনে সমবেত গুঞ্জন পড়ে থাকে। আবার একাকীর নিভৃত নিঃশ্বন। ভরাপেটে হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। সামনে একটা রিকশা পেলে তাতে চড়ে বসে। ফাঁকা রাস্তায় রিকশা দ্রুত এগিয়ে যায়। দু'একটা দোকান খোলা আছে এখনো। রিকশার সিটে গা এলিয়ে দেয় শাহেদ। ক্লাস্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে আসছে। এখন সূখকর শয্যায় গা ডুবিয়ে গভীর একটা ঘুম ভিন্ন আর কিছু কাম্য নেই। গলির মোড়ে এসে রিকশাটা ছেড়ে দেয়। সদর রাস্তা ছেড়ে শাহেদ গলি ধরে এগোয়। অতি সম্প্রতি তার এখানে উঠে এসেছে। শহরের এদিকটায় নতুন নতুন বেসব বাড়ী উঠেছে সবই প্রায় কোনো রকমে বেড়া আর টিন দিয়ে খাড়া করেছে। ফলত, স্বল্পজীবী লোকদের মোটামুটি একটা সূখকর আশ্রয়।

এখন অনেক রাত। সারা পাড়া গভীর ঘুমে মগ্ন। ফলত, নৈশবেলের গভীরতা প্রগাঢ়। কেবল দু'একটা ঘরে এখনো আলো দৃষ্টিত হয়। সন্ত ঘুমভাঙা শিশুর অল্পটুকু কান্নার ধ্বনি ভেসে আসে। নাতিপ্রশস্ত অঙ্ককার ইট-বিছানো এবড়ো খেবড়ো গলিটা আজ ভীষণ শান্ত। অভ্যস্ত পায়ে শাহেদ অঙ্ককারে হাঁটে। বাড়ীর সামনে এসে একটু দাঁড়ালো। না, দরজা খোলাই আছে। হাত দিয়ে ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। এক চিলতে উঠোন অঙ্ককারে থৈ থৈ করছে। দরজা বন্ধ করে শাহেদ সোজা নিজের ঘরে ঢোকে। স্নইচ টিপতেই ঘর আলো। টেস, টেবিলটার ওপর বইগুলো কে যেন তছনছ করেছে। হয় শাছু নয় আনোয়ারের কীর্তি। সন্ধ্যার সময় পড়তে বসে এই কাজ করেছে হুঁজনে মিলে, কী এলো-মেলোভাবে ফেলে গেছে জিনিসপত্র। চেয়ারের ওপর বসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলে শাহেদ। স্নান-সর থেকে মুগ্ধহাত ধুয়ে এসে বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরায়। সকলেই ঘুমে অচেতন। কেবল পাশের ঘর থেকে বাবার কাশির শব্দ শোনা গেল। প্রায়ই গভীর রাত করে বাড়ী ফেরে, ফলত নৈশআহার বাইরে করে আসে। এজ্ঞে অহেতুক কেউ তার জ্ঞে জ্ঞেগে থাকে না। কাল সকালে আবার অফিস! ভাবতেই মনটা দমে আসে।

শাহেদ একটা গুণ্ড কোম্পানীতে চাকরী করে। বর্ণনাতীত স্বল্প বেতন। এ চাকরী তাব মোটেই ভালো লাগে না, আর ভাল না লাগলেও অল্প চাকরী পাচ্ছে কোথায়? টাকা কয়টা হেরে মনটা এখনো খচ্‌খচ্‌ করছে। পিতার সম্ভাব্য কর্মাবসর, ক্রমবর্ধমান সাংসারিক অনটন ও আর্থিক অপ্ৰাচূর্ষ তাকে এক অস্বাস্থ্যকর ভাবনায় ধাবিত করে। (আজ যদি সে টাকাগুলো পেয়ে যেত?) ফলত: নিষিদ্ধ অর্থোপার্জনের বাসনা এক দুর্মর অলীক সাফল্যের সংকেত হানে। অল্প জ ভ্রাতৃত্বয় এখনো বিদ্যায়তনিক শিক্ষালাভের অগম্য পথে অধ্যবসায়ী। একজন যদি অল্প ভুবনের স্বপ্ন দেখে তো দ্বিতীয়জন আত্মকেন্দ্রিকতায় নিষিদ্ধোদী। ফলত: উভয়ই জনকের চোখে এখনো অল্প মিথিলার ছবি ধরে। বিজন ঘরে চিন্তার যুথচারী আশন অক্ষমতার অব্যক্ত একটা ষঙ্কণা তাকে যেন কুরে কুরে খায় অহরহ। কে যেন তাকে বার বার প্রভারিত করে। সে যেন আর ফিরে যেতে পারবে না। আমার গন্তব্যের ছয়ারে কে যেন ছু বাছ মেলে পথরোধ করে দাঁড়ায়। গলার ভেতরে কি যেন একটা জমে আছে। সজ্ঞারে গলা খাঁকারি দিল। গভীর ঘোন্নায় তার মন অদৃশ্য সেই অরাতিক লক্ষ্য করে নিষ্টিবন ফেলে। জানালার বাইরে না পড়ে শিকে লেপটে যায়।

শাহেদের মনে হল, ঐ নিষ্ঠীবন জ্ঞানালার শিকের মত যেন তার নিজের গায়েই লেপটে গেল। সমস্ত শরীর গভীর ঘুণায় রি-রি করে ওঠে।

ভোরে উঠে আবার অফিস দৌড়তে হবে। শাহেদ আলোটা নিভিয়ে দেয়। সারা ঘর চকিতে অন্ধকারে মাতামাতি। বিছানায় গা দিতেই গভীর ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসে। জন্তনের প্রাবল্যে ঘন ঘন মুখ ফারিত হয়। কোনোমতেই চোখের পাতা খোলা রাখতে পারি না। মাথার ভেতরে সমস্ত কিছু ঘুলিয়ে আসে। জাগরণের ব্যর্থ চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে আর স্ববশে আনা যায় না। ঘন ঘন হাই ওঠার দরুন চোখের কোণ ভিজে ভিজে ঠেকে। শাহেদ চিং হয়ে সটান শুয়েছিল। পাশ ফিরে ডান দিকে কাং হয়ে বাঁ হাতের কলুইটা ধরুকের মত ভাঁজ করে বালিশের ওপর গ্রস্ত করে আর ডান হাতটা বৃকের ওপর আলতো করে ছুঁইয়ে রাখে। কাং হয়ে শোয়ার দরুন কানের পাশ দিয়ে একটা পানির রেখা টপটপ করে গড়িয়ে পড়ে। ‘ঈস, হাই উঠলে এতো পানিও বারে’। তখন চোখের পানিতে উপাধান সিক্ত হয়। বাতাস এই নিঃশব্দ জন্তনাশ্রর ভেজা গন্ধ বয়ে বেড়ায় চার দেয়ালের ভেতরে। এখন কত রাত তা ঠাণ্ড করা যায় না। নিদ্রার অপ্রতুলতায় একেক দিন কী ভীষণ ছটফটই না করেছে সারা—সারারাত। প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ বুজে পড়ে থেকেছে। আজ রাতে তার কিছুই করতে হয়নি। ‘মনে হয় ঘুম হবে আজ। একটানা গভীর নিরুপদ্রব ঘুম। চেতন-অবচেতনের গভীরে নির্ভার ঘুম নিঃশব্দ পদপাতে এগিয়ে আসে। গভীর আবেশে প্রগাঢ় নিদ্রার ভায়ে চোখের পল্লব ক্রমে ক্রমে কপাট বন্ধ করে দেয়। কেবল একটা অস্পষ্ট চাপা গুঞ্জরণ বৃষ্টির ফোটার মত অনবরত তার চৈতন্তে ভেসে আসে, সেই ধ্বনিপুঞ্জ তাকে টেনে নিয়ে যায় ভিন্ন দৃশ্যে ভিন্ন লোকে। ধ্বনিতে কিসের সংস্বে! যেন বর্ণাঢ্য কোনো স্বপ্নের দৃশ্যাবলি একটি কোমল স্নগন্ধী বয়ে আনে প্রবল হাওয়ায়, নিদ্রার গভীরে অশ্রুত এক রাগিণী ঠাপে। চৈতন্তের গভীরে সেই অমল ধ্বনি মরে আসে। দিনান্তের ক্লিষিত আলো জ্বলে জ্বলে যেমন নিভে আসে। এখন শাহেদ কিছুই শোনে না, কিছুই দেখে না। কেবল আঁধারময় এক রজনী প্রতিভাসে কাঁপে। যে অন্ধকার তাকে অস্ত্র এক হুবনে নিয়ে যাবে, যেখানে প্রাত্যহিকতার ভাবনা নেই।

সারারাত ধরে শাহেদ, কেবল একটা স্বপ্নই দেখল, কাজিফত উছানে পৌছানোর গাস্তাটা বার বার সে হারিয়ে ফেলছে।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



কবিরের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো। তাব নাকি বিশেষ প্রয়োজন। বারবার বলেছিলো যেন সময়মতো তাদের লারমিনি স্ট্রীটের বাসাতে যেতে ভুল না হয়। অথচ কবিবকে তখন পাওয়া গ্যালো না, তার আপা জানালেন সকালে বেরিয়ে সে আর ফেরেনি। বাসায় কিছু বলেও যায়নি। স্তত্রাঃ ক্ষুধা ফিরতে হলো আবুবকরকে। সাথে কেউ ছিলো না, থাকলে এ-দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে একচোট হয়ে যেতে পারতো।

বিকেল এরপর উদ্দগ্ধহীন কাটলো। স্টেডিয়ামেব বইয়েব দোকানগুলি বুখাই তছনছ করলো কাজিত পোপারব্যাক খুঁজে। পুরনো বইয়ের ব্যবসায়ীদেরও রত্নাকর মনে হলো না, বসে থাকতে হয় বলে বসে আছে—এ-কথা যেন ওরাও জানে। রেস্তো পাওয়া যাবে বন্ধুদের? ঠিক নেই। উজিয়ে সোজা চলে গ্যালো টনি কারটিসদের কাছে। নাহ্।

সন্ধ্যা নামলো যখন ঘন হয়ে তখন হ্যামারকেটের এক চায়ের দোকানে সে একা। চায়ের কাপ, সিগারেট ও কবিতার কাটাকুটি হাতে, কিন্তু অস্ত্র নেই সময়-কাটার। অথচ সে কবি, তার পক্ষেই সম্ভব শরীরের সকল রক্ত খুলে পৃথিবীকে পান করা, তার জন্তেই সমীচীন রক্ষিতার মতো ভোগ করা পৃথিবীকে। আবুবকর এখন কোথায় যাবে। নীলখেত ফিরতে-ফিরতে সে একজন মহিলাবাদী অধ্যাপক, তিনজন রমণবিলাসী লেখক ও সাতজন স্ত্রীসাহিত্যিক দেখতে পেলো। তার সাথে জুটলো এক রাজনীতি-ব্যবসায়ী, বঙ্গদেশ খুন হতে থাকলো।

দশটা নাগাদ ঘরে ফিরে এসে সে আবার একা। সহমর্মী এক নতুন বৃটিশ কবির সাথে কিছুক্ষণ কুয়াশায় হাঁটাইটি করা গেলেও, এক জর্মন কুমারীকে নিয়ে রোমহর্ষক

আলোচনায় মাতলেও, সে দেখলো কি সাংঘাতিক এই একাকিত্ব তার। সহবানী বন্ধুব নারী ও মছপানের আহ্বান উপেক্ষা করে বারোটা নাগাদ আবুবকরকে নামতে হলো রাত্য়। নামতে সে বাধ্য ছিলো, এমন মনে হলো।

পথে—চারপাশে—ফাল্গুন দেখা দিগেছে। কাঙ্কন ফুল বিকশিত। ডালে-ডালে আশ্রম্ফুল পুঞ্জিত। চঞ্চল মউমাছি। কেবল বেগুন নেই, থাকলেও শোনা যেতো দখিণা বাতাসে মর্মর। একটি-ছটি গাড়ি আসছে মাঝে-মাঝে। যাচ্ছে বোডো বেগে। এতো রাতে কিসের তাড়া ওদের? নিরাফুল গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছে পথচারী। বৃহৎ ও স্ত্রগোল চাঁদ একদম মাথার ওপরে। লারমিনি স্ট্রীটে পৌছবার আগে সে দেখলো তিনজন মাতাল, ছ'জন মৃত ও একজন যুবতী প্রমোদবালা। গড়ে প্রায় পাঁচশো গজ পর-পর দেখেছে এদের, অথচ আবুবকরের মনে হলো এক সাথেই এই ক'জন হাঁটছে।

কবিরের আপা এবারেও দরজা খুলে দিলেন। না, এখনো ফেরেনি সে। রাতে না-ও ফিরতে পারে। আবুবকরের কিসের দরকার? ও, কবিরেরই জরুরি দরকার ছিলো। অতো দূর থেকে যখন এসেছে তখন একটু বসুক সে, হঠাৎ ফিরতেও পারে তো অনেক রাতে। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে? আজ বরং থেকেই থাক সে এখানে। না-না, কোনো অসুবিধে হবে না।

কিছুক্ষণ পর কবিরের বাবা এলেন। আগে থেকেই আবুবকরকে চেনেন তিনি। কবিরকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো, ছেলেটা এমন বখে গেল কেন।

কিন্তু উদ্বেগ নেই কারো মুখে। কোনো ফোনও হয়নি খানায় বা হাসপাতালে বা স্বজনদের কাছে। অর্থাৎ কবির আজকাল প্রায়ই বাইরে রাত কাটাচ্ছে এবং নিরাপদেই ফিরে আসছে। আবুবকর যদূর জানে তার কোনো নেশা নেই—না মদে, না মেয়েতে, না তাসে, না রাজনীতিতে; তাহলে এমন হয়েছে কেন ও? জরুরি প্রয়োজন ছিলো, কিসের প্রয়োজন। যোলো আনা সম্ভাবনা অবশু পরামর্শের। কিসের পরামর্শ।

কবিরের ঘরে সে যখন একা তখন কাকে যেন তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলো। দেখলো একটি মুখ যাতে দু'টি চোখ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু কোথায় যে দেখলো! জানালাগুলি বন্ধ। কেবল অন্যরের দিকে দরজাটা খোলা। গাঢ় লাল রঙের পরদা সবসময়েই কিছু-কিছু ঢুলছে। ওখানে কি? কে? অসম্ভব। আসলে সে দেখেনি কোনো দৃষ্টি হয়তো, অসুভব করেছে মাত্র। কিন্তু সহসা এই অসুভব কেন?

অতএব ঘুম এলো না। জাগরণে ঘাবে বিভাবরী? মরি-মরি।

ডেস্কের ওপর রাখা বইপত্রের দাঁটাঘাঁটি করতে লাগলো আবুবকর। সব কিছুতেই কবিরের চিহ্ন লেগে আছে। লেন ডেইটন-এর ক'টি বই। হজরত মোহাম্মদের (স) উক্তি মনে পড়লো : 'নারীকে তোমরা আঘাত করো না, ফুল দিয়েও না'। আজ্জোজে কাগজপত্রের 'পাম্পশু পায়ে শামসু মিয়া হুট হামসুন পড়ে' ইত্যাদির ছড়াছড়ি। ডায়রীর মতো একটা পেয়ে সে পড়তে থাকলো। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে রেখে দিলো। কিছুই নেই কোতুহলের, উপভোগের। 'আমরা সবাই এই জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থার শিকার, একে পদাঘাতে-পদাঘাতে ভাঙা ছাড়া নতুন সুন্দর জীবন গড়া অসম্ভব'—এইসব। আবুবকরের মনে পড়লো মাতাল ও মৃত ও প্রমোদবালা ক'জনকে। মাথার ওপরে পূর্ণ চাঁদ। সেই চাঁদ।

বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লো সে। জানালার একাংশ রাখলো খুলে। না, ঘুম নেই। কবির এখন কি করছে? নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে না। এ-বিশ্বাস কেন জানি হলো তার।

অন্ধকারেই আবার ফিরতে হলো আবুবকরকে ডেস্কের কাছে। শীতলতায় মাথা ঠেকিয়ে, শরীর এলিয়ে বসে থাকলো। হু' হাতে টানতে লাগলো চুল। অনেক বড়ো হয়ে গ্যাছে চুল। বোদলেয়ারকে মনে পড়লো। বীঠোফেনকে মনে পড়লো। মনে পড়লো ব্লেক—উইলিঅম ব্লেককে। স্বর্গ-নরকের বিয়ে। শক্তি হচ্ছে শাখত আনন্দ। কারণ শরীর আত্মার অংশবিশেষ মাত্র। জলপ্রেমিকদের জলেই ডোবাও। আইনের পাথরে কারাগার যেমন তৈরী, তেমন ধর্মের ইটে বানানো হয়েছে বেঞ্চালয়। রমণীর নগ্নতা ঈশ্বরের কারুকর্ম। For everything that lives is Holy.

বিদায়, ব্লেক। ঘুম।

ঘুম আসছে আবুবকরের।

কিন্তু আবার সেই হু'টি চোখ। কি চায় ওরা? অবসন্ন দেখে সে ওদের। হু'টি ভীত কালো পাখি সোজা উড়ে আসছে। দিগন্ত অন্ধকার। চারপাশে আবার রাত্রি নেমে এলো। ও কি চাঁদ না উজ্জ্বল কোনো ফুল?

ঘুমে চোখ জড়িয়ে গ্যালো, সেই সঙ্গে আত্মার অংশবিশেষ, রক্তও বুঝি নিশ্চ প। কিন্তু কে যেন আবুবকরের সমস্ত মুক্ত করে নিচ্ছে। গবিত জনের আভরণ হচ্ছে লজ্জা, তার দুটোই অদৃশ্য হলো, কেবল থাকলো সৌন্দর্য। আবদ্ধ চোখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দৃষ্টির কালো বর্তুল, দেখলো নগ্ন আবুবকরকে, যাকে লেহন



করছে শয্যার পাশে দাঁড়ানো একটি পিপাসা, কখনো উবু হচ্ছে, আর ঘন শ্বাস ফেলছে; কখনো ফিরে যাচ্ছে, আর উত্তাল হচ্ছে বাহুতে।

চার চোখ একত্র হলো।

কে তুমি ?

কে তুমি ??

আমাকে চাখো।

আমাকেও চাখো।

ওরা পরস্পর একতা পায়। সেই ঐক্য থেকে জন্ম নেয় শিল্প, জীবনের বৃক্ষ, আর মৃত্যুর বৃক্ষ বিজ্ঞান কেবল যাহাতে থাকে অতীত, তার ছায়া। বস্তুত একদা কল্পনা কোনদিন প্রত্যক্ষ হয়।

প্রথর আনন্দ নিয়ে জেগে ওঠে আবুবকর। অপস্থত হয় বৃক্ষ, বৃক্ষের মহান নৈশব্দ্য। ক্লাস্তিতে জন্ম হয় তার। আবুবকর স্থখী, ক্লাস্তিতৃপ্ত।

চারপাশে সকালের আলো ফুটতে থাকে। কিন্তু ঘরের ভেতর এখনো গহন ছায়া। ওরা ছ'জন একতা ভেঙে মুখোমুখি হয়। ওরা কেউ কারো মুখ দেখে না, দেখতে পায় না!

আবুবকর জানতে চায়—কে তুমি ?

সে বলে—আমাকে চিনতে চেষ্টা করো না। পরিচয়ে মৃত্যু হবে আমার।

—কিন্তু অপরিচয়ে তো আমার মৃত্যু। কবিরের মৃত্যু।

—না।

—কেন ?

—এ তোমাদের ভুল। তোমরা জানো না মৃত্যুর যুক্তি আছে। কিন্তু এ যুক্তি নয়, শক্তি।

—কবির ফিরছে না কেন ?

—ভ্রাস্তিতে।

—আমিও ফিরবো না। অর্থাৎ আর কোনদিন আসবো না। আমাদের মৃত্যু হোক।

—না। প্রেমে তুমি জন্ম নাও আবুবকর, বাঁচতে থাকো।

সে চলে-চলে যায়। পরদা একবার কাঁপিয়ে দাঁড়ায়—আমাকে খুঁজো না।

আবুবকর তার অন্তর্ধান দেখে। রাত্রির ছায়াটি কে ? সে কেন আনন্দের কথা বলে, আনন্দে কি পেয়েছে জীবন, তার জীবন, আমাদের জীবন ?

সকাল আরো উজ্জল ও শক্তি হইয়াছে। জানালা খুলে, দরজা খুলে সে বারান্দায় যেয়ে কি খোঁজে। কবিরের পিতা বাগানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপরিচিত এক পুরুষ। হাতে ছড়ি। মাথায় টুপি। মনে হয় বেড়াতে বেরিয়ে এখানে থেমেছেন। তাঁকে কেমন খেয়াল করছেন কবিরের আপা। তা নিয়ে রগড় করছে ছোটো বোনটি।

এ-বাড়ির সবাই এতো ভোরে জেগে যায়? কেন যায়?

আবুবকরের কেমন শুকতা পায়। ঘরে ঘিরে আসে। বসে। বাথরুমে যাবে কি যাবে না করে। শেষে সিগারেট জ্বালে। তখন শুকতার সঙ্গে-সঙ্গে দহন শুরু হয়। এদিকে চারপাশে দীপ্তি। তার কিছু নিয়ে ঘরে ঢোকে কবিরের ছোটো বোনটি—ভাইয়া!

—কি?

—নাশতা করবেন না? চটপট হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন।

—হ্যাঁ। কিন্তু নাম কি তোমার?

—আমার নাম? আমার নাম মউ। আর আপার নাম লোপা। লোপা'পা। আমি বলি পাপা।

—কোন ক্লাশে পড়ে তুমি?

—ভা বলবো না। আপনি আমাকে কবির ভাইয়ার মতো খুকী ভাববেন তো!

—না মোটেই ভাববো না।

—উ, বললেই বিশ্বাস করছি বুঝি। আপা কাউকে বিশ্বাস করতে মানা করেছেন। আবুককেও না। আম্মকেও না।

চঞ্চল বাচাল হাসিখুশি মেয়েটা আবুবকরকে চমকে দিয়ে চলে যায়। এই অল্পকরণের নাম সমালোচনা। কেন সে ভাইয়া ডাকলো? কবিরের সমান সম্মানী পাওয়া সম্ভব নয়।

খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু আবুবকর এ-নিয়মে করতে লাগলো নাড়াচাড়া, কেন এমন হয় এবং কেন এমন হওয়া উচিত নয়। বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর, একাকী নাশতা সারার পর তুচ্ছাতিতুচ্ছকে নিয়ে তার আবার ঘন শুরু হয়। বাড়াবাড়ি যেমন পৌঁছে বিষয়াস্তরে, তেমনি তাকে এক সময় ভাবতে হয় সামান্য সেই চমকে যাওয়ার কথা। অ্যালবিয়নের কোনো কল্লাকে দেখেছে। দেখেছিলো কি? বন্দিনী সে কাঁদছে। কিন্তু শক্তি, শাস্ত আনন্দ, তুমি কে? তুমি কোথায়?

অচরিতার্থ বাসনাকে লালন না-করে বরং দোলনার শিশুটিকে হত্যা করো। জন্ম !  
জন্মের শিল্প। প্রচুর জন্মানোর নাম সৌন্দর্য।

মউ-র পাপা আবার ঢুকলেন ঘরে। নাশতার টেবিলে তাঁর সাথে কোনো কথা  
হয়নি। সারাক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন সেই প্রশান্ত পুরুষের সঙ্গে। এখন কি  
বলতে চান বা বলবেন ?

আবুবকর আগেই কথা কয়ে উঠলো—আপা, আমি এখন চলে যেতে চাইছি।

লোপা অদ্ভুত চোখে তাকে দেখলেন। যেন তার কথা কিছু শোনেননি, কিংবা  
অন্ত কিছু ভাবছেন। বললেন—কবির !

—আমি আবুবকর।

—কবির !

—ঐ। দেখুন...

লোপা তখন চলতে শুরু করেছেন। আনমনা। বারান্দায় যেয়ে দাঁড়ালেন।  
সেই রোমশ পুরুষ এখনি বোধহয় বেরিয়ে যাবেন।

—ভাইয়া !

—মউ ! ও। আমি এখন চলে যাচ্ছি।

—কেন, ভাইয়ার সাথে দেখা করবেন না ?

—ও তো এখনো এলো না। আর কতো অপেক্ষা করা যায়। আমার খুব  
কাজ আছে।

—কবির ভাইয়া তো আছে। কি বদলে গ্যাছে যে একদম চেনা যায় না। এতো  
সুন্দর হয়েছে তবু ওকে আগের মতো ভালাগে না।

—কি বলছো তুমি !

—সত্যি বলছি। ওকে...

মউ হঠাৎ থেমে গ্যালো। লোপাকে দেখেই খুব সম্ভব। লোপার চোখেমুখে  
রোষ। এ-বাচালতার জন্তে শামাতে গ্যালো কিন্তু হলুদ ফ্রকের কিশোরীটি তখন  
পলাতক। লোপা দাঁড়ালো আবুবকরের সামনে—তোমার যাওয়া হবে না কবির।

—কেন ?

আবুবকরের স্বরে এই প্রথম তীব্রতা ধ্বনিত হলো। শিলাতে আছড়ে পড়া  
তরঙ্গের আকোশ তার বৃকে।

—তুমি বাইরে গেলে ফিরতে চাও না। অন্তায় হৃবিধে ভোগ করো।

শান্ত হলো আবুবকর—আপনি ভুল কনছেন, আমি কবির নই।

—তুমি কবির ।

—না ।

—প্রমাণ চাও ?

—চাই ।

—দিতে পারি, কিন্তু তার আগে তোমাকে বলতে হবে কেন তুমি লুকোতে চাচ্ছে। ভয়ংকর আজগুবির আশ্রয় নিয়ে পালানো তোমার উচিত হবে না ।

—প্রমাণ পেলে আমি এসব কথার জবাব দেবো ।

—দেবে ? দিতে পারবে ? তবে যাও অই আয়নার সামনে, ছাখে নিজেকে ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবুবকর দেখে সে কবির । সে নত হয়ে যায়, আঁকড়ে ধরে লোপার জাহ্নু—আমি কবির ।

তখন সেই চোখগুলি দেখা যায় । চারটি চোখ ছুঁটির বদলে । রাত্রির ছায়া দিনের কারনিশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তার মুখে একটি চোখ, বুকে ছুঁটি চোখ আর নিতম্বের সংকীর্ণতায় একটি চোখ । দৃষ্টি ভেদ করছে আবুবকরকে, গেঁথে রাখছে দেয়ালে । পাখি বানায় নীড়, মাকড়শা বোনে জাল, মাহুঘ গড়ে বন্ধুত্ব, কিন্তু তুমি কে—কি করো তুমি ? তোমার চুল—রাশি রাশি উত্তাল চুল—তোমার জন্তে ছায়া, অই ছায়ার ভেতর কি ? আরো—আরো চোখ ?

—কি হয়েছে কবিরের ?

জানতে চান কবিরের বাবা ।

—ও অমন করছে কেন লোপা ?

জানতে চান সম্ভ্রান্ত অতিথি । তিনি উঁকি মেরে কি দেখেন । লোপার জাহ্নু ? আবুবকরের রক্তাক্ত হাত ? কাচবিদ্ধ চোখ ? Eternals ! I hear your call gladly. তিনি কি জানেন the head Sublime, the heart Pathos, the genitals Beauty, the hands & feet Proportion ?

—ওকে ঘুমিয়ে রাখো বাবা । ওর এখন ঘুমের দরকার । ঘুমোবে ও ।

লোপা বলে । করুণ হয়ে গ্যাছে সে, অথচ বুকের ভেতর তার বনে-বনে ফোটা ফুল, দুলায়মান নবীন পাতা । হায় ! জ্ঞানী ও মূর্খ একই গাছ কখনো ছাখে না !

আবার গভীর রাত্রি ও তার ছায়া । কি আজব স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছে আবুবকরের । কেন এমন স্বপ্ন দেখলো ? বুকের ভেতর যেখানে খুঁউব নরম একটি

বুক সেখানে হুঁকে দে'য়া হয়েছে ঘীণুর জন্তে আনা পেরেক। হে জেরুজালেমের বিদগ্ধ যুবক-যুবতী ও অ্যালবিয়নের বন্দিনী কণাগণ, ছাথো কি আক্রোশ বাহুতে, কেমন জাক্জাল্যমান কেশরাশি, ছাথো পশ্চিম সাগরের অন্তায়মান আশুন! শয়তানের গভীর স্তনদ্বয়ে মুখ রেখে ছাথো রাহাব কেমন গ্যালো শাখতীর দেশে। শারলেমেনের সন্ন্যাসী, হে ধূসর বৈরাগী, এ-অশ্রু ছাথো, for a Tear is an Intellectual thing. পুরুষ, তুমি পান্না-মোতির ফারনেস; নারী, তুমি সোনালি তাঁত; কবির, তুমি এখন খরদীপ্তিময় এক সিংহ, ষ্টেশরের প্রজ্ঞা। শাখতী, তুমি মহাকাল-সন্তানের জন্তে, তোমার প্রেম সে-ই পায়।...আবুবকর এ-সমস্ত স্বপ্নের ভেতর দেগে কবিরকে, ক্যারিবি আন সাগরের তীরে উলঙ্গ শুয়ে আছে, তাকে লালাসিক্ত করছে বেলাভূমির রৌদ্র, হাওয়া, পুরুষ, শীতল পিছল ঢেউ। আবার অন্ধকারে কবির, কায়রোর এক নৃত্যশালায়, মদমত্ত উদরনৃত্যে উত্তরঙ্গ, নগ্ন জেরিন আফোকিকে চুষে-চুষে খাচ্ছে।... কবির এখানেও।

না, ঘুম ভেঙেছে আবুবকরের। পাশে গত রাত্রির সেই ছায়া। সম্পূর্ণ বদলে গ্যাছে মূর্তিটি। অবিকৃত আছে মাত্র চারটি চোখ: ওপরের মূহু ও ভীতু একটি চোখ, মাঝের বিশাল ও কাতর দু'টি চোখ, নিচের স্ফীত ও উৎসাহী চোখ। এমন কেন ও? কিন্তু দৃষ্টি! অহো, কি ভয়ংকর। নগ্ন হয়ে আছে আবুবকর, জলে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে।

—বিশ্বাসঘাতক!

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে আবুবকর। কিন্তু সে খুব নরম ও স্বরেলা স্বরে বলে—তুমি আজো খুব ভুল করছো কবির।

—না, করছি না। বিশ্বাসঘাতক তুমি, একশ'বার বলবো এ কথা, চেষ্টায়ে জানাবো সবাইকে। এভাবে আমাকে পুড়িয়ে মারবার জন্তেই কি থাকতে বলেছিলে কাল?

—আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি? গোলাপ, আমার গোলাপ তুমি। বাঘ, বাঘ, জলন্ত অঙ্গার তুমি। নিজেকেই দহন করে দীপ্তি পাচ্ছে তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ, তোমার মন ভালো ছিলো না সারাদিন। লোপাকে, মউকে, কবিরকে তুমি আজ নষ্ট করতে চেয়েছিলে!

—না, চাইনি। তোমাকেই চেয়েছি।

—আমি কখনো নষ্ট হবো না। আমার অগ্নিশক্তি হয়েছে, এ্যাদিন তোমার তা

বাকি ছিলো। এসো, এখন এসো আমার কাছে। নাও এই চোখটি, রাখো প্রেম।  
নাও এই চোখ দুটি, দাও আক্রমণ। নাও এই চোখটি, করো প্রবেশ। তুমি আত্মা,  
আমি তার অংশ।

\* \* \* \*

সকালে লোপা ডাকলো। মউ ডাকলো। বাবা ডাকলো। উপস্থিত হলো  
কবির। আবুদকর শুনলো প্রয়োজন। একসাথে নাশতা খেতে-খেতে তখন সবাই  
এরা পরস্পরকে ভালবাসলো, আক্রমণ করলো এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করলো। ছায়াটি  
কেবল এ-সমস্ত দৃশ্য দেখলো, অশ্রুতে তার মুখ ভেসে গ্যালো।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



‘মালেকুল মগুত এসে বলবে : “আসসালামো আলায়কুম !” আর তুই সঙ্গে সঙ্গে ঢ’লে পড়বি !’—যিনি বলছিলেন, তাঁর লুঙ্গি হাঁটুর বেশী নিচে নামেনি ; গায়ে একটি শাদা ফতুয়া ; মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা ও শাদা, চোখে চশমা নেই : ঐ চোখে এখনো ভালো দেখতে পান কিন্তু চোখের চাউনি কেমন স্তিমিত মুক্ত ও ঘোলাটে, চোখের নিচে মাংসের স্তর ফুলে আছে। তিনি মেঝের উপরে বিছানায় ব’সে কথা ব’লে যাচ্ছিলেন ; তাঁর বলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় তিনি শ্রোতার সম্বন্ধে গুরু : যাকে বলা হচ্ছে সে আদৌ শুনছে কিনা, সে সম্বন্ধে তাঁর চেতনা নেই ; কর্ণধরের উখান-পতন আছে কিন্তু চোখ সারাক্ষণ স্তিমিত। তাঁর সামনে তক্ত-পোশের উপর আধোশোয়া হয়ে যে ছেলেটি তাঁর কথা শুনছে, তার মুখে মুহূ-বিস্ত্রত হাসি, তার দাড়ি-না-ওঠা এখনো-কিশোর মুখে সোনালি লাবণ্য জ্বলছে, লালচে গাল, ভিতরের আভা। যেন স্বকের উপরে নীল-হলুদ আভা দিয়েছে। তিনি, বুদ্ধ, অবিরাম কথা ব’লে যাচ্ছিলেন ; আর সে, ছেলেটি, মগুত, মাথা নিচু ক’রে কি অশ্রুদিকে চেয়ে শুনে যাচ্ছিলো, মুহূ হেসে মাথা তুলছিলো কখনো।

তিনি বলছিলেন, ‘মালেকুল মগুত এসে তোকে সালাম দেবে, আর তোর দিন-রাতের খেলা তখনই শেষ হয়ে যাবে। তুমি দিনরাত কাজ করতোসো : একটু নিখাস নেবার ফুরসৎ নেই, জিরোনোর সময় নেই, আল্লাতা’লার নাম নেবার ফুরসৎ নেই ; তাহ’লি কি হবে, ডাক আ’লি আর দাঁড়াতি পারবি না, সোনা, সব জরুরি কাজ পড়ে থাকবে। ওরে, রাজা বলো প্রেজা বলো—সবারই তাঁর কাছে যাতি হবে। ছুনিয়ার এই মজা—এ কিছূ না রে বাপ : এ হলো চোখের ভুল, এ হলো হৃদয়ের মায়্যা। ওরে, এই ছুনিয়া তো তোর আসল বাসস্থান না : খাঁচার

দোর খুলে দিলি পাখি দৌড়য়, মানুষও ছাড়া পালিই দৌড়য় । মৃত্যু ডেকে বলতেসে : “চ’লে আয় !” কবর ডেকে বলতেসে : “চ’লে আয় !” ক-দিন থাকবি তুই আর : একদিন-না-একদিন যাতিই হবে তাঁর কাছে ; তাই তো বলি তোদের : তারে ভুলিস নে, তার নাম কর, নামাজ পড়, রোজা রাখ, আর সোজা পথে চল, আল্লার নেক বান্দা হ ।’

মণ্টু কোন কথা বলছিলো না, কেননা তার কথা বলতে হচ্ছিলো না, বুদ্ধই অবিরাম অনর্গল কথা ব’লে যাচ্ছিলেন, সে কেবল মাঝে-মাঝে সমর্থনস্বচক অশ্রুট শব্দ করছিলো বা মাথা নাড়ছিলো । তিনি মেঝের উপর বিছোনো শয্যার উপর শিরদাঁড়া খাড়া ক’রে ঠায় ব’সে বক্তৃতা করে যাচ্ছিলেন, কেবল তাঁর মুখ নড়ছিলো, চোখ স্তিমিত, দেহ স্তব্ধ । মণ্টু তার শোবার তক্তপোশের উপর ব’সে, অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে শুনছিলো, এখন মাঝে মাঝে সে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো, আর তার এ লোকটি সম্বন্ধে সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিলো ।

বুদ্ধ মণ্টুর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, ওদের জন্মজায়গা খুলনায় থাকেন, মাঝে-মাঝে ঢাকায় আসেন, ঢাকায় এলে ওদের বাড়িতেই ওঠেন বা অন্ত-জায়গায় উঠলে মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে এসে থাকেন । বুদ্ধ লোকটি অভূত চরিত্রের ; নিঃসন্তান, স্ত্রী আছেন—তার সম্বন্ধে তিনি তেমন উৎসুক নন ; ভদ্রলোকের বয়স প্রায় সত্তর, আজীবন কোনো জীবিকা অবলম্বন করেননি—ব্যবসা বা চাকরি-বাকরি কিছুই না ; দেশে সামান্ত জমিজমা আছে, তাতে সারা বছরের খোরাক চলে না, কোন এক সময়ে অন্নদিনের জন্তে মসজিদের এমামতি করেছিলেন । আত্মীয়দের—আর দেশের লোক মাঝেই তাঁর আত্মীয় : খুঁজে-খুঁজে সব বের করেন, লতায়-পাতায় কোথায় সম্পর্ক আছে তা-ও—আত্মীয়দের বাড়ি-বাড়ি খেয়ে বেড়ান ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা যাদের তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা চেয়ে নেন—এইভাবেই চলে তাঁর । যেহেতু এভাবেই তিনি চালাচ্চেন বছরের পর বছর, অতএব কেউ তেমন আপত্তি করে না ;—ষদিও বিরক্ত হয়তো অনেকেই হয় । মেয়েরা এবং বুড়োবুড়িরা বরং খুশিই হন দেশ-গাঁয়ের সব আত্মীয়স্বজনের নাড়িনক্ষত্রের খবর তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরে ।

ষথারীতি তিন-চারদিন হলো তিনি মণ্টুদের বাড়িতে এসেছেন । তিনি শুধু দিনের বেলা বাড়িতে খান, রাতে আদৌ কিছু খান না । এখনো অন্তান্ত আত্মীয়দের বাসায় যাওয়া আরম্ভ করেননি, একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন বুঝি,—অন্তবার কিন্তু এতদিনে অন্ত কোথাও চলে যান এবং যেখানেই তিনি যান সেখানেই জমিয়ে বসেন । কাছে



একটা মসজিদ আছে, অনেক সময় সেখানেই কাটিয়ে দিচ্ছেন দিনরাত। বাঁড়র ছোকরাকে নিয়ে একদিন বাজারেও গিয়েছিলেন সাধ ক'রে। আর, যতক্ষণ বাড়িতে আছেন ততক্ষণ তাঁর মুখ চলছে, ততক্ষণ অবিরাম গল্প করছেন, নিজের বর্তমান ও অতীতের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা। বাড়ির ছোটো-বড়ো সবাইকে উপদেশ দিচ্ছেন অন্তবন্ধ মুকব্বির মতোই, সবার সঙ্গে তুই-তোকারি করছেন : মা, মেয়ে ও মেয়ের মেয়েকে একই সোধোন করছেন। কথাবার্তা উপদেশ ও গল্প সব সময় শালীনতার সীমার ভিতর থাকছেন। মেয়েদের-ববৌদের বলছেন নামাজ পড়তে, রোজা রাখতে আর মাথায় কাপড় দিয়ে চলতে। উনি কেবল বাড়ির কর্তাকে—ছেলেটি অর্থাৎ মন্টুর আক্বাকে—ভয় ক'রে চলেন, একটু সতর্কভাবে কথা বলেন, সহজে তাঁর সামনে বের হ'তে চান না। মন্টুর আক্বা, শাহাবুদ্দিন সাহেব, আবার উদার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন যে বড়ো যতদিন থাকেন, গুঁর যেন কোনো অস্থবিধে না হয়। এমনিতে মন্টুদের পরিবারটি বেশ বড়ো : আক্বা, মা, বড়ো ভাই, ভাবি ও তাদের তিনটি ছেলেমেয়ে, মেজোভাই ও মেজোভাবি—এদের বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক, এখনো কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি, আর মন্টুর বোন জুলেখা; বড়ো বোনের বিয়ে হয়ে গেছে—তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে থাকেন, বছরে দু'বছরে একবার ক'রে আসেন। জুলেখা আপা কলেজে পড়ে,—বড়োকে দেখে সে তেমন সন্তুষ্ট দেখায় না ব'লে আত্মা খুব বকাবকি করছেন,—কেননা, সবচেয়ে যা বেশি ভয় : বড়ো আবার দেশে গাঁয়ে না-জানি কি নিন্দাই রটাবে। এমনিতেই আপার বিয়ে নিয়ে রোজ আত্মাকে কথা শোনানো, 'আইবুড়ো মেয়েকে ঘরে রাখিস নে, ওতে ভীষণ গোনা, ভালো একটা পাত্র দেখে পার ক'রে দে—' বড়োভাবি ছেলে-মেয়ের মা, গুঁর সামনে মাথায় কাপড় দিয়ে থাকছে। মেজোভাবি যে এত উচ্ছল, সেও বড়োকে দেখলেই মাথায় কাপড় টানার একটা অর্ধপ্রয়াস করছে সস্তমস্হচক,—আর আড়ালে গিয়ে ছোটো আপার সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ছোটো আপা বলে, 'ভাবি, দেখেছো, বড়ো যখন বকবক করে তখনো তসবিহ্ গুণে যায়—তসবিহ্ গুণলেই হলো, ও দোআ-দরুদ পড়ে কখন?' মেজোভাবি বলে, 'আর নামাজ পড়ে কি তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করেছে?' বলে আর ওরা হাসাহাসি করে। মা অথবা বড়োভাবি থাকলে হেসে মিষ্টি ধমক দিয়ে থামিয়ে ছায়। এদিকে এই বড়ো দূর-সম্পর্কের আত্মীয়টিকে, আত্মীয় না ব'লে দেশের লোক বলাই ভালো—তাঁকে জায়গা ক'রে দেয়া হয়েছে মন্টুর ঘরে,—ইক্বল ফাইতাল পরীক্ষার জন্তে মন্টুকে যে-ছোটো একটেরে ঘরখানি ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তাতে। ছোটো ঘর, একটি তক্তপোশ, ছাড়া কালির দাগ-পড়া একটি টেবল—মন্টু

প্রথম একেবারে বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, যখন সে-ঘরেরই অল্প পরিসর মেঝেতে তিনি তাঁর নোংরা বিছানা ক'রে নিলেন, মাথার কাছে তাঁর সঙ্গী পুঁটলিটা থাকল, সেই বিছানার উপরেই তিনি নামাজ পড়তে লাগলেন, তার ওপর ব'সে-ব'সে উপদেশ দিতে লাগলেন, রাজ্যের গল্প করতে লাগলেন। প্রথমদিন পড়ার ও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় পরের দিন সকালে মা-র উপরে রাগও করেছিলো মন্টু; কিন্তু তখনই তলে-তলে অবচেতনে লোকটা যেন তাঁর অদ্ভুত গল্প ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাকে আকর্ষণ করছিলেন,—এবং ক্রমশ মন্টু কৌতূহলে পড়াশোনা ও ঘুম একপাশে ঠেলে রেখে তাঁর সম্বন্ধে জাগ্রত হয়ে উঠছিলো, আর খারাপ লাগছিলো না; তাঁর অল্লীল ও অদ্ভুত গল্প দিয়ে বুদ্ধ যেন তাকে জাহ্নকের বঁশিতে মোহিত সাপের মতো মুগ্ধ ক'রে ফেলছিলেন। রাত। দেয়ালে শেডহীন আলো ঝুলছে ফলের মতো। মন্টু ব'সে আছে তক্তপোশে : তার ঠোঁট মেয়েদের মতো লাল, গাল লালচে, রুক্ষ চোখ, ফর্শা মুখের কিশোর স্নন্দর ছেলেটি মস্তমুগ্ধের মতো বুদ্ধের কথা শুনছে, তার ভিতরে কোথায় যেন বহুদূরে রক্তের পলাশবনে অস্পষ্ট ঝড় উঠেছে। আর, বুদ্ধ তাঁর মেঝের বিছানায় শিরদাঁড়া খাড়া ক'রে তার মুখোমুখি হয়ে গল্প করছেন।

বুদ্ধ বলছিলেন, 'ছনিয়ারে খুব ছেনেছি, সোনা, সত্তর বছর ধ'রে ছেনেছি। এখন যৌবন গেছে, সে-সাধ নেই, শক্তিও নেই। চুল পেকে গেছে কবে, দাঁত প'ড়ে গেছে : ভালো-মন্দ খেতে পারিনে, সারাক্ষণ পেশাব টপটপ ক'রে পড়তেছে, জানিনা নামাজ কবুল হবে কি না, রহমান্নুর রহিম মাপ করবেন কিনা। কতো দেখলুম, কতো শিখলুম, সব খেলা রে, ছুদিনের খেলা। দেখতে-দেখতে খেলতে-খেলতে চ'লে যায় সে-সব দিন, শিরদাঁড়া আর ক'দিন খাড়া থাকে। সত্তর বছর চ'লে গেলো রে, কখন যে গেলো কিভাবে গেলো বুঝতে পারলাম না, মনে হয় সেদিনের কথা, এই সেদিন যেন, গ্রাংটো হ'য়ে ঘুরতাম, সত্তর বছর চ'লে গেলো এক মুহূর্তের মতো। হায় আল্লা, কতোদিন কাঁদি আল্লার কাছে : একি লীলাখেলা তোমার মা'বুঝ। কিছুই বুঝলাম না, কিছুই বুঝা যায় না, আমি তোমার নাদান বান্দা। কানবি রে, আমার মতোই কানবি একদিন, তার চেয়ে এখন থেকে কাঁদি, এখন থেকে আল্লার নাম নে, তোর তো ব্যেস হয়েছে, নামাজটা পড় নিয়মিত, এই ব্যেস এখন থেকে বুঝে চল, সংযম শেখ, দেখবি : আল্লা তোর সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তোর এই চেহারা, মেয়েদের কাছে ঘেঁষবি নে, ছিবড়ে ক'রে দেবে তাহলে। সংযম শেখ, বেহেশতের সব ছরপরি—যাদের টাকুরা কেউ ছোঁয়নি—আ, তারা তোর সঙ্গে অপেক্ষা করবে। নামাজ পড়, রোজা রাখ, আর সোজা পথে চল। আলহামদোলিল্লাহ,

আমাদের ধর্মের মূল কথা কি জানিস ?—সোজা হ'য়ে চলে। ব্যাস, তাহলে আর কোনো ছুঃখ থাকবে না তোর। এই কোঠা-বালাখানা এসব কিছুই থাকবে না, জাদু, স্তবরাং আল্লার হুকুম মেনে, রসূল যে-পথ দেখিয়েছেন সে-পথে চল। তোর কবে নামাজ পড়ার ব্যয়স হয়ে গেছে, কতো নামাজ কা'জা করেছিস। জানিস, এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়ার জন্তে আশি হোক্‌বা—কতো বছরে এক হোক্‌বা হয় তা কেউ জানে না—আশি হোক্‌বা ধ'রে দোজখের আজাব সহ্য করতে হবে—সে কি কষ্ট, হায় আল্লা! ছুনিয়াতে বাহান্তরটা ধর্ম আছে, তার মধ্যে ইসলাম সেরা, কেন সেরা ?—তার কারণ ইসলাম ধর্ম খুব আধুনিক। কিন্তু ধর্ম ভালো হ'লে কি হবে শাস্তি আর ভালো নেই, মানুষ অনাচারী শ্বেচ্ছাচারী ব্যাভিচারী হয়ে গেছে, এই যে চাঁদ এই যে সূর্য, এর যে একজন কারিগর আছে, মানুষ তা ভুলে যায়। আন্তাগফিরুল্লাহ, কতো মুসলমান বলে ও-আল্লা নেই, ছুনিয়া আপনা-আপনি তৈরি হয়েছে। প্রমাণ চাস আল্লার ?—এই যে চাঁদ-সূর্য—এর একজন কারিগর থাকবে না ? এই যে রাত দিন হচ্ছে এর পেছনে আল্লার হাত আছে না ? কিন্তু আল্লা নিরাকার, তাঁকে তো দেখিয়া দেয়া যাবে না, তাঁকে মনের মত্তি অনুভব করতে হবে। তিনিই দাতা এবং দয়ালু। রাখাল এবং মুসা নবির সেই গল্প জানিস না ? কিন্তু মানুষ বড়ো খাবাপ হয়ে গেছে রে, ঠিক ধর্মের উণ্টো কাজ করবে, কিন্তু আল্লা আর রসূল বার-বার বলেছেন : যাই করো করো, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন ক'রোনা। ইয়া, সীমা লঙ্ঘন ক'রো না, নফস দমন করো : তুমি যাই কবছো ভেবো না যে আল্লা দেখতে পাচ্ছেন না। তোমার ছুই কাঁধে ছুই ফেরেশতা রয়েছে যে : একজন নেকী, একজন বদী, তোমার ভালো-মন্দ সব কাজ লিখে রাখছে, সব মানুষেরই কাঁধের উপর ফেরেশতা রয়েছে দুজন ক'রে, রোজ হাশরের দিন তারা তোর সারা জীবনের সোয়াব এবং গোনাহ দাখিল করবে, তারপর যেকোনো পাল্লা ভারি হয় সেই অমুযায়ী তুই বেহেশতে বা দোজখে যাবি। কিন্তু সব মুসলমান একদিন না একদিন বেহেশতে যাবে, কেননা রসূলুল্লাহ তাঁর উম্মতদের জন্তে কাঁদবেন, “ইয়া উম্মতি, ইয়া উম্মতি !” ব'লে, বলবেন, “ইয়া আল্লাহ, তোমার বান্দাদের কসুর মাফ করো !” কিন্তু মানুষ কিছু সোয়াবের কাজ করবে তো, তা নাহ'লে রসূলুল্লাহ কেন তাঁর উম্মতদের জন্তে আল্লার দরবারে আরজি পেশ করবেন আর আল্লাই বা তাঁর বান্দাদের মাফ ক'রে দেবেন কেন ? কিন্তু কি হয়েছে ছুনিয়া ! আর ছুনিয়ার মানুষ ! তবলিক করছে ক'টা মুসলমান ? আর খুলনায় ছাখ গে, যেম-মাগিরা শাদা কাপড় প'রে সাইকেল নে খেটান ধর্ম প্রচার করছে। কী তাদের প্রচারের ধরন ! কী সূব্যবস্থা !

ইংরেজের হেকমতই আলাদা, দু'শো বছর যে এ-দেশে রাজত্ব ক'রে গেলো সে তো আর এমনি-এমনি হয়নি। তো খায়েব। মুজিব আছে না, মুজিবর রহমান, তুই চিনবি না হয়তো, বৃড়া, আমাদের বয়েসী, এই সেদিন সে তার মেয়ের বয়েসী এক ছুঁড়িকে বে করলো। দেখা হয়েছিলো আসার আগে, বললাম, “শালা, করতোসো কি? পাঁচটা বে করলে? শালা, একেবারে জাহান্নামে যাবি যে।” দাঁত প'ড়ে গেছে, চুল পেকে গেছে, মুখ কুঁচকে গেছে—আমার তো ওর তুলনায় খুব ভালো স্বাস্থ্য—শালা খ্যা-খ্যা ক'রে হাসলো। বিশ্বশয়তান। এই তো মুসলমান। এ যে কাফেরের বাড়ি। সেদিন মসজিদে এক মোলানা সাহেব ওয়াজ নসীহত করছিলেন, বললেন : হাল জামানায় মেয়েদের দুটো জিনিশ খোলা—মাথা খোলা আর মাই খোলা—আস্তাগফিরুল্লাহ্। দিনে-দিনে কি হচ্ছে মেয়েরা। আর কি এক কাপড় বেরিয়েছে, কেরিলিন নাকি, ও আর প'রে কি লাভ, ও তো সবই দেখা যায়—মেয়ে-মর্দ সব ঐ কাপড় প'রে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর টেলিভিশন না কি হয়েছে : বেঁচে থাকলে আরো কতো কিছুই যে দেখবে। মানুষ এই সব ভড়ং খুঁজে পেয়ে ওর মধ্যেই ম'জে আছে। মানুষ যতদিন না নফ্-স দমন করতে পারছে, ততদিন তার মুক্তি নেই। আমাদের ছাথ : সারা জীবন রাঁড়বাড়ি গেলাম না—কতো বন্ধুবান্ধবকেই তো দেখলাম কতো কিছুই করলো। আমি যখন তোর মত ছিলাম বা হয়তো আরেকটু বৃড়া, তখন একটা ঘটনা ঘটেছিলো। একদিন বিকেলে পুকুরধারে ব'সে আছি, পাড়ার একটা মেয়েলোক দেখি কলসি নিয়ে পানি নিতে এসেছে, কিন্তু পানি না নিয়ে আমার কাছে এলো। তারপর লোভ দেখাতে লাগলো আমাকে, পিঠে গরম মাই চেপে ধরলো,—কিন্তু আমি ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম,—জানবি ভয় অনেক সময় আল্লার আশীর্বাদ। পালিয়ে গেলাম, কেননা তখনই জানতাম জেনা করার শাস্তি সাংঘাতিক। আমাদের গ্রামেরই একটা লোকের একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছিলো তার কিছুদিন আগে,—আমরা সব জানতাম। লোকটা নিজেব মেয়ের সঙ্গে জেনা করতে গিয়ে আটকে গিয়েছিলো—ব্বাতে পারছিলিস তো—আর ছাড়াতে পারিনি, বাপে-মেয়েতে—কী সাংঘাতিক—একেবারে কবিরী গোন। সেজন্তে মেয়ে শেয়ানা হয়ে গেলে বাপ ভাই কারো সামনেই যাওয়া উচিত নয়—আর আজকাল তো ঘরে-ঘরে শেয়ানা মেয়ে বোবাই হয়ে আছে—কতো কী-বে হচ্ছে আল্লাই মালুম। কিন্তু মানুষের খাহেশ তো সারাজীবনে মেটানো যায় না, ইচ্ছা থাকলেও ক্ষমতায় কুলোয় না। এই সেদিন খুব খাহেশ হ'লো হঠাৎ, তোর দাদি তো বর্তমান, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না, বৃড়া হয়ে গেছি একেবারেই।

হুনিয়ারে আর কতো দিন ছানা যায়, ভোগ-বাসনা একদিন কমবেই। কিন্তু মাহুয়ের লোভের কমতি নেই। মসজিদে কিছুদিন এমামতি করেছিলাম—তখন কি দেখেছিলাম জানিস ? আমি বাড়ীর কাছেই মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। দেখেছিলাম, ঐ মসজিদের ইমাম সাহেব কাফনের কাপড় চুরি ক'রে বেচতো, শেষে একদিন ধরা প'ড়ে গিয়ে বিদায় নিতে হয়। তাহ'লে ছাখ, বদমায়েশি কোথায় না আছে। তাই ব'লে কি ধর্ম নেই, আল্লা নেই ?—বেশক, নিশ্চয় আছে। ভালো লোকও কি দেখিনি, তা-ও দেখেছি। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হওয়ার আগে একবার আজমীর শরীফে গিয়েছিলাম। সে কি ভিড় : স্টেশনে লোক থইথই করছে। আমি ভাবলাম : হয়েছে, আমার আর আজমীর শরীফ দেখা কপালে নেই। কিন্তু আল্লার কি মজি : এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো : সে-ই ব্যবস্থা ক'রে দিলো। কুলির মাথায় ঝাঁকায় চ'ড়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে কোনো রকমে ভিতরে ঢুকেছিলাম। কতো অভিজ্ঞতা আছে। কতো সোয়াব দেখেছি, কতো গোনাহ্। সব-কিছুর পেছনেই ভেদ আছে, দিল্ পরিষ্কার থাকলে সব বোঝা যায়। ধর, জিনের কথা, ভালো-মন্দ সব রকম জিন আছে হুনিয়ায়। জিনের মধ্যেও আলেম ফাজেল আছে। ফেরেশতা আগুনের তৈরি, আর মাহুয মাটির। আর জিন মাহুযের লেবান প'রে মাহুয সেজে ঘুরে বেড়ায়। বাজারে যে এত ভিড় হয়, অর্ধেক জানবি জিন। হাসছিস ? আল্লার ভেদ তো জানিস নে, তাই হাসিস, তাই বিশ্বাস করিস নে। তোদের ঐ “সায়েন্স” দিয়ে কিচ্ছু হবে না। এই যে মাহুয কটকট ক'রে ম'রে যায়, কই কতো বড়ো-বড়ো “সাইন্টিস্ট” আছে বন্ধ করুক তো। তা পারবে না, সোনা। যাক গে। আসল কথা মনে রাখবি : হুনিয়াদারিতে ম'জে যাবি না, বেহেগতে—তোরা যাকে “হেভেন” বলিস ইংরেজিতে—হুনিয়ায় যা আছে তার দশ গুণ জিনিস আছে : এই যে সব খাপস্বরত মেয়েমাহুয দেখিস তার চেয়ে ঢের খাপস্বরত হরপরি থেকে হাজার রকম মেওয়া আছে। কাজেই সার কথা বলি : এ সোনার খাঁচায় ভুলে থেকে না, দিন রাত আল্লার নাম করো, নফ্‌স্‌ দমন করো আর সোজা পথে চলে। ব্যাস, তাহলেই তোমার দিন-হুনিয়া সব জায়গায় শান্তি।’

কখনো থেমে থেমে, কখনো অবিরল অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছিলেন বুদ্ধ ; বিচ্ছিন্ন এলোমেলো, যোগস্বত্রহীন কথা। মাঝে মাঝে তাঁর কণ্ঠস্বরের মাত্রা চড়ছিলো, কখনো নিচু স্বরে ঘেন কি গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করছেন—এভাবে তিনি কথা বলছিলেন। শুনতে-শুনতে কিশোর মণ্টুর অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হচ্ছিলো : কখনো রক্তোচ্ছ্বাসে

লাল হয়ে যাচ্ছিলো তার মুখ-চোখ, তাকাতে পারছিলো না মুখ তুলে, আবার কখনো  
 • সে অন্তমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলো—কিছু শুনতে পাচ্ছিলো না। ‘নামাজ পড়তে হবে’  
 বলে বলে বুদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন বিছানার উপর, তারপর দরজা খুলে বাইরে থেকে গজু  
 ক’রে এসে এশার নামাজ পড়লেন। তারপর সেই বিছানাতেই লম্বা হয়ে শুয়ে  
 পড়লেন। এই কাজগুলি যখন তিনি করছিলেন এবং পরে মণ্টু পড়ায় মন দিতে  
 চাইলো কিন্তু সমাজ-বিছার বইখানি অনর্থক খোলা প’ড়ে থাকলো, কিছুই মাথায়  
 ঢুকলো না তার। ‘আজ আর পড়া হবে না’ ভেবে বাইরে বেরলো মণ্টু, বারান্দায়  
 খোলা বাতাসে অনেকটা আরাম পেলো সে, মাথার ভিতরে যে-জট পাকিয়ে  
 গিয়েছিলো যেন তা আশু আশু খুলে যাচ্ছে রাতের ফুরফুরে বাতাসে। ঘরে এসে  
 বইপত্র তুলে, বডো আলো নিভিয়ে, জিরো-পাওয়ারের আলো জ্বলে দিয়ে মণ্টু শুয়ে  
 পড়লো। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এলো না তার, মাথার ভিতরে যেন একটা পাথরের  
 জাঁতা ঘুরছে আর অনেকগুলি টুকরো-টুকরো কথা ছিটকে-ছিটকে বেরিয়ে আসছে  
 সেই বিভীষণ চাপের ভিতর থেকে, বাস্তব-বিভ্রম-স্মৃতি-স্বপ্ন-অবচেতন যেন চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে  
 রঙিন ধুলোর মতো উড়ছে তার চারপাশে।

অনেক রাতে মণ্টুর ঘুম ভেঙে যায়। সে আধো আলো-অন্ধকারে দেখতে পায়  
 বুদ্ধ মণ্টুর বিছানার দিকে তাকিয়ে নিজে বিছানার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, নগ্ন। ভয়ে  
 মণ্টু চীৎকার করতে গিয়েও থেমে যায় ; কেননা সে শুনতে পায় বুদ্ধের অস্পষ্ট কর্ণস্বর,  
 ‘নক্‌স্‌ দমন কর, এখনো দমন করতে শেখ, আল্লার নাম কর—তিনিই রক্ষাকারী।’  
 তসবিহ্‌ গুণতে গুণতে যেমন বলেন তেমনি বিড়বিড় ক’রে এসব কথা কি তিনি  
 আমাকে বলছেন, না কি নিজেকে ? মণ্টু ভয়ে পাশ ফিরে শুলো, অনেকক্ষণ তার  
 ঘুম এলো না : মাথার ভিতর একটা উত্তেজিত শিরা যেন দপদপ করছে—সকালবেলা  
 ঘুম থেকে উঠে মণ্টু মনে করতে পারলো না : রাতে সে ঘুমের ঘোরে যা দেখেছিলো  
 তা কি স্বপ্ন না সত্যি।





একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। হাওয়া দিচ্ছে উত্তর থেকে। ঠাণ্ডা সঁাতসঁতে শীতের হাওয়া। মেরু হরিণের শিঙের মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ। এলোমেলো। খিদে, রাগ, জ্বালা, অভিমান। শীত। ক্রমাগত, অবিচ্ছিন্ন শীত। (উ-ই, মুহাব্বাত! শালা বেজন্মা, চল।)

বুকের ভেতর তার সেই কষ্টটা, সেই পুরোনো দুঃখটা তাকে অস্থির করছিলো। সেই সঙ্গে একটা নাম না জানা আক্রোশ তার সমস্ত চেতনায় আপসাচ্ছিলো। চোখের মণিতে তার একটা অতি পুন্স আঙনের শিখা। জ্বালা করছে।

আর একদিন, সেই ঘেবার রেল লাইনের ধারে অজিতের পেটে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, (শালা গুয়ারের বাচ্চা, আমার সঙ্গে মামদোবাজী? বোঝ শালা কেমন মজা।) সেবারও এমনি একটা অপরিচিত আক্রোশ তার ভেতরে জেগেছিলো।

এখন এই শীতালী অন্ধকারে ঠাণ্ডার চাবুক খেতে খেতে অজিতের মুখটাকে ভাবতে চাইলো সে। ছবিটা ঠিক মত মনে করতে পারলো না। কেমন হিজিবিজি। ঝাপসা।

চারিদিকে এখন কুয়াশা এবং ধারাবাহিক বাহুড় অন্ধকার বিধবার মতো শোকাহত। বুকের ভেতর সেই কষ্টটাকে নিয়ে সে হাঁটছিলো। এ দুঃখটা কি, কবে কেমন করে জন্ম নিয়েছে আমি জানি না। মাঝে মাঝে আমার ভেতর জাগে বিনা নোটিশে। আমাকে তখন অস্থির করে। কোন কিছুতে আমি তখন শান্তি পাই না।

‘মদের গেলাস আর বাজারের মেয়েমানুষ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আবার দুঃখ কিসের। ও শালা সব চিন্তার ফুলস্টপ। হা, হা, হা।’ পিয়াকু ভাই হাসতে হাসতে বললো। (শ্রীরামপুর ট্যান্ডি স্ট্যাণ্ডের সেই চওড়া কব্জিওয়ানা, কাবলী স্কাণ্ডল

পরা, লাল লাল ছোপ লাগানো দাঁত—বেপরোয়া পিয়াকু ভাই। মদ খেয়ে ভোম হয়ে পড়ে থাকতো। দু’তিন দিন তার কোন খোঁজ পাওয়া যেত না। নিজের গাড়ী, বলবার কেউ নেই।) আমি তখন হীরাসিংয়ের ছোকরা ক্লীনার্শ। বৃত্তাম না। হাঁদার মতো চেয়ে থাকতাম। শুনতাম। ধমক দিয়ে উঠতো কেউ হয়তো : “আবে তু কিয়া শুনতা, আপনা কাম কর।” এখন বুঝি। কিন্তু পিয়াকু ভাইয়ের কথার কোথায় যেন ফাঁক ছিলো। এখন সেটা ধরা পড়ে। দুঃখটা যখন প্রবল হয়, জালা যখন অসহ্য, অস্থিরতা যখন বৃকের ভেতর ছট্‌ফট্‌ করে—মদ খেয়ে, মেয়েমানুষের উলঙ্গ শরীর নিয়ে নাড়াচাড়া করেও তখন তাকে ভোলা যায় না। আগে বৃত্তাম না। এখন বুঝি। পিয়াকু ভাই তুমি মিথ্যে কথা বলেছিলে। হাসির আড়ালে তুমি কি যেন লুকোতে চাইতে। কিন্তু তা কি হয় পিয়াকু ভাই। তা হয় না। ক্ষণিকের জন্তে হয়তো তা ভুলে থাকা যায়। কিন্তু জীবনটা তো ক্ষণিক নয়, সময়টা তো মুহূর্ত নয়। আগে এসব বৃত্তাম না। এখন বুঝি। আর বুঝি বলেই অস্থির হই। শাস্তি পাইনা। ছট্‌ফট্‌ করি। (উ-ই, মুহাব্বাত ? চল শালা।)

অজিতকে যেদিন খুন করলাম সেদিন আমি প্রথম শ্রাওড়াফুলী বেঞ্জাপাড়ায় ঢুকেছিলাম। পটলার দোকানে মদ খেয়েছিলাম। আমার ভেতর তখন একটা আক্রোশ দাপাচ্ছিলো।

ছোট বেলায় বাপ মারা গেছে। (বাপ মদ খেতো, বেঞ্জাবাড়ী পড়ে থাকতো, রেস খেলতো, মাকে ধরে মারতো। মা পরের বাড়ী ধান ভানতো, শোলার ওপর রাঙতা বসিয়ে পুতুল বানাতো। বিক্রি করে সংসার চলতো।) একটু যখন বড় হলাম—ইস্কুলে যাই—কারক বিভক্তি মুখস্ত করি,—বড় ভাই মারা গেলো। (বাপ মরার পর বড় ভাইয়ের ওপর সংসার ছিল। বড় ভাই মিলে চাকরি পেয়েছিলো, সেই বড় ভাই মারা গেলো মজহুর মিছিলে গুলি খেয়ে।) আমি তখন কাজ নিলাম—হীরা সিংয়ের ক্লীনার্শ। ট্যান্ডি ধোয়ামোছা করি, বালতি বালতি পানি ঢালি রেডিয়েটরের মুখে। প্যাসেঞ্জার জোটাই। রাতের বেলা শুষ্ক শুষ্ক দেখি : ইস্কুল ঘর। মাস্টার। রোদে পোড়া ইস্কুল মাঠ। ক্লাসের পরিচিত মুখগুলো। আমার ভেতর তখন কষ্ট হতো। (সেই কি আমার প্রথম কষ্ট, জালা, দুঃখ ?—কি জানি।) মাঝে মাঝে খারাপ লাগতো, সব কিছু ছেড়েছুড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে হতো। কান্না পেতো। ওস্তাদ (হীরা সিংকে আমি ওস্তাদ বলতাম) বিরক্ত হয়ে কিছু বললে রাগ ধরতো নিজের ওপর, নিজের ভাগ্যের ওপর। মনে হতো সবাই আমাকে ঠকাচ্ছে। স্বার্থপর। এমন কি মাকেও। কিন্তু বাইরে কোনদিন প্রকাশ করতাম



না। আমার সেই কষ্টটাকে, সেই দুঃসহ কান্নাটাকে ততদিনে লুকেতে শিখেছিলাম।

ধীরে ধীরে আমি বড় হলাম। ক্লোনর্স থেকে ড্রাইভার। নুরীর (আমার বোন, তখন ষোলোয় পা দিয়েছে।) বিয়ের জন্তে চিন্তা করছি। নিজের সম্পর্কে নোতুন করে, আশন করে, একান্ত করে যখন ভাবতে শিখছি, তখন আমাকে মদ খেতে হলো, বাজারের মেয়েমানুষের কাছে যেতে হলো, অজিতকে খুন করতে হলো। (অজিতের মুখটা! আহ্ শালা, আমার একদম মনে পড়ছে না।)

২

শীত। বড্ডে শীত। এখন যদি একটু আগুন পাওয়া যেতো! আবার বৃষ্টি এলো। নাহ্, আমাকে আর বাঁচতে দেবে না। এখন একটু আগুন যদি...সারাটা জীবনই তো আমার শীতকাল, একটু আগুনের জন্তে, একটু গরম হবার জন্তে মাথা কুটে মরলাম। কুকুরের মতো হস্তে হয়ে ফিরলাম (উ-ই, শালার গখ কত, চল্)।

অজিতকে যেদিন খুন করে ভাগলাম, সেদিন এমনি বৃষ্টি হয়েছিলো। শীত ছিলো। আমার ভেতরটা তখন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিলো। (তার মানে তোমার ভেতর তখন ভয় হচ্ছিলো। শালা ডরপোক ইঁদুরের আত্মা নিয়ে আবার ষায় মানুষ খুন করতে! মর শালা!)

—কি রে তুই এখনো দুনিয়াতে আছিস দেখি, যাচ্ছিস কোথা?

—তোার বোনের কাছে।

—কি বললি? দেখ্গে শালা তোার বোনকে নিয়ে কে মজা লুটছে।

—তবে রে হারামির বাচ্চা...

তারপরই র্যাপার জড়ানো অজিত পেটে হাত চেপে রেল লাইনের খোয়ার ওপর আর্তনাদ করে পড়েছিল।

কালো অঙ্ককার সমুদ্রের ভেতর থেকে একটা দ্বীপ ভেসে উঠলো: উঠোনে চাপ চাপ রক্ত। জমার্ট বেঁধে আছে। দরজাগুলো হা হা করছে। বিছানা বালিশ, ভাঙা হাঁড়ি, ছড়ানো ভাত, ছিটানো ঘরদোর—তার জলে যাওয়া স্বপ্ন—সব, সব দেখতে পেলো সে।

৩

রহমত ভাইয়া, তোমাকে না বলে চলে যাচ্ছি। আয়ায় কমা করো। কোন কিছু না ভেবে সেদিন চলে এসেছিলাম আমি। অপরিচিত জায়গা। মসজিদে,

গাছতলায় শুয়ে রাত কাটিয়েছি। পকেটের পয়সা ফুরিয়েছে। অতীত দিন গেছে। কোন চাকরী পাইনি। তুমি আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলে। কাজ দিয়েছিলে। মাঝে মাঝে স্মৃতিরা এসে ভিড় করতো, বুকের ভেতর কষ্ট হতো। কাজের ভেতর ডুবে থাকতে চাইতাম। দিন আমার মন্দ কাটিছিলো না। কিন্তু এতো চড়াই উৎসাহী পার হয়ে এসেও আমার ভেতরের সেই স্বপ্নটা, সেই সাধটা, সেই তৃষ্ণাটা তখনো মরেনি, আশ্চর্য! (উ-ই, শালা মুহাৰত, চল)।

পেছন থেকে আমাকে কি ডেকেছিলো? কি জানি, আমি শুনতে পাইনি। আমি তখন কালা হয়ে গিয়েছিলাম। শীত, ওহ্ কি ভয়ানক শীত! বৃষ্টির বেগ বাড়লো। গায়ের জামা-কাপড় সব ভিজ্ঞে উঠেছে। হাড়ে স্ৰুই ফোটাম্ছে। মেয়েটা এতক্ষণ কি করছে? কাঁদছে?...আমার বউ কাঁদছে, এখন কাঁদছে? আমার বিয়ে করা বউ আমার, একান্ত আমার...অথচ... (বলিহারী ষাই তোর সাধ দেখে। তুই শালা হ'লি রাস্তার কুকুর, তুই গেলি কি না বিয়ে কোরতে, মুহাৰত জমাতে? শালা লালচে কোথাকার, চার মাসের ছেলে পেটে করে বউ এলো তোর ঘর করতে, হা হা হা। লে ক্বাবা, তুই কাঁদছিস? মাইরী তুই কামাল করলি ইয়ার। আরে তোকে কাঁদতে নেই, মাঝে দেখলে হাসবে। উ-ই, শালার শখ কতো, বিয়ে করবে, মুহাৰত জমাবে, ছেলের বাবা হবে, শালা লালচে, চল)।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



প্রত্যাশা কম, তাই ওর দুঃখও কম। কিন্তু আজকাল স্বেলকে খুশি-খুশিই দেখায়। বাজার যা আক্রা তাতে কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয়, ঝুড়ো-গাড়া মাছ ছাড়া বড়ো বড়ো মাছ যেন সব পালিয়েছে এ-তল্লাট থেকে, জাল দুখানা ঘরের কোণে পড়ে পচে—পাইকারদের কাছ থেকে কিনে এনে বাজারে বেচতে হয় তাকে—তিন টাকা সাড়ে তিন টাকার বেশি মুনাফা তুলতে হাড়ে দুকো গজিয়ে যায়—তবু এক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বুকখানা সব সময় ছমছম করে স্বেলের। সাড়ে চার হাজার টাকা! এই তার বড়ো আঙুলখানা কালিতে লেপ্টে কাগজের উপর একখানা ছাপ দিলেই সে সাড়ে চার হাজার টাকা শেতে পারে। স্বেল আজকাল মাঝে মাঝেই তার ডান হাতের বড়ো আঙুলটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। যেন নিজেকেই সে কলা দেখাচ্ছে! সাড়ে চার হাজার টাকা তাদের বংশে কেউ বাপের জন্মে দেখেছে একসঙ্গে? সেই বলে না, ঠোঁট ঢাকতে পেছন আলগা—এই তো হল গিয়ে অবস্থা!

আড়াই-শো গ্রামটাক বেলে মাছ তখনো পড়ে ছিল, আন্তে আন্তে হলদেটে হয়ে আসছে মাছগুলো, উড়ে বসছে নীল ডুমো মাছি—দর কমাতে কমাতে স্বেল দু-টাকা চার আনা কিলোয় নেমেছে—তবু ও-কটা আর কাটছে না—একটা বড়ো ঘুরঘুর করেছে অনেকক্ষণ থেকে—তার মতলব স্বেল যদি শেষ পর্যন্ত দেড় টাকায় নামে; হঠাৎ দিলদরিয়াভাবে স্বেল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, ও-কটা বেলে মাছ আর বেচবে না, বাড়ি নিয়ে যাবে। নিতাই অনেকক্ষণ থেকে ঝাড়া হাত-পা হয়ে বসে আছে, ওর সঙ্গেই বাড়ি ফিরবে। ঝুড়িটা তুলে নিয়ে স্বেল বলল, চল নিতাই, চল। বসে বসে কোমর টাট্টে গেল। বাড়ি আছে নাকি?

নিতাই বলল, না দাশ। কিনতে হবে। চলো, এক কিলো চালও কিনে মেবো।

—এ-বাজারে চাল কত ক'রে যাচ্ছে আজ ?

—দু-টাকা তিরিশ, তাও ভাঙা।

—তবে চ, বাণ্ডইআটির বাজারে অন্তত পনেরো নয়! সস্তা হবে।

নিতাই একটু শৌখিন, সে জামা পরে। প্র্যাঙ্কিকের ব্যাগে টাকা রাখে। স্ববল ওসব ধার ধারে না, লাল কাপড়ের তৈরি গেঁজে তার কোমরে ধুতির নীচে বাঁধা, চকচকে খালি গা। গেঞ্জি জামা হলেই তার আবার কাচাকাচির ঝামেলা—শরীরের তো আর কাচাকাচি নেই। পুকুরে একটা-দুটো ডুব দিলেই—বাস। নিতাই চাল কিনল, আর শুকনো লঙ্কা। স্ববলের বাড়িতে কালই র্যাশন তোলা হয়েছে—এখন দুদিন আর চাল কিনতে হবে না—সে কিনে নিল পাঁচশো মুন—বিড়ি কিনতে গিয়েও কিনল না। এই স্বযোগে একটু চালাকি খেলে নিল—নিতাই বিড়ি কিনেছে—এখন সে নিজেকে কিনলে আর নিতাইয়ের থেকে নেওয়া যাবে না। তার থেকে, নিতাই কেষ্টপুরের রাস্তায় বৈকলে তারপর সে তার নিজেরটা কিনে নেবে।

বড়ো রাস্তায় এসে বিড়ি ধরিয়ে নিতাই বলল, দিন-দিন ধাঁ ধাঁ ক'রে বাড়ি উঠে যাচ্ছে এ-জায়গায়। কি ছিল আর কি হল!

নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে স্ববল একটু গর্বের স্বরে বলল, দিনকাল কি আর চিরকাল এক থাকে? আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, এখানে কামট ভাসত—এই অ্যাভুতো বড়ো হাঁ।

—কামট ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আর শালার মাছও ছিল, ইয়া ইয়া বোয়াল-চেতল, আর এখন দেখ দিনি—সে-সব বুজিয়ে কিরম বাস যাচ্ছে!

—সোবলদা, তোমার জমিটা ছাড়বে না? সাড়ে তিন হাজার টাকা দর উঠেছে শুনছি ?

স্ববল বিজ্ঞভাবে বলে, সাড়ে তিন কি, দেখবি একদিন দশ হাজার উঠবে। আমি এখন ছাড়চি না, অত কাঁচা পায় নি আমাকে!

কেষ্টপুরের অনেক ভেতরে দেড় মাইল দূরে নিতাইয়ের বাড়ি। স্ববলের বাড়ি এই এখান থেকেই দেখা যায়। তালগাছটার মাথায় দুটো শকুন ব'সে আছে। শালারা রোজ ব'সে থাকবে। রাস্তার দু-পাশ বরাবর খাল চ'লে গেছে। বাঁদিকের খালটা বরাবরের পুরনো—ডানদিকেরটা নতুন। নতুন রাস্তা বানালাই তার পাশে খাল থাকবে। খাল কেটে সেই মাটি দিয়েই তো রাস্তা উঁচু করল, তবে ডানদিকের খাল বরাবর একটানা নয়—মাঝে মাঝে ফাঁক আছে, আছে মানে ছিল, এ-বছরের

বৃষ্টিতে সব ভেসে একাকার হয়ে গেছে। ছল ছল ক'রে বইছে বৃষ্টির নতুন টাটকা জল, এই জলে বাগ্‌দা-চিংড়ি খুব বাড়ে। রাস্তা থেকে নেমে কাপড় গুটোলো স্ববল। কোন্ জায়গায় জল কম, তার জানা আছে। কাপড় গুটোতে গুটোতে কোমর পর্যন্ত তুলতে হল, হড় হড় ক'রে জল ঠেলে স্ববল এসে পৌঁছল বাড়িতে—তার উঠোন পর্যন্ত ডুবে গেছে এবার—তার কুমড়ো আর কাঁচা লক্ষা গাছগুলো সব পচিয়ে দিয়েছে। মাইরি, এরম বিষ্টি বাপের জন্মে কেউ কখনো দেখে নি!

কিন্তু এত বৃষ্টির জগ্গও স্ববল খানিকটা খুশি খুশি বোধ করে। উঠোন ভেসেছে ভাস্কর, রান্নাঘরে জল ঢুকেছে ঢুকুক—কিন্তু মাঠ-খাল ডোবা-পুকুর সব একাকার হয়ে গেছে—সেনগুপ্ত বাবুদের গ্যারেজে জল ঢুকেছে—মোটর-গাড়িটা ইস্তক ডুবে গেছে গলা পর্যন্ত, বাবুবা সব ঠ্যাঙের কাপড় তুলে ছপছপিয়ে হেঁটে আপিস যাচ্ছে—তাই দেখে স্ববল কম হেসেছে নাকি! ও-বাড়ির দেমাকী ঝি মাসী সে পর্যন্ত পৌঁদের কাপড় তুলে—। তা ছাড়া, স্ববলের লাভও হয়েছে। তার বাড়ির সামনের ডোবাটাও ভেসে গেছে, পেছনে সাইকেল কোম্পানির পুকুরে বড়ো বড়ো মাছ ভেসে এসেছে—স্ববল চুপি চুপি বস্তায় গোবর ভ'রে ডুবিয়ে রেখেছে মাঝভোবায়—গোবরের গন্ধ পেলে বড়ো মাছ আর কোথাও যাবে না। জলটা একটু নামুক—স্ববল তখন জাল বার করবে। এত বৃষ্টিতেও কিন্তু তুলসীগাছটা মরে নি—তুলসীমঞ্চটা বেশ উঁচু।

ঐ তুলসীগাছের জগ্গই তো সব। ছিল জলা-জংলা জায়গা, নলখাগড়ার ঝোপ আর মাছের ভেড়ি। স্ববলরা ক' পুরুষ ধ'রে এখানে বাস করছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। স্ববলের ঠাকুরদার আমলে তো বেশ বাড়বাড়ন্ত অবস্থা ছিল তাদের, স্ববলের একটু একটু মনে আছে। পাইকপাড়ার রাজাদের বাড়িতে রোজ মাছ জোগান দিত তার ঠাকুরদা। মহিষবাথানে একটা নতুন ভেড়ি কিনতে গিয়েই তো একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল—জমি-জিরেত সব বেচে ফতুর হয়ে গেল। আর জমিরই বা কি দাম—এ-সব জলা-জমি কিনতই বা কে—সস্তর টাকা পঁচাত্তর টাকা বিধে—তারও কোনো ঠিকঠাক মাপ-জোক নেই। কোথা থেকে কি হল—গরমেন্টের লোক এসে তাঁবু গাড়লো—মোটা মোটা লোহার পাইপে করে গঙ্গামাটি এনে ডরিয়ে ফেলল জলা—নাম হয়ে গেল লবণ হ্রদ। এ-পাশে তৈরি হল রাস্তা—ভি. আই. পি. রোড—কি বাহারের রাস্তা—দু-পাশ দিয়ে আনাগোনার অল্প আলাদা ব্যবস্থা। যে ছ-চার ঘর বাড়ুই-সাপুই থাকত এখানে—হাজার দেড় হাজার টাকা বিঘের ঘর পেয়ে ডগমগ হ'য়ে ঝটঝট জমি বেচে চ'লে গেল। স্ববলও কি আর থাকত? স্ববলরা

হ-ভাই, বাকি ভাইরা যে-বার ভাগের জমি বেচে পকেট ভর্তি টাকা বাজিয়ে চ'লে গেল হাতিয়াড়া আর কৈখালির দিকে, স্ববলের যাওয়া হল না ঐ তুলসীগাছ আর তার মায়ের জন্ত। স্ববলের ভাগে শুধু পড়েছিল বসত-বাড়িটুকু—স্ববলের মা বগলা তুলসীতলায় আছড়ে প'ড়ে ডুকরে উঠেছিল। বসতবাড়ি বেচবি শেষ পর্যন্ত! ঔ্যা, তোর! ভেবেচিস কি? বসতবাড়ি বেচলে বাড়ির বড়ো ছেলে মুখে রক্ত উঠে মরে—তা জানিস না। আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফ্যাল আগে—পেটে বাবলার বাড় ধরেছিলুম—টাকার গরমাই—তুলসীগাছ উপড়ে তুললে হাতে কুষ্ঠ হয়—। স্ববল অবশ্য মায়ের এ-সব কান্নাকাটিতে গ'লে ষাবার লোক নয়—সাড়ে চার হাজার টাকার কাছে ও-সব কান্নাকাটি তো ছেঁড়া জালে মাছ ধরা। কিন্তু তার বউও ভয় পেয়ে বেঁকে বসল—শেষ পর্যন্ত বগলা এসে স্ববলের পায়ে পড়তে স্ববল একটু খতমত খেয়ে গেল—হাজার হোক মা হ'য়ে ছেলের পায়ে হাত দিয়েছে, বগলা পাগলের মতন স্ববলের পায়ে মাথা কুটেছিল।

স্ববলের বাড়ি রাস্তার এ-পাড়ে, একটুর জন্ত বেঁচে গেছে। গরমেন্ট যদি চাইত তা হলে স্ববলকে আর ট্যা ফৌ করতে হত না—বগলার হাজার কান্নাকাটিতেও কিছু আসত যেত-না—ঐ তো হরিদাস সাপুই বেচতে চায় নি গরমেন্টের কাছে—মারোয়াড়িরা তাকে বেশি দাম দিতে চেয়েছিল—কিন্তু রাস্তার মাঝখানে তার জমি, শেষ পর্যন্ত সেই দামেই তো গরমেন্টকে বেচতে হল। স্ববলের জমি গরমেন্ট চায় নি—কিন্তু আর পাচজনা এসে ধরাধরি করেছে তাকে—সাইকেল কোম্পানি রাস্তা বানাতে চেয়েছে, সেনগুপ্ত বাবুরাও চেয়েছিলেন তাঁদের জমির সঙ্গে একলশ্বে জুড়ে নিতে, দর উঠেছিল সাড়ে চার হাজার—তার তো মোটে এক কাঠা ন ছটাক জমি—স্ববল দেয় নি। মা আর ক-দিন! ও-বুড়ি চোখ বুজলেই তার পর যে-কোনোদিন স্ববল বড়ো আঙুলের টিপছাপ দিয়ে সাড়ে চার হাজার টাকা পেতে পারবে—এই চিন্তা তাকে সব সময় একটা স্থখ দেয়। এর মধ্যে দর আরো চড়বে না কি আর?

স্ববলের বয়েস একচল্লিশ, তার ন-টি ছেলেমেয়ে। এর মধ্যে সাতটি বেঁচে-বর্তে আছে। বড়ো ছেলেটা হাতিবাগানে সবজি বিক্রি করে, ওখানেই ঘর ভাড়া ক'রে বউ নিয়ে আছে—বাগ-মার খোঁজ-খবর নেয় না। স্ববলের বউটা একেবারে বছর-বিয়োগিনী—মাঝখানে দুটো বছর ক্যান্স দিয়ছে একটু, তাও বিশ্বাস নেই, আবার কোনদিন পেটে একটা বাঁধিয়ে বসবে তার ঠিক কি! ছেলেমেয়েগুলো উঠানের জলে খল্ খল্ করছে—এদিকে যে শোবার ঘর পর্যন্ত জল ছলকে উঠছে—সে

দিকে খেয়াল নেই। দেখেই স্ববলের রাগ চ'ড়ে গেল। সব চেয়ে পাজি ঐ সেন্নো মেয়ে কুসীটা। ভাইবোনগুলোকে কোথায় একটু সামলাবে তা নয়, নিজেই হারামজাদী খিঞ্জিপনায় মেতেছে। মেয়েটা একেবারে হাড়বজ্জাত—রান্নাশর থেকে চুরি ক'রে থাকে, ভাই-বোনের খাবার ঠকিয়ে থাকে—রান্নাসীর মতন নোলা। ঝুড়িটা দাওয়ান নামিয়ে রেখে স্ববল ক'রক'রভাবে ডাকল—এই কুসী, শোন ইদিকে।

শাড়িটা উরুত পর্যন্ত তোলা ছিল, জলের মধ্যেই শাড়িটা ছেড়ে দিল, বুকের আঁচল ঠিক ক'রে ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। স্ববল খপ্ ক'রে তার চুলের মুঠি চেপে ধ'রে বলল, কি করছিলি ওখানে? অ্যা?

কুসীর মাথাটা হেলে পড়েছে, ক্যানকেনে গলায় বলল, একটা ল্যাটা মাছ, ঐ তুলসীতলায়—

স্ববল ঠাস ঠাস ক'রে কুসীর গালে চড় কষাতে কষাতে বলল, ল্যাটা মাছ? তোর মুখে গুঁজে দেবো। হারামজাদী, খানকীর বাচ্ছা, সংসারের একটু সুরাহা নেই ওকে দিয়ে, মরিস্ না কেন? অ্যা? মর না! মর! জল হাদাচ্ছে? ও ছেলেটার জর, ওকে স্ধু জলের মধ্যে নিয়ে—

স্ববলের বউ বেরিয়ে এসে সে-ও কুসীর পিঠে গুম-গুম ক'রে কিল মারা শুরু করল এবং চ্যাচাতে লাগল, গুথাকী আমার একটা কথা শোনে না, বললুম নক্সাগুলো বেটে রাখতে—

কুসীর বেশ ভারভক্তি চেহারা, বোঝাই যায় না তার বয়েস মোটে বোলো— আর-সব ভাইবোনগুলো রোগা-রোগা, স্তভরাং কুসীকে মেরেই বাপ মা খানিক হাতের স্ধ পায়। মার খেয়েও কুসী কাঁদে না—মুখ গৌজ ক'রে চ'লে ব রান্নাশরে।

স্ববল প্রত্যেকদিন সূর্য ওঠার আগেই পায়ে হেঁটে চ'লে যায় দস্তবাগানে মাছের আড়তে। সেখান থেকে মাছ কিনে আসে নাগেরবাজারে বেচতে। বিক্রিবাটা সেরে অতখানি রাত্তা হেঁটে যখন বাড়ি ফেরে তখন রোদ মাথার ওপরে। বাড়ি ফিরেই ছেলেমেয়েদের মারধোর করা তার নিত্য তিরিশ দিনের অভ্যাস। এতগুলো পেটের জন্তাই তো তাকে খেটেখুটে মরতে হয়। মাথায় একটু সর্বের তেল খাষড়া মেরে স্ববল খালে দু-চারটে ডুব দিয়ে আসে। তার পর দাওয়ান মাহুর পেতে বসে। স্ববল নিয়ম ক'রে দিয়েছে, সে আগে থাকে—ছেলেমেয়েরা তার পর থাকে! তার নিজের শরীরটা ঠিক না রাখলে এত বড়ো রান্নাশরের সংসারটা চালাবে কে? সে অস্ধে পড়লে তো কেউ কুটো নেড়ে সাহায্য করতে আসবে না! কলাইকরা

খালা ভর্তি ক'রে ভাত এনে দেয় তার বউ। মাঝখানে গর্ত ক'রে সেখানে ডাল ঢেলে দিয়ে স্ফল পুরো ভাতটা একসঙ্গে মেখে ফেলে—তার পর ষেদিন যা টাকনা থাকে—মাছের ঝাল কিংবা কুমড়োর শাক—যাই হোক—তা দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে চেটেপুটে খায়। খালাখানা সে এমন চকচকে ক'রে চেটেপুটে শেষ করে যে তার পর আর না মাঞ্জলেও চলে। খেয়ে উঠে স্ফল একটা লম্বা ঘুম দেয়। শেষবিকেল নাগাদ ঘুম থেকে উঠে একটু গড়িমসি করে, কোনোদিন আর-এক দফা ছেলে-মেয়েদের মারধোর দেয়, কিংবা ঘরের ডাঁচার বেড়ায় ফুটোকাটা ছাইবার চেষ্টা করে, কিংবা চালায় উঠে কচি লাউগুলো গুনেগেঁথে দেখে। কোনোটায়া পোকা লাগলে আদর ক'রে চুন মাখিয়ে দেয়। কোনো-কোনো দিন এ-সবে আর মন যায় না—অন্ধকাব হয়ে এলেও তাদের ঘরে লঠন জলে না—ভি. আই. পি. রোডের আলোর বঁাকা রেখা এসে খালের জলে খেলা কবে—তখন সে উসখুস করে কিছুক্ষণ—তার পর গুটিগুটি পায়ে চ'লে যায় কেঠপুরের দিকে, দু-চারজন পুরোনো স্মাঙাতের সঙ্গে তাড়ি খায় পাঁচ ছ-আনা খরচ ক'রে, নিতাইয়ের সঙ্গে বড়োরকমের একটা মাছের ব্যবসা ফাঁদার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে। বাড়ি ফিরে এসে আগে গুড় দিয়ে গুটিকয়েক রুটি গিলে গলা ভর্তি ঢল ঢেলে পেট ভরায়, তারপর শুয়ে ঘুম। যে-সব দিন তাড়ি খেতে যায় না—সে-সব দিন আর সময়ই কাটে না—শিগগির খাওয়া সেরে নেবার জন্ত তাড়া দেয়—কেরোসিন বেশি খরচ হল ব'লে গজগজ করে, বাতি নিবিয়ে কতক্ষণে শোবে সেই তার চিন্তা। শোবার ঘর মোটে একখানিই—মাটির কুম্বেতে চট আর কাঁথা বিছিয়ে সার বেঁধে শোয় ছেলেমেয়েরা—স্ফল শোয় ক্লিকেবারে দরজার ধারে। বাইরের দাওয়াটার একপাশ ঘেরা—বগলা শোয় কুম্বেতে। সেই-সব দিন স্ফল শুয়ে শুয়ে ঘন ঘন বিড়ি টানে, ঘুম আসবার আগে অল্প ধরনের উসখুসানি পেয়ে বসে তাকে—রান্নাঘর ধোওয়া মোছা ক'রে তার বউ যখন শুতে আসে দরজার কাছেই থপ্ করে তাকে টেনে আনে স্ফল—ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়েছে কিনা গ্রাহ করে না—কিছুক্ষণ বউয়ের শরীরটা ঘাঁটাঘাঁটি করে, চটকায়, রোগা চিমসে চেহারা নিয়ে বউটা হাপরের মতন হাঁপায়—তার পর কোনোদিন মরাকান্না কাঁদার মতন গুনগুনিয়ে বলে, আবার একটা শস্তুর এসেছে পেটে, তোমাকেও বলিহারি—বুড়ো বয়েসে এখনো এ-সব ভালো লাগে বাপু? স্ফল হ্যা-হ্যা করে বোকার মতন হাসে।

স্ফল যখন বাড়িতে থাকে না তখন ছেলেমেয়েগুলো এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে—মাঝে-মাঝে রাস্তায় মোটরগাড়ি থামলে ওরা সেখানে ঘেঁষে হাঁ করে



দাঁড়িয়ে থাকে—ফরসা, স্থল্লর সাজগোজ-করা বাবু আর দ্বিধাদ্বিধের মুখ থেকে চোখ ফেরায় না—ছেলেদুটো পোড়া সিগারেটের টুকরো, সোডার ছিপি আর পাউরুটির মাথা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে যায়। বারো বছরের ছেলে হারাণ—সে-ই শুধু কিছু দিন ধরে একটা প্রাইমারি ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছে। স্থবলের বউ ছেলেমেয়েগুলোকে নামলাতে পারে না—শুধু সেজো মেয়ে কুসীকেই একটু চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করে, মাঝে-মাঝেই চেষ্টা করে ওঠে, এই কুসী-ই, এই হারামজাদী, কোথায় গেলি রে? কুসীর সাড়া না পেলে হাতের কাছে অন্য যে ছেলেমেয়ে থাকে তাকেই বলে—ওরে ছাখ না, সে আবাগীর বেটি কোথায় গেল? যা না মুখপোড়া!

কুসী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে, তখন থেকে অত চেনাছো কেন? এই তো ভ্যাইপি রোডে ডাঁড়িয়েছিলুম।

কুসীর মা অঙ্গভঙ্গি করে বলে, চেনাবো না কি কেতন গাইব? আসুক আজ তোর বাপ—অত ভ্যাইপি রোডে তোর যাবার দরকার কি লা? আমি বুঝি না কিছু? শাড়ি পরেছে ছাখো না—মাই-টাই সব বেইরে পড়েছে, এত বড়ো ধিক্কি মেয়ে—

কুসী আঁচল টেনেটুনে বলে, একটা তো জামা কিনে দিলে না। সবাই জামা পরে—

—জামা কিনে দেব না ব্যাটা দেব! স্ত্রাংটো করে রাখি নি এই ঢের, বলে পেটে ভাত জোটে না—আর গিলতেও পারে এক-এক জন।

দু-খানা গাড়ি থেমে আছে, চার-পাঁচজন ভদ্রলোক হাত নেড়ে নেড়ে গুদের বাড়ির দিকে দেখিয়েই কি যেন বলছে। স্থবলও সেখানে দাঁড়িয়ে। বগলা চোখ-দুটো বঁড়শির মতন তীক্ষ্ণ করে চেয়ে রইল। আবার বুঝি ছেলেটাকে লোভ দেখাতে এসেছে ড্যাকরার। দাঁওয়য় দাঁড়িয়ে বগলা চোঁচাতে লাগল, ও সোবল, সোবল, আবার কি কথা বলচিস?

স্থবল গ্রাহ না করে লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। লোকগুলো ভি. আই. পি. রোডের পাশ দিয়ে ছড়ছড় করে অনেকখানি নেমে এল। খালের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল বাড়িটা। কুসী দাঁড়িয়েছিল ঠাকুমার পাশে—একটা লোক বারবার চোখ বুলোচ্ছে কুসীর শ্রাণ্ডলার মতন শরীরে। বগলা তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে চোঁচাতে লাগল, ও সোবল, আগে স্তন যা, আগে

আমার কথা শুনে যা। আমি কিন্তু কুরুক্ষেত্রের করব বলে রাখি—আমার ভাতার খণ্ডের ভিটে—

স্বল মুখ ফিরিয়ে একবারমাত্র দাঁত খিঁচিয়ে জ্বাব দিল, আঃ, থামো না! নইলে জন্মের মতন চোঁচানি বন্ধ ক'রে দেব বলচি। স্বল আবার মনোযোগ দিয়ে লোকগুলোর কথা শুনতে লাগল।

বেশ খানিকটা বাদে স্বল প্রায় আনন্দে লাকাতে লাকাতে ফিরে এল। তার হাত ভর্তি টাকা। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে বগলার—তলার ঠোঁটটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে—স্বলের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বলল, ওকি রে, কি ক'রে এলি? টিপসই দিয়ে এলি?

স্বল রহস্যময়ভাবে হেসে বলল, হ্যাঁ, দিলুম তো।

—ঈ্যা? আমি মরার আগেই?

—ওকি ওকি, মাটিতে বসে পড়ছ কেন? আগে সবটা শোনো। মেয়েমাহুঁষ একেই বলে। আগে থেকেই হেঁদিয়ে মরে! তোমায় তো কথা দিইচি তুমি মরার আগে বাড়ি বেচবো না। সহজে তো মরবেও না—গরিবের ঘরে মেয়েছেলেরাই বেশি বাঁচে।

—কি হয়েছে বল না? ও লোকগুলো এসেছিল কেন? টাকা দিল কেন?

—বাড়ি বেচি নি বাবা, বাড়ি বেচি নি! মুকুৎসে তিরিশটা টাকা লাভ হয়ে গেল। ওরা এখানে একটা ছবি টাঙাবে—সেজন্য মাসে মাসে আমায় পৌয়ে'রো টাকা করে দেবে।

—ছবি টাঙাবে বলে টাকা দেবে? কি ছবি?

—কি ছবি তা কি জানি! সে যা হোক! বিজ্ঞাপন বলে একে।

—বিগ্‌কাম্পন আবার কি?

—বললুম তো ছবি!—মাস মাস পৌয়ে'রো টাকা—আজ শালা কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, ভগবান একেবারে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, এই নে—দেখি যাই একবার নেতায়ের কাছে।

—মাস মাস দেবে।

স্বল দিলদরিয়া হয়ে হঠাৎ মাকে একটা সওয়া চার টাকা দামের কঞ্চল কিনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে! হারাণ দাবি জানায়—এবার তাকে কাগজ আর পেনসিল কিনে দিতেই হবে—নইলে ইসকুল থেকে নাম কাটিয়ে দেবে। স্বলের বউ বলে, হ্যাঁগা, কুসীর জন্তু এবার একটা বেলাউজ কিনে দাও—গতরখানা তো

খুব হয়েছে। লোকে হ্যাংলার মতন তাকায়। হঠাৎ যেন মনে হল, মাশে পনেরো ঢাকা আগ্র বেড়ে যাওয়ায় স্ববলের সংসারের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

তিন-চার দিন বাদেই ট্রাকে করে সব জিনিসপত্র এসে উপস্থিত হল। কয়েকটি প্যাট শার্ট পরা বেশ চটপটে ছোকরা ডোবার পাশ দিয়ে স্ববলের বাড়িতে উপস্থিত হল। স্ববলের বাড়ির দু-ধারে পোতা হল দুটো শক্ত লোহার পাঞ্জা। স্ববলদের মাটির বাড়িতে বাঁশ আর শালবল্লার খুঁটি—এ-জমিতে এই প্রথম লোহা ঢুকল—তারপর সেই লোহা দুটোর মাথায় বসানো হল বিশাল একটা ছবি। বিমান কোম্পানির বিজ্ঞাপন। পুরো ছবিটাই সুন্দর মাদক নীল রঙের—ডানদিকের কোণে একটা উড়ন্ত বিমান, বাঁদিকে দূর শহরের দৃশ্য—মন্দিরের মতন বাড়ির চূড়া—মনে হয় দেবভূমি অমরাবতীর ছবি যেন, নীচে হাত ধরাধরি করে ছুটছে সাহেব মেম যুবক-যুবতী, মেমটির স্কার্ট উড়ে গেছে অনেকখানি, কি সুন্দর তার পা দুখানি, তার বৃকের ডোলও বড়ো মনোরম। ছবিটির মাঝখানে বড়ো বড়ো ইংরাজি অক্ষরে লেখা :

### FLY QUANTAS TO THE WORLD

স্ববলের বাড়ির এ-দিক থেকে ও-দিক পর্যন্ত জুড়ে সেই ছবি—ছোকরার ষাটাতিনেকের মধ্যে সব ঠিক-ঠাক লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। ছবিখানা এমনই ঝকঝকে ঝকঝক নতুন এবং চোখজুড়ানো যে ছেলেমেয়েরা তো দূরের কথা, স্ববলও অনেকক্ষণ সেদিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। তার বাড়ির শোভাই যেন বদলে গেছে। এখন ভ্যাইপি রোড দিয়ে যাবার সময় সবাই তার বাড়ির দিকে তাকাবে। ইস, ছবিখানা কি, ঠিক যেন জ্যাস্ত। ব্যাটাছেলেটার হাত ধরে মেমটা এইমাত্র যেন দৌড় শুরু করেছে, দৌড়োচ্ছে, এখনো দৌড়োচ্ছে। এরোপ্লেনটার গৌ গৌ শব্দ এছুনি যেন শোনা যাবে! আর ঐ বাড়িগুলো? ঠিক যেন আকাশ ফাঁক হয়ে দৈবাস্বর্গের একটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। স্ববল লোহার খুঁটি ভালো করে নেড়ে-চেড়ে দেখল—শক্ত করে পোতা হয়েছে কিনা। তারপর ছবির দিকে চেয়ে সে খুঁটির গায়ে আদর করে হাত বোলাতে লাগল। অতবড়ো ছবিতে বাড়ির পাশের তালগাছটাও যেন অনেকখানি চাপা পড়ে গেছে। তালগাছটার মাথায় দুটো শকুন বসে আছে। এ-শালাদের কিছুতেই তাড়ানো যাবে না! স্ববল ঠিক করল, তালগাছটা না-হয় সে কেটেই ফেলবে। তা হলে কি এই ছবির ওপরেও শকুন বসবে! না-না। এইটুকু সময়েই ছবিটা যেন স্ববলের নিজের সম্পত্তি হয়ে গেছে।

ছেলেমেয়েদের কাছে সেদিনটা একটা বিরাট উত্তেজনার দিন। কুসীও বারবার ঘুরে ঘুরে ছবিটার দিকে তাকাচ্ছে। এত ভালো লাগছে তার, সে বুঝতে পারছে না কি করবে, কাকে গিয়ে এ কথা বলবে। কি সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে, আর ছেলেটাও কি সুন্দর! সাহেব মেম অনেক দেখেছে কুসী। এ-রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ি এয়ারশোট যায় আসে—তাতে সাহেব মেম থাকে—কিন্তু এই ছবির মতন সুন্দর তারা কেউ নয়। ছেলেটার ঘাড় কি রকম চওড়া, আর মেয়েটার পা, মুখটা একেবারে গোলাপি গোলাপি টুসটুসে—ও-রকম জামার দাম অনেক, তা আর বলতে!

এ-বাড়িতে হারাণই সবেমাত্র লেখাপড়া শিখছে—আর কেউ ইংরিজি-বাংলা কিছুই পড়তে জানে না! মাঝখানে কি লেখা আছে কেউ বোঝে নি। হারাণই গম্ভীর ভাবে বানান করে পড়ল, এফ এল ওয়াই—ফ্লাই, ফ্লাই মানে মাছি! বাকি সবাই সমস্বরে বলল, যা: মাছি না হাতি! মাছি আবার কোথায়! হারাণ গম্ভীরভাবে বললে, লেখা আছে, আমি তার কি করব! হারাণের ছোটো ভাই নবু সবচেয়ে এঁচোড়ে পাকা—সে বলল, মা, ছাখ্ ছাখ্, মেয়েটার পৌদ দেখা যাচ্ছে, হি-হি-হি—। কুসী অকারণে তাকে এক চড় কষাতেই তার মা খেঁকিয়ে উঠল, তুই এই ভর সন্ধেবেলা ছেলেটার গায়ে বিনা দোষে হাত তুললি যে বড়ো! তোর বড়ো বাড় বেড়েছে, না রে? তোর পিঠে আমি চ্যালা ভাঙব!

আজ বাড়িতে এ-রকম একটা দারুণ ব্যাপার হয়ে গেল, কুসী তাই আশা করেছিল সেই উপলক্ষে আজ রাতে ভাত রান্ধা হবে। তার মা সেদিক দিয়ে গেলই না। সুবল আনন্দ করার জন্ত আজ তাড়ি খেতে চলে গেছে। কুসীকে আটা মাখতে বসতে হল। দুখানা দুখানা করে রুটিতে পেটও ভরে না—খিদে আরো বাড়িয়ে দেয়, তার থেকে ভাত এক গেরাস খেলেও শাস্তি। রান্নাঘরের দেয়রের কাছে বসে কুসী আটা মাখছে, বুপ্-বুপ্ করে নেমে আসছে অন্ধকার, কট্ কট্ করে ব্যাঙ ডাকছে, একটা ব্যাঙের ডাক ঠিক ছোটো ছেলের কান্নার মতন ট্যা ট্যা—ওটাকে নিশ্চয়ই সাপে ধরেছে। এই বর্ষাকালটায় চোঁড়া সাপের বড় উপদ্রব এদিকে। ষাড় ঘুরিয়ে কুসী দেখল এখন আর অন্ধকারে ছবিটা দেখা যায় না—তালগাছের মাথায় শোনা যায় শকুনের ডানার ঝটপটানি।

কাঠবিড়ালির ডাকের মতন একটা সরু শিমের শব্দ হতেই কুসী চঞ্চল হয়ে উঠল। চোখ তীক্ষ্ণ করে রাস্তার দিকে তাকাল। তাড়াতাড়ি হাত ডলে ডলে আটাগুলো পরিস্কার করে বলল, ঠাকুমা, আমি আটা মেখে তো রেখেচি, তুই রুটিগুলো বেলে দেনা রে!

রান্নাঘর থেকে মা ঝংকার দিয়ে উঠল, কেন, তুই কোথায় যাবি ?

—আমি একটু আসছি।

—আসচিস মানে ? এই রাস্তিরে যাবি কোথায় ?

কুসীও ঝংকার দিতে জানে। সেও কাঁঝিয়ে উঠে বলল, বাবারে বাবা, একটু পাইখানাতেও যেতে পারব না !

বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে কুসী চুপি চুপি ভি. আই. পি. রোডে চলে এল। সাট সাট করে গাড়ি যাচ্ছে, কুসী চট করে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল গুপাশে, তার পর রাস্তার ধার দিয়ে নেমে ঢালু জায়গাটা পেরিয়ে জলের পাড় ঘেঁষে একটা আসশ্রাওড়া ঝোপের পাশে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে তার শক্ত জোয়ান হাতে কুসীকে কোলে টেনে নিল। একটা ঠোঙা কুসীর মুখের কাছে এগিয়ে ধরে বলল, এই নে, তোর জন্তে এনেছি। তুই তো আলুর চপ ভালোবাসিস !

বাড়ির সবার কাঁছ থেকে সারাদিন লাখি-কাঁটা খাচ্ছে কুসী, উপরন্তু খাবার যা পায় তাতে তার একটুও পেট ভরে না। সারাক্ষণ খিদে থাকে। এই একজন, তাকে শুধু আদর করে, তাকে কত ভালো ভালো জিনিস খেতে দেয়। টাবু এর নাম। সাইকেলের কারখানায় ফিটারের কাজ করে। তেলেভাজা আলুর চপ বেঙনিগুলো কুসী হাম হাম করে খেতে লাগল। আর সেই ফাঁকে ওর আঁচলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে টাবু ওর কচি স্তন দুটো ডলতে লাগল। খানিকটা খাওয়া হলে তারপর কুসী বলল, টাবুদা, তুমি খাবে না ? এই ইঃ, মাইরি, যা স্ফুস্ফুড়ি লাগছে, হি-হি-হি—

—চুপ চুপ, চ্যাচাস নি।

—ওখানে না, ওখানে না, তা হলে কিন্তু আমি সত্যি চেষ্টাব।

—আচ্ছা আচ্ছা, পাগলি একটা।

কুসীর উরুর তলা থেকে হাত সরিয়ে এনে টাবু সেই হাত কুসীর নিতম্বে রাখলো দু'এক মুহূর্ত, তার পর সেই হাত আবার ইতিউতি যাত্রা করল। শরীর মুচড়ে ছটফটেয়ে কুসী মাটিতে শুয়ে পড়তেই পাশাপাশি শুয়ে পড়ল টাবু।

ঢালু জমিতে অন্ধকারে হুজনে শোওয়া—বেশ খানিকটা ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে অনবরত। ওদের কেউ দেখছে না। কুসী ফিসফিস ক'রে বলল, জানো, আজ আমাদের বাড়িতে একটা ছবি টাঙিয়েছে—

—কি ছবি ?

—তুমি ছাখো নি ? উরে: সাবাস—এত সুন্দর না—না দেখলে বিশ্বাস হবে না, এখন অন্ধকার, কাল দিনের বেলা এসো—

হঠাৎ উত্তেজনায় কুমী দারুণ ভয় পাওয়ার মতন চম্কে গেল। যেন সে একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখেছে। ফ্লোরোসেন্ট রঙে আঁকা তাদের বাড়ির বিজ্ঞাপনটায় কোনো চলন্ত মোটরগাড়ির হেডলাইটের আলো পড়তেই সমস্ত দৃশ্যটা একবার ঝকঝক করে উঠল, আলো সরে যেতেই আবার অদৃশ্য। কুমী বলল, দেখেছ? দেখেছ? ছাথো নি?

—কি? কি দেখব? তুই আশ্বে কথা বল না—কোন শালা আবার—

—ঐযে, ঐযে ছাথো, আমাদের বাড়িতে—আবার আলো পড়তেই আবার দৃশ্যটা ফুটে ওঠে। টাবু সেটা দেখতে পেয়ে বলে, ও, অ্যাডভাট্রাইজ।

—তার মানে কি?

—কবে টাঙালো? বেশ সুন্দর তো!

—সুন্দর না! দেখতে পেয়েছ—ছেলেটা আর মেয়েটা—

এক-একটা গাড়ির আলো পড়ছে—আর আলোতে ছবিটা দেখার জগ্ন কুমী প্রত্যেকবার উন্মুখ হয়ে ওঠে। টাবুর ব্যস্ত হাত তার শরীরের নানা জায়গায় ঘুরছে—সে আর বাধা দিচ্ছে না। টাবু তার মুখের কাছে মুখ আনতেই তড়বড়ানিতে দাঁতে লেগে ঠোঁট কেটে যায়। জ্বিত দিয়ে নোন্তা রক্ত চুষতে চুষতে কুমী বলে, টাবুদা, ঐ ছেলেটা-মেয়েটা ছুটেছে কেন?

—এরোপ্পেনে উঠবে ব'লে। তুই একটু পাশ ফের, এই হ্যাঁ, ঠিক আছে।

—এরোপ্পেনে উঠে ওরা বুঝি ঐ বাড়িগুলো যেখানে—সেখানে যাবে?

—হ্যাঁ। উম্-ম্-ম্—

—ঐ জায়গাটা কোথায়?

—কে জানে? লগুন হবে বোধ হয়—মানে বিলেত।

—ও ছবিটা আমাদের বাড়িতে টাঙানো কেন?

—চূপ কর না, উঃ তোকে এত ভালোবাসি আমি মাইরি, সত্যি, উম্-ম্, সোনা সোনা, কাল তোকে মাংসের কাটলেট খাওয়াবো।

—ওদের দুজনের মুখ ছটো কি সুন্দর, না? বেলো? শরীরময় অনির্বচনীয় পূজক নিয়েও কুমী বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারে হঠাৎ-হঠাৎ বলসে-ওঠা সেই ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে।



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সেই গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মুর্গীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন্ জায়গায়। অণচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরের-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর সবই বদলে গিয়েছে, বদলায় নি শুধু ডিসপ্যাচ ষ্টিমারের দল। এ-জাহাজের ও-জাহাজের ডেকে-কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি ছবছ একই। কীরকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা যে গন্ধটা আর সব-কিছু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মুর্গী-কারী রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুর্গী, তার পেটের ভেতর থেকে যেন তারই কার রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন স্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই পাওয়া যায়। পুরনো দিনের রুপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভীড় আগেব চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরের পরিপাটি আহালাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি তাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাজ। পোর্টেবলটা আনব আনব করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মর্দিতা 'দেশ'—মালিক না আসা পর্বন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'ত্রটা'ও হয়ে যান, তা হলেও তাঁর 'স্বামী' বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

‘রূপদর্শী’ ছদ্মনাম নিয়ে এক নতুন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ-ভরা লেখা ছেলেবেলায়। ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অভখানি কথা শুঁছিয়ে লিপল কী... আর এত সব কেছা-কাহিনীই বা যোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছুটির আর্জি লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এতবড় অগ্নায় অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন? হঁঃ! এ আবার একটা কথা হল! সিলেট নোয়াখালির আনাড়ীরা দেবে ঘুষ ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন!

জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিন্ধের নৃঙ্গি, চিকনের কূর্তা আর মৃগার কাজ-করা কিস্তি-টুপি পরে ডেকের ওপর টহল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছেও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির ভিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, ‘রূপদর্শী’ দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনছে কতখানি!

একটুখানি গলা খাঁকারি দিয়ে শুধালুম, ‘ও সারেঙ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?’

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বলল, ‘আমাকে “আপনি” বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে ছ-একবারের বেশী দেখি নি, কিন্তু আপনার আকা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরিবকে মেহেরবানি করেন।’

খুশী হয়ে বললুম, ‘তোমার বাড়ি কোথায়? বস—না, তার ফুরসত নেই?’

ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়ল।

আমি বললুম, ‘সে কী? একটা টুল নিয়ে এসো। এসব আর আজকাল—’ কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙও টুল আনল না। তারপর আলাপ পরিচয় হল। জাহাজের লোক—স্বথ-দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়ল না। শেষটায় মোকা পেয়ে ‘রূপদর্শী-দর্শন’ তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যেসকল পুঁথিপড়া শোনে, সে সকল আগাগোড়া শুনল, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আল্লাতালার উদ্দেশ্যে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, ‘ইনশাফের (গ্রায়থর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, কিন্তু এ-দুনিয়ায় ইনশাফ কোথায়? আর বে-ইনশাফি তো তারাই করেছে বেশী, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতলাই কার জন্তে কী ইনশাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল!’



আমেরিকার কথায় মনে পড়ল। ‘চৌতলি পরগণায় বাড়ি, না, যেন ওই দিকেই কোন্‌খানে।’

সারেঙ বললে, ‘আমারই গাঁ ধলাইছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছিল, ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।’

আমি শুধালুম, ‘কী হল তার? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।’

সারেঙ বললে, ‘শুধুন।’

‘যে লেখাটি ছড়র পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জান-মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না, যে সে-জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায় নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে-লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কী রকম ঘাম বারে দেখেছেন—এই জাহাজেই যার দু’দিক খোলা, পদ্মার জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নীচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ, তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ বারো চোদ্দ হাজার-টন ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও অনুমান করা যায়? খাল বিল নদীর খোলা হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নামের মাঝখানে, কালো-কালো বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকজা, লোহালকড়ের মুখোমুখি।

‘পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিমরি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের কলের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো হুন গেলান হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব হুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।

‘কিংবা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে “এমথ”—’

আমি শুধালুম, ‘একেই কি ইংরাজীতে বলে এমাক্ (amuck)? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে!’

সারেঙ বললে, ‘জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।’ তারপর একটু থেমে সারেঙ বললে, ‘আমাদের

সকলেরই দু-একবার হয়েছে, আর সবাই জাবড়ে ধরে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—  
—শুধু সমীরুদ্দী কখনো একবারের তরেও কাতর হয় নি। তাকে আপনি দেখেছেন,  
সায়ের? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত  
কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুচাঁর গুজন ছিল তিন মনের কাছাকাছি—  
তাকে সে এক খাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে  
জমেছিল বাঘের খাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিন্নমি যায় নি, “এমুখ” হয় নি, তার  
কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক  
পয়সা সে কামাবেই কামাবে, ভিন্নমি গেলে চলবে না, বিয়ারি পাকড়ানো সখৎ  
মানা।’

সারেঙ বললে, ‘কী বেহদ তকলীফে জানপানি হয়ে যে কুলুম শহর পৌছলাম—’  
আমি শুধালাম ‘সে আবার কোথায়?’

বললে, ‘বাংলায় যারে লক্ষা কয়।’

আমি বললুম, ‘ও, কলছো।’

‘জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি  
কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা  
পয়সা বার জাহাজে বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের  
অসহ কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নামলেই না। বললে,  
নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে-কথা ঠিকও বটে, হুজুর, খালাসীরা কাঁটা পয়সা  
বন্দরে বন্দরে যা ওড়ায়! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখে নি, আধুলির  
বেশী কামায় নি, তার হাতে পনের টাকা। সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।

‘আমরা পেট ভরে যা খুশি তাই খেলাম। বিশেষ করে শাক-সবজি। জাহাজে  
খালাসীদের কপালে ও-জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।

‘তারপর কুলুম থেকে আদম বন্দর।’

আমার আর ইংরিজী ‘এইডন’ বলার দরকার হল না।

‘তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে স্তসোর খাড়ি—দু দিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর  
বালু, মাঝখানে ছোট্ট একটা খাল।’

বুঝলুম ‘স্তসোর খাড়ি’ মানে স্তয়েজ কানাল।

‘তারপর পুস’ই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সবজি  
খেতে নামলাম সেখানে। ঝাঝুরা গেল খারাপ জায়গায়।’

পোর্ট সর্কদের গণিকালয় যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে-খবরটি রাখে।

‘পূর্গই থেকে মার্সই, মার্সই থেকে হামবুর—হামবুর জর্মানির মূলুকে।’

ততক্ষণে সিলেটা উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কী ধনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে-রকম উচ্চারণ করে, ইংরিজীর বিকৃত উচ্চারণের মারফতে নয়।

সারেঙ বলল, ‘হামবুর্গে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাধাই করে আমরা দরিয়্যা পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌছলাম হুউক বন্দরে—মিরকিন মূলুকে।’

‘নয়া বুনা কোন খালাসীকেই হুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই বা না কেন? মার্কিন মূলুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভূষাও সেখানে মাসে পাঁচ-সাত শো টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশকাল আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশী কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে দিয়ে তামাম মূলুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণ ভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মার্কিন মজুরদের জ্বর লোকসান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।’

‘হুউক পৌছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শব্দ পেটের অস্থখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভান করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলি করে নি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে।’

‘হুইক পৌছবার দিন সন্ধ্যাবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসম-কিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কী কৌশলে সে পারে পৌছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভুল করে বুঝিয়ে বললে।’

‘বিশ্বাস করবেন না সায়েব, কী রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরী করেছিল। কলকাতার চোরা-বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের স্ট, শার্ট, টাইকলার, জুতা, মোজা।’

‘আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি যোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী গাঁতারের জাড়িয়া পরে নামল জাহাজের উলটো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগচির ভিতরে তার স্ট জুতা মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগচি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ-মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাড়িয়া ডেগচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে সে শিশ দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে

আমাদেরই এক সিলেটা ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিশের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে হুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটারা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার যে কোন ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার স্ট্রট পেরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিশ দেখলেও ভাববে, সে হুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাঁওয়া খেতে।

‘পেলেনটা ঠিক উত্তরে গেল, সায়েব। সমীরুদ্দীর জন্ম খোঁজ-খোঁজ রব উঠল পরের দিন দুপুরবেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয়, সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখিকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু হুউক শহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন্ পুলিশের গোসাই?’

গল্প বলায় ক্লান্ত দিয়ে সারেঙ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না দিয়েই সারেঙ বললে, ‘তারপর হজুর, আমি পুরো সাত বছর জাহাজে কাটাই। ছু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসত হয়ে ওঠে নি। আর কী-ই বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। ষতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষের ক বছর স্বেচ্ছাই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ী নাকি আমার জন্ম কাঁদত। তা হজুর দরিয়ার অর্থে নোনা পানি ঝাকে কাতর করতে পারে না, বাড়ির দু ফোঁটা নোনা জল তার আর কী করতে পারে বলুন!’

বলল রটে হক কথা, তবু সারেঙের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ বললে, ‘বাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুত পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরকিন মুলুকে, দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আফসোস করি নি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্ম কোন্ মুলুকে দানাপানি রাখেন, তার হৃদয় বাতলাবে কে?’

‘তারপর কল-বরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল আমার পায়ের হাড়ি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম ডিসপ্যাচের কামে। এ-জাহাজে আসার দুদিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা ফজরের

নমাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাঞ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী! বুকে জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, ভাই সমীরুদ্দী! এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপন ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।

‘কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশী তাঞ্জব লাগল আমার, সে আমার প্যারে কোন সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে। শুধালাম, “তোমর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাই নি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিকল না?”

‘কোন কথা কয় না। ফকির-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায় নি।

‘বুখলাম কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়ার চেষ্টা না করে, ঠেলেঠেলে কোন গতিককে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশভার পেলেট সামনে ধরলাম, আঙা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ওই খেতে সে বড় ভালবাসত—কিছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেললাম, বাচ্চাহারা মাকে মাছয যে-রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু ছজুর, পরের জন্ত অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবানি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্ত খাবার গিলি কী করে?

‘সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলাম না। আমার, ছজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—ভুউক বন্দরেও আমাদের যখন নামতে দেয় নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

‘রাত্তির অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটল।

‘হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কী ঘটেছে।’

সারেঙ দম নেবার জন্ত না অজ্ঞ কোন কারণে খানিকক্ষণ চূপ করে রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, ‘তার সে দুঃখের কাহিনী—ঠিক ঠিক বলি কী করে সায়েব? এখনও মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুটি অন্ধকারে সে আমাকে সব-কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিস্ফেছিল, আর অতি অল্প কথায়ই সে সব-কিছু সেরে দিয়েছিল।

‘সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে।

বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানি নে, একসঙ্গে কখনও চোখে দেখি নি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানি নে, আমিও দেখি নি।'

'তবেই বুঝুন হুজুর, সে-টাকা কামাতে হলে কটা জ্ঞান কুরবানি দিতে হয়।

'প্রথম পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার জন্ত। তারপর আরও অনেক টাকা দিখি খোদাবার জন্ত, তারপর আরও বহুত টাকা শহরী ঢঙে পাকা চুনকামকরা, দেয়াল-গুলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্ত, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্ত এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙিঘরের উন্টোদিকে দিখির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্ত।

'সাত বছর ধরে সমীরুদ্দী মিরকিন মূলুকে, অম্বরের মত খেটে, দু শিফ্ট আড়াই শিফটে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজকার, আর আপন খাই-খরচার জন্ত সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মূলুকের ভিখারীরও দিন গুজরান হয় না।

'সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্ত, জমি কেনার জন্ত। মিরকিন মূলুকের মাহুয ষে-রকম চাযবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।

'ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরী শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। হুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদমিও বিনা তকলিফে। তার ওপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে কলকজা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জ্বোরে, জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধ্যার সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়া দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না হতেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।

'রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানখেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হয়।

'বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধানখেতের মাঝখানে।

‘মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ মসজিদের নকশাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনিয়ার, আর হজুরও মিশর মূলুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।

‘কত দূর-দরাজ থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি, সমীরুদ্দীও জানে।

‘মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখে—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টঙ্কিঘর!’

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, ‘সে কী কথা!’

সারেঙ যেন আমার প্রশ্ন স্নতেই পায় নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, ‘কিছু না, কিছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্ত দিকে বানিয়েছে? কই, তা হলে তো নিশ্চয়ই সে-কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গাঁয়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বড় প্যার করেন। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

‘প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চান নি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানখেতের মধ্যখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমাহুষ আরও কত কী।’

আমি থাকতে না পেয়ে বললুম, ‘বল কী সারেঙ! এ-রকম ঘা মাহুষ কি সহিতে পারে? কিন্তু বল দিকিন, গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?’

সারেঙ বললে, ‘তারাই বা জানবে কী করে, সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুঁতি-ফাঁতির জন্ত তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায় নি—সমীরুদ্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়ি-ঘরদোর বাঁধতে, জমি-খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে শাদি

করে মিরকিন মূলকে গেরস্থালী পেতেছে, এ দেশে আর ফিরবে না, আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা। তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।’

আমি বললুম, ‘উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর?’

সারেঙ বললে, ‘সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকে নি। সেই ধানখেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলে নি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জ্ঞপ্তি পীড়াপিড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরে নি। শুধু বলেছিল, যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।’

‘কলকাতার গাড়ি সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের মুকুব্বীরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর দু পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, বাড়ি চল, ফের মিরকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, হুদিন জিরিয়ে যা।’

আমি বললুম, ‘রাশ্বেলটা কোন্ মুখ নিয়ে ভাইয়ের কাছে এল সারেঙ?’

সারেঙ বললে, ‘আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন সায়েব, সমীরুদ্দী কী করলে? তাইকে লাথি মারলে না, কিছূ না, শুধু বললে, সে বাড়ি ফিরে যাবে না।’

‘তার পরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে তো বলেছি, শা-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চূপ করে বসে।’

দম নিয়ে সারেঙ বললে, ‘অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী আমাকে সব-কিছূ বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, “ভিখিরী স্বপ্নে দেখে, সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার ছুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি-ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই ছুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায়?”’

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, স্বপ্ন হত, তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকী কাহিনী না বললে অস্তায় হবে।



সারেঙ বললে, 'চৌদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।

'কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে ?

'সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায় নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পৌঁছল সেই ভাইয়েরই কাছে। আবাব সে টাকাটা ওড়াল।'

ইনসাফ কোথায় ?

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



ঘুম ভাঙতেই চমকে উঠলো রাসেলা।

সে ভাবলো, ভোর হয়ে গেছে। চেয়ে দেখলো চারদিক, আলোছায়া অন্ধকার। ঠিক ভোর হয়নি এখনো। বিছানায় শুয়ে হাই তুলল সে ঘন ঘন। তারপরে কান সজাগ রাখলো বাইরের পদধ্বনির প্রতীক্ষায়। চারদিকে শীততাপ হাওয়া। এ মুহূর্তে ভালো লাগছে নিজকে, জীবনের মতো।

কাল রাতে ঘুমোতে ষাবার সময় ভেবেছিলো, খুব ভোরে সে বড়ই কুড়োতে যাবে; তার আগে কেউ ঘেন আর গাছতলে না যেতে পারে।

পা দু'টো টানা দিতেই পায়ের দিকটার কাঁথাটা ছিঁড়ে গেল শব্দ তুলে। এবাব সে কাঁথাটা সরিয়ে উঠে পড়লো। বিছানা থেকে।

মায়ের শিয়রের কাছে এলো। চোখে পড়লো তার—মাকে জড়িয়ে ধরে বাবা তখনো অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছেন। উভয়ের কাপড় লজ্জাজনক অবস্থায় পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে নিলো। ঘেন কিছুই দেখিনি সে। সামনের দিকে এগুতে এগুতে বাইরে বড়ইতলে পায়ের শব্দ শুনতে পেলো—অনেকগুলো পায়ের শব্দ। ঘরের ঝাঁপ খুলে দৌড়ে বাইরে এলো রাসেলা। ভাবলো, আলসেমি না করলে হয়তো বা এতক্ষণে অনেক বড়ই পেতে পারতো সে।

কুলসুম, ধলু হয়তো এতক্ষণে অনেক বড়ই পেয়েছ। ভরে ফেলছে কৌচড়।

অসহায় লাগলো নিজকে। তবুও কতকগুলো বড়ই কুড়িয়ে কাপড়ের আঁচলে ভরে নিলো রাসেলা।

আঁধার কেটে পূর্ব উঠি উঠি করছে। কুলসুম রাসেলার কাছে এলো। তারপর বললে সে, “দেহি রাসেলা, ডুই কতডি পাইছত।”

উভয়েই নিষেদের কৌচড়ের খোঁজ নিয়ে ঘরের দিকে এগুলো ।

আমিনা এতক্ষণে কাঁপ ঠেলে বাইরে এলো । রাসেলা দৌড়ে মায়ের কাছে এলো, “এই যে মা এতড়ি ।”

আমিনা মেয়ের কৌচড়ের বড়ই দেখে হাসলো মনে মনে । তারপর লোটা নিয়ে চলে গেল ঘাটে । রাসেলাও তার পিছু নিল ।

মুখে পানি দিয়ে মা মেয়ে ঘরে এলো ।

“মা মুড়ি আছেনি গো ?” মেয়ে হাঁকলো ।

“দেগগা, টিনঅ আছেনি, তর বাপের লইগ্যা হুগ্গা রাহিছ ।”

“রাখমু হানে ।” মায়ের কথার উত্তরে রাসেলা বললে ।

মুড়ির টিনে হাত দিয়েই রাসেলা হেসে উঠলো, “মাগো, মুড়ি দেহি একমুড, বাবার লইগ্গা রাইখ্যা আমি খামু কি ?”

ওঘর থেকে উত্তর দিলো আমিনা, “যা আছে তুই খা, একমুড কড়কড়া বাত আছে । তর বাপেরে দিমু নে ।”

মুড়ি কাপড়ের খোঁটে তেলে বাইরে চলে এলো রাসেলা । দাঁওয়ান বসলো, বঁকে । তারপর উঠে গিয়ে খড়ের-পাড়ায় হেলান দিয়ে চিবুতে লাগলো সে । খেতে খেতে চোখের সামনে ধরা পড়লো গ্রামের খোলা দিকটা । গ্রামের গাছের মাথা ছাড়িয়ে সূর্য উঠে গেছে অনেক উপরে । পাশের খালে নোকো তুলতে তুলতে যাচ্ছে যেন হাঁওয়ান ভর করে, বিনা পালে ।

তারপর চোখ ঘোরালো লাউ মাচায় । মাচায় ঝুলছে ছোট বড় বেশ কয়েকটা দব্জ রংয়ের গলা—চিকন পেটমোটা লাউ । লাউ মাচার পাশেই গোয়ালঘরটা দখতে পেলো সে, ছোট্ট বাছুরটা তিড়িং করে লাফিয়ে ক্ষেতের দিকে ছুটে আসছে । আবার দৌড়ে যাচ্ছে মায়ের কাছে । খুব ভালো লাগলো রাসেলার । বাছুরটার এই অনাহুত ছুটোছুটি ।

এদিকে কখন এসে কুলসুমদের ছাগলটা লাউগাছের একটা মূল ডগায় কামড় বসালো । দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠলো রাসেলা । কাঁকার ডাল ভেঙ্গে ছাগলটাকে তাড়া করতে করতে গাল পাড়লো । “হারামজাদী, মরাসোগীরা—অগ ছাগল বাইন্দা রাখতে পারেনা ! মাইনবেগো গাছ যে খাইয়া যায় পরতেক দিন ।” ছাগলটা ছুটে পালালো । তাই আবার গজরাতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে সে । “আইয়া লউকনা আবার, ঠ্যাং ভাইলা হালামু । অ’ কুলসুমী, তগো ছাগল বাইন্দা রাহিছ ; নাইলে চুল ছিরা হালামু তর ।” কুলসুমের উদ্দেশ্যে গাল দিতে লাগলো রাসেলা ।

আমিনা মেয়ের চীৎকার শুনে এসে লাউয়ের হেঁড়া ওগাটা হাতে নিয়ে ছুঃপ পেল। তারপর বললে সে, “অগো ঐ বকরীডার জালায় আর কিছ্‌চু লাগাইয়া স্ত্‌খ পাই ন। যা লাগামু আউস কইর্যা—গইল্যা খাইয়া যাইব, এতবড় অতিযার ঐভার প্যাডের মইদে। আর অরাঅ’ জানে অইও, অগ ছাগলের খাইছ্‌ৎ। ইট্টু বাইন্দা চাইন্দা রাখবো হেয়োন। মাইনবেরে জালাইয়া খাইব।”

একসঙ্গে অনেক গালি দিয়ে হাঁপালো আমিনা।

তারপর মায়ে বিয়ে করে এলো। “ক’গো মা ছুদের কাইড়াডা? সাব-বাড়ীতে ছুদ দিয়া আহিগা।”

“সিকার মইদে ঠাখ।” আমিনা মেয়ের শ্রুনের উত্তরে জানালো।

“কিছু অংচেনিগো মা, খালি একমুড় মুড়ি খাইয়া চো চো কইরতাছে প্যাড্‌ড।” রাসেলা মায়ের দিকে তাকালো কাতরভাবে।

“ছুদভুগ দিয়া আয় সাব-বাড়ীতে। আমি কুড়ি বানাইয়া রাখমেন, আইয়া খাইছ্‌।” বলতে বলতে আমিনা ঘাটে এলো এঁটো বাগন হাতে নিয়ে।

রাসেলা অগত্যা ছুধের কাড়াটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সে নামলো মাটির রাস্তায়। রাস্তার বৃকে গাছগুলো তখনো শিশির ভেজা। ঘাসগুলো ভেজা বলেই পাল্লের নীচে ফস্কাতে লাগলো বারে বারে। পথের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা হাঁটতে লাগলো সে।

রাস্তার নীচে কুঁয়োর কাছে লজ্জাবতী গাছের মাথায় বেগুনী ফুল। ফুল তুলতে সে নামলো নীচে। তারপর যখন সে লজ্জাবতী গাছে হাত দিল পাতাগুলো লজ্জা শেষে সব ঘুমিয়ে পড়লো। বৃঞ্জ গেল সবগুলো পাতা।

স্কারে টান মেরে রাসেলা ছিড়লো ছুঁটো বেগুনীরঙা ফুল।

একটা বাড়ীর কাছে এসে পড়লো সে। এ বাড়ীর পাশ দিয়েই সাব-বাড়ীর পথ। উঠোন জুড়ে কিলবিল করছে মুরগীর ছাঁগুলো। ধরতে ইচ্ছে হলো তার ছুঁএকটাকে। সবার অলক্ষে সে ধাওয়া করলো ছুঁএকটার পেছনে। কিন্তু বৃড়ো মা-মুরগীটার চীৎকারে ভয় পেলো সে। পালাতে চেষ্টা করতেই এক বলক ছু পড়ে গেল কাড়া থেকে।

ভয়ে বৃকটা অবশ হয়ে গেল তার। মাটিতে ছুধটা তখনো সবটুকু চূপসে যায়নি। কালিচোষা কাগজের মতো চুষতে চুষতে সবটুকু দুধ খাচ্ছিল তখন রাস্তার মাটি। ভয়ে কাঁপলো সে। দুধ কম হয়ে যায়, যদি সাব-বাড়ীর ঝি মেপে দেখে! ‘আচ্ছা সামনের কল থেকে পানি মেশালে হয় না!’ ভাবলো সে।

কলের দিকে চোখ পড়লো তার। একটা খুঁট শালিক কলের মাথায়। কখনো বা ক্ষেতের অস্ত্রাঙ্গ শালিক কিংবা পাখিদের দিকে চেয়ে সেই খুঁটশালিকটা কিচির মিচির শব্দ তুলছে।

রাসেলা আস্তে আস্তে কলের কাছে আসতেই শালিকটা গেল উড়ে, দেখতে পেল সে। তারপর আবার দেখলো নীচু ধানক্ষেত থেকে এই রাস্তার উপরে উঠে আসছে গঞ্জের লোকেরা। ভয় পেল সে। পানি মেশাতে আর পারলোনা কোনরকমেই।

সাহেব বাড়ীতে এসে পড়লো যখন, ভয়ে ভয়ে ঝিকে ডাকলো সে। “দুধ বাহেনগো।” কথাটা যেন বার হচ্ছিল না রাসেলার কণ্ঠ থেকে। ঝি এসে দুধ নিয়ে গেল ভেতর বাড়ীতে।

কান খাড়া করলো রাসেলা। মনে হলো ভিতবে কাদের কণ্ঠস্বর। কেউ বুঝি বা বলছে দুধের স্বপ্নতার কথা।

কিস্ত না। কিছু না। দুধের কাড়াটা হাতে ঝি আবার রাসেলার কাছে এলে। হাতে দিল মাটির কাড়াটা। একঝাঁক আগুনের হাওয়া যেন কানের কাছ দিয়ে ছুটে পালালো।

মাটির কাড়া হাতে উঠোনে নামলো রাসেলা।

সাহেব বাড়ীর সামনে ছোট্ট আঙ্গিনায় ঘাসের আন্তরণ। সবুজাভ। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে সেই আঙ্গিনায়। এই ছোট্ট ছেলে-মেয়েগুলোর মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়েকে প্রতিদিন খুব ভাল লাগে তার। সে মেয়েটির নাম রীনা। অল্পদিন হলে গরম কাপড়ের লাল ব্রক পরা রীনাকে চোখ ঘুরিয়ে দেখত সে বার বার। কিস্ত সে দাঁড়াতে পারলোনা ভয়ে।

ক্রকের লাল রংটা শুধু চোখের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে গেল বাইরের দিগন্তে মিশে।

রাসেলা বাড়ী এলো। হাঁকলো এবার মাকে, “মাগো, ঝুটি অইছে নাহি?”

আমিনা মেয়ের কাছে এলো। সোহাগভরে পাতিল থেকে ঝুটি নিয়ে মেয়ের হাতে দিয়ে সতৃষ্ণভাবে মুখের দিকে চাইলো কয়েকবার। স্নেহাকাজ্জ্বল মেয়ের বুক ভরে গেল। এমন সময় পাশের বাড়ীর রাহেলার মাকে দেখতে পেল আমিনা—তার ঘরের কাছে এসেই দাঁড়িয়েছে মহিলা।

“বহেন গো বুজান”—বললো আমিনা।

“নাহ, আর বইয়া কি করমু, পরানডা খাবলা খাবলা লাইগতাছে, বালাগেনা মনডা, মাইন্নাডার কহন যে কী অয়!” বলতে বলতে রাহেলার মা আমিনার এগিয়ে দেওয়া আসনে বসলো। বললো আবার, “আর অর বাপে অগো, বিয়ালে গ্যাছে,

সহাল সহাল কিইয়া আইবনা, হে'ওনা। আমারে টাকাইয়া রাইখ্যা হেয় বইয়  
রইছে। কি যে আরাষ অইছে এইবার—হারাডা বচ্চর ধইর্যা অই গুড়ির ব্যারাম  
আর মাহু'ওতো টেহেনা বেশী।”

অজানা আশঙ্কায় কথাগুলো বলেই নিজেই মুখে হাত দিল রাহেলার মা  
“টিগবো কি দিয়া, শইল্লে তাগোদ থাকলে এনা ব্যারামের লগে লড়াই কইরবো! ন  
খাইয়া না খাইয়া তাগোদ আর আছে নিহি!”

কাঠের চটি দিয়ে উল্লনের উপরে কড়াইয়ের পুঁইশাক নাড়তে নাড়তে বললে  
রাসেলার মা।

রাসেলা শুনছিল বসে। মাটির কলসী থেকে ঢক্ ঢক্ শব্দ তুলে পানি খেয়ে  
বেরিয়ে গেল সে। তারপর বড় ঘর থেকে কুলোতে করে বড়ই এনে দিল রোদে  
এলো মোখলেসের নতুন বিয়ে করা বো। রাসেলার বড়ই দেখে তার জিহ্বায় জম  
এলো। হেঁ মেরে কুলো থেকে কতগুলো বড়ই তুলে নিল সে।

“নিয়েমা, নিয়েমা, ভাবীসাব, কইয়া রাইখলাম।” বলে চৌচিয়ে উঠলো  
রাসেলা। ফজিলা খাতুন হাসতে হাসতে কাঁথের কলসী কাঁথ বদল করে ঘাটের  
পুকুরে চলে গেল।

এরপরে দৌড়োতে দৌড়োতে এল কুলসুম। তার নিত্যকার খেলার সঙ্গিনী।  
রাসেলা দেখলো চোখ তুলে। কুলসুম কলকণ্ঠে বললো, “লগো রাসেলা, কলই হাগ  
তুইল্যা আনিগা!”

হাত ধরা-ধরি করে রাসেলা আর কুলসুম চলে গেল বাড়ীর কাছে পশ্চিমের  
চকের খেতে।

আধঘণ্টা অবধি কলাই শাক তুলে বিরক্তিত হলো রাসেলা।

বললো সে, “এলা ঝাইগা কুলসুম, ঐ ঞাথ, আজী সাব আইতাছে।” এবার  
ছুটে পালালো ওরা দুজনেই।

করিম হাজী দূর থেকে শাক তুলতে দেখে ওদের উদ্দেশ্য করে বললেন,  
“কেরাগো তরা, খারইছ, আইতাছি! অহনে দৌড়াছ ক্যা হারামজাদীরা?”

রাসেলা বাড়ীতে ঢুকলো হাঁপাতে হাঁপাতে।

রান্নাঘরে ঢুকে বললো মাকে, “কলই হাগগুলো বিয়ালে রাইল্লেন গো মা।”

আমিনা ক্লেপে উঠলো শাক দেখে, “লন্সীছাড়ী, তরেনা না করছি পরের কোলার  
হাগ তুইলতে। খারইছ, তর বাপে আইয়া লউক, তর একদিন নয়গা আমার  
একদিন, আইজ দেহুমনে!”

রাসেলা মায়ের ভয়ে চুপসে গেল। চোখ ফেলতে-পারলোনা শাকগুলোর দিকে। সে ঘর ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করলেই ভাতের হাঁড়ি ঠেকা দিতে দিতে আমিনা বললো, “গোসা করিছনা। গোসল কইর্যা আইয়া বাত খা দুইডা। আর ঠিলাডা লইয়া যাইছ, বুড়াইয়া লইয়া আবি।”

রাসেলা নিঃশব্দে মাটির কলস কাঁখে নিয়ে ঘাটে চলে গেল।

দেখতে পেল সে, তখনো ঘাটের তালের তক্তার উপরে ভেজা কাপড়ে দাঁড়ানো ফজিলা ভাবী। স্নান করে ভেজা কাপড়ে চুল শুকোচ্ছে।

কলস নামিয়ে রাসেলাও বসলো ঘাটের তক্তায়। দেখতে পেল সে, ভেজা কাপড়ে লেপ্টে আছে ফজিলার উদ্ধত শরীর। দু'টো পীনোন্নত বুক দেহের উপর যেন গোধাময় হয়ে আছে। তাকিয়ে দেখলো কয়েক বার অলক্ষে। তারপর নিজের নবাকুর বুকের দিকে চেয়ে পুলকিত শিহরণ উপভোগ করলো রাসেলা। যেন দু'টো পদ্মকুঁড়ি তার দেহে অঙ্কুরিত হচ্ছে লজ্জানম্নভাবে।

কেমন গোপন শিহরণ এই প্রথম পেল রাসেলা। যৌবনের এই আগমনী যেন তাকে সুখ দিল এই মুহূর্তে। হঠাৎ মনে হলো তার, সে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে তাহলে!

গোসল সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলো রাসেলা।

ভাত খেতে বসলো সে উদাসানন্দে। কিছু যেন খেতে ইচ্ছে হচ্ছেনা তার!

“আর দু'গুংগা বাত দেই?” মা বললো।

“আর লাইগবোনা।” মাকে বললো রাসেলা।

“আর দু'গুংগা দেই, খাইয়া ল।” ভাতের পাতিলের নীচে আমিনার হাতের কর্কশ আওয়াজ বাজলো। রাসেলা বুঝতে পারল ভাত বেশী নেই। তাই সে বললে, “মা আর বাত খামুনা!”

মায়ের বুক ক্ষেটে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। রাসেলার কাছে ধরা পড়লো।

হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে ‘মরা-কান্না’ ভেসে এলো।

রাসেলা মাকে বললো, “কিগো মা, কি অইছে?”

তারপর উভয়েই বুঝলো—রাহেলার মার কঠ! হয়তো বাঁ রাহেলার যত্ন-কান্না!

“কি অইছেগো বুজান,” বলতে বলতে ঘর থেকে ছুটে বেরলো আমিনা। পেছনে রাসেলা। ভাত পড়ে রইলো পাতে।

রাহেলার মা মাটিতে গড়াগড়ি বাছে

“আমার কি অইল গো...হায় আল্লাহ আমারে কই ডুবাইয়া দিলি আল্লা।...অ রাহেলা আমারে ফালাইয়া গেলি কই মা’জান। তরে খুইয়া আমি ক্যামনে থাকমু, ও আল্লা কইয়া ছাও আমারে...”

সবাই সাশ্বনা দিল রাহেলার মাকে।

ফজিলা বললো, “কাইশ্মেননা আশ্মা, কান্দই আর কি অইবো। যার বাশ্বা হেই লইয়া গ্যাছে। অর রহর শাস্তি আউক হেই মোনাজ্জাত করেন আশ্মা।”

কিন্তু রাহেলার মার চীৎকার আকাশে বাতাসে ছড়াতে লাগলো।

“মাগো মা.....অ রাহেলা, তুই চইলা গেলে এই খালি গরে আমারে মা ডাইকবো আর ক্যাডা। অ রাহেলা.....ও আল্লা, তর এইকী রহম আল্লাহ...”

সবার কণ্ঠেই কান্না। কিন্তু কাঁদলে আর চলনা বলেই অনেকের ধমকানিতে শেষে সবাই রাহেলাকে কবর দেয়ার জন্তে ব্যস্ত হলো।

জানঘরে নিয়ে গেলো রাহেলাকে।

অনেক সময় কাটলো। রাহেলাকে কবর দেয়া হয়ে গেছে পাশের ছাড়া ভিটেতে। রাসেলা সব দেখলো।

নিশ্চুপ, নিশ্চক। যেন কথা বলার শক্তি নেই তার।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে কখন রাত গাঢ় হয়ে গেল। বাড়ীতে এলো রাসেলা। বারে বারে রাহেলার মার কান্নার ধ্বনি যেন কানে ভাসতে লাগলো তার। “তরে ফালাইয়া আমি এই খালি গরে ক্যামনে থাকমু, অ...রাহেলা...” যেন বারে বারে এই কথাগুলোই রাসেলার কানে বাজতে লাগলো।

চোখের কাছে যেন হলো রাহেলা যেন জীবন্ত দাঁড়ানো। যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ভুল ভাবলো তার। এ তো স্বপ্ন! আসলে মৃত্যু সব ছিনিয়ে নিয়ে যায়—সব কিছু অনাঙ্গীয় করে দেয়। ভাবতে লাগলো। সন্ধ্যা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কতটা বা সময়! এর মধ্যেই সব ছিনিয়ে নিয়ে গেল একটি মৃত্যু।

বিছানায় উঠে এলো রাসেলা। ভয়ে ভয়ে কাঁধাটা মুড়ি দিয়ে নিলো সমস্ত দেহের উপর দিয়ে। ক্লান্তি, দুঃখ, অবসাদে চোখের পাতাগুলো ভারী হয়ে আছে যেন! ঘুম আসছে। ধীরে ধীরে। ঘুম আসছে—যেন সমুদ্রের মতো ঘুম।



সারা দিনের ছবি, শব্দ, অল্পস্মৃতিগুলো সব চেউয়ের মতো তন্দ্রার সৈকতে গড়িয়ে  
পড়ছে যেন।

ছায়াছবির মতো সারাটা দিনের দৃশ্যগুলো দৃশ্যাস্তর হয়ে যাচ্ছে তার মনের  
পর্দায়।

আব্ছা আব্ছা ভোরের অঙ্ককার...বড়ই কুড়োনো.....

তুলতুলে মুরগীর ছা,.....

লঙ্কাবতীর বেগুনি ফুল...

রাহেলার মুখ...

মাটিতে লেপটে যাওয়া হুধ...

ভয়...সাহেব বাড়ীর রীনার লাল ফ্রক.....

কলের মাথায় খুঁট শালিক...

রাহেলাবু, রাহেলাবু... রাহেলাবু...

সবুজ কলাই শাক...মুড়ি...ভাত...শৃঙ্গ পাতিল...মায়ের করুণ দীর্ঘশ্বাস...ছুধা...  
ফজিলার ভেজা দেহ...নিজের নবাস্থর বুক...

মা...বাবা...ভয়...কান্না...রাহেলার মা'র শোকালাপ...ও আল্লা, তর এইকি  
রহম আল্লা...

রাহেলার জীবন্ত মুখ...মৃত মুখ...কবর...রাহেলাবু'...

রাহেলাবু...রাহেলাবু'...

সব যেন এখন ছায়াছবির মতো মনের পর্দায় ভেসে উঠে তলিয়ে যায়...ভেসে  
উঠে সরে দাঁড়ায়।

সব, সবকিছু।





আহা, আমি আর লোকালয়ে যাব না। শওকতের বিধবস্ত ইচ্ছেরা মেডিকেল কলেজের ছয় নম্বর ওয়ার্ড থেকে হাহাকার করে উঠল। ইচ্ছেরা ইথারে তরঙ্গ তোলে না, তাই তিরিশ জন অধ্যুষিত এই ঘরের বাতাস এত ভারী, অকম্পিত। আমি হীনবল এক ক্যানসারের রোগী—অস্তিমদশায়, আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে—রোগী তার কাঠির শলাকার মতো হাত দুখানি নেড়ে দেখতে চাইল। উঃ, নাড়তেও কত কষ্ট! আমি স্ববির হয়ে গেছি। অথচ আমার বয়স চল্লিশ মাত্র। এবং তাই আমি সব কাজে অল্পযুক্ত, প্রয়োজনহীন ও বিরক্তিকর এক বোঝা।

—‘মুখটা একটু খুলুন তো!’ অল্পরোধের গলায় আদেশ এক নারী-কণ্ঠের। নাস। এরকম উপমার কোন মানে হয় না অথবা কেন মাথায় এল সে জানে না—শওকত উপমাটা আওড়ালো, মাহুঘ কামড়ানো ভোমরার মত নাসটি গুণগুণ করে উঠল আমার কানের কাছে।

মুখ খুলল। থার্মোমিটারে তাপ উঠল না? নাসের জ্বতে কুঞ্জন। নিশ্চয়ই তাপের মাত্রা খুশী করতে পারেনি তাকে। একটা দার্শনিক চিন্তার কীট মাথায় ঘুরছিল বহুক্ষণ। এবারে রূপ পরিগ্রহ করল : উষ্ণতা দিয়ে জীবনের পরিমাপ করা যায় না। অল্পক্ষ জীবনের নদীর সংখ্যা স্বল্প হতে হতে শূন্যে গিয়ে পৌঁছেলেও জীবনের সেটাই আসল রূপ। তার সাম্প্রতিক জীবনের শেষ উষ্ণতাও যেদিন নীরবে নিঃশেষ হয়ে যাবে—সেইদিন সে নিঃসন্দেহে শেষতম, চরমতম এবং মহত্তম অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

নাসটি তার শরীরের হুগাশে কষল ওঁজু দিয়ে চলে যাচ্ছিল। শওকত দর্শনে বিরতি দিয়ে ডাকল, ‘সিস্টার’।

সিস্টার এগিয়ে এসে জিজ্ঞাস্ব দৃষ্টি মেলে তাকালো।

—‘পানি।’ শব্দের সংক্ষিপ্ততা অমুষ্ণ ব্যর্থতার করুণ রূপ। অথচ আমি একদিন কথা বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করেছি। শওকত অতীতকে ভাবল। শব্দের ফুলঝুরি ছিল আমার ব্যবসার অস্ত্র। আমি শওকত আলী, আঠারো বছর আগের বি-এ। চাকরীর বিধাতাদের তুষ্ট করতে না পেরে দালালী দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। জীবন বীমার দালালী।

নাস্টি ফিরে এল। হাতে খোলাটে জল। কতদিন গ্লাসটি মাজা হয়নি যেন। নাকি জলটাই খোলাটে! অথবা শওকতের দৃষ্টিও স্বাছ্যদোষে নষ্ট হয়ে গেছে? কিন্তু নাসের চেহারাটি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মুখ স্বচ্ছ...ট্রান্সপারেন্ট সাবানের মত লালচে। জানালার রোদে দাঁড়ালে তার শিরা-উপশিরার রক্ত চলাচল দেখা যাবে—শওকতের বিশ্বাস। নাস্টির বৃকে বিদ্ধ করার মত উত্তম এক যৌবন।

অবশ্য যৌবন যত উত্তমই হোক তাকে বিদ্ধ করবে না কোনদিন আর; করতে পারবে না বলা যায়।

শওকতের উষ্ণতা লাভ করার কল্পনা অবাস্তব। সিস্টার যখন এগিয়ে এসে শওকতের ঘাড়ের নীচে তার আশ্চর্য নরম একটি হাত ও বৃকে আর একটি আলতো করে রেখে তাকে একটু উঠিয়ে পানি খাইয়ে দিতে চেষ্টা করল, তখন শওকত, আশ্চর্য হলেও, একটুও উষ্ণ হল না।

বরং তার মনে এক আশ্চর্য অমুষ্ণতার সংক্রমণ: মোটামুটি স্বন্দরী যৌবন সম্ভারে সজ্জিতা এই যুবতীটি কেন আমার শুশ্রূষা করছে? এটা কি তার মনের সহজাত সৃষ্ট ও পুষ্ট সেবাপরায়ণতা? না। তা নয়। এই সেবা তার চাকরী। আসলে পয়সার বিনিময়ে সে তার শ্রমকে সেবার পবিত্রতা দিয়ে বিক্রি করছে। আমি—আমরা তাকে নিয়োগ করেছি। কি আশ্চর্য! মৃত্যুর আগে আমাকে পানি কিনে খেতে হচ্ছে?

—‘না, না’। শওকত আর্ত চীৎকার করে উঠল। দুর্বল হাতে সিস্টারের আলতো ধরে রাখা গ্লাসে এক অস্থির ধাক্কা দিয়ে বসল, যেন নিজের অজান্তে। সিস্টারের সাহায্য ছাড়াই শুয়ে পড়তে পারে সে। মেঝের ওপর গ্লাস ভাঙার উৎকট শব্দ উঠল। সে দেখতে পাচ্ছিল, পানি প্রথমে সিস্টারের মুখে ছড়িয়ে পড়ে পরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তার একপাশের বৃকের জামাকে ভিজিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সিস্টার প্রথম অবস্থায় হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরতেই স্বর থেকে নিজস্ব হয়ে গেল অকস্মাৎ।

শওকত জানে সিস্টার তার সম্বন্ধে রিপোর্ট করতেই গেল। সন্দেহ নেই সে আহত হয়েছে মর্মান্তিকভাবে। আহত এবং অশমামিত। অথচ, আমি সারাজীবন আহত হতেই অভ্যস্ত। জীবনে কাউকে আহত করেছি—এমন উদাহরণ এই প্রথম। না না, প্রথম নয়। শওকত মনে করল, সে অসুস্থ হয়ে তার পরিবারের সবাইকে প্রথম আহত করেছে। কারণ অর্থের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ও হো! আরও একটা উদাহরণ তার মনে পড়ল। এই মুহূর্তের নিজের হাসির রূপ সম্বন্ধে ধারণা না থাকা সত্ত্বেও শওকত হাসল। সে প্রথম আহত করেছিল এক মহিলাকে—যিনি অতি উঁচু মহলের এক প্রতিষ্ঠিত পুরুষের গৃহলক্ষ্মী। এক লাখ টাকার কেস দিতে পারলে শওকতকে ইন্সপেক্টর করা হবে, কর্তৃপক্ষ কথা দিয়েছিলেন। ঘাট সত্তর হাজারের কন্ট্রাক্ট জোগাড়ও হয়েছিল কয়েকজনের কাছে থেকে। বাকীটা একজনের, সম্ভব হলে এই ভদ্রলোকের ওপর দিয়ে চালালে অনেক অকারণ শ্রম বাঁচত। তাই শওকত বহুদিন থেকেই মহিলার স্বামীটিকে শিকার করার উপায় খোঁজায় সচেষ্ট ছিল। নানা কারণে পেরে উঠছিল না।

শেষে একদিন হস্তে হয়ে মহিলার শরণাপন্ন হয়েছিল সে। দীর্ঘক্ষণ ধরে স্বামীর মৃত্যুর পরে মহিলায় ও তার সম্ভানদের জীবনব্যতীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়েছিল। মহিলাটি আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন। রহস্য করে মারাত্মক প্রশ্নও করেছিলেন একটা এক সময়, ‘স্বামী যে আমার আগেই মারা যাবেন এ ধরনের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তো।’

শওকত বিমূঢ় হয়েছিল। সামলে নিয়ে বলেছিল, ‘দেখুন সে নিশ্চয়তা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলে এ ব্যবসা করতে আসতুম না। তবে আমি আর একটি কথা বলেছি সম্ভানদের সম্পর্কে। সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।’

মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, ‘আমার সম্ভান থাকতেই হবে এ ধরনের চুক্তিও তো কারো সাথে করিনি।’

শওকত হতাশ হয়ে পড়ল। আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে উঠতে বাচ্ছিল, মহিলা চরমতম অবাধ করলেন সেই মুহূর্তেই, ‘আজই রাতে একবার আসুন। তখনই বলে দেখব ওকে।’

আশার পরিধিতিকে অনেক বড় করে সন্ধ্যার পরেই শওকত পৌঁছল। বিরাট বাড়ীটা বড় নির্জন। দিনেও সেই মহিলা ও জনচারেক চাকর গোছেয় লোক ছাড়া কাউকে দেখা যায়নি।

এখন কারও চেহারা চোখে পড়ছে না।

ডুইংকমে মহিলাটি একা বসে বিদেশী পত্রিকার পাতা ও-টাচ্ছিলেন। শওকতকে দেখে মিষ্টি হেসে বললেন, ‘আস্থন।’

নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। শওকত ভাবছিল, ভদ্রলোকের দেখা সেখানেই পাবে। নেই। ঘরটি খাবার ঘর এবং বসবার ঘরের মতই নির্জন। মহিলা বললেন, ‘উনি এখনও আসেন নি। কিছু মনে করবেন না—আস্থন না আমরা এর মাঝে কিছু খেয়ে নিই।’

শওকতের এবার বিভ্রান্ত হবার পালা।

টেবিলে যা ছিল তা যদিও সেই ভদ্রমহিলার ভাষায় ‘কিছু নয়’ তবু শওকত এত রকমের খাবার একসাথে সেই প্রথম দেখেছিল। কিন্তু অবাক হওয়ার কারণ তা নয়! শওকত কারণগুলো একত্র করল : এক ॥ আমি নিয়ন্ত্রিত নই। অথচ মহিলা কত সহজভাবে আমাকে খেতে বললেন—তায় নির্বিকারভাবে খাবার ঘরে এনে। আমাকে ভেবেছেন কি? দুই ॥ তাঁর স্বামী এখনও ফেরেন নি, হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন। তার অপেক্ষা না করে, আমি যদি খাই...তা ছাড়া উনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে থাকেন...। ব্যাপারটা সব মিলিয়ে তার কাছে অশোভন লাগল।

মহিলা পূর্ণ দৃষ্টি মেলে শওকতের দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টির ভাবা শওকত যেন অনায়াসে পড়ে নিচ্ছিল তার চোখ থেকে : কি আশ্চর্য আপনাকে আগে থেকে না বলে খাবার ঘরে এনে খেতে বলায় মনঃকুল হয়েছেন মনে হচ্ছে। বিশ্বাস করুন আপনাকে আগে বলার কথা খেয়াল ছিল না। ও, আপনি আমার স্বামীর কথাও ভাবছেন।

তারপর চোখ নামিয়ে মুখে বললেন, ‘উনি আজ আসবেন না।’

আবার বিস্ময়।—‘আপনি জানতেন?’

—‘সবই বলব, বস্থন। নিন, শুরু করুন।’

শুরু হল।

মহিলা আপন মনেই বললেন, ‘চাকর বাকর সব ঘুমিয়েছে। আর বাবুর্চী সন্ধ্যায় ছুটি নিয়ে চলে গেছে। আমাদের নিজেদেরকেই সব কিছু নিয়ে টিয়ে খেতে হবে।’

খেতে খেতে বললেন, ‘উনি শুধু আজ আসেননি, তা নয়। কোনদিনই প্রায় রাতে বাড়ী ফেরেন না। হঠাৎ কখনও যদি আসেন সে রাতে ছুটোর পরে।’

—‘কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন রাতে ওর সাথে এ বিষয়ে কথা বলবেন।’

—‘মিথ্যে বলেছিলাম।’

—‘আমার আসবার প্রয়োজন বুঝতে পারছি না।’

মহিলাটি এতক্ষণ পরে আশার বাণী শোনালেন : ‘বুঝতে পারবেন। তবে কথা দিচ্ছি, আপনার কেস আমি করিয়ে দেবই। আমার স্বামী যদি টাকা নাও দেন— আমি নিজে দেব।’

খাওয়া শেষে শওকতসহ মহিলা ড্রইংরুমে এলেন। বাড়ীটি এখন অবধি নির্জন ও তৃতীর প্রাণীহীন ; অন্তত শওকতের কাছে।

মহিলা ওকে বসিয়ে বললেন, ‘ভাল কথা, আপনার স্ত্রী কি অপেক্ষা করবেন আপনার জন্তে?’

—‘না, আমার ফিরতে প্রায়ই রাত হয়। ও খুমিয়ে পড়ে।’

—‘আচ্ছা আপনি কাগজটা পড়ুন, আমি কাপড় পান্টে আসছি।’

চলে গেলেন।

শওকত কাগজটা হাতে নেওয়ার আগে মাথার ভাবনাগুলিকে গুছিয়ে নিল : ‘মহিলার স্বামী রাতে ফেরেন না। কোথায় থাকেন? ক্লাবে? সারারাত? মহিলা একাই বাড়ী থাকেন। একা কি? না আমার মত কাউকে ‘প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে’ ডাকেন। অথচ আমার দু’বছরের ছেলে এখন মায়ের পাশে ঘুমিয়ে। মহিলার কি সত্যি আমাকে ‘প্রয়োজন’? অথচ আমার টাকার দরকার। এবং শেষে : ছি ছি, একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এরকম ধারণা করা উচিত নয় আমার।’

ধারণা করতে হল না। মহিলার নির্দেশিত ‘কাগজ’টি নিয়ে চোখ বুলোতেই এক সেকেন্ডে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। পশ্চিমা নাইট ক্লাবের মাসিক সংকলন। পাতায় পাতায় ছবিতে ছবিতে চরম উচ্ছ্বলতার নগ্নতম প্রকাশ।

মহিলা কাপড় পান্টে এলেন। ড্রইংরুমের উজ্জ্বল আলোতে শওকত তার সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছদ দেখল।

ডাক্তার এলেন।

যথারীতি বৃকে পিঠে স্টেথিসকোপ লাগালেন। বিছানা পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা সুইপারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন।

এর মধ্যেই শওকতের চোক একবার ডাক্তারকে ছেড়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং অবাক হয়ে দেখল শওকত সমর্থ রোগীরা উঠে বসে এবং অসমর্থরা শুয়ে শুয়েই উৎসুক। লক্ষ্য করছে তার ও ডাক্তারের গতিবিধি। ব্যাপারটা বুঝল। পৃথিবীর সব বয়সের সব পরিবেশের মানুষই এক। শুধু মজা দেখতে চায়। মুমূর্ষা

অথবা অসুস্থতা তার প্রতিবন্ধক নয়। নাসের সাথে তার ব্যবহারের মজা সবাই দেখেছে। এখন তার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তারের আঘাত দেয়ার মজাটাও দেখে নিতে চায়।

ডাক্তার আঘাত দিলেন না। মিষ্টি হেসে বললেন, 'স্টাফদের সাথে ভালো ব্যবহার কবতে হয়। ওরাই তো আপনার এখানকার কেয়ার টেকার। ওদেরকে রাগিয়ে দিলে ভালো সেবা পাবেন কি করে বলুন।'

ডাক্তার চলে যেতে শওকত আর একবার দৃষ্টি ফেলল ঘরে। সবাই শুয়ে অন্তদিকে তাকিয়ে। তাকে দেখছেননা আর কেউ। আমি তোমাদের মজা দেখাতে পারলুম না, সে বলতে চাইল। কি করব বল, ডাক্তারটা বড় বেরসিক এবং ভদ্র। অবশ্য আমার যদি এতটুকু শক্তি থাকত, ডাক্তারের কাঁধ থেকে স্টেথিস্কোপ খুলে নিয়ে তোমাদের আর একবার মজা দেখাতুম।

নাস আর একবার এল। গভীরতার প্রতিমূর্তি। খাওয়াতে চাইল, পারল না। শওকত ইচ্ছে করে খেল না, বরং নাসকে তুষ্ট করার জন্তে খাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না।

নাস চলে যেতে আবার সেই মহিলার কথা মনে হল। চিন্তার রাজ্যে লজ্জার স্থান নেই : মহিলার সত্যি আমাকে 'প্রয়োজন' ছিল। আমি তার এবং তিনি আমার প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার কেসটা পেয়েছিলুম। ইন্সপেক্টরও হয়েছিলুম। এবং আমার দু'বছরের ছেলে নিউমোনিয়ায় মারা না যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে আমার যৌন সম্পর্ক বজায় ছিল।

এই সময় নাসও ডাক্তারদের দ্রুত ব্যস্ততা লক্ষ্য করল শওকত। একটা অসুস্থতার অবসান হল। ৩১নং বেডের অসুস্থতা সাদা চাদরে ঢাকা পড়ল।

এইবার আমার পালা, শওকত ঠিক ধরে নিল। আমি একা একাই ঘুমিয়ে পড়তে চাই। সবাইকে সামনে ডেকে ঘটা করে চোখ বন্ধ করে লাভ কি। আমার ছেলেও আমার অবর্তমানে এবং খুব সম্ভব মায়ের উপস্থিতি সন্দেহে তার সাময়িক তদ্রার অবসরে বিদায় নিয়েছিল।

মহিলার বাড়ীতে আমি আর যাইনি। সন্তানের মৃত্যু আমাকে সং করেছিল। সং অসং কে? যেই হোক—মহিলার বাড়ীতে না যাওয়ার জন্তে আমাকে সারাজীবন এক ব্রাঞ্চ অফিসের খুদে ইন্সপেক্টর হয়েই থাকতে হল। মহিলা প্রভাবশালী ছিলেন সন্দেহ নেই, নইলে তাঁর এক কথাতেই আমার উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেল কেন।

—‘শ্রম, বাড়ী যাবেন না?’ নার্স ডাক্তারকে প্রশ্ন করছে এই ঘরেরই অন্ত  
প্রান্তে।

—‘হ্যাঁ, এইত।’ ডাক্তারের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

বাড়ী সম্বন্ধে গৌরববোধ না থাকলেও শওকত বাড়ীর কথা ভাবতে লাগল।  
দুই ছেলের একজন বেতার শিল্পী হওয়ার ও আর একজন সিনেমার অভিনেতা  
বনবার আশ্রাণ কৌশল করছে। তিন মেয়ের বড়টা বিবাহযোগ্য, বিয়ে হয়নি  
আজ্ঞাও অবিদিত।

সহসা, আজ কি বার, এখানে আমি কতদিন আছি, এখন সময় কত—ইত্যাকার  
প্রশ্ন শওকতকে বিব্রত করে তুলল। বলা বাহুল্য একটারও উত্তর তার নিজের পক্ষে  
খাড়া করা সম্ভব হল না। জানালায় চোখ যেতে দেখল অনাহৃত সূর্যের অস্পষ্ট  
প্রবেশপথ। এখন দিন বুঝলেও, সময় সম্বন্ধে সে সঠিক হতে পারল না। এই  
ঘরের দিক সম্বন্ধে তার ধারণা না থাকায়, সে এই রকম সিদ্ধান্ত নিল: যদি তার  
সামনেকার জানালাটি পূর্বের হয় তাহলে এখন সকাল, আর যদি পশ্চিমের হয়  
তবে বিকেল।

অবশেষে সে সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত হল, বাড়ীর সবাই যখন যথারীতি এসে  
পৌঁছলো। তাহলে এখন বিকেল। ঠিক নিয়ম মত স্ত্রী শিয়রে বসে মাথায় হাত  
বুলোল, বড় মেয়ে পায়ে। মেজ ছেলে খবর নিল শরীরের—আর বড় ছেলে বলল,  
টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলেই কেবিনে স্থানান্তরের ব্যবস্থা হবে।

এ পর্যন্ত রুটিন মাসিক চলল। এরপরে নতুন বিষয় ঘটল একটা। বড় ছেলে  
হঠাৎ শওকতের নিজস্ব জীবনবীমা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল।

শওকতের নিজস্ব একটা জীবনবীমা আছে। দশ হাজার টাকার আরও প্রায়  
পাঁচ হাজারের মত পুরতে হত। অতএব তার মৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক অবস্থা  
কিছুটা উন্নত হবে বলা যায়। শওকত স্ত্রী ছাড়া কাউকে বীমার কথা বলেনি।  
টাকার পরিমাণ স্ত্রীও জানে না। বড় ছেলে সেটাই জানতে চাইল। হস্তত মায়ের  
কাছ থেকে অনেকে। এবং সব টাকা দেয় না হলেও তা পাওয়া যাবে কিনা  
প্রশ্ন করল।

—‘হঁ।’ শওকত টাকার পরিমাণটা কষ্ট করে উচ্চারণ করল। মৃত্যুতে তা  
পাওয়ার নিশ্চয়তা বোঝাতে চাইল, সক্ষম হল না।

শওকতের শেষ নিরীক্ষার দৃষ্টিটা সবার উপর তীক্ষ্ণ পৰ্যবেক্ষণ করে এল। অকল্পনীয়  
অৰ্ধ-প্রাপ্তি সম্ভাবনার উৎকট আনন্দ প্রকট সবার মুখে, এই পরিবেশেও।



আমি জীবনে এত আনন্দ দিতে পারিনি কোনদিন ওদের, শওকত ভাবল, আমি শেষ বারের মত চিন্তা করছি, এই ভাল হল।

এখন রাত্রি। ছাদের বাতিগুলো নিশ্চল ও দীপ্তিহীন। বৈদ্যুতিক গোলযোগের জ্বলে সবগুলো নিভেও গেল এক সময়। শওকত কামনা করল, আজ যেন আর না জ্বলে ঐ অন্ধকারের যৌবনহননকারীরা। আজ আমি নিবিড় প্রশান্তিতে যুগ্মোতে চাই।





তখন বেশ রাত্রি! কোথাও শব্দ ছিল না। আকাশে স্থির হয়ে বুলছে চাঁদ। বাতাসের সঙ্গে পারদের মত ঠাণ্ডা হওয়া আসছিল ঘরে। আমি জানালায় রাত্রি দেখছিলাম। আর ঠিক তখন, আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে। আমি সেই কণ্ঠস্বর কোনদিন শুনিনি। সেইভাবে কেউ কোনদিন আমাকে ডাকেওনি।

আমি তখন সালমার কথা ভাবলাম। ভাবলাম সালমা হতে পারে। সালমা আমার প্রেমিকা। এত রাতে সালমা ছাড়া আমাকে কেউ মনে করবেনা। নিশ্চয়ই সে এখন আমার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কি দৃশ্টি মেয়ে।

আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়লাম। বলতে ইচ্ছে হল, শেষ পর্যন্ত অভিসারিণী সাজলে। মোটেই মানাচ্ছে না। কাল সকালে কলেজে ঢুকবে কি করে? মেয়েগুলোর সামনে দাঁড়াবেই বা কোন সাহসে? আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কি ভাবে তুমি প্রেমের কবিতার ওপর লেকচার দেবে কাল। ঢের হয়েছে, এসো এবার। ঘরে বসবে। কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পেলাম না। চাঁদ স্থির থাকলো আকাশে।

ঠিক এ-সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ঘরে কেউ নেই। সবুজ ডিম্‌লাইটটা জ্বলছে।

অতএব কেউ আসেনি এখানে। আমার করিডোরে কেউ দাঁড়ায়নি। কেউ ডাকেনি আমার নাম ধরে। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

পরদিন বিকেলে সালমাকে গিয়ে সব খুলে বললাম। বললাম, কণ্ঠস্বরটা তোমার নয়। তবে তোমার মত। তুমি যে ভাবে আমাকে নাম ধরে ডাকে ঠিক তেমনি মিষ্টি, তেমনি স্নেহেলা।

সালমা হাসলো, ডাক্তার দেখাও ।

—দেখাচ্ছি তো ।

—তাহলে ডাক্তার বদলাও । ও-সব হাতুড়ে ডাক্তারে কাজ হবে না । বেশ বুঝতে পারছি রাত্রিতে তোমার ঘুম হচ্ছে না ।

—কি করবো তাহলে ?

—বললামই তো, ডাক্তার দেখাও ।

—তারপর ?

—ভালো হয়ে যাবে ।

—অর্থাৎ তোমার মত কঠিনের আর কেউ আমাকে ডাকবেনা, এইতো ?

—না । সালমা হেসে বলল, এবং আমার কঠিনের আমিই তোমাকে কাছে ডেকে নেবো । এবং তা স্বপ্ন নয়, সত্যি ।

অফিস শেষে বিকেলে ফ্ল্যাটে না ফিরে মোজা ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে হানা দিলাম । যেন লেকচার দিচ্ছি, কি পেয়েছেন মশাই । কি ডাইগনোসিস করছেন আপনি ? রাত বিরাতে লোকজন আমার নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে । শেষ পর্যন্ত কি আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বেন ?

ডাক্তার হাসলেন ! কি ওয়ুধ দিলেন, আল্লাই জানে, ক'দিন বিছানায় পড়ে পড়ে যুমোলাম ।

এর ক'দিন পরে আবার এক জ্যোৎস্না রাতে, এবার আর ডাকাডাকি নয়, একে-বারে স্পষ্ট তাকেই দেখতে পেলাম । দেখলাম সালমা এসে দাঁড়িয়েছে জ্যোৎস্নায় ।

—কি ব্যাপার, কি হচ্ছে ওখানে ? ঘরে এসো । আর এত রাত্রিতেই বা কি দরকার ?

—শব্দ নেই ।

—কতক্ষণ এসেছো ?

—শব্দ নেই ।

—কথা বলছো না কেন ?

—কোন শব্দ নেই ।

—সালমা, আমি বিরক্ত হচ্ছি ।

এবারও কোন উত্তর এলো না ।

—সালমা কথা বল, কথা বল বলছি । চূপ করে থেকোনা ।

এইখানটায় আমার ঘুম ভেঙে গেল । জেগে দেখি কেউ কোথাও নেই । সবুজ

আলোটা এখনো জ্বলছে। তাহলে কেউ আসেনি। কেউ আমার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেনি। ভুল দেখেছি আমি। আর সখ হলোনা। ঘুসি মেয়ে টেবিলে ওপর রাখা গ্লাসটা চুরমার করে ফেললাম।

সকালে উঠে ইয়াবড এক ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম অফিসে।

সন্ধ্যায় সিনেমার কাউন্টারে সালমার সঙ্গে দেখা।

—কোথায় ?

—হানি-মুনে। হাসলাম আমি।

—বয়স কমছে নাকি ওলডম্যান ?

—কমাতে চাইতো।

—আসল কথা বল।

অফিসে ছুটি নিলাম।

—উদ্দেশ্য ?

—এমনি। তুমিও নাও, আমাব মত, এমনি এমনি। বড্ড মজ হবেখন।

—অদ্ভুত প্রস্তাব। সে অল্প হাসলো। ঘন ঘন ছুটি নিলে চাকরীটা আমাব থাকবেনা বন্ধু। বড্ড সাধের চাকরী।

—সালমা, তোমাব চাকরীর প্রয়োজন নেই। এবার থেকে তোমার চাকরী আমার ফার্মে। আমার সারা ক্ল্যাট জুড়ে তোমার অফিস বসবে। বুঝলে লক্ষী মেয়ে, তোমার চাকরী আমার সারা জীবন জুড়ে। তারপর একটু থেমে বললাম, আমাদের প্রেমের শেষ। এবার বিয়েটা চূঁকিয়ে ফেলা কর্তব্য। তাহলেই আমি সখ হয়ে উঠবো।

—ঠিক আছে। সালমা এবার গম্ভীর হলো, আমাকে ভাবতে দাও। তারপব ডাকলো স্কটার। পর মুহূর্তে ওকে আর দেখা গেল না।

দু'দিন পর বরে ফিরে দেখি চিঠি এসেছে। সালমা জানিয়েছে বিয়েতে তার আপত্তি নেই।

ছব্বরে। আনন্দে দু'হাতের মুঠি শূঁজে ছুঁঁলাম। ফুঁটিটাকে ধরে রাখতে পারছিলাম। সালমা, সালমা আমার বউ হবে ? সকালে উঠে যাকে আমি রোজ দেখবো গুণগুণ করে গান করে আমার কফি তৈরী করছে, বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখবো ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় হঠাৎ আমার ছায়া দেখে চমকে উঠে হাসছে। এবং যাকে সঙ্গে নিয়ে রোজ রবিবার আমি মনিং শোয় যাবো সেই

সালমা আমার বউ হবে, আমার সন্তানের জননী হবে, আমার কাছে থাকবে, সারাটা জীবন ধরে থাকবে। আহ্ সালমা, কি লক্ষ্মী মেয়ে তুমি!

দিনগুলো যেন কাটতে চায় না। চারিদিকে চিঠি ছাড়তে শুরু করলাম। বাবা এলেন গ্রাম থেকে। বড় ভাই এল করাচী থেকে। তাঁরা অবাক এবং আশ্চর্য। অব্যাহা ছেলেটার কুমারত্ব এবার ঘুচলো তাহলে।

অবশেষে দিনটি এল।

আগামীকাল আমার বিয়ে।

মোট্টেই ঘুম আসছিল না। চিঠি লিখতে বসলাম। কিন্তু কাকে?—সালমা কেই লেখা যাক। খাসা একটা প্রেমপত্র। লিখলাম, সালমা। খানিকক্ষণ মাথায় আর কোন ভাবনা এলো না। তারপর আবার লিখলাম, সালমা। তারপর আবার, সালমা সালমা সালমা। লিখেই চললাম। সারাটা পাতা জুড়ে শুধু একটি নাম, সালমা। এ-লেখা যেন আর শেষ হবে না। সাদা পাতায় স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর মুখ। ধীরে সে মুখ বাপসা হতে শুরু করলো। এক সময় তাকে আর চেনা গেল না। কী স্বচ্ছ। এবং কি ধূসর! কিন্তু একি? এ কার মুখ? এ কি সালমার মুখ। না আর কারো। তবে এ মুখকে চিনতে পারছিলাম কেন? কেন মনে হচ্ছে একে কোনদিন দেখিনি পর্যন্ত। চিনি না? কে এ তবে? খুব সকালে সালমার দরজায় গিয়ে নক্ করলাম। চোখ দেখে বোঝা গেল সারা রাত সেও ঘুমোয়নি। আমাকে দেখে চমকে উঠলো। ফিস্ ফিস্ করে বললো, ভাগে শিগগির। বিয়ের বাড়ী, লোকে বলবে কি। লগ্নের আগেই বর এসে হাজির।

এবার আমার মুখ থেকে যেন ঈশ্বরের বাণীর মতই কথা বেরিয়ে এল: আমাকে মাপ কর সালমা। আমি যাকে ভালোবাসি সে অস্ত্র কেউ, তুমি নও। দ্বিতীয় বার চমকে উঠলো সে।

আমি আবার বললাম, তোমার মত। কিন্তু তুমি নও। তোমার মত সে হাঙ্গের, কথা বলে, ডাক দেয়। কিন্তু সে তুমি নও। আমি দেখিনি কোনদিন তাকে। সে আর কেউ।

সব শুনে সালমা পাথর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ সে কোন কথা বললো না। তারপর বললো, আমি তোমার স্বস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। যাও তুমি।

আমি বললাম, সালমা, আমার স্বস্থতা ফিরে আসার পথ হারিয়ে গেছে। এবার সালমা তাকালো আমার দিকে। আমার চোখের দিকে। এভাবে সে কোনদিন আমার দিকে তাকায়নি। সালমার এ চোখ কোনদিন আমি দেখিনি।

এক মুহূর্ত। তারপর হুঁহাতে মুখ ঢেকে ছুটে গেল সে ঘরের ভেতর। হুঁহাতে  
সশব্দে বন্ধ করলো কপাট। বুঝলাম সালমা কাঁদছে।

আমি ফিরে আসছি। ধীরে ধীরে ভোরের আলো জেগে উঠছে। কিন্তু এ  
যেন আরেক শহর। আমার প্রতিদিনের চেনা ভূবন এ নয়। আমি যেন আরেক  
রাজ্য প্রবেশ করছি। এবং আমিই কি সেই ব্যক্তি গতকাল যে এই শহরেব  
একজন বাসিন্দা ছিল ?





“একটু দাঁড়াও।”

আমার বন্ধু নাসির মোল্লা কোর্টের প্রাঙ্গণে হাটতে হাটতে হাতে হেঁচকা টান দিয়ে বললে।

“কি ব্যাপার?”

“ব্যাপার আছে। কোর্টের পেছনে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখে আসা যাক।”

আমার তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার কথা। খাজনা-সংক্রান্ত একটা মামলা ছিল, তার দিন পড়ে গেছে। স্ততরাং এখানে এই টম্বি-দালাল উকীল-মোক্তারের দললে আর এক তিল দাঁড়াতে মন চায় না।

কিন্তু আমার মামলার তদ্বির যুক্তি-পরামর্শ, উকীলের দরদস্তুর নাসিরই করে। এদিকে আমার মগজ দৌড়য় না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে থানা খেতে হয়।

আমার আরো আপত্তি ছিল অগ্র কারণে। আদালতের পেছনে যাওয়া কতকটা বিলাত ঘুরে মক্কা আসার মত। কোর্ট টিলার উপর। পেছনে যেতে হলে এক ধাপ নীচে নেমে আবার উপরে উঠতে জান খারাপ। রীতিমত হাপানি ধরে যাবে।

তবু নাসিরের অহুরোধ এড়াতে পারলাম না।

আমরা দুজনেই চাকরী থেকে রিটায়ার করেছি। এখনও সংসারের গেরো কাটেনি। আর সময় কাটবে কী করে? কিছু না কিছু কাজে লেগে থাকতেই হয়। নাসির পাকাপোক্ত লোক। তার হাতে হাল ঈপেই আমি নিশ্চিন্ত। এই ক্ষেত্রে আর ঘাড় বঁকিয়ে জোয়ালের ভার আরো বাড়াতে রাজী নই।

কিন্তু টিলার পথে ষথারীতি নেমে আবার উপরে ওঠার সময় তামালা দেখা

গেল। আদালতের পেছনে এক কালি মাঠের উপর বেশ ভিড় জমে গেছে একটা পাদ্রীকে ঘিরে। বীভূষ্টের সেবকটিকে আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সামনে টাক-পড়া মাথা ফর্সা লম্বাটে চেহারা। গলায় ক্রশ ঝুলছে ক্যামকের উপর।

“এ ত আমার চেনা লোক! ব্রাদার জন।” নাসির হঠাৎ বলে উঠল।

আমরা ক্রমশ উপরে উঠছি। ধাপে ধাপে পা ফেলতে ফেলতে নাসির উচ্চারণ করে, “আরে তুমি চিনবে না। এ হচ্ছে ব্রাদার জন। একবার কেরোসিন ব্র্যাক মার্কেট করার অপরাধে আমার কোটে ব্যাটা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। পরে সে কাহিনী বলব। এখন পা চালাও।” দু-জনে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বৃদ্ধকালে পাহাড়-চড়া অত সহজ নয়।

অকুস্থলে দেখা গেল লোকজন কম জমেনি। ব্যাপার কী। ব্রাদার জন তখন চীৎকাব দিচ্ছে, “এই সম্পত্তি খুব ভালো আছে। Very good—ভেরী গুড।”

আমরা দুই কোতুহলী দর্শক। গিজগিজ ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

পাদ্রী হাঁকছে, “দর্শকমণ্ডলী!” আমি তখন নাসিরকে বললাম, “বেশ বাংলা বলে তো!”

“বহুদিন এই দেশে, বলবে না কেন?” নাসির জবাব দিয়েই আবার পাদ্রীর উপর চোখ ফেললে।

পাদ্রী হাঁকতে লাগল, “দর্শকমণ্ডলী। এই সম্পত্তি খুব ভালো সম্পত্তি আছে। প্রটে বারো ‘কানী’ জমি। পুকুর। আর আছে তিন একর জমির উপর বসতবাড়ী পুকুর গাছপালা, দশটা নারিকেল গাছ, লিচু গাছ পাঁচটা—আরো ফ্রুট-ফলের গাছ আছে। এখন নীলাম ডাকা হবে। প্রস্তুত—”। ব্রাদার জন দম নিলো।

কোতুহলী শ্রোতা দর্শক এবার উৎকর্ষ। একজন নেপথ্যে জানতে চাইলে, সম্পত্তি কার?

“এই সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সৌদামিনী মালো সিষ্টার।”

“আজব নাম!”

পাদ্রী ব্যক্তব্যর শুনে আরো বিনয় সহকারে ঈষৎ জোর গলায় বলে উঠল, “সৌদামিনী মালো চার্চের সিষ্টার—বহেন ভগ্নী ছিল। তিনি এক মাস মারা গেছেন। চার্চ তার সম্পত্তি নীলাম করছে।”



শ্রোতাদের মধ্যে এবার একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়, কারণ আকাশের রোদ্দর বেশ নির্দয়। হঠাৎ গরম পড়ছে।

নেপথ্যে একজন বললে, “সাহেব, জলদি করো।”

“অলরাইট” উচ্চারণের পর ব্রাদার জন হেঁকে উঠল “সৌদামিনী মালো, সৌদামিনী মালো, তারই সম্পত্তি। এবার নীলাম শুরু হবে। আমাদের পয়লা ডাক পাঁচ হাজার। তারপর আপনারা বিডিং করুন। ‘হায়েস্ট বিডার’, উচ্চতম মূল্যে যিনি ডাকবেন, তিনিই পাবেন।”

পাত্রীর সঙ্গে দুজন কুলী শ্রেণীর যুবক ছিল। তাদের দিকে চোখ ইশারা ঝাঁজ একজন হেঁকে উঠল, “পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার।”

তার ডাকের মধ্যে জনান্তিকে একজন ডাক দিলে, “পাঁচ হাজার পাঁচ শ।”

পাত্রীর সহকারী হাঁকলে, “পাঁচ হাজার পাঁচ শ। আর কেউ ডাকবেন?”

কিন্তু আর কারো হাঁক শোনা যায় না। অবিশ্রি দর্শকদের মধ্যে গুজগুজুনি চলছে নানা কথার। পাত্রী-সহকারী আবার হাঁক দিলে, “পাঁচ হাজার পাঁচ শ—এক...পাঁচ হাজার পাঁচ শ—দুই—”

হঠাৎ একজন ডাক বাডালে, “ছ হাজার।”

“ভেরি গুড” ব্রাদার জন বলে উঠল। তার সহকারী ছ হাজার ছ হাজার রবে আরো কয়েকবার হাঁক দিলে। শেষে আর একজন ডাকিয়ে বাড়ল। সে সাত হাজার দাম তুলে দিলে।

আমরা বেশ মজা দেখছিলাম। কিন্তু বাড়তি টাকা ত নেই। পেমেন্টে যে ক’টা টাকা পাই, তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে। নচেৎ এত বড় সম্পত্তি মস্তাই পাওয়া যেত। বড় আফশোস হতে লাগল। দাঁড়িয়েছিলাম; সম্পত্তি কোন ভাগ্যবানের পাতে যায় তা দেখার জন্তে।

নীলাম জমে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু ন হাজারের পর আর দাম শতে-শতে লাফ দিয়ে যায় না। একজন ডাকলে, ন হাজার ন’শ পঞ্চাশ। আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়ল। দশ হাজার।

পাত্রী-সহকারী হাঁক দিতে লাগল, দশ হাজার এক—দশ হাজার দুই—। তারপর সে শুরু। জনতা নীরব। তিন—বলার আগে একজন মাত্র পঁচিশ টাকা যোগ দিলে। দশ হাজার পঁচিশ।

ওদিকে রোদ্দুর বাড়ছে। বৃদ্ধকালে কেন দাঁড়িয়ে আছি। আজ বলতে লজ্জা নেই, হয়ত সম্পত্তির লোভ। স্মৃধার্ত কালেভদ্রে অপরের খাওয়া দেখেও নাকি শান্তি পায়।

শেষ পর্যন্ত আরো পাঁচাত্তর টাকা দাম বাড়ল। অর্থাৎ দশ হাজার এক শ। বোঝা গেল নীলাম ডাকিয়েদের পকেট শুকিয়ে যাচ্ছে। রস নদারাং। যিনি শেষ পাঁচিশ টাকা বাড়িয়েছিলেন, ভিড়ে তাকে দেখা গেল না। তবে হাত নাড়ছিল সে অপরের কাঁধের উপর দিয়ে।

পাত্রী-সহকারী হাঁক দিলে, “দশ হাজার এক শ—এক...দশ হাজার এক শ—দুই—।” সে খামলে তারপর। পাঁচ ছ’ মিনিট কেটে গেল। আর তিন উচ্চারণ করে না যে। এবার লোকটাকে দেখলাম যে দশ হাজারের উপর এক শ বাড়িয়েছিল। মাঝ-বয়সী লোক, বুড়ো-বুড়ো ঠেকে। প্যাট-কোট-টাই সমন্বিত। মাথায় মখমলের টুপি। বাজি মেরে দিয়েছে, এই ভাব চোখে মুখে। কতক্ষণ আর নীলাম-কর চূপ থাকতে পারে? কিন্তু ‘তিন’ আর উচ্চারিত হয় না। দর্শক অধৈর্য। তার চেয়ে বে-সবুর যিনি ওস্তাদের মার দিয়েছেন শেষ সময়ে। সে ত জবাব চেয়ে বসল।

এখন বেশ মজা বেধে গেছে। কৌতূহলী দর্শক তাই দাঁড়িয়ে থাকে, রোদ্দুর সবেও নড়ে না।

ব্রাদার জনের মুখের দিকে তাকাই। সেখানে কালো আর ফিকে সবুজ রং খেলা করছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কিন্তু একটা কাশি দিয়ে হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে উঠে সে হাঁক মারলে, “দর্শকমণ্ডলী!”

কৌতূহল আরো বেড়ে যায়। নীলামদাতা এবার কী করবে?

ব্রাদার জন মুখ খুললে, যেন গীর্জার পুলপিট অর্থাৎ প্রচার বেদী থেকে সর্মদা দিচ্ছে, এমনই কর্তৃস্বর: “ভ্রাতৃগণ, আজ নীলাম এখানেই রহিত থাকবে। আগামী কল্যা পুনরায় ডাকা হবে। আজ লোক খুবই কম। কাল দশ হাজার এক শ হইতেই আরম্ভ হইবেক। আমেন্।”

দর্শকদের মধ্যে অনেক গুলতানি শুরু হলো। আর টুপি পরা সেই শেষ পাঁচ-মারা নীলাম-শিল্পী ত রেগেই খুন। ব্রাদার জনের চারিদিকে জটলা পেকে গেছে। সেখানে ভদ্রলোক জোর গলায় বলছে, This is sheer hypocrisy, এটা জোচ্চুরি...ইত্যাদি। আমার কৌতূহলের মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছিল। ভিড়ের সান্নিধ্য এই ক্ষেত্রে আরামদায়ক। আমি তাই পা বাড়াই।

নাসির আমার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে বললো, “আর ভিড়ে সৈধিও না।”

—“একটু মজা দেখে বাই।”

—“আর মজা দেখে কাজ নেই। ষা গরম, সর্দি গর্মি হয়ে মরবে। চলো বাড়ী যাই !”

—“একটু দেখে যাই না।”

—“দেখে কাজ নেই। আমার কাছ থেকেই সব বিত্তান্ত শুনে নিও।”

আকাশে সূর্য তখন দোজখের পিণ্ড বললেই চলে। আমি নাসিরের কথা মেনে নিলাম।

আবাব চড়াই-উৎবাই। ওঠা-নামার ব্যাপাবটা এখন কষ্টকর।

নাসির হেসে বললে, “আর মজা দেখতে গেলে আমাদের মাজা ভেঙে যেত।”

রসিকতাব দিকে আমাব খেয়াল ছিল না। আমি বললাম, “নাসিব, ব্যাপার কী ?”

সে বেশ মাথা হুলিয়ে, ঈষৎ ব্যঙ্গ আর ক্রুবতা মাখানো এক রকমের হাসি ছড়ালো, শেষে মুখ খুললে, “বাবা, এর নাম ব্রাদার জন !”

“জন ?”

—“হ্যা, ও এক জন বটে। আমার কোর্টে কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেটের দায়ে অভিযুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, What have you to say, তোমার কী বলার আছে ? জন জবাব দিল, End justifies the means, উদ্দেশ্য দিয়্যাই উপায়ের বিচার করা উচিত। আমি ব্ল্যাকমার্কেট করিয়্যছি 'ভিক্কুকদের লঙ্গরখানায় ভাত প্রদানের জন্ত।”

—“অপরাধ স্বীকার করলে ?”

—“হ্যা। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ব্যাটা পাকা বদমাস। আজ দেখলে না, কি ভাবে ম্যানেজ করলে।”

—“কি ম্যানেজ ?”

—“ঐ সম্পত্তির দাম কম্‌সে কম পচিশ হাজার। দশ হাজারে ছাড়তেই পারে না।”

নাসির আমার দিকে মুখ কুঁচকে, চোখ নাচিয়ে জনের বাহাহুরীর আবহাও'টা ফোটাতে চাইলে।

—“কিন্তু সৌদামিনী মালোর সম্পত্তি, আর নীলাম করছে ব্রাদার জন ? এ ব্যাপারটা কী ?”

নাসির তার সাদাচুল মাথা হুলিয়ে চোখের কোণায় হাসি মাখিয়ে জবাব দিলে, “সেটাই উ মজা।”

—“মজা ?”

—“শোনো। সে অনেক কথা। ব্রাদার জনের মত চিহ্নকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক বয়ান প্রয়োজন।”

—“তা বয়ান করো।”

—“বেলার দিকে খেয়াল আছে ? খেয়েদেয়ে এসো সন্ধ্যায় আমার বাড়ী, তখন সব বলব, ব্রাদার জন-সৌদামিনী মালো উপাখ্যান।”

—“না, অত দেরী করতে পারব না। খেয়ে একটু জিরিয়েই বিকেলে আসছি। বিকেলের চা তোমার ওখানেই খাব।”

—“বেশ!”

কথায় কথায় আমরা রাস্তায় এসে পড়েছি। উংরাই শেষ হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালাতে লাগলুম।

## ২

“জানো সাজ্জাদ, ভাবছি, কোথা থেকে আরম্ভ করব ? ব্যাপারটা বেশ জটিল। নাসির মোল্লা এখন বুড়া হয়ে এসেছে, বলতেই পারো। তাই ভয় পাচ্ছে। তবে শুরু করতে হয়।

সৌদামিনী মালো নবীগঞ্জের অধিবাসিনী। নবীগঞ্জে যে ব্যাপটিস্ট মিশন আছে, তারই কাছাকাছি। তুমি ঐ অঞ্চলে কতদিন সার্কেল অফিসার ছিলে, জায়গাটা ত চেনোই। অবশি তখন ওখানে মিশনের পাত্রী ছিল ফাদার জনসন। লোকটা ভালই। এদের আবার ভাল মন্দ কী? বৃটিশ রাজত্বের ভিৎ পাকা করতে এদের এখানে সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হতো, যেন দরকার মত outpost—আউটপোস্টের কাজ করতে পারে। গরীব দেশে এখানে-ওখানে ছুঁচারণে দাতব্য ডিসপেন্সারী, কি এক আধটা স্কুল চালায়। লোকে ভাবে, আহা কি সব দয়ার প্রাণ! বৃটিশরা ভালই জানত, The nearest way to poor man's heart is down their throat—ইংরেজেরই প্রবাদ। ব্যাটারী এই ভাবে কিছু কিছু খ্রীষ্টানও বানায়। তারা ত ইংরেজের খয়ের খাঁ ব'নে বেত। বলতে পারো ইংরেজ বাহাদুর এমন ভাবে কিছু দেশী বাচ্চা পয়সা করত। নদীয়ার কাছে ত কত মুসলমানকে ওরা খ্রীষ্টান করে ফেলে। পড়েছ নজরুলের ‘স্বত্ব-সুধা?’ আসলে এরা কেউ ধীমুখের ভৃত্য নয়, এরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভৃত্য। ই্যা, কোথা থেকে

কোথা এসে পড়লাম। একটু ধৈর্য ধরে শোনো। বুদ্ধকালে ভাল রাখা দায়।  
কথায় কথায় অনেক দূর চলে গেছি।

হ্যাঁ, সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো ছিল পেশায় আরদালি। কিন্তু বেজায়  
তুখোড় লোক। প্রভুর মন যুগিয়ে চলার শিল্প সে রপ্ত করেছিল। বে-কোন  
অফিসারকেই খুশি করার পন্থা আবিষ্কারে দক্ষ জগদীশ মালো। ফলে, কলা-মূল্যে  
ভালই পেত। বখশিসে মোটা পেট এমন আরদালি তুমি ছ'টি খুঁজে বের করতে  
পারবে না। আমি অবিদ্রি তাকে দেখিনি। আমারও শোনা কথা। তখন  
সস্তার বাজার। পুরা বেতন বাঁচত, তার উপর উপরি ইনকাম। আর সে ত  
মিশরের সম্রাট হতে চায়নি। চেয়েছিল, গ্রামে ছ'চার বিঘে জমি-জিরেৎ, একটু  
অনটন-মুক্ত দিন-বাপন। পনের বিশ বছরের চাহুরীতে জগদীশ তা পুষিয়ে নিলে।  
কিন্তু বেচারার একটা বেশ দুঃখ ছিল। ছেলেপুলে নেই। এখন না হয় 'জমিন  
আবাদ, বাচ্চা বাদ' ধুয়া গুনছো। ক' বছর আগে কে আর এসব নিয়ে মাথা  
ঘামাতো? জগদীশের, মোদ্দা কথা, ছেলেপুলে হয় নি। সে-যুগে কে বন্ধা, তা ত  
আর ঠিক করা যেত না—গেলেও, গাঁয়ে এসব রেওয়াজ ছিল না। সৌদামিনীর  
স্বামী স্থির করলে, আর একটা বিয়েই যুক্তিযুক্ত। অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক।  
বংশ ত গুম্ব করে দেওয়া চলে না? কিন্তু বেচারি বর সাজার অবসর পায়নি।  
হঠাৎ মরে গেল। অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক। তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে  
গেছে। কু-লোকেরা রটিয়ে দিলে সৌদামিনী তাকে বিষ খাইয়েছে। বংশ-রক্ষা  
হোক, কিন্তু অপরের সম্মানে নয়। সৌদামিনী ভেতরে ভেতরে হয়ত এমন  
একটা দুর্জয় পণ করে বসেছিল। এসব খোদাকেই মালুম। এইসব ক্ষেত্রে কোন  
মেয়ে কী করে, বোঝা দায়। কিন্তু তুমি বলছ, স্বামীকে হত্যা করবে না—তা  
অস্বাভাবিক মূশকিল? মূশকিল কিছুই নয়। এমন হতে ত পারে। আমিও  
বলছি, গুজবের কথা। কারণ, এসব নিয়ে আর কোন তদারক হয়নি। এখন  
সৌদামিনীর বয়স চল্লিশ পার। জগদীশ পঞ্চাশের সামান্য এদিক কী ওদিক। হয়ত  
ঘোবনের খাই নেই, তবু সতীন বা সতীনের ছেলে আসবে—তা সৌদামিনী মনের  
সঙ্গে মেলাতে পারে নি। অতএব দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্ত গোয়াল আচ্ছা। আমিও  
বলছি, অস্বাভাবিক মূশকিল। যাক, ও-পাট চুকল। সৌদামিনী তখন একা।  
কিন্তু সেও হ'শিরার মেয়ে। আর রব-দব ছিল জোর। তখনও দেহ আছে, তার  
উপর সম্পত্তি। গ্রামের দু-চার জন ছুঁচোর মত হয়ত হোঁ-হোঁ ঘুরঘুর করছিল।  
কিন্তু সৌদামিনী গোপনেও জগদীশেরই বোঁ হোয়ে থাকল! অপবাদ কেউ দিতে

পারবে না। অবিশি জগদীশ একটা কাজ করে যেতে পারত। কোন আত্মীয়ের নামে সম্পত্তি লিখেপড়ে সৌদামিনীকে জীবন-স্বস্তের অধিকারী করে দিত। কিন্তু তা হওয়ার যো ছিল না। ওর নিকট আত্মীয় ছিল জের্ততেতো দাদা। সে স্বদেশী করত। জগদীশ সরকারের পেয়ারা লোক। অল্প দিকে স্বদেশীবাবু। সাপে নেউলে আর কি দিয়ে বন্ধু হবে? এসব কথা তোমাকে শোনানি, তাহলে সব বুঝতে পারবে। জগদীশ ত মরল। কিন্তু জের কাটল না। বিধবার সম্পত্তির দিকে ঐ আত্মীয়ের লোভ সহজে কী মেটে? অবিশি আট দশ বছর এইভাবে কেটে গেছে। স্বদেশীবাবুর নাম মনোরঞ্জন মালো। তার বয়েস হয়ে গিয়েছিল। ছেলেপুলে আছে। জেল্টেলে খেটে গ্রামে ফিরে সে নামে স্বদেশীবাবু রইল। সাদা টুপিটা পকেটে গুঁজে অথবা দরকার হলে মাথায় দিয়ে সেও মন দিলে সংসার গোছাতে। গ্রাম্য দলাদলির মধ্যে মাথা গলানো এবং তৎ-মণ্ডকায় ছুঁচার পয়সার দালালী বা টল্লিগিরির কমিশনে একটা আয়ের পথ ত খোলা যায়। এক কথায় স্বদেশীবাবুর স্ত্রুতা তার টুপির মধ্যেই নিবন্ধ রইল। পাশাপাশি বাড়ী। স্ত্রুতাং বিধবা বৌদির দিকে নজর পড়া স্বাভাবিক। ভুল বললাম, বৌদি নয় সম্পত্তির দিকে। কিন্তু সৌদামিনীর শরীর গৌর আর মুখ সুন্দর হলেও, কঠোর হওয়ার যথেষ্ট তেজ ছিল। অবরে-সবরে এই মানুষ আবার হীরার চেয়ে শক্ত হতে পারে, যত রুগড়া ত সেইখানে। নচেৎ মনোরঞ্জন মালো কবে দুর্গ ফতে করে ফেলত। স্বদেশীবাবু প্রথম প্রথম কতকগুলো স্ট্যাটেজি—পায়তারা কবে নিলে। একদিন হয়ত সকালে দেখা গেল, সৌদামিনীর কলা-বাগান থেকে কয়েক কাঁদি পাকা ফল গায়েব। কিছু চারা গাছ মাড়ানো। কিন্তু বিধবা পাড়া-পড়শীদের খুব মিষ্ট ভাষায় ব্যাপারটা জানিয়ে এলো। আর কিছু না। তারপর মাঝে মাঝে রাত্রে সে বন্ধুক ছুঁড়ত। কমিশনার সাহেব জগদীশকে নিজের বন্ধুক দিয়ে গিয়েছিল বখশিসরূপে। অস্ত্রখানা এখনও সৌদামিনীর কাছে আছে। তা ছাড়া তার তাকু আশ্চর্ষ। বাড়ীর উঠানে চিল ঢুকতে সাহস পায় না। মনোরঞ্জন মালো ফেল মারলে। বৌদির চেহারা সুন্দর, কিন্তু তেজ তেমনি অপর্ষাপ্ত। অবিশি সৌদামিনীর কয়েকটা হাতের লোক ছিল। তার জমিনের চাষী, কয়েকজন। তারা বলত, “মায়ের অঙ্গে প্রতিপালিত, মার ত অপমান হতে দিতে পারি নে।” স্বদেশীবাবুর সেও একটা ভয়। ছোটলোকগুলো কখন কী করে বসে, বলা যায় না। আর সৌদামিনীর অন্তর ছিল। বিপদে-আপদে সে বহু মানুষকেই সাহায্য করত। বেড়ার মধ্যে গেরছর মুর্গা দেখলে জিভে জল-সরা শেয়াল যেমন ঘন ঘন ডাকায় আর লোভের

চোটে ছটফট করে, মনোরঞ্জন মালো সেই রকম অবস্থায় নতুন পায়তারা ভাঁজতে লাগল। কী করা যায়, কী করা যায়। অবিশ্রি সময়ও এদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, তা মনে রেখো। বছর যাচ্ছে, বছর আসছে। সৌদামিনীর চুল ক্রমশ শন, দেহে প্রৌঢ়ত্বের রেখা। কিন্তু আদাওতি ঠিক চলছে। সৌদামিনী বনাম স্বদেশীবাবু……

ঠিক এই পর্যায়ে দেখা দিল ব্রাদার জন। সে ত পরকালের চেয়ে ইহকালের খবর ঢের বেশী রাখে। তারপর মিশনের অবস্থা ভাল নয়। যুরোপে মহাযুদ্ধ বেধেছিল। ফলে ডোনাস'রা আর খাত-মত টাকা পাঠায় না বা হার দিয়েছে কমিয়ে। সুতরাং আয় বৃদ্ধির উপায় একটা করতে হয়। ব্রাদার জন এলাকার খবর জানত। স্বদেশীবাবুর সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কারণ বাবু এলাকার সবচেয়ে ভাল ইংরেজী কইয়ে-বলিয়ে। ভাষা মারফৎ একটা অদৃশ্য যোগসূত্র গড়ে ওঠে। অবিশ্রি তখনও পাত্রীর ভূমিকা তত প্রকট হয়নি। আর বাবুর সঙ্গে কি কথাবার্তা হোত, তা খোদাকেই মালুম।

কিন্তু সৌদামিনী সকলের মুখে ছাই দিয়ে বসল।

ব্যাপারটা বলছি। সৌদামিনী মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আট দশ বিগ মাইল দূরে তার মাতৃকুলের কিছু ভাই-বোন কুটুম আছে। এক জায়গায় থেকে থেকে মাহুষের প্রাণ তো হাঁপিয়ে ওঠে। সৌদামিনী এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, ওরা রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এবার স্নে শুধু বেড়িয়ে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো একটা বছর ছয়েকের শিশু। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে আনা। পোস্তপুত্র রাখবে সৌদামিনী। পোস্তপুত্র! সম্পত্তির দিকে যারা চোখ রাখছিল, তারা এবার আকাশের দিকে চোখ তুললে। সম্পত্তির নতুন মালিক জুটে গেছে। আর শুধু মালিক নয়, চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারী। সৌদামিনী তাকে মাহুষ করে তুলতে নিজের সামান্যতম আরাম পর্যন্ত বিলিয়ে দিলে। এবার সৌদামিনী জননী, যেন সত্ত্ব আঁতুড়-বর-ছাড়া। চব্বিশ প্রহর চোখে চোখে রাখতে লাগল ছেলেটাকে। নাম রাখলে হরিদাস। হরিদাস বেড়ে উঠতে লাগল। চেহারাটা কর্কা, বেশ খাড়া নাক। আর চোখ দুটো ঝিলিকে ঠাসা। সৌদামিনী, হরিদাসের মধ্যে জীবনের সমস্ত পূর্ণতার একটা প্রতীক খুঁজে পেলে যেন। বেশী বাইরে যেতে দিত না তাকে। কারণ, পাড়াপড়শীর চক্ষুশূল। ওর জন্তে আলাদা একটা শিক্ষকই রেখে দিলে বাড়ী এসে পড়িয়ে যাওয়ার জন্তে। আরো ন' দশ বছর এইভাবে কেটে গেল। সৌদামিনীর অবিশ্রি চুল পেকে গেছে। চেহারা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার মুখাবয়বে একটা পরিভূঙ্গির

আজা ছিল। সেই মুখের দিকে তাকালে তোমার চোখ খুঁজে পাবে স্নিগ্ধতা, দয়া-  
সম্ভাভ এক রকমের তাপহর স্পর্শ। অবিশ্রিত স্বদেশীবাবুও বসে নেই। তারও বয়েস  
বাড়ছে। আর তৎসঙ্গে সংসার। অর্থাৎ সর্বরকমের বোঝা। সম্পত্তির দিকে  
চাইলে এখন চোখ পুড়ে যায়। নতুন গেরো এসে জুটেছে। হরিদাসের বয়স বারো।  
একটা মেয়েমানুষের কাছে হেরে যাবে মনোরঞ্জন মালো? আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের  
একটা বরকন্দাজের উপপত্নীর (হোক বৌদি) কাছে? একটা কিছু করতে হয়।  
ব্রাহ্মণ জনের মিশন চলছে না ঠিকমত! তারও কিছু রুজি-রোজগার প্রয়োজন।  
একদিন শুদিকে গেলে কিছু একটা যুক্তি করা যায়। স্বদেশীবাবু মনে মনে এসব  
লক্ষ্যভাগ করেছিল নিশ্চয়। ...আঁচ করতে পারো, সাজ্জাদ!...ই্যা, জ্ঞাতিশত্রু বড়  
শত্রু। মনোরঞ্জন মালো এবার একটা বোমা ফাটালে, স্বদেশী আমলে সন্ত্রাসবাদীদের  
সঙ্গে থেকেও যা সে করতে সাহস পায়নি।

সে গ্রামময় প্রচার করে দিলে, সৌদামিনীর পোষাপুত্র জাতে নমশূত্র নয়,  
ব্রাহ্মণ। ব্যাপারটা তলিয়ে চাখো। কী ভয়ানক শাস্ত্র-বিরুদ্ধ পাপকর্ম। ব্রাহ্মণের  
জাত মেরেছে এক শূত্রাণী! রাম, রাম। স্বদেশীবাবু এই টিলে পাখীকে কাৎ করে  
ছাড়লে। আগে শত্রুতা বা ঙ্গা যা বলো, ছিল ব্যক্তিগত। এবার তা সমাজগত  
ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। গ্রামে দু-চার ঘর ব্রাহ্মণ কায়েত মাহিষ্য ছিল, তারা দাঁতে  
আঙুল কাটলে। ছি ছি, এমন কথা কে কোনদিন শুনেছে। যাদের বয়েস  
বেশী, তারা মস্তব্য করলে: কলিকাল। সৌদামিনীকে গ্রাম-সমাজের কাঠগড়ায়  
দাঁড়াতে হোলো—সে বেশ জোর দিয়ে হলপ করে বললে, হরিদাস শূত্র—তার দূর  
সম্পর্কীয় এক গরীব আত্মীয়ের ছেলে। পরিস্থিতি আপাততঃ এখানে চুকলো।  
কিন্তু সৌদামিনীর বিরুদ্ধে ত মনোরঞ্জন মালো একা নয়। আরো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির  
আছে। স্ততরাং গ্রামের অটল নিরুমা প্রহর তারা সহজে যেতে দিলে না। খোঁজ  
নিয়েই দেখা যাক। যদিও বিশ মাইল দূরে, কিছু রাহা-খরচ যাবে, যাক। আহা,  
ভগবান যাক ডাক দেয় সে ত হেঁটে হেঁটে বারাণসী চলে যায় তীর্থ করতে। এই  
দশ ক্রোশ পথ আর তারা সামাল দিতে পারবে না? বোঝা গেল. শুদের সেবার  
ভগবান ডাক দিয়েছিল। একজন দেব-উৎসর্গীত প্রাণ বারোয়ারী রাহা খরচে  
সৌদামিনীর সেই আত্মীয়-বাড়ী থেকে খোঁজ নিয়ে কিরল। বাজি মাং। মজ্জুর  
ব্যক্তির কোন ছেলেই নেই। সব মেয়ে। সৌদামিনী বুট বলেছে, মিথ্যাবাদিনী।  
সমস্ত গ্রাম তোলপাড়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ছিল, সেটা যুধিষ্ঠিরের দল থামাতে  
চায়, নচেৎ কল ত ভেঙে যেতে পারে। সৌদামিনী এবার বেশ রোয়াবের সঙ্গে



জবাব দিলে। কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করলে না। সমস্ত গ্রাম তার বিরুদ্ধে। আর জুলুম শুরু হলো। তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না, দুখেলা দুটো গাই হারিয়ে গেলো। এমন ছোট-খাট নিত্য নির্ধাতন। একদিন ব্রাদার জন এই সময় গ্রামে এলো। ইহকালের খবর সে পরকালের চেয়ে কম রাখে না, আগেই বলেছি। ব্রাদার জন ব্যাপারটা শুনে গ্রামবাসীদের মিটিয়ে ফেলতে বললে ব্যাপারটা, সৌদামিনীর সামনেই। একটা ছেলে মাহুষ করছে...মাহুষ...‘সে শূদ্র আছে না কায়ৎ আছে গড্ এসব দেখিতে বারন করিয়াছে’—এই জাতীয় নানা বাণী ছাডলে। সৌদামিনী কঁাদতে কঁাদতে ব্রাদার জনকে উকীল পাকড়ালে একটা মিটমাটের জঞ্জো। মনোরঞ্জন মালোর সঙ্গেও এক পাশে চুপি চুপি কী কথা হলো তা ব্রাদার জনের গডই জানে। বিষয় নিষ্পত্তি প্রয়োজন। কিন্তু মনোরঞ্জন মালো ত সম্পত্তি-নিষ্পত্তি চায়। ব্রাদার জন বললে, দু-দিন সবুর করো, আমি ফয়সালা করিয়া দিবে। আর মনে রেখো, সৌদামিনী এখন কোণঠাসা। এই হুগায় তার চুল শন হয়ে গেছে। আগে ত বুড়ি মনে হোত না, এখন ত শ্মশান-যাত্রীর সামিল ধরে নিতে পারো। যারা এই অবস্থায় ওকে দেখেছিল, তাদের কাছেই শুনেছি। হরিদাস আর বাড়ীর বাইরে যেতো না। যেতে চাইলে কেঁদেকেটে বাধা দিত। চতুর্দিকে ঘোলাটে আবহাওয়া। ব্রাদার জন এই গ্রামে আসে কিন্তু সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করে না। শেষে কয়েকজন মরীয়া ধর্মপুত্র ত একদিন সৌদামিনীর বাড়ী হামলা করে বসলো। কিছু শাস্ত প্রকৃতির বুড়ো মাহুষ এই ঈশ্বরপ্রাপ ব্যক্তিদের খামালে। কিন্তু সৌদামিনী বাপের বেটা, বাঘের দুধ খেয়েই বোধহয় মাহুষ—বেয়িয়ে এলো একদম নিরস্ত্র, যদিও বাড়ীতে বন্দুক আছে। কিন্তু জনতার সামনে সে এবার বোমা ফাটালে। বোমাও বোধহয় এত শব্দ তুলতে পারত না। সৌদামিনী চোখ থেকে শিবের মত আগুন ছড়িয়েই বললে কি বললে, শোনো। তার কথাটাই মুঞ্জবানি পেশ করতে হয়। সৌদামিনীর উপর তখন যেন কিছু ভর করেছিল।

...শোন অভাগীর ব্যাটারী, ধম্পুস্তুর যুধিষ্ঠির দল—আমার হরিদাস শূদ্রও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। শোন, কী। তোরা ত জানিস, আমি বছরে দু-বার আত্মীয়বাড়ী যাই। তখন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, একদম পুরো কোটাল। গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার দু-হাজার লোক মরছে হুগায়। আমি ফিরছিলাম হরিশচক থেকে... আলোক ডাঙার কাছাকাছি আসতে বেহারাদের তেষ্ঠা লাগল। একটা আমগাছের তলায় পাকী রেখে ওরা গেল জল খেতে। পুকুর আছে বিবে দুই জমি দূরে। আমার সামনে আবার একটা ধান ক্ষেত। ধান শেকে গেছে। আর পনের দিন বাঁচলে কত লোক বেঁচে যেত নিজে

ক্ষেতের চাল খেয়ে। কিন্তু তা আর হলো কৈ। হঠাৎ ধানক্ষেত থেকে শিশুর কান্না আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, একজন লোক জমিন আঁকড়ে মরে পড়ে আছে। মুখে দাড়ি। তাব পাশে একটা মরা মেয়ে। তার পাশে একটা ছেলে। বসে মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে থেকে থেকে, আবার উঠে বসছে। কিন্তু সে-ও চিঁচিঁ করছে, ধুকছে। ছেলেটার পানে চাইতে আমার দিকে হাত বাড়ালে। চোখের চাওয়া কী করণ! আমিও অজানিতে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বছর তিনেকের ছেলে; কিন্তু অনাহারে-অনাহারে দেড় বছরের বেশী দেখায় না। কোলে তুলে নিলাম...নিয়ে এলাম...পান্থীর ভেতর লুকিয়ে রাখলাম...আশিম খাই, সঙ্গে দুধ ছিল...দুধ দিতে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। বেহারারা টের পেলে না। এক আত্মীয়ের কাছে তিন মাসের জন্ত রেখে এলুম দু'শ টাকা দিয়ে। ভাল খাওয়া দাওয়ায় ছেলেটা বেশ তাজা হয়ে উঠল। তারপর নিয়ে এলাম। গুর আসল বাবা, লুঙ্গি-পরা দাড়ীওয়ালা সেই মুসলমান চাষী। আমার হরিদাস মুসলমান...

ঘেন বাজ পড়ল উপস্থিত জনতার উপর। বেশ কাটল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু সৌদামিনীকে কেউ একটা উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেলো না। তামাসা দেখতে দু-চার জন মুসলমান পর্যন্ত জুটেছিল। এখন ব্যাপার অল্পদিকে গড়াতে পারে। ধর্মপুত্রেরা ঘে-বার মানে মানে বাড়ী ফিরলে। বুঝলে, আর গোলমাল বিবেয় নয়। ব্যাপার আরো খিতিয়ে থাক, তখন দেখা যাবে। স্বদেশীবাবু অন্তত তাই ভেবেছিল। তাই ভেগেছিল।

সেই রাত্রে হরিদাস বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল। সৌদামিনী ব্রাদার জন-কে ডাকিয়ে আনলে এক হস্তা অপেক্ষার পর। সে খ্রীষ্টান হবে। ব্রাদার জন প্রথমে বারণ করলে, উপদেশ দিলে, ধর্মত্যাগ ভাল নয়। শোনা কথা বলছি। ধরে নাও তা হতেও পারে। নৌকা ঠেলে দিয়ে বিয়াইকে 'আজ থাকলে হতো' বলার মত!

সৌদামিনী খ্রীষ্টান হয়ে গেল। তিন চার দিনের মধ্যে তার সমস্ত সম্পত্তি মিশনের নামে লিখে পড়ে দিলে পর্যন্ত। নিজে উঠে গেল মিশনের বাড়ীতে।

কিন্তু সাজ্জাদ, বুড়া গাছ উপড়ে অল্প জায়গায় পুঁতলে কি আর শিকড় গজাবে? কিসের যীশুখৃষ্ট আর বটবৃক্ষ—। সৌদামিনী এক মাসের মধ্যে পাগল হয়ে গেল। বদলী হওয়ার আগে এক সিন্টারের মুখে শুনেছিলাম, সৌদামিনী প্রায় কাঁদত আর চীৎকার দিত: আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল—! হে যীশু, ও হরি, হে অন্না, আমার হরিদাসকে ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে!

আজই জানতে পারলাম, এতদিনে হতভাগিনীর হাড় জুড়িয়েছে!





চামড়ার মোটা ব্যাগ হাতে ছলিয়ে ভদ্রলোক ওদিকের গাড়িগুলির কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। অনেকগুলো ঝাঁটাঝাঁটি করেও পছন্দ হচ্ছে না। ব্যাগ খুলে টাকা গুণে দিলেই হয়, কিন্তু কিনবেন কিনা তাই ভাবছেন। কপালের ওপর ভাঁজ পড়েছে গোটা কয়েক। সেল্‌স গার্লটিও চেয়ে আছে মুখের দিকে, তাই কিছু বলতে গেলেন—

‘আচ্ছা এটা, এটাও কি কিকস্টার্ট নাকি?’

‘ও ইয়েস, এটাও কিকস্টার্ট। গীয়ার পায়ে, ব্রেক পায়ে। কিকস্টার্টে বরং সুবিধে, স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বুঝতে পারবেন গাড়িটা স্টার্ট হল কিনা।

‘ইয়ে—স্পীড কত?’

‘অ্যাবাউট ফিফটি মাইলস পার আওয়ার। সিংগেল মেসিন একটা হোগায় ফিফটি মাইলস কম নয়।’

‘ডাবল মেসিন...’

মেয়েটি লুফে নিল কথা, ‘ই্যা ই্যা, তাও আছে। আহ্ন ওই দিকটার’—

ক্রতপায়ে মেয়েটি এগিয়ে গেল কোণাকুণি। কাঁধ থেকে পাতলা কারুকার্যময় তাঁতের শাড়ি খসে পড়ে অর্ধ অনাবৃত বাহু প্রকাশ করে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মুখে সৌজন্তের হাসি। বৃকের ওপরে পড়ন্ত শাড়িটা ধরে ফেলেছে। তুলে দিল।

‘এগুলো হচ্ছে ডাবল মেসিন। সেল্‌ফ স্টার্ট। ইঞ্জি অ্যাণ্ড স্মুদ গোল্ডিং। আপনি বুঝতে পারবেন না হোগা চালাচ্ছেন, মনে হবে গাড়ি চালাচ্ছেন।’

অনেকক্ষণ বলে খামল মেয়েটি। দেখান শেষ হয়েছে। ভদ্রলোক ইতস্তস্ত করছেন। মনে ধরেছে বোধহয় কথাগুলো। চেয়ে আছে, ভদ্রলোকের মুখে আগের সেই অনিচ্ছা নেই। চোখাচোখি হল।

‘আমি ডাবল মেসিনই একটা কিনব। স্তনছি এগুলো ট্রাবল দেয় না, আপনিও সেকথা বললেন। সেল্ফ স্টার্টও সুবিধের মনে হচ্ছে।’

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় টেবিলে বসে থাকা একটা লোকের কাছে এগিয়ে গেল মেয়েটি।—‘একটা ক্যাশ মেমো করুন মিস্টার মল্লিক।’

ভদ্রলোক ব্যাগ খুললেন, টাকা গুনলেন, মেমো হাতে নিয়ে ব্যাগে পুরলেন। ‘দেখুন, ডেলিভারী আমি আজ নেব না, সোমবারে নেব।’

‘ঠিক আছে।’

মেয়েটা একটা কাগজে সোল্ড লিখে হোণ্ডার গায়ে লটকিয়ে এল : দুটো বেজেছে। দোকান বন্ধ হবে। আজ শনিবার তাই দুটো পর্যন্ত দোকান খোলা। অন্তান্ত কর্মচারীরা এখনো যায়নি। মল্লিক এবং জেমমিন একসঙ্গে ফুটপাতে নামল।

সামনে একটা স্টেশনারী দোকানে ঢুকল তারা।

‘এখানে কি দরকার?’ মল্লিক জানতে চাইল।

‘কিছু কেনাকাটার আছে।’

কিছুদূর এগিয়ে একটা বইয়ের দোকান। দোকানটার সামনে এসে হেসে মেয়েটা বলল, ‘এক মিনিট মল্লিক।।...শেষের কবিতা আছে?’

‘আমার দোকানে দুটো শেষের কবিতা আছে। আপনি কোনটা চাইছেন?’

‘আমি রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা চাই।’

‘আছে। এই নিন।’

‘নজরুলের অগ্নিবীণা দিন একটা।’

‘এই নিন।’

‘আর কি আছে, ভালো?’

এত বই নিতে দেখে মল্লিক বলল, ‘এত বই কেন?’

‘আছে, এ কেন-র উত্তর কাল পাবে।’

‘কাল কেন?’

‘ই্যা, কাল। চল।’

‘বইয়ের দাম?’

‘দিয়েছি। চল।’

খানিকটা পথ এগিয়ে মল্লিক বলল, ‘এগুলো বুঝি আমার কালকের জন্মদিনের উপহার?’

জেসমিন মাথা নেড়ে হাসল। এসো পেটল পাশ্পের কাছে এসে উভয়ে বিদায় সন্ধ্যা জানাল। ধীরে ধীরে গলিটা ধরে হেঁটে চলল মল্লিক। ওদিকে আগামী-কালের প্রতীক্ষায় খুশিমনে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছিল জেসমিন। গলিটার শেষ বাড়ীটা পাশ কাটিয়ে স্থপার মার্কেটের কাছে বড় রাস্তার ওপর মাথা তুলেছে। নাতি-প্রশস্ত গলিমধ্যে গরম বাতাসের ধীরস্থির আনাগোনা। মাথার ওপরে চনচনে রোদ। জেসমিনের সঙ্গে মেসার্স আহমদ কোং-এই পরিচয়। মেয়েটা গোড়ার দিকেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কেউ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুক বা কারো দৃষ্টি তার ওপর পড়ুক এটা সে চায় না। তবু তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর একটি বছরের মধ্যে হঠাতা ছাড়িয়ে হৃদয়ের কাছাকাছি। অফিস-ফেরত লোক ভর্তি গলিতেই হেসে উঠল মল্লিক। কেন লোকে হৃদয়ের কাছে আসে, কাছে আসতে চায়? বাড়ির দরজায় পৌঁছল। ক্লান্ত বিমুখ পা টেনে টেনে হিটড়ে উপরে উঠল। পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল। ঘরে ঢুকেই ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। খবটাকে মনে হচ্ছে বাড়ি বদলে এইমাত্র নতুন এক ঘরে এসে দালপত্তর নামিয়ে রাখা হয়েছে। সব বিশৃঙ্খল।

দাট-প্যাণ্ট গেঞ্জি খুলে ঘরের দড়ির আলনায় ঝুলিয়ে দিল। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অর্ধনগ্ন অবস্থায় শুয়ে শুয়ে নিমগ্ন হলো ভাবনায়। নগ্নতার প্রতি মল্লিকের কোনোপ্রকার বিদ্রোহ নেই। দেহের প্রতিটি ভঙ্গির পরিমাণে মাহুব যে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার প্রমাণ হয়ে যেত, মল্লিক একথা বিশ্বাস করে। নারী যে প্রকৃতির রহস্য এবং নারী-দেহ একাধারে সৌন্দর্য ও বেটপ দেহ গড়নের মূর্ত প্রতীক তাও আর কারোকে বুঝিয়ে বলতে হত না।

বিছানা ছেড়ে উঠে জামা আর পায়ে পরবার স্পঞ্জ জোড়া নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। সকালে একবার স্নান করে অফিসে গিয়েছে। রোদে হেঁটে এসে ঠাণ্ডা হবার জন্তে এখন একবার স্নান করা আবশ্যিক। শাওয়ারের চাবিটা ঘুরিয়ে দিল। রোদে টাংক গরম হয়ে জলটা ত নিশ্চয় আগুনের মত হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় ফিরে স্নান করতে গিয়ে দেখেছিল জল তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। কিন্তু কই, মাথায় যে এখনো জলস্পর্শ নেই। চাবিটা আর একটু ঘুরিয়ে দিল। এবারও না। এ সময়ে জল না থাকার দরুন মল্লিক ওয়াসার ওপর বিরক্ত হল।

সন্ধ্যার আগে নতুন জলে স্নান করে সামনের পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসল। এখানে ওখানে ছেলেমেয়ে খেলছে। মল্লিকের ঠিক সামনে দিয়ে একটি যুবতী প্যারাম্বুলেটরে বাচ্চা ঠেলে নিয়ে গেল। দৃশ্যটি দেখে আগাগোড়া জলে উঠল

মল্লিক। নতুন মা হয়েছে বোধ হয় মেয়েটা। বিরক্তিতে ভুরু দুটো এক হয়ে এলো।

পার্ক ছেড়ে বাইরে এলো। থমকতে হল। পুরো রাস্তা জুড়ে এক পাল ছাগল ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা লোক। উর্ধ্বশ্বাসে কয়েকটা ছাগল মল্লিকের আশপাশ দিয়ে দৌড়ে পার্কে ঢুক পড়ল। একটা লোক গিয়ে গুলিকে তাড়িয়ে বার করে আনলো। অনিচ্ছাসঙ্গেও মল্লিক একবার ছাগলগুলি যেদিকে ছুটছিল সেইদিকে তাকাল। মনে পড়ল ওদিকে আধ মাইল পরে কসাইখানা। ছাগলগুলো নিয়ে এখন জবাই করবে। জবাই করে একবার ঝুঞ্জিয়ে দিলেই প্রতি সের সাড়ে তিন টাকা।

বাসায় ফিরে এল। আর একটু পরে একেবারে কোন হোটেলের খেয়ে এলেই চলত। ক্ষিদে নেই। শুয় পড়ল দুপুরের এলোমেলো বিছানাতেই। খানিকক্ষণ আশেপাশে দু' একটা মশার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনলো। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল খুব সকালে। পার্কটাতে গিয়ে একবার ঘুরে এলো। আকাশ তখন পরিষ্কার হচ্ছে। রোজই এ সময় দুটো ফ্ল্যাট পরেরই একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। মেয়েটিও পার্কে বেড়াতে আসে। আজো এসেছিল। মিষ্টি করে একবার হেসেছেও। ঘরে এসে মল্লিকের খারাপ লাগল। আজ তার জন্মদিন। জেসমিনই একদিন জেরা করে জেনে নিয়েছিল। মেয়েটিকেও আসতে বললে হত। কথা হয়নি যদিও, এই ফাঁকে কথাও হত।

ঘরটা গুলিয়ে ফেলল জরত হাতে। গোছানো শেষ হলে একটা চেয়ার টেনে জানালার ধারে বসল। আপাতত করবার কিছু নেই। মন্থর গতিতে সময় চলছে।

দরজায় টোকা পড়ছে। দরজার দিকে চাইল মল্লিক। সব ন'টা। এ সময় কে আসতে পারে। মল্লিকের বন্ধু নেই, বন্ধু তার কাম্য নয়। আবার টোকা পড়ল। বসে থেকেই গলা চড়িয়ে বললে, 'ভিতরে এসো।'

বলার পর যে ঘরে ঢুকল তাকে ও এমনভাবে দেখবে আশা করেনি। জেসমিন রক্তরং শাড়িতে সজ্জিত। গৌরী দেহের ওপর আলতা রং ছায়ায় জেসমিন যেন অপরাধী! ঘন কুন্তলের প্রশস্ত সিঁথির ছায়াম্রিত ললাটে কুমকুমের টিপ। চোখের কোণায় কাজলটানা। হাতে রক্ত গোলাপের একটি তোড়া এবং উপহার। বিস্মিত নেত্র মল্লিক চেয়ে রইল।

এগিয়ে এসে হাতের বস্ত্রগুলি টেবিলের ওপর রাখল। তারপর মল্লিকের কাছে এগিয়ে এল। তোড়াটি বাড়িয়ে ধরল সামনে, 'নাও।'

বিস্ময়াহত মল্লিক তোড়াটি নিল। জেসমিন য়ুহু ঝংকার তুলে হাসল। জানালা খুলিয়ে আসা। পূর্বের সূর্যের আলো গুর ঝকঝকে দাঁতের ওপর শিড়ে সোনালী দেখাল। জানালার ক্রেমে নিতম্বের ভর রেখে ঘুরে দাঁড়াল জেসমিন। ‘একটু আগেই এলাম। আজ তোমার জন্মদিন, আজও সময় ধরে এলে চলবে কেন? কই তোমার নিমস্ত্রিতেরা কেউ আসেনি?’

‘না।’

‘তারা ঠিক দশটার পর আসবে।’ জেসমিন হাসল, উঁচু বৃক্কে হাসির ছন্দে কয়েকটা টেউ ছলল—‘বংগালী তো, দেখবে সবাই এসে পৌঁছতে এগোরোটা বেজে গিয়েছে।’

থামল। চোখ বুলিয়ে ঘরটা দেখল। মল্লিকের ওপব এসে দৃষ্টি থামল। যাক, তবে সত্যি সত্যি সভ্যভব্য হয়েছ। যা হাল করে রাখতে ঘরের। কেমন বরে থাক তুমি এর মধ্যে?’

‘অভ্যেস হয়ে গেছে।’

‘অভ্যেস ফেরাও। এত বলছি তবু শুনবে না। আমি এলে তোমাকে এমন বিশৃঙ্খল ঘরে থাকতে দেব না, সময় পেলে অবশ্য এখনো আমি মাঝে মাঝে এসে ঘরটা গুছিয়ে গাছিয়ে দোব। তুমি ঘরের একটা চাবি দেবে আমাকে।’

হাসছে। বাতাসে ঝাঁচল আর বিলুনী-ত্যক্ত চুলগুলি উডছে। অপমানে ক্ষোভে কালো হয়ে উঠেছে মল্লিকের মুখ।

‘কই কিছু বলছ না।’

‘দেব।’

‘আজই দিও। তুমি আবার ভুলে যাবে।’

‘ভুলব না।’

কিছুক্ষণের নীরবতা। সাড়ে দশটা বেজেছে। গুরা দু’জনে ছাড়া এখনো কেউ আসেনি।

‘কই, এখনো কেউ এলো না যে?’

মল্লিক নিচের রাস্তায় যানবাহন দেখছে। জেসমিনের কথার উত্তর দিল না।

‘শুনতে পাচ্ছ?’

‘বল।’

‘নিমস্ত্রিতেরা কেউ এলো না যে?’

‘আসবে না।’

‘নিমন্ত্রণ করনি বুঝি কাউকে ?’

‘না।’

‘এটা তোমার অস্থায়। বছরে জন্মদিন একটাই আসে, সেদিন সবাইকে নেমস্তত্র করে একসঙ্গে ফুঁতি করবে। তা না করে তুমি চূপচাপ বসে আছ। আগে জানলে আমি তোমার বন্ধুদের নেমস্তত্র করে আনতাম।’

মল্লিক দেখছে। জেসমিন ঘরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। থমকে দাঁড়াল। চোখ গেছে দেয়ালে টাঙ্কানো ফটোর দিকে।

‘এরা কাবা ? এই মহিলা আর তার দুই পার্শ্বে দুজন পুরুষ ? এরা ?’

জেসমিনের দৃষ্টি অস্থির করে মল্লিক ফটোর দিকে তাকাল। ‘মুখটা সহসা যন্ত্রণাক্ত এবং কালো দেখাল।

‘এদেব রুস্তো তোমার ঐ পরিকল্পনা সফল হত না।’

‘কিন্তু এটা কারা ?’

মল্লিক নীরব। দৃষ্টিটা জেসমিনের মুখের ওপর থমকে আছে।

ফটোটা জেসমিন আবার দেখল। মস্তব্য করল, ভদ্রমহিলা বয়সকালে স্নন্দরী ছিলেন। ফটোটা তার কবেকার ?

মল্লিক অপনকে দেখছে। কপোতীর বকের মত বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। নিশ্বানের মুখে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উড়িয়ে দেবে যেন।

আবার দেখল ফটোটা, কিছু একটা আবিষ্কার করল। বিস্ময়স্তরু। ‘এ যে দেখছি তোমার মুখটাই বসানো।’

বার কয়েক ফটো এবং মল্লিক ও মল্লিক এবং ফটোর দিকে দৃষ্টিপাত করল।

‘আমার মুখটা বসানো নয়, ওঁর মুখটাই আমার মুখে বসানো।’

‘এ তো আশ্চর্য !’ জেসমিন উত্তরোত্তর বিস্মিত।

‘আমার মা।’

‘তোমার মা ?’

‘হ্যাঁ, ঐ ভদ্রমহিলা আমার মা।’

নিজের অজ্ঞাতে জেসমিন একবার ফটোটা দেখল। হঠাৎ চমকে উঠল। কিছু অবিশ্বাস ঠেকছে। নিজের অজ্ঞাতেই প্রশ্ন করে বসল, ‘ঐ লোক দুটো ?’

‘আমার বাবা।’

কঠিন রুক্ষ মুখে মল্লিক লক্ষ্য করছে আরেকজনের মুখের পরিবর্তন। কতটা



আঘাত পেল চোখ দুটো দিয়ে তাই দেখছে যেন। জেসমিনের মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছে। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, ‘কি বললে?’

দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল কথাটা মল্লিক। টলছে। পড়ে যাচ্ছিল, মল্লিক ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল। চোখ দুটো মুদে এসেছে।

চোখ মেলল। চেয়ে রইল মল্লিকের মুখের দিকে স্তব্ধ যন্ত্রণাক্ত চোখ মেলে। মল্লিক যেন এইরকম চেয়ে থাকার জবাব দিতে চাইল, ‘তুমি পড়ে যাচ্ছিলে। আমি ধবে ফেলেছি।’

জেসমিনের চোখ দুটো মল্লিকের মুখের ওপর থেকে ফটোর দিকে উঠে গেল। আবার নেবে এসে স্থিবি হল মুখের ওপর। মল্লিক ফটোটা দেখল। জেসমিনের দিকে ঝুঁকে বলল, ফটোটা আমাব জন্মের পর মার দুপাশে পিতৃহয় দাঁড়িয়ে তুলেছিল। আমার বয়স তখন দেড় বছর।

একটা কাতর শব্দ করে বালিশে মুখ গুঁজে দিল জেসমিন। মল্লিক উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল। জেসমিন বিছানা ছেড়ে উঠে মল্লিকের সামনে দাঁড়াল।

‘তুমি তোমার মায়ের জারজ সন্তান একথা আমাকে বলনি কেন?’

মল্লিক সোজা হুঁজি তাকিয়ে রইল জেসমিনের দিকে। জেসমিন রাগে অপমানে জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।—‘ভেবেছিলি জারজ সন্তান হয়ে একটা পবিত্র মেয়েকে বিয়ে করে সমাজে ঐতিষ্ঠিত হবে? মনে কবেছিলি সত্য কথা গোপন করলেই তোমার জন্মের ঐতিহাস কলঙ্কমুক্ত হবে? নিচ্জন্মে হয়ে আমাকে নিয়ে ঘর-সংসার করবে, আর তোমার ছেলেমেয়েবা সমাজের মাহুয় হয়ে জন্মাবে?’

জেসমিন প্রতারিত হবার ক্ষোভে নির্মম হয়ে উঠল।—‘বাসন হয়ে ঠাদে হাত বাড়িয়েছিলি তুমি, তোমার অত লোভ করতে লজ্জা হল না?’

‘জন্মে যদি আমি সত্য হয়ে থাকি, আমার জন্মটাও তবে অসত্য নয়।’

‘ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। জাবজের আবার দেমাক।’

‘জেসমিন।’ সহসা গগনবিদারী চিৎকার করে উঠল মল্লিক।—‘অহম্বোধ আমার বেশী। যা ইচ্ছে তাই বলে তুমি আমাকে অপমান করতে পারবে না। দোষ আমার নয়, আমার জন্মেরও নয়, দোষ যদি কিছু থেকে থাকে তা আমার মার। কিন্তু মাকে আমি দোষী ভাবতে পারি না। মার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, তাই হয়ত—

‘মল্লিক!’ জেসমিন কঠোর কণ্ঠে ডেকে উঠল।

‘আমার মা দুই পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন করেছে। পুরুষের কামনানীপ্ত

লালসার্চিট দৃষ্টির সামনে নিজেদের অর্ধনগ্ন করে বেড়াচ্ছে তোমরা। তোমাদের সতীত্ব আমার মায়ের সতীত্বের অনেক নিচে।’

‘উহ্!’ বিষাক্ত শরাহত হৃৎয়ার বেদনায় জেসমিন টলে উঠল। মল্লিক চেয়ে দেখছে। খাটের বাজু ধরে নিজেকে সামলে নিল জেসমিন। দবজার দিকে এগুল। মল্লিক ছুটে গিয়ে গতিবোধ কবে দাঁড়াল।

‘সরে দাঁড়াও।’

‘না।’

‘এখানে আর এক মুহূর্তও আমি থাকব না। সরে দাঁড়াও।’

‘না।’

জেসমিন জলে ঠাটা চোখ দুটো তুলে তাকাল, চোখাচোখি হল। সে কিছ একটা বলার আগেই মল্লিক বলল, ‘আজ যখন বলতে শুরু কবেছি তখন আব ফেবা যায় না। তোমাকে সব শুনে হবে।’

‘না। আমি তোমাকে ঘেন্না করি।’

‘করো তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু সব না শুনে তুমি যেতে পার না।’

‘আমি শুনব না।’

‘না শুনলে। কিন্তু আমার বলা শেষ না হলে তুমি যেতে পারবে না। তোমাব উপস্থিতিতে আমি বলব সব কথা।’

‘জোর করছ?’

‘হ্যাঁ।’

জেসমিন বসে পড়ল। মল্লিক বলল, ‘সব কথা বলা শেষ হলে আমি তোমাকে আমার মাকে দেখাব।’

ছিটকে উঠে দাঁড়াল জেসমিন, ‘কি! তোমার মা কি এখানে? বঁচে আছে?’ চারপাশে দৃষ্টি ফেরাতে লাগল।

‘হ্যাঁ, বঁচে আছে। এখানে নয়, ঐ পাশের ঘরে।’

ঘাড় ফিরিয়ে জেসমিন একটা দরজার শিকল তোলা দেখল। সভয়ে তাকিয়ে রইল ঐদিকে।

মল্লিক বলল, ‘মা আজ তিন বছর ইনভ্যালিড হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছে। এই তিন বছরে যথেষ্ট ধকল গেছে মার ওপর দিয়ে, মা মরেনি। গত বছর একটা নতুন উপসর্গ জুটেছে। বাকশক্তি রহিত হয়েছে। তবু বঁচে আছে! নৃত্য হয়ত

খুব দূরে নয়, কিন্তু এখনো সে বেঁচে আছে, তাই তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। মরে গেলেও করব।’

জেন্সমিন মল্লিকের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল যেন সামনে সে নির্ভয় ব্যাধকে দেখছে।

মল্লিক বলল, ‘বাবা ছিলেন ফরেষ্ট অফিসার। এক ঝড়ের রাতে বাইরে গিয়ে বাংলাতে ফিরতে পারলেন না, ষাবার সময় তাঁর বন্ধুকে বলে গিয়েছিলেন। শহরের মেয়ে ছিল মা। বনবাদাড়ে এসে ভয় পেত বলে বাবা কোথাও বাইরে গেলে তাঁর বন্ধু নাসিরকে বলে যেতেন। নাসির এসে রইল মার কাছে সে রাত্রে। বাইরে তুমুল ঝড়। কতকগুলি দানব যেন বড় বড় গাছগুলি নিয়ে টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিয়েছে। মা একা ঘরে ভয় পেল কিনা দেখতে এসে নাসির যা দেখল, আমার ভারজ হয়ে জন্মাবার জন্তে তাই যথেষ্ট ছিল। কেউ জানল না, কেউ দেখল না, ঔষিগতের একটি নিষ্পাপ মানুষকে তারা কলঙ্কিত করল। সে চিহ্নিত হয়ে রইল। সবার থেকে। আমি জন্ম নিলাম। বড় হলাম! বাবা মারা গেলেন। মায়ের রক্ষক হয়ে রইল নাসির সাহেব, কিন্তু মার বুঝি তা সহ হল না। আমরা তার দয়ার বেড়ি ছিঁড়ে পাড়ি জমালাম অনেক দূরে। অবশেষে গত যুগ ধরে এইখানে। সেইখানে। সেই সময় উপার্জনের সন্ধানে নামবার আগে মা এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে সব বলল। ঘরে বাতি জ্বালানো ছিল না, কেউ বাতি জ্বালাবার দয়কারও বোধ করিনি। হয়ত তাই নির্দিধায় মা সব বলেছিল। বলে আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমাকে তুই ছেড়ে যাবি ?

মার মুখ আমি দেখতে পাইনি। কণ্ঠস্বরে মনে হয়েছিল মা যেন বলছে, পাপ আমি করিনি। সেই মুহূর্তেই মাকে আমি ক্ষমা করেছিলাম। কেন জানি না মনে হয়েছিল, মার রূপ, মার যৌবন আর পরিস্থিতি এর জন্ত দায়ী।

তুমি আমাকে প্রতারক বলেছ। নিজের জন্মের ইতিহাস কেউ ফলাও করে বলে না জেন্সমিন। আমিও বলিনি। আর সে কারণেই আমাকে যদি প্রতারক বলে থাক, আমার দুঃখ করবার কিছু নেই। ই্যা, তবে আমি প্রতারক। শুধু আমি নই, পৃথিবীর সহস্র সহস্র মানুষ তবে আমার মত প্রতারক। তোমাকে ভালবেসেছিলাম, একথা বললেই যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, আমি হয়ত দুঃখ পাব। তোমাকে আমার বলে পাব এ আশা আমার ছিল না তাই তুমি যখন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখলে আমাকে নিয়ে, আমি অস্বস্তিবোধ করলাম। এবং তোমার মোহ ভাঙতেই আজ সবটুকু বলেছি। এবার তুমি চলে গেলেও আমি দুঃখ পাব না।’

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল ওরা। জেসমিনের মুখ কালো বেদনার্ত দেখাচ্ছে। মল্লিক নীরেট মুখে জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে আছে। মুখের একটা পাশ শুধু দেখতে পাচ্ছে জেসমিন। ফিরে তাকাল। সহজ হয়েছে, যেন কিছুই ঘটেনি।

‘মাকে দেখবে এসো।’

শিকলটা খুলে ফেলল। পাশের ঘরে ঢুকল দুজন। জেসমিন যেন যন্ত্রচালিত। বোধশক্তিহীন। ঘরের দক্ষিণ দেয়াল খেঁষে একটা খাট। স্ট্যাণ্ডে মশারী সামিয়ানার মত করে খাটান। খাটের পাশে একটা ছোট টেবিল। একটা হরলিক্সের শিশি, কিডিং বোতল, কাপ ইত্যাদি টেবিলটাতে। অদূরে খাটের মাথার কাছে একটা হিটার! এক কোণায় জলের কুঁজো গেলাস দিয়ে ঢাকা। অনাড়ম্বর ঘরটাতে ঢুকতেই জেসমিনের নাকে ঔষধের গন্ধ ঢুকল। মল্লিক খাটের পাশে এগিয়ে গিয়েছে। একটা কঙ্কালের মত কিছু বিছানাব ওপর দেখে ভয়ে চোখ বুজে ফেলল জেসমিন।

‘আমার মা—ফটোয় তাকে দেখেছ।’

চোখ মেলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্ধ করে ফেলল। দুর্বোধ একটা কিছু শুনেছে। ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখছে যেন।

মল্লিক বলল, ‘কেউ বিশ্বাস করবে না, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত এই কঙ্কালের গায়ে এমন রূপবোঁদন ছিল ঝার মূল্য দিতে গিয়ে তাকে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে। ফটোর সেই মুখ, সেই দেহের সঙ্গে এই কঙ্কালের সামঞ্জস্য নেই।’

মল্লিক স্নেহসিক্ত দৃষ্টি দিয়ে খাটের কঙ্কালের দিকে চাইল। সেই দৃষ্টি দেখে জেসমিন প্রথমে অবাক হল তারপর ঘৃণা ঘোষ করল। দৃষ্টি ফেরাল সে অন্য দিকে।

‘কিছু বলবে?’

চমকে তাকাল জেসমিন। মল্লিক ঝুঁকে পড়েছে খাটের ওপর। শায়িতার ঠোঁট দুটো প্রবল বেগে কাঁপছে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক ঐচ্ছল্যে ঠিকরে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুকটা হাড়-পাঁজর স্কন্ধ ফুলে উঠেছে। অথচ টুঁ-শব্দটি বেরুচ্ছে না!

‘থাক মা, চুপ কর। বুঝছি তুমি কি বলতে চাও। ও আমার সহকর্মিনী, নাম জেসমিন—তোমাকে দেখতে এসেছে।’

নিরন্তর হয়েছে। ওঠের কাম্পন মন্দীভূত। মল্লিককে দেখবার পর থেকে সেই ষে কাঁপতে শুরু করেছে একবারও থামেনি।

‘মাই মা ওকে পৌছে দিয়ে আসি।’ ওঠের কম্পন শুরু হল। দৃষ্টি নেমে গেছে।  
চোখ দুটো মুদ্রা এলো। ক্লান্ত হয়েছে। যুঁমোবে।

এ ঘরে এসে শিকল তুলে দিল মল্লিক দরজায়। ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল জেসমিনের।  
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। মল্লিক জানলার কাছে ফিরে গেল। দৃষ্টি বাইরে।

‘এবার তুমি যেতে পার। আমি বাধা দেব না।’

অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে রইল ঘরটা। কেউ ঘর ছেড়ে চলে যাবার শব্দ হল না।  
বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল মল্লিক। ঘরের মাঝখানে শুষ্কভাবে জেসমিন দাঁড়িয়ে।  
আঁচল লুপ্তিত, পলকশূন্য চোখে মল্লিকের দিকে চেয়ে আছে।

চমক ভাঙল। মৃদুস্বরে বলল, ‘একটা চাবি দাও।’

সব কথা শুনবার পরেও চাবি কেন মল্লিক বুঝতে পারল না। চাবিটা হাতে  
পেতেই কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল জেসমিন!

পরদিন যথাসময়ে উভয়ে অফিসে উপস্থিত হল। যথাবিহিত কাজ করে গেল।  
সেই ভদ্রলোক এসে তাঁর হোণ্ডা ডেলিভারী নিলেন। বিকালে অফিস থেকে পার্ক,  
রেসকোর্স লেক ঘুরে মল্লিক বাড়ী ফিরল।

উভয়ের কথা বলা প্রায় বন্ধ। মুখোমুখি হলে এবং অফিসের দু-একটা কাজে  
যেটুকু কথাবার্তা হয় তার বেশী কিছু নয়।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে মায়ের ঘরে গিয়ে দেখল ছোট টেবিল থেকে পরিষ্কার  
একটা টেবিলে গুয়ুধের শিশিগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে। শিয়রের টেবিলটাতে এক  
তোড়া রক্তগোলাপ। এরপর রোজই একতোড়া রক্তগোলাপ মায়ের ঘরে  
টেবিলটাতে দেখা যেতে লাগল। অফিসে দেখা হলেও মল্লিক এ বিষয়ে জেসমিনকে  
কিছু বলল না।

সেদিন বাড়ী ফিরে দেখল দরজা খোলা। ঘরে ঢুকল। মার ঘরের দরজাটাও  
খোলা। সেই ঘরে এসে মল্লিক দাঁড়াল। মায়ের শিখানের পাশে মেঝেতে হাঁটু  
গেড়ে বসেছে জেসমিন। উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের প্রতি সন্নিবদ্ধ। ভুরু কঁচকে তাকাল  
মল্লিক।

‘আমার মায়ের কাছে তুমি কেন আস? রোজ একতোড়া ফুল কেন রেখে  
যাও মায়ের শিখানে? মাকে তুমি ঘৃণা করেছ, অসতী বলেছ, মা সে কথা জানে না,  
তাই—?’

জেসমিন রূঢ় কণ্ঠ শুনে চমকে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ ধীর শান্ত। দৃষ্টিটা  
মল্লিকের ওপর থমকে দাঁড়িয়েছে। মৃদু অথচ কঠিন স্বরে বলল, ‘না।’

‘তবে কেন ? আর কি অপমানের বাকি আছে ? মাকে তুমি অপমান করছ কেন ?’

‘অপমান নয়, সম্মান করছি মাকে ।’

কথাটা ধাক্কা দিল মল্লিককে । পরক্ষণেই সে চীৎকার করে উঠল, ‘যার সম্মানকে শ্রদ্ধা করতে পারনি তাকে সম্মান করছ কেন ? কে চেয়েছে তোমার সম্মান ?’

জেসমিন শান্তভাবে আঙুল দিয়ে খাটের দিকে দেখিয়ে জবাব দিল, ‘চেয়েছেন উনি ।’

‘মিথ্যে, মিথ্যে, কেউ চায়নি ।’

‘ওঁর চোখে তার ছাপ দেখবে । উনি অসম্বলিত হননি, হলে আমি আসতাম না । ওঁর চোখে দেখে তোমার প্রতি ভৎসনা ।’

জলজলে চোখ দুটো মল্লিকের দিকে স্থির হয়ে আছে, ঠোঁট দুটো দুর্বীর বেগে কেঁপে যাচ্ছে । মল্লিক এগিয়ে গেল । ওঁর শিয়রে একটা হাত রেখে হাঁটু গেড়ে মেঝেয় বসল । যন্ত্রণাক্ত বিকৃত কণ্ঠে বলল, ‘এ কি বললে মা । ও যে তোমাকে অশ্রদ্ধা করে ।’

ওঁর কম্পন দ্রুততর হল ? বুকটা দ্রুত তালে গুঁঠানামা করছে । মল্লিকের গণ্ডদেশে জল নামল চোখের কোণ বেয়ে । নির্বাক নিম্পলক চোখে চেয়ে রইল শীর্ণ কঙ্কালের দিকে । জেসমিন অনেক আগেই চলে গিয়েছে ।

পরদিন জেসমিন আবার এসেছে । তার পরের দিনও এসেছে । এমনি করে সে দিনের পর দিন এসেছে । মল্লিকের ঘরের ভোল বদলেছে, মল্লিকের মায়ের ঘর রোগীর ঘর ছেড়ে এক বিলাসের কক্ষ হয়ে উঠেছে । মল্লিক নীরব দ্রষ্টা ।

সন্ধ্যার আগেই সেদিন বাইরে থেকে ফিরল মল্লিক । এসে দেখল মার শিয়রে সেবারও জেসমিন বসে আছে । ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল মল্লিক । জেসমিন বলল, ‘ডাক্তারকে একবার ডাক । অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না ।’

‘কি হল ?’

‘নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয় । গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে ।’

মল্লিক ডাক্তারের কাছে গেল । ডাক্তার হাতের রোগী দেখা শেষ করে আসবেন বললে । ফিরে এল ।

‘ডাক্তার এলো না ?’

‘রোগী কমে এলেই আসবেন বললেন ।’

কতকগুলি খণ্ড মুহূর্তের দুঃসহ নীরবতা ।

‘একি! অমন করছ কেন?’

জেসমিন চিন্তিত মুখে ফিরে তাকাল। রোগিনী নিশ্বাসের অভাবে ছটফট করছে। শীর্ণ হাত দুটো প্রবল বেগে কাঁপতে কাঁপতে গলার কাছে উঠে এল। মাথা নাড়াচ্ছে। গলার শব্দটা বেড়েছে! মল্লিক হাঁটু গেড়ে বসল কাছে।

‘খুব বষ্ট হচ্ছে মা?’

বেরিয়ে-আসা গোল গোল চোখ দুটো ফুরিয়ে তাকাল। মুখটা হাঁ করল। নাকের ছিদ্র দুটো ফুলে উঠেছে। বুক কাঁপছে। সহসা পরিবর্তন হল, মুখ বন্ধ হয়ে এল, বুক নেমে গেল, গলার শব্দ স্তিমিত হয়ে আসছে। শ্রান্ত হয়ে চোখ মুদল।

‘এখন কেমন লাগছে মা?’

‘মাগো, ওমা—’

এক বিরাট স্তব্ধতা রোগিনীকে ঘিরে ধরেছে। এক অশুভ আশঙ্কায় চমকে উঠল মল্লিক। হাতের শিরা দেখল, বৃকের ওপর কান পাতল। জেসমিনের দিকে তাকাল।

মল্লিকের চেহারা দেখে চমকে উঠল সে। মমির মত ভাবলেশহীন মুখ মল্লিকের।

‘মা নেই জেসমিন। কান্নার ব্যবস্থা করতে হবে।’

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না জেসমিন। মাথায় কিছু ঢুকল না। শিয়রের পাশে স্থানুর মত বসে রইল।

উঠে দাঁড়াল মল্লিক। জেসমিন তাকাল।

‘এসো।’

মল্লিককে অনুসরণ করল সে। দরজায় ডাক্তারের সঙ্গে মুখোমুখি।

‘আপনার আর দেখবার দরকার হবে না ডাক্তার সাহেব, নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।’

ডাক্তার বিব্রত মুখে বিদায় নিল।

হুদিন পরে মায়ের ঘরে বসেছিল মল্লিক। জেসমিন এলো। অসময়ে তাকে দেখে মল্লিক বলল, ‘অফিসে যাওনি?’

‘না।’

তারপরই কথা ফুরিয়ে গেল। সন্ধ্যা হল। মুখোমুখি খাটের কাছে বসে রইল দু’জনে। দুটো চডুই কিছুক্ষণ চোঁচামেচি করে কোথায় উড়ে গেল।

ষরটা অন্ধকারে ভরে উঠল। মল্লিক কয়েকটা ধূপকাঠি এবং দুটো মোমবাতি খাটের মাথায় জালিয়ে দিল। ছ'দিন আগে এই ঘরে ধূপকাঠি জ্বালাতে গিয়ে শুনেছিল মায়ের কাফনের চারপাশে ঘিরে পড়শীরা সুরা পড়ছে। তার মध्ये এক বৃদ্ধার কণ্ঠ এখনো তার কানে লেগে আছে। তিনি পড়েছিলেন, ফাবি আইয়ে আলাই হে রাবি কু মাতু কাঞ্জিবান। মল্লিক সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল। জীবনে বৃদ্ধি তখনকার মত এত ভাল লাগেনি কখনো।

মোমবাতিটা জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে যাচ্ছে। মল্লিক অপলক চোখে আলোর শিখার প্রতি তাকিয়ে ছিল। খাটের ওপাশে জেসমিন উঠে দাঁড়াল। মল্লিক সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

‘যাচ্ছ ?’

‘রাত হতে চলল।’

জেসমিন আঁচল টেনে মাথায় দিল। ঠিক সেই সময়ে আজান শোনা গেল। অপূর্ব মিঠে স্বরে মুন্সাজ্জিন আহ্বান জানাচ্ছে। এণার নামাজের সময় হল। নামাজীরা এবার মসজিদে যাবেন, ওজু করবেন, নামাজের লাইনে দাঁড়াবেন। ইমাম তার শশশোভিত মুখমণ্ডলে প্রসন্ন হাসি নিয়ে পাগড়ী মাথায় সর্বাগ্রে দাঁড়াবেন।

...আসহাদো আন্নামু মুহাম্মাদুর রাহুল্লাহ।

‘আজানের সুরটা কি মধুর দেখছে?’ মল্লিক কান পেতে দিল। জেসমিন আঁচলটা ভাল করে মাথায় টানল। মোমবাতি দুটো স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলছে। মল্লিক আরো কয়েকটা ধূপকাঠি ধরাল। আজান এখনো শেষ হয়নি।







কয়েকদিনের মধ্যেই সাপের আবাতে দু'জনের মৃত্যু হল। এ অঞ্চলে সাপের বড় উপদ্রব। সাপ এমন এক নিয়তি যার প্রতি সাবধান হওয়া মনের এক সাঙ্ঘনা ছাড়া কিছুই নয়। আমি সাবধানতার জ্ঞান আমার তাঁবুর চারপাশে কার্বলিক অ্যাসিড, ডি ডি টি প্রভৃতি যথেষ্টভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ছয় ব্যাটারীর বড় একটা টর্চ ছিল আবার সঞ্চে। টর্চটা লাঠির মত সারাক্ষণ আমার হাতে থাকত। যোপ জঙ্গলে হাঁটবার সময় আমি গামবুট ব্যবহার করতাম। ভারী পায়ে হাঁটতে আনাব কষ্ট হত। কিন্তু বড় রকমের একটা কষ্টকে এড়ানোর জন্য এটুকু আমি সহ কবে নিয়েছিলাম। এ ছাড়া সন্ধ্যার পর তাঁবুতে বসে কখনই আমি ট্রানজিস্টর খুলে গান শুনবার চেষ্টা করি না। আমার একটা সন্দিক্ধ ধারণা ছিল, সাপ গান শুনতে ভালবাসে। বিশেষ করে বাঁশির সুরে সে মোহিত হয়। আমি সাপুড়ে দেখেছি, তারা লাউবাঁশি বাজিয়ে সাপকে বশে রাখে।

কিন্তু এ ব্যাপারে কে যেন আমার ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল। সে বলেছিল, ব্যাপারটার মধ্যে সাপুড়ের চালাকি আছে। আসলে সাপের কোন শ্রবণ ইন্দ্রিয়ই নেই। আমার মনে পড়ছে, পরিবর্তে তাকে একটা কাহিনী শুনিয়ে ছিলাম আমি। আমারই ব্যক্তিগত জীবনের একটা ঘটনা। বছর দশেক আগে, আমি আর হিরণ্য একবার খালের ভিতর দিয়ে ডিডি বেয়ে আসছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। হিরু বাঁশি বাজাচ্ছিল, আমি অলসভাবে দাঁড় বাইছিলাম। আমরা দু'জনেই গলুইয়ে বসেছিলাম বলে পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। খালের জল যেন কালো আলকাতরার মত জমাট বেঁধে গিয়েছিল। সেই জলে ডিডি খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। হঠাৎ আমার সমস্ত শিখিল ইন্দ্রিয় যেন চকিতে

সতর্ক হয়ে জেগে উঠল। আমি আঁতকে উঠলাম। দেখলাম, হলুদ চক্র-কাটা একটা চন্দ্রবোড়া পাটাতনের মাঝখানে বিড়ে পাকিয়ে বসে আছে। পদ্মফুলের ডাঁটির মত সতেজ একটা অংশ বিড়ের মাঝখান থেকে উঠে ফণা ধরে আছে। অত্যন্ত তন্নয় সে। হয়ত বাঁশির সুরেই ওর অমন তন্নয়তা। আমি হিরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। মনে হল হিরুও খানিকটা বিচলিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মুহূর্তেই ও সামলে উঠল। ইঙ্গিতে আমাকে দাঁড় বেয়ে যেতে বলে সে আগের মতই বাঁশি বাজাতে লাগল। ইচ্ছে করলেই এ সময় আমি সাপটাকে বৈঠা দিয়ে আঘাত করতে পারতাম। কিন্তু হিরুই আমাকে বায়ণ করল। সাপ বড় প্রতিশোধ-প্রিয় প্রাণী। একবার আঘাত পেলে পালটা আঘাত সে দেবেই।

ফলে বৈঠাটাকে জল থেকে আমি উপরে তুলি নি সেদিন। অত্যন্ত সন্তর্পণে ডাঙার কাছে আসতেই আমরা দুজনে ডিঙি থেকে লাফিয়ে বাঁচলাম। এমন ঘটনার পর সাপের শ্রবণ ইন্দ্রিয় না থাকার কথা কে বিশ্বাস করতে পারে! আমি এই ভয়েই সন্ধ্যার পর কখনো রেডিও খুলি না।

স্বভাবতই আমার মত লোকের পক্ষে যত রকম ভাবে সাবধানতা গ্রহণ করা সম্ভব সব আমি করেছিলাম। তবু কখনো কখনো আমার বেহুলা লখিন্দবের গল্পটি মনে পড়ে যেত। লোহার বাসবে থেকেও লখিন্দর নিয়তিকে এড়াতে পারে নি। সাপ এমন এক নিয়তি।

যাই হোক, দিন দশেক হল তাঁবুতে এসেছি আমি। চতুর্দিকে জঙ্গল। পশ্চিম দিকের জঙ্গল গ্রামের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে আপাতভাবে গ্রামটাকেও একটা জঙ্গল বলেই ভুল হয়। বাঁশঝাড়, বকুল, জিওল, তেলাকুচার ফাঁকে ফাঁকে দুটো একটা কুঁড়ে ঘর। লাউমাচা, ঝিঙেমাচা। মাচা দেখলেই কেমন একটা কৌতূহল যেন আমাকে পেয়ে বসে। হয়ত অতিরিক্ত সর্পভীতিই এর কারণ। কিন্তু লতাগুলি যখন বাতাসে দোল খায় তখন মনে হয় যেন বা একটা তেজিয়ান সাপ চকিতেই আমার চোখের আড়ালে চলে যাবার জন্ত পাতার সঙ্গে মিশে গেল। ফলে আমি কখনো ভুলেও লাউমাচার কাছাকাছি এগোই না।

আমি জানি, আমার এই আচরণের জন্ত আমার সঙ্গীরা হয়ত গোপনে আমাকে নিয়ে আলোচনা করে। সঙ্গী বলতে একজন, আমার পিওন—গুণধর। অন্তর্জন এক নেপালী দারোয়ান—বাহাদুর। বাহাদুর আমাদের দেহরক্ষী। বন্দুকটি ওর হেফাজতেই থাকত। আমি তেমন চৌকস গানার হলে ওঁ যন্ত্রটা আমার কাছেই রাখতাম। সে সুরোগ না থাকলেও আমি লক্ষ করেছিলাম প্রকৃত কুরুরের মত

বাহাদুর আমাকে সারাক্ষণ নজরে নজরে রাখত। অনেক রাত্রি অবধি জেগে থেকে আমাকে পাহারা দিত! কিন্তু এত সবেও সাপে কাটা মৃত্যু দেখে আমার পক্ষস্ব কোথায় যেন উবে গিয়েছিল। আমি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলাম দিনগুলি।

অথচ আমার কোন উপায় ছিল না। এই রকম জল জঙ্গল বোঁপবাড়ে ঘুরে বেড়ানই চাকরি আমার। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয় বলে তাঁবু আমাদের সব সময়ই সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হয়। এ যাত্রায় আমরা কেবলমাত্র একজোড়া তাঁবু পেতেছি। একটি আমার জন্তু অপরটি ওদের দুজনের জন্তু। গ্রামের লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ওরা আমাকে গ্রামের পরিত্যক্ত কাছারী বাড়িটা ব্যবহার করার জন্তু উপদেশ দিয়েছিল প্রথমে। আমরা যথা সময়ে গৃহপ্রবেশও করেছিলাম। কিন্তু গুণধরই আবিষ্কার করল সেই অভাবনীয় দৃশ্যটি। আমি চমকে উঠে দেখলাম ঘরের বাতায় আড়াআড়িভাবে দড়ির মত একটা সাপ ঝুলে আছে। আশাতভাবে ওটাকে একটা বাঁশ বলে ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি সেই ভুলই করেছিলাম। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা আমাদের অভয় দিয়ে বলল, ‘ওটা বাস্তু সাপ! এখানে প্রায় বাড়িতেই অমন থাকে। এ সাপ গৃহস্থের কোন অমঙ্গল করে না।’

আমি লক্ষ করলাম খড়ের ছাউনির নিচে কোণের দিকে একটা পাখি চড়ুইয়ের বাসাও আছে। হয়ত পাখির লোভেই বাস্তু সাপ ঘরের বাতায় আস্তানা গেড়েছে। তা যে জন্তুই হোক এ ঘরে বসবাস করা অসম্ভব। আমি বললাম, ‘হয় সাপটাকে বাইরে আন, মেরে ফেল, নয় ফাঁকা মাঠের দিকে তাঁবু খাটাও।’ গ্রামের কেউ কেউ আমার আতঙ্কগ্রস্ত চেহারা দেখে মুখ টিপে হাসলেও আমি মান অপমানের কথা ভুলে গিয়ে বাহাদুরকে বন্দুক আনতে বললাম। ওটাকে গুলি করব।

কিন্তু আমাকে ওরা বাধা দিল। ঘরের মধ্যে গুলি ছুঁড়লে খড়ের চালে আগুন লেগে যেতে পারে বলে ওরা আমাকে ভয় দেখাল।

‘তা হলে কি এখানে থেকে প্রাণ দেব বলতে চাও?’ আমি প্রায় বিকৃত গলায় ধমকে উঠলাম।

ওরা বলল, ‘তা হলে হুজুর, বৈঘ্যনাথ ওঝাকে ডাকা হোক। সাপের লেজ ধরে সে হিড় হিড় করে টেনে নামাক।’

আমি অসম্মতি দেখাই নি বলে বৈঘ্যনাথ এল। ঘরের দরজা কাঁপ বন্ধ করে ধূপ-ধুনো জালিয়ে কি কৌশল করল কে জানে, হাঁপাতে হাঁপাতে একটা সাপ সে বাইরে নিয়ে এল। তারপর আমার সামনে ছুটে এসে মাথাটাকে মুঠোয় ধরে লেজের উপর পায়ে চাড় দিয়ে টান টান করে টেনে ধরল। বলল, ‘বুঝলেন বাবুসাব, এটা

নির্জলা মাদী। মরদটা হয়ত ধারেকাছেই কোথাও গা লুকিয়ে রয়েছে। হৃদিশ পেলাম না।’

‘তা হলে তো সোনায় সোহাগা হয়েছে।’ আমার সারা গা সিরসির করছিল। নাভিকুণ্ডের কাছে আশ্চর্য এক অহুত্বুতি মোচড় দিয়ে উঠছিল। বললাম, ‘চুলোয় যাক তোমাদের কাছারী বাড়ি। এ ঘরে আমার থাকা হবে না।’ গুণধরকে ফাঁকা মাঠে তাঁবু খাটাতে আদেশ করলাম।

আমি সেই থেকে তাঁবুতেই আছি। রাতে নিজের হাতে বিছানার চারদিকে মশারী গুঁজে দেই ভাল করে। বালিশের কাছে টর্চ রাখি। সকালে চারদিক ফর্দা হলে বিছানা ছাড়ি। ভাল করে জামা গেঞ্জি ঝেড়ে নিয়ে গায়ে পরি।

এ ব্যাপারে আমাদের অফিসের এক ভ্রলোকের মুখে একটা ঘটনা শুনেছিলাম। তিনি তখন হুন্দরবনের দিকে পোষ্টিং হয়েছিলেন। শীতকাল। এ সময় কচিং কমাচিং সাপ চোখে পড়ে। তবু তিনি সারাক্ষণ হুন্দরবন আর সাপের কথাটা মনে রেখেছিলেন। একদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রাকেট থেকে জামা টেনে নিয়ে মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দিয়েই আতকে শিউরে উঠলেন। কি যেন একটা জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বৃকের উপর দিয়ে গা রগড়াতে রগড়াতে বিছাতের মত নিচে নেমে গেল। তাকিয়ে দেখলেন, সাপ। বলা বাহুল্য ভ্রলোক যেন পুনর্জীবন ফিরে পেলেন। সাপটা বোধ হয় শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্তই জামার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বসেছিল।

এখন অবশ্য শীতকাল নয়। তবু আমি সতর্কতার জন্ত জামা গেঞ্জি এমন কি তোয়ালে অবধি ছ-একবার না ঝেড়ে ব্যবহার করি না।

এতভাবে সাবধান থাকা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হত, হয়ত সতেজ পদ্মফুলের ডাঁটির মত কোন এক বিষধর সাপ আমার তাঁবুর কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। কেবল হয়ত তেমন একটি স্বেযোগের জন্ত অপেক্ষা। আমি গুণধরকে নিয়ে লাইন বাল্ল আর চেনের বাল্ল না বইয়ে দিন ছুয়েক ধরে আশে-পাশের সমস্ত গর্তগুলি বুজিয়ে দেবার কাজে লাগিয়েছিলাম।

কিন্তু এর মধ্যে পর পর দুজন লোককে সাপে কাটল। এবং দুটো মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলল। আমার বন্ধুয়ল ধারণা হচ্ছিল, অতঃপর সর্পাঘাতে তৃতীয় যে ব্যক্তিটি নিহত হবে সে হচ্ছি আমি। কিছুতেই আমি এই ধরনের একটা দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছিলাম না।

সাপে কাটার প্রথম ঘটনাটি ঘটল বড় সড়কের উপর একেবারে দিনের আলোয়। একজন রেলওয়ে পয়েন্টসম্যান দিনকয়েকের ছুটিতে গ্রামে এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল নববিবাহিত স্ত্রীর জুতু কিছু কিছু সুগন্ধী প্রসাধনী আর কিছু রোমান্স। ঘটনার দিন সে ভিন গাঁয়ে মুরগীর খোঁজে বেরিয়েছিল। পথে সড়কের উপর সাপের ছোবল। ইস্—ছুটতে ছুটতে সে বাড়ির দরজায় এসে স্ত্রীর নাম ধরে চোঁচাতে চোঁচাতে এলিয়ে পড়ল। ব্যাস।

বৈঘ্যনাথ ওবাকে ঝাড়ফুক করতে দেখা গেল। বেহুলার নাম ধরে সংকীর্তন। আমি জানতাম ও সব শ্রেফ ভূয়ো ব্যাপার। সময় মত ডোর বাঁধলে, মুরগী লাগালে হয়ত বা বেঁচে যেত বেচারী।

আমি সেই রাতেই গুণধর আর বাহাদুরকে ডেকে সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসার কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। ডোর বাঁধতে হয়। রেড দিয়ে চিবে দিয়ে টিপে টিপে রক্ত বার করতে হয়। ডাক্তার না এলে বাঁধন খুলতে নেই। সাপের বিষে নেশা হয়। মাতালের মত রুগী তখন টলতে থাকে। তাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। দরকার হলে চড় লাথি কিল। রুগী একবার ঘুমিয়ে পড়লেই বুঝতে হবে বিষ তার সারা দেহে ঘুরতে ঘুরতে মাথায় এসে জমে গেছে। কক্ষনো তা হতে দেওয়া উচিত নয়।

আশ্চর্য, আমি বলছিলাম, যেন আমাকেই হু' একদিন পর সাপে কাটলে এই ধবনের প্রতিষেধক নিতে হবে। যেন কোন এক বিচক্ষণ ব্যক্তি মরবার আগেই তাঁর মৃত্যুসুস্থ তৈরী করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কথাটা মনে আসতেই আরো কেমন বিপন্ন মনে হল নিজেকে।

যাই হোক, সাপে কাটার দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল। এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে সাপে ছুঁয়েছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে সে বনের কাঠকুটো খোঁগাড়ে গিয়েছিল। সেখানেই সে ঢলে পড়ে থাকে। হয়ত সে বৃদ্ধা সংসারের জঞ্জাল বলেই বৈঘ্যনাথ ওবাকে লাগাবার দরকার মনে করে নি তার ছেলেরা। মড়া কাঁধে বয়ে পাঁচ ক্রোশ দূরের নদীতে লাস ভাসিয়ে দিয়ে ওরা চলে আসে। ফিরে এসে বৃড়ীর বড় ছেলে দেখে গোয়াল ঘরে গাই বাঁধা নেই। শুধু তাই নয় গরুটা ধারে কাছে কোথাও নেই। চড়াং করে মাথায় যেন রক্ত চড়ল। শালা—! গাইয়ের নাম ধরে চিংকার করে ডাকতে ডাকতে লোকটা জোড়া বাঁশঝাড়ের পাশে এসে দেখে গরুটা পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আর ওর পা জড়িয়ে লতার মত একটা সাপ বাঁটে মুখ লাগিয়ে হুখ চুষছে।

লোকটা একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে তৈরি হল। ‘শালা, তুই না সকালে মাকে খেয়েচিস?’ অবশ্য ও জানত বাঁট থেকে দুধ চুষে খায় যে সাপ সে সাপের বিষ থাকে না। তবু দুধ চুরি করার দৃশ্য দেখে পাগলের মত ও ন্কেপে উঠল। ‘শালা, সকাল বেলা মাকে খেয়ে আশ মেটে নি তোর? আবার দুধ চুরি করে খেতে এসেছিল! আজ হয় এসপার হবে নয় ওসপার। জ্বোধে মানুষের দিশে জ্ঞান হারিয়ে যায়। লোকটা যখন মরা খেঁতলানো সাপ মাথার উপর দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ি এল তখন সে মাতালের মত টলছে। তার কজির উপর জোড়া দাঁতের চিহ্ন দেখে বুঝবার উপায় ছিল না তখন ঐটুকু ক্ষত থেকেই পচন শুরু হতে পারে দেহে। পরমায়ু থাকলে হয়ত বা এ বেচারি বেঁচে যাবে। ভিন গাঁ থেকে ডাক্তার ধরে আনবার উপদেশ আমিই ওদের দিয়ে এসেছিলাম। জানি না আমার কথা কতখানি ওরা গ্রাহ্য করবে।

এইভাবে গতকাল সারাটা রাত আমার প্রচণ্ড এক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কেটে গেছে। সারাটা রাত এত বেশি স্পর্শকাতর ছিলাম আমি যে পাতার শব্দেও চমকে চমকে উঠেছি। বাতাসে কপালের উপর চুল উড়ে এলেও মনে হয়েছে সাপ। গভীর রাতে জঙ্গলের পাখি যখন কর্কশভাবে চিৎকার করে উঠেছে তখন আমি দুঃস্বপ্ন দেখার মত আর্তভাবে ডুকে উঠেছি।

আজ আবার আর একটা রাত্রি এল। সমস্ত আতঙ্ক যেন রাত্রির জন্ম জমা হয়ে ছিল। আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে মশারীর মধ্যে ঢুকে চারপাশ ভাল করে গুঁজে দিতে দিতে গুণধরকে ডাকলাম।

গুণধর কাছে এল। তাঁবুতে ঢুকল।

‘খাওয়া হয়েছে তোদের?’ আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে প্রশ্ন করলাম। ‘বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে যা। লণ্ঠন ছাড়া বাইরে বেরিয়েছিস কেন?’

গুণধর নিঃশব্দে বাতি নিবিয়ে দিয়ে একটা ছায়ামূর্তির মত তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু একটু বাতাস বইছিল। পর্দার কাপড়টা একটু একটু জুলছিল। বাইরে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি আলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন তেমন জোরালো না হলেও খানিকটা লাল আভা ছলকে ছলকে তাঁবুর মধ্যে আছড়ে আসছে। আর পাশে গুণধরদের তাঁবু বিছানায় শুয়ে ঠিক নজরে আসছে না। অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে শুয়ে পর্দা নড়া দেখছিলাম আমি।

বাইরে একটানা ঝিল্লিরব। দূরে সড়ক ধরে বোধ হয় কোন ভারি লরি চলে

যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে উৎকর্ণ হয়ে আমি শব্দ শুনলাম। অফিস ডাইরীটার কথা মনে পড়ল। কালো ডাইরী খাতাটা টেবিলের উপর পড়ে আছে। শুটাকে সাবধানে রাখা উচিত ছিল। ওপরঅলা হঠাৎ একদিন চলে এলে দেখবে ডাইরীর পাতা একদম ফাঁকা। কৈফিয়ত চাইবে। চুলোয় যাক। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ঘুমোতে চাইলেই ঘুমোন যায় না। প্রতিদিনই এমন হচ্ছে। কখনো কখনো পর্দা নড়ার শব্দে অহেতুক আমি চমকে উঠি। কিন্তু আজ আমার চমকে ওঠার পিছনে নির্দিষ্ট একটা কারণ ছিল। কটকট করে তাঁবুর ভিতরেই কি যেন একটা ডাকছে। কি ডাকছে? ব্যাঙ। আমি সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে চেঁচিয়ে উঠলাম, ‘গুণধর!’

গুণধর আবার লঠন হাতে তাঁবুতে ঢুকল।

‘দেখ তো গুণধর ঐ কোণের দিকে ব্যাঙ ঢুকছে কিনা? মনে হল ব্যাঙ ডাকছে।’

গুণধর হ্যাট হ্যাট করে মাটিতে চাপড়া মারল কয়েকবার। ‘না বাবু কিছু নয়, কিছু নেই।’

‘তবে কে ডাকল শুনি?’ আমি বিরক্ত হলাম ওর ওপর। তবু সহজ গলায় বললাম, ‘একটু ভাল করে দেখ না বাবা, বিদেশে কিছুইয়ে কি শেষটায় প্রাণ দেব।’

গুণধর ক্যাম্প খাটের নিচে, টেবিলের তলায়, স্কটকেসের পিছনে, চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে আবার বিদায় নিল। আবার সেই বাইরের আগুনের আভা। একটা যেন আগুনের ফুল উড়তে উড়তে ভিতরে এল। না, জোনাকি গুটা। মশারির গায়ে নীলাভ শীতল আগুন ছুঁইয়ে দিয়ে জোনাকিটা বসে পড়ল।

আমার সমস্ত দৃষ্টি এখন জোনাকির দিকে। আগুনের ফুল জ্বলছে, নিবছে। আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত একটা জোনাকিই কখন যেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

গভীর রাতে সমস্ত চরাচর যখন নিস্তরু তখন আমাকে নিশিতে পেল। আমি না ঘুমে না জাগরণে। আমি ঘুম থেকে জাগরণে, জাগরণ থেকে ঘুমে অনেকক্ষণ ধরে ছলতে ছলতে এক সময় সতর্কভাবে কি একটা কুৎসিত স্পর্শ অনুভব করলাম। আঁতকে উঠলাম। কিছু একটা শীতল সরীসৃপের মত মস্ত আমার উরু বেয়ে উপরদিকে উঠে আসছে। ঋণিকেই আমি বস্তুটাকে চিনতে পারলাম। সাপ। একটা সাপ আমার দেহলগ্ন হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আকারে তেমন দীর্ঘ বলে মনে হল না ওকে। আমি জানি, সাপের ব্যাপারে বড় অথবা ছোট কিছুই যায়

আসে না। ফলে মুহূর্তেই আমার সর্বান্ধে এক অবর্ণনীয় অল্পভূতি খেলে গেল। কিন্তু সন্ধে সন্ধে নিজেকে আমি স্থিতধী করবার চেষ্টা করে কাঠের মত অনড় হয়ে পড়ে রইলাম। এ ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোন গতি নেই। কারণ এক ঝটকায় আমি লাফিয়ে উঠলেও মশারির মধ্যে জড়িয়ে যাব। যদি অত্যন্ত সাপটাকে চেপে ধরি তা হলেও ওটা আমার কঠোর মূঠোর ভিতর থেকে পিছলে বেরিয়ে আসবে। সাপের সন্ধে পিচ্ছিলতার একটা সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে পড়ছিল। ফলে মরার মত ভান করে পড়ে থাকা ছাড়া আর আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না এখন। আমার বিবেকবুদ্ধি সব যেন মুহূর্তেই লোপ পেয়ে গেছে। আমি কেবল চোখ বুজে অল্পভবেই সাপের গতিবিধির দিকে নজর রাখতে লাগলাম।

মনে হচ্ছে ওটা এখন উরুর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আমার পেটের দিকে আসছে। আমি স্পষ্ট অল্পভব করতে পারছিলাম প্রথমে ও সমস্ত দৈর্ঘ্যটাকে কুঁচকে ছোট করে সামনের দিকটা প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে। অনেকটা ঠিক কৈচোর বৃক হাঁটার পদ্ধতির মত। ইচ্ছে থাকলেও আমার চোখের পাতা খোলার মত সাহস হল না। মনে হল চোখ খোলার শব্দও যেন সাপটা শুনতে পাবে। আর সন্ধে সন্ধে ফণা তুলে আমার নাভিমূলে দংশন করবে। আমি এখন সাপের সন্ধে এক জাতীয় সখ্যতা গড়বার চেষ্টা করলাম। আমার দেহের উপর দিয়ে ইচ্ছেমত গুকে বিচরণ করবার অধিকার দিলাম। এ অধিকারে ও আমাকে দংশন করবে না এইটুকুই শুধু প্রার্থনা করছিলাম। ঠিক যেমনভাবে দুর্বল সবলের সন্ধে সখ্যতা করে, যেমনভাবে মৃত জীবন্তের সন্ধে সখ্যতা করে, তেমনভাবেই আমি সখ্যতা গড়তে চাইছিলাম।

লক্ষ্য করলাম, ও তার মাথার দিকটা এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে দিক ঠিক করে নিচ্ছে। আমার সমস্ত রোমকূপের ভিতর দিয়ে শীতল একটা স্পর্শ চুঁইয়ে চুঁইয়ে চুকে পড়ছিল। সাপের দেহের রক্তে কি শীতলতা! আমি ছেলেবেলায় কোথায় যেন পড়েছিলাম সাপের দেহে হিমশীতল রক্ত থাকে। এই শীতলতা আমাকে অবশ করে আনছিল।

আমার গায়ে কোন জামা ছিল না। ডোরা কাটা পায়জামা হাঁটুর উপরে এসে গুটিয়ে কুঁচকে আছে। আমার একটা পা বাঁকাভাবে বালিশের উপর, অল্প পা সটানভাবে মশারির কোণা ছুঁয়ে আছে। আমার বাঁ হাত বৃকের উপর, যেখানে ফুসফুস থাকে; ডান হাতখানা কোথায় রেখেছি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি।



এজন্য আমার দুঃখও হল না। মনে হচ্ছিল আমার দেহ থেকে কয়েকটি অঙ্গ কমে গেলে সেই অঙ্গগুলি সাপেরও আওতার বাইরে চলে যেত। আমার বাঁচবার এখন একটাই মাত্র পথ মনে হচ্ছিল, সমস্ত অঙ্গগুলি হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু ফুসফুসটার স্পন্দন আমি অনুভব করতে পারছিলাম। মনে হল তলপেটের দিক থেকে সাপটা এখন ক্রমশ উপর দিকে উঠে আমার ফুসফুসটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, ফুসফুসের দিকেই গতি ওয়। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে জোরে ফুসফুসটাকে চেপে ধরতে ইচ্ছে হল আমার। না না, এখানে নয়, এখানে দংশন করলে আর কোন আশাই থাকবে না আমার। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টার পরও আমি আমার বাঁ হাতের আঙুল একটুও নড়াতে পারলাম না। যেন এতটুকু শক্তি নেই আমার। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এখন আর আমার ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল নয়। এমন অসহায় আমি। মনে হচ্ছিল একটা মেদ মাংসের দেহ ছাড়া আমি আর কিচ্ছু নই। আমি কি তা হলে অনেক আগেই মরে গেছি!

অথচ আমার অনুভব শক্তি প্রচণ্ডমাত্রায় তীব্র হয়ে উঠছিল। আমি অনুভবে বুঝতে পারছিলাম ও তার সরু চেরা জিবটাকে বার করে ঘামের মধ্যে ভিজিয়ে নিচ্ছে। সরু পলতের মত জিব। যেন জিব দিয়ে ও আমার ঘামের স্বাদ লেহন করছে। মনে হল অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় জিব বুলোচ্ছে ও। আর একটু এগিয়ে এলেই আমার আঙুলের নিচে ফুসফুসটাকে খুঁজে পাবে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুধু অপেক্ষা ছাড়া আর আমার কিছুই করার ছিল না এ সময়।

আমার ফুসফুসের স্পন্দন এমন ভারি আর দ্রুততর হচ্ছিল যে আমি স্বাভাবিক হওয়ার কথা কল্পনায়ও ভাবতে পারছিলাম না। অথচ আমার অত্যন্ত স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন এখন। আমি খুব সন্তর্পণে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস টানতে লাগলাম।

ও আমার দু' আঙুলের ফাঁকে মুখ আনল। মুখ এনে ফুসফুসের উপর জিব বুলিয়ে ঘাম চুষে নিতে লাগল। সাপের হোঁয়ায় আমার হাতের আঙুল কি কেঁপে উঠেছে। আমি কি এখন মুঠো করে সাপটাকে চেপে ধরব। না না, এখানে নয়, এখানে নয়।

বোধ হয় আমার আকৃতি ও গুণতে পেল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে ও। আমার কজ্জি, আমার বাহ, আমার বাহর কাছ দিয়ে বৃকে হেঁটে বগলের কাছে এসে জড় হতে লাগল। বগলের ঘামে জিব বুলাতে লাগল। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ওয় চলাকোরা। তবে সত্যি সত্যি আমাকে বৃত্ত বলেই কল্পনা করেছে ও। আমি আরো বৃত্ত, আরো নির্ভীক হবার চেষ্টা করলাম। যেন সেই পঞ্চতন্ত্রের দুই

বন্ধু আর ভাল্লুকের গল্পের মত। আমি গাছললায় শুয়ে। ভাল্লুক আমার সর্বদেহে  
শ্রাণ নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছে আমি জীবিত কি মৃত।

আমার বগলের কাছ থেকে চামড়া ঘষে ঘষে উপর দিকে উঠে এল ও। আমার  
গলার কাছে ওর জিবেলের স্পর্শ পেলাম। আমার শ্বাসনলী খাণ্ডনলীর উপর ওর  
দেহের ভার বিছিয়ে পড়ল। আমার চিবুকের নিচে কয়েকবার মাথাটাকে এ-পাশ  
ও-পাশ ঘোরাল ও। ঘাড়ের কাছে মুখ ছুঁইয়ে আবার উঠিয়ে নিল। আমার চিবুক  
বেবে দর দর করে ঘাম নামছে এখন। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘামের স্রোত আমার শাণ্ড  
দেহে। যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাপের সঙ্গে সহবাস করছি আমি। অথচ এইভাবে,  
একমাত্র বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর আমার কিছু নেই।

বুঝতে পারছিলাম ও এবার চিবুকের উপর উঠে আসবার চেষ্টা করছে।  
অনেকখানি উঠে এসে হঠাৎ ও গড়িয়ে পড়ল। বন্ডন করে সর্বদেহে আমার রক্তের  
একটা চেউ খেলে গেল। যেন সেই স্রোতের গমকে আমার সর্বাঙ্গে থরথর করে  
কাঁপুনি শুরু হল। আতঙ্কে আমি অনুমান করবার চেষ্টা করলাম, এ সময় সাপটা  
নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছে আমি মৃত নই জীবিত। ফলে মনে হল বিষধর কালো  
কুকুচে সেই সাপ নিশ্চয়ই এতক্ষণে গলার কাছে বিড়ে পাকিয়ে বসে পদ্মর ডাঁটির  
মত ফণা তুলে ধরেছে। ফণায় হলুদ কয়েকটা ছিট। চিকন নাতিদীর্ঘ সরীসৃপ  
ক্রোধে যেন আরো বেশি দৃঢ় লগ্নাটে হয়ে উঠেছে। ফণার ভারে মাথাটা একটু  
একটু হুলছে ওর। যেন সে যে-কোন মুহূর্তেই ঢলে ছোবল মারতে পারে  
এখন। আমি নিম্পলক ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রইলাম। অপেক্ষা। শুধু  
অপেক্ষা।

এ সময় ফণাটা ওর নেমে এলে নির্ঘাৎ আমার চোখের নিচ স্পর্শ করবে।  
চোখের নিচে অত্যন্ত নরম চামড়ার উপর বিষ বিছিয়ে দিলে পলকেই আমার  
সর্বদেহে সেই বিষ ছড়িয়ে যাবে।

আমার আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে হল। সকলের কাছে দুর্বলের অসহায়  
আকৃতির মত আর্তনাদ। প্রথর উত্তেজনায় এ সময় আমি আমার চেতনা ছাড়া  
আর কিছুই উপলব্ধি করতে পারছিলাম না। যেন আমি বলতে শুধু এক চেতনা ;  
দেহহীন চৈতন্য। রক্ত মাংস মেদ মজ্জা কিছু নেই আমার। আমার অধীনে,  
আমার আজ্ঞাবহনকারী কেউ নেই। না হাত, না পা, না আমার দেহের কোন  
অংশ। এমন অসহায় জীব আমি। তা হলে, কিভাবে এখন সাপটাকে আমি  
গলার কাছ থেকে নামিয়ে নেব। কি করে এখন ওর সঙ্গে যুঝে উঠে আরো

বহুকাল বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব। অথচ আমায় বাঁচতেই হবে। কি যেন একটা বড় রকমের প্রয়োজনে আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল। কি প্রয়োজন? আমি স্বরণে আনতে পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমি চোপ বৃজে অস্থির সময়ের জন্ত অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত দেহের উপর দিয়ে কিলবিল করে সাপের মত ধাম নামছে এখন। যেন অসংখ্য সাপ আমার দেহের উপর ছড়িয়ে গেছে। গলার কাছে ফণা ধরে থাকা আসল সাপটাকে এখন আর আলাদা ভাবে চিনতে পারছিলাম না আমি।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেলে সহসা আমি মরিয়া হয়ে চোখ খুললাম। কিন্তু কিছুই আমি দেখতে পেলাম না। আমার দৃষ্টিকে অনেকখানি ছড়িয়ে দিলাম, প্রথর করলাম। না, কিছুই আমি দেখছি না। অনেকক্ষণ আমি দেখি নি কিছুই। তারপর ধীরে ধীরে ডুবুরির আলো দেখার মত একটু একটু করে আমার লোমশ বৃকে, একটা হাত, একটা পা নজরে এল। বিষধর ফণা তুলে ধরা সাপটাকে খুঁজে পেলাম না। না, ফোখাও নেই সে। তবে কি ও বিছানার ভাঁজে আশ্রয় নিয়েছে?

আমার গলার নলীটা হঠাৎ দপদপ করে কাঁকি খেয়ে চলে উঠল। আমার দাঁতের পাটি সিরসির করে কেঁপে উঠল। আমি নিশ্চেষ্টে ঘাড় ঘোরালাম, তুললাম। না, এতটুকু চিহ্ন নেই সাপের। আমার ফুসফুসটা যেন ক্রমশই বড় হচ্ছে। আমি দম চেপেও গুকে স্বাভাবিক করতে পারছিলাম না এখন। আমার ঠোট খুলে গেল।

মশারির ভিতর বাতাস কি কয়ে গেছে! আমি হাঁ করে বাতাস টানতে লাগলাম। একটু প্রকৃতিস্থ হতে আমার মনে হল, যেন একটা ভিজে চাদরের উপর শুয়ে আছি আমি। এ সময় আমি নিজেই আমার ঘামের কাঁঝালো গন্ধ পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখনো সেই ঘুম আর জাগরণের সন্ধিক্ষণের অবশ্যতা আমার সমস্ত দেহের উপর যেন বিরাজ করছিল। আমি পুরোপুরি সক্রিয় হবার চেষ্টা করলাম। আবার সাপটাকে দেখতে পাওয়ার আগেই আমি আমাকে তৈরি রাখবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সকল চেষ্টাই কেমন যেন বুথা হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে গুণধর এল। সে-ই আমাকে পুরোপুরি জাগিয়ে তুলল। আমি বিছানা থেকে লাকিয়ে উঠে হতবিহ্বলভাবে বিছানার দিকে তাকিয়ে রইলাম।





‘স্নাত্তায় চৈচিও না।’ খুস্তি উচিয়ে কমলা ধমক দেয়। ‘লেখাপড়া ফেলে ওয়া তোমার গাছ পাহারা দেবে?’

‘তাই বলে—’

‘কেন, তোমার পুলিশ কী করছিল? তোমার সোহাগের পুলিশ?’

বউয়ের ধমকে দমে গিয়েছিল, বউয়ের খোঁটায় দপ করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হেরষ করে-কি, গেট খুলে ভেতরে ঢুকে বাজারের থলে ছটো বারান্দায় ছুঁড়ে দিয়ে বেড়া থেকে একটা বাথারি টেনে নিয়ে বাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের ওপর।

‘হারামজাদা! শালা! শয়ারকি বাচ্চা! তোমাকে রোজ গণ্ডেপিণ্ডে গেলাচ্ছি পড়ে পড়ে ঘুমোবার জন্তে!’

ঢিল হাতে নিলেই রাস্তার কুকুর দৌড় দেয়, কিন্তু পুলিশ কিনা পোষা কুকুর— পড়ে পড়ে মরি খায় বেধড়ক। কুঁই কুঁই করতে করতে খায়।

মারের চোটে দেহটা তার শিউরে শিউরে ওঠে। আথালিপাথালি মারের চোটে।

‘বাবা! বাবা!’

‘আর মেরো না বাবা!’

‘মরে যাবে বাবা!’

‘কী করছ বাবা!’

রমা এসে খপ করে বাপের হাত চেপে ধরে, বাচ্চু উবু হয়ে পড়ে পুলিশের ওপর।

‘বাহাদুরি হলো! অবলা একটা জীবের ওপর বাহাদুরি ফলানো হলো!’ মুখ ঝামটা দিয়ে বাজারের থলে নিয়ে কমলা চলে যায়।

ডিউটির খেলাপ হেরষ সহিতে পারে না। অফিসে না, বাড়িতেও না। তাই বুকটা তার দারুণ ধড়ফড় শুরু করলেও মনটা হয়ে যায় ঝরঝরে।

বাথারিটা বেড়ায় গুঁজতে গুঁজতে বলে, ‘কয়লার ঘরে বেঁধে রেখে আয়। আজ খাওয়া বন্ধ। জল পর্যন্ত না।’

‘কেটে গেছে বাবা!’

‘কাটুক।’

‘রক্ত বেরোচ্ছে!’

‘বেরোক।’

‘ডেটল দিয়ে দেবো?’

‘খবদার! শেপটিক হয়ে মরে মরুক।’

কুকুর যদি কুকুরের ডিউটি না করে তবে তার বেঁচে থেকে লাভ ? হেরষ তো আর শখ করে কুকুর পুষছেন ?

হুকুম দিয়ে কুয়োটলায় চলে যায়। হাঁটু অন্ধি কাদায় মাখামাখি। পেছাবও পেয়েছে জ্বর। কিন্তু আগে পা ধোবে, না পেছাবটা পয়লা সেরে নেবে ঠিক করতে গিয়ে চারপাশের লাউ-কুমড়ো পুঁই-নটে-পালমের দিকে চেয়ে থাকে অনিমেঘ।

এই কিচেন গার্ডেনের ক্রেডিট বউয়ের। যখন-তখন, সেকথা বউ শোনায়। কিন্তু কুয়োর মাটির দৌলতেই না ফলনের এত বাহার ?

রাস্তা উঁচু করার জন্তে বাকি মাটিটা বরবাদ না করে যদি সামনের বাগানে ঢালত !

বারোয়ারি রাস্তা উঁচু করার তার কী দায় ঠেকেছিল ? কুয়ো তো সবাই কাটালো, তার মতো আহাম্মুকি কেউ করেছে ?

জলার রাজা হয়ে ছিল। ভুতুড়ে এই জলায় সে-ই প্রথম ইলেকট্রিক জ্বালায়, রেডিও চালায়—তামাম সঁত্রাগাছিতে তা নিয়ে ধন্য ধন্য পড়ে যায়।

গত বর্ষায় জলাটা হাঁটু-জলের লেক হয়ে উঠলে কী রূপ খুলেছিল বাড়ির। লেক প্যালেস !

যেচে যেচে সবাই তারিফ করেছে। অফিসের লোকেরা দলে দলে এসে দেখে গেছে। তাদের জলখাবার জোগাতে মাসিক বাজেট বানচাল হয়ে গেলেও বুক হেরষর ফেঁপে উঠেছে। গর্বে মন টইটশুব।

আর এখন !

চারপাশে সব হাল-ফ্যাশানের বাড়ি, নতুন নতুন ডিজাইনের বাড়ি—মাঝখানে কী বিচ্ছিরি যে দেখায় এই বাড়ি ! কী বেমানান যে দেখায় !

তবু টেক্কা দিতে পারত। এ-তল্লাটে ওই ফুলের গাছ নেই। অমিত তো বলে কলকাতাতেও নেই।

এটা হয়তো চালবাজি। কলকাতায় নেই এমন-কিছু ভূভারতে থাকতে পারে না। তবে কিনা কাটোয়া থেকে চারাটা যখন এনে দিয়েছে, দেশের বাড়ির বাগান নিয়ে এটুকু চাল ছোকরা মারতে পারে। রুতজ্ঞ হেরষর তাতে প্রতিবাদ সাজে না।

নিজের হাতে দেড় স্কোয়ার ফুট জায়গা খুঁড়ে ঘেঁস তুলে ফেলে শেষ রাতে গাঙ্গুলি মশায়ের ভিণ্ডের মাটি চুন্নি করে এনে গর্ত বুজিয়ে চারা বসিয়েছিল।

দিনের পর দিন সকাল-সন্ধ্যা খেদমত করেছে। বাঁচে কি বাঁচে না—কী প্রতীক্ষা কী হুশিঙ্গা দিনের পর দিন !

তেইশ দিন পরে পাতা ছাড়তে হাঁফ ছাড়ে। আর ভাবনা নেই। এবার লকলক করে লতিয়ে উঠবে, গেট ছেয়ে যাবে। একই গাছে ছু-রঙের ফুল! আর কড়া-মিষ্টি গন্ধ।

বাড়ির বাহার খুলবে। গন্ধে ম ম করবে তামাম জলা।

মাগুলী বাড়িটা আবার সবার চোখ কাড়বে।

আবার হেরষ জলার রাজা হয়ে উঠবে।

যেচে যেচে আবার সবাই তারিফ করবে।

আর একটা ছাগল কিনা—

‘মরণ! কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—’

‘বেশ করছি!’

‘বেশ করছি? তাহলে বাচ্চুকে সেদিন মেরেছিলে কেন?’

‘ডির্টার্ব করো না—যাও।’

‘জল ঢেলে এসো, নইলে ভালো হবে না বলে দিলাম।’ খালি বালতিটা ছুম করে নামিয়ে রেখে কমলা পেছন ফেরে। ‘এক বালতি জল দিয়ে যেও।’

‘বয়ে গেছে!’

আর কি অমিত চারা এনে দেবে! মোমবার কনফার্ম হয়ে মঙ্গলবাবই ইউনিয়নের মেম্বার বনে গেছে যে ছোকরা, বড়বাবুকে আর কি সে খাতির করবে!

‘বয়ে গেছে’ বললেও কুয়ো থেকে জল তুলে হেরষ চাতালে ঢালে। পায়ের কাদা ধুয়ে হেঁসেলের বালতিটা ভতিও করে। ডিউটি!

পুলিশকে কোলে নিয়ে বাচ্চু ফোঁপাচ্ছে এবং এক হাত ভাইয়ের পিঠে রেখে আরেক হাত পুলিশের পিঠে বুলোচ্ছে রমা—হেঁসেলে বালতি পৌছে দিতে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে এই দৃশ্য দেখেই হেরষ গর্জে ওঠে, ‘বললাম কী! কথা কানে যায় না! শীগগির বেধে রেখে আয়।’

‘ঘাচ্ছি।’

‘ঘাচ্ছি! এফুনি যা।’

পুলিশ মুখ তোলে, পিট পিট করে তাকায়। এক কিস্তি লেজও নেড়ে দেয়।

আকাশনীল দুই চোখ। ভারী মায়াবী। এলপ্নানেডে লোকটা দিবিয় গেলে ফকসটেরিয়ার বলে পঁচিশটা টাকা হাতিয়ে নিলেও আসলে দো-আঁশলা। তবে চোখ দুটির তুলনা নেই।

কিন্তু কুহুরের চোখ ধুয়ে কি জল থাকবে?



‘চেনটা নিয়ে আয় ।’

রমা চেন নিয়ে এলে বকলসে আটকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে পুলিশকে কয়লার ঘরে হেরষ বেঁধে রেখে আসে ।

হেঁসেলের দরজায় এসে বলে, ‘ওর মাংস আজ আমি খাব ।’

‘খেও ।’

‘দস্তুরমতো পয়সা দিয়ে কেনা—ফেলে দেবো ?’

‘কে বলছে ফেলতে ।’

‘খুব ঝাল দিয়ে কষা মতন করে—’

‘ওই নাড়ীভূঁড়ি আমার কড়াইতে রান্না হবে না ।’

‘অ ! অলরাইট ! ওর হাঁড়িতেই রাখো—তবু খাব ।’

‘খেও । ওর বাটিতে খেও । ওর মতো নর্দমার পাশে বসে—’

‘পারি না ভেবেছ ? আমি ইচ্ছে করলে—’

‘সব পারো । দেখলাম তো ! পুলিশ সোনা ! পুলিশ মানিক ! কত আদিখ্যেতা, কত সোহাগ—’

‘তাই বলে ডিউটি—’

‘সেই ! ভয় হয়, কবে কোন ডিউটি না করে আমরা না খুন হয়ে যাই । অমাহুষ ! যাও এখান থেকে ।’

‘খুব যে দরদ এখন ! অথচ লোম উঠছে বলে কালও না কুরুক্ষেত্র করেছ ?’

‘বলি যাবে, না যাবে না ? নইলে সব ছুঁড়ে ফেলে আমি—’

‘মেজাজ !’

‘মেজাজ তোমার একচেটে ?’

হেরষ সরে পড়ে । মাসের প্রথম রোববার । ভালোমন্দ বাজার করেছে । বউ ক্ষেপলে সব মাটি ।

কুকুরটাকে নিয়ে বরাবর কমলা খোঁটা দেয় । কিন্তু কুকুরের জন্তে দরদে উথলে খোঁটা তো কখনো দেয় না ?

ব্যাপার কী ?

ভেতরে ভেতরে হেরষর মতো অবস্থা হয় নি তো ?

মুখে বতই বলুক ‘এর চেয়ে একটা মাহুঘের বাচ্চা পুথলে কাজ দিত’, এই বয়সে

এত ধার-দেনার মধ্যে একটা মাহুষের বাচ্চা পয়দা করলেও মাহুষ করে তোলা যে অসম্ভব ব্যাপার মনে মনে সেটা বুঝে গেছে বলেই কি কুকুরটাকে কোলের ছেলের মতো ভালোবেসে ফেলেছে? মুখে দূব ছাই-দূব ছাই করলেও মনে মনে ভালোবেসেছে?

বিচিত্র না। স্বামী ভালোবাসে ছেলের মতো, ছেলেমেয়ে ভালোবাসে ভাইয়ের মতো—বউও তখন ভালো না বেসে পাবে।

রুটি আলুভাজার প্লেট নামিয়ে রেখে রমা শুধায়, ‘চা খাবে তো?’

‘দিলেই খাই।’

রমা চলে যাচ্ছিল, হেরষ ডাকে, ‘কুকুরটাকে তুই অমাহুষ বানিয়েছিল। বেশি আদর দিয়ে বেড়াল করে ফেলেছিল। গোড়াতেই বলেছিলাম—সব সময় বেঁধে রাখবি, বেঁধে না রাখলে কুকুরের রোখ হয় না—যাচ্ছিল যে?’

‘তোমার চা নিয়ে আসি।’

‘আমার কথাগুলো কানে গেল?’

রমা ঘাড় নেড়ে ষর থেকে বেগিয়ে যায়।

রোববার রোববার কুকুরটাকে রমা স্নান করায়। কলেজে যাওয়ার আগে বোজ্ঞ ভাশ করে পাউডার মাখায়। সকালে বিকালে বাচ্চু মাঠে নিয়ে গিয়ে হাগিয়ে আনে। গজগজ করলেও আলাদা হাঁড়িতে কমলা হলুদ দিয়ে ভাত-মাংসের ছাঁট ফুটিয়ে দেয় রোজ।

কুকুরের স্বস্থ-সবল হয়ে বেঁচে থাকার জগ্গে এগুলো জকরি। অমাহুষ হওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু সব সময় ছানাছানি করা? জড়িয়ে ধরে শোয়া? পেটে কাতুকুতু দেওয়া?

উনিশ বছরের মেয়ে আর পনের বছরের ছেলেকে ছানাছানি করা, জড়িয়ে ধরে শোয়া, পেটে কাতুকুতু দেওয়া যায় না বলে বাপ না হয় দুধের সাধ ষোলে মেটাতে ওই কাজগুলি করে, মেয়ে তাই বলে বাপের পৌ ধরবে?

হেরষ ডাকে, ‘রমা। রমা।’

‘তোমার চা করছি।’

‘আগে শুনে যা—’

রমা এলে বলে, ‘তুই বলতে পারিস আমিও কুকুরটাকে লাই দিয়েছি—’

‘আমি তো কিছুই বলিনি বাবা।’

‘কিন্তু লাই দেওয়ার কথা যদি বলিস—’

‘আমি কিছুই বলব না বাবা !’

‘কেন বলবি না ? আমি যদি আমার ডিউটি না করে থাকি নিশ্চয় তোমার বলার রাইট আছে। আর আমারও তার কৈফিয়ত দেওয়ার—’

‘আমার একটা কথা রাখবে বাবা ?’

‘জ্যা !’ তেড়েমেরে কথার মাঝখানে আচমকা রমার কাতর মিনতিতে হেরছ যায় হকচকিয়ে।

‘বাচ্চু বলছিল, আমারও মনে হয় তাই ভালো।’

‘কী ভালো ? বাচ্চু কী বলছিল ?’

‘সত্য কাকাকে দিয়ে দাও। সত্য কাকা একটা কুকুর খুঁজছে—’

‘দিয়ে দেবো ?’

‘নইলে মরে যাবে।’

‘মরে যাবে ?’

‘মাথাটা যেমন ফেটে গেছে—যদি সেপটিক হয়—মল্লিকার দাদাব মতো—’ গলা ধরে আসে, ছুঁচোখ রমার ছলছলিয়ে ওঠে।

মেয়ের মুখের দিকে বাপ হাঁ করে চেয়ে থাকে। গলার এই ধরে আসা, চোখের ছলছল করে ওঠা, কুকুরটা—না মল্লিকার দাদার জন্তে ?

পাত্র হিসেবে মল্লিকার দাদাটা ফ্যালনা ছিল না। তাই তার সাথে মেয়ে প্রেম শুরু করলে মটকা মেরে থাকে। কল্পক প্রেম। জমুক প্রেম। কিন্তু বেজাতের সাথে বিয়েতে হেরষ কখনো মত দেবে না।

অবশ্য লুকিয়ে বিয়ে করলে থানা-পুলিশও করবে না।

বরং বিয়ের পর মেয়েজামাইকে মাপ করে দেবে। হালচাল বুঝে সময় মতো মাপ করে দেবে।

কশালের সামান্য কাটাটা সেপটিক হয়ে রাতারাতি ছেলেটা ফৌত হয়ে গেলে হেরষ দমে যায় ভয়ানক।

দিন কয়েক গুম হয়ে থেকে মেয়ে সামলে নিলেও বাপের কেবলি মনে হয় তার শুধু একটা বিনে পয়সার দামী জামাই ফসকে গেল, কিন্তু মল্লিকার বাপের হয়ে গেল ডাहा লোকসান।

সাতাশ বছরের রোজগরে ছেলের মরে যাওয়া আর সাতাশ বছর রেঙলার প্রিমিয়াম নেওয়ার পর ইনসিওরেন্স কোম্পানির লালবাতি আলানোর মধ্যে ফারাক

আছে ? আঁতুড়ে দুটো মরে গেছে কমলার, সে জন্তে তেমন আপসোস নেই। কিন্তু বাচ্চর যদি কিছু হয়ে যায় ? পনের বছরের বাচ্চর।

‘ডেটল লাগিয়েছিস ? ডেটল ? ডেটল ?’

‘ভূমি বারণ করলে—’

‘বারণ করলাম ধলে—ঐডিয়েট। শীগগির ডেটল লাগা। ষা, নিয়ে আয়। আমার কাছে নিয়ে আয়। আমি লাগাব। তুই যে এমন উজ্বুক—’

মেয়েকে হুকুম কবলেও নিজেই হেরষ ডেটলের শিশি তুলে নিয়ে ছুটে যায় কয়লার ঘরে।

পাৰা দেড়টি বছর থাওয়াচ্ছে।

সংসাবে হপ্তায় একদিন মাছ এলেও পুলিশের জন্তে রোজ আসে চার আনার কবে মাংসের ছাঁট, বেঙ্গ্পতিবাব দইভাত। ছেলে মেয়েবা এক ফোঁটা দুধ না পেলেও পুলিশেব জন্তে সকালে বিকালে দুধ-কটি।

দেড় বছরে কম খবচ হয়েছে।

মরে অমনি গেলেই হলো !

ডিউটি না কবলে আবাব ঠ্যাঙানি দেবে। আবাব ডেটল লাগাবে।

শুক মুঠায় পুলিশের একটা কান পাকড়ে ডেটল লাগাতে লাগাতে হেরষ বলে, ‘সোহাগ কবে করে আর মাখায় তুলে দিস না। সব সময় বেঁধে রাখবি। বেয়াদবি করলেই চাবুক।’

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



আমার বিশ্বাস ছিল, দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করেছিলাম, এই মুটে এই মুটিয়া সাবধান  
আঃ দিলে গোদরেজের আলমারিটায় টোল খাইয়ে, লোকগুলো এত অপদার্থ।

বিরক্তিতা চড়াক করে মাথায় উঠতেই চিস্তার সূত্রটা বাট করে ছিঁড়ে গেল।

আসলে আমার করবার কিছু নেই। আমি একটি ঝুঁটো জগন্নাথ। আমি  
নির্বাক দর্শকমাত্র। অসহায় অবসন্ন সে মনে মনে বিলাপ করে উঠল।

এই তো কি যেন একটা ভাবছিলাম, বলতে চাইছিলাম কিছু, ওই হতভাগা  
চারটে মুটে গোদরেজের আলমারিটা এ ফ্ল্যাট থেকে ও ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে সিঁড়িতে  
ফেলে টোল খাইয়ে, পাল্লাটা খোলা যাবে তো, দিলে বারটা বাজিয়ে। আলমারিটা  
ঠিক গোদরেজ কোম্পানীর নয়, তবে ওই ধাঁচের তৈরি, দেখতে স্ননতেও একই,  
একই রকম টেকসই—তার শালা তাকে বলেছিল এবং যদিও তার শালা বয়সে ছোট  
সে এইসব ব্যাপারে তার শালাকেই অথরিটি বলে মনে করে—তার উপর জিনিসটা  
তার বউ-এর খুব মনে ধরেছে, তাছাড়া জিনিসটা সেকেও হাণ্ড, তাই বেশ দাঁও-এ  
পাওয়া গিয়েছে, এ তার শালা আর বউ-এর সূচিস্থিত অভিমত, অবিশ্বি এটা যে  
গোদরেজ নয়, এরা তিনজন ছাড়া বাড়ির আর কেউ জানত না। কারণ তার মা  
এই হৃদুৎ বস্তুটা তাদের বাড়িতে আনা হল সেজন্য বউ-এর উপর অকস্মাৎ প্রসন্ন হয়ে  
ওটাকে পাড়া প্রতিবেশী মহলে গোদরেজ বলেই গাণ্ডিয়ে বেড়ালেন। কারণ তাঁর  
বড়লোক বোনের বাড়িতে তিনি এই ধরনের দু'চারটে বা জিনিস দেখেছেন সবই  
গোদরেজের এবং স্ননেছেন ওগুলো বেশ দামি। ফলে বাড়িতে প্রথম চোট  
গড়নীদের ভিড় হল এবং যেহেতু আসল গোদরেজ কী বা তার দাম কত তা তার মা  
বা বউ কারও জানা ছিল না তাই পরস্পরের বিবরণে গরমিল ঘটে তাদের সন্মহকে

জাগিয়ে তুলল এবং সবাই খুঁটিয়ে জিনিসটাকে দেখতে লাগলেন। ঊর্ধ্ব বন্ধুর অফিসের এক কলিগের বাড়িতে পরশুই বউ-ভাত খেয়ে এলাম, একজন স্পাইই বলে ফেললেন। ওয়া যেটা প্রেজেন্টেশানে পেয়েছে সেটাকে দেখলেই গোদরেজ বলে চেনা যায়। যা দাম! আর জিনিসটা কি!

এ ধরনের ঘটনা তাঁর স্ত্রী আদৌ পছন্দ করবেন না, এ ধরনের মন্তব্যাদিতে তিনি ফেটে পড়বেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। ওই জন্মেই আমি তোমাদের বাড়ির কোন ব্যাপারে থাকতে চাইনে। তাঁর স্ত্রী এই ভাবেই প্রথম রাতে জিনিসটা ফেঁদেছিলেন। সেদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কিঞ্চিৎ মাল টেনে বাড়িতে আসায় অকস্মে উপরওয়াল উপঘাচক হয়ে তাকে কয়েকটা ভাল কথা বলায় এবং স্ত্রীর পাশে শোয়ামাত্র রিরংসা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পড়ায় হুনিয়ার রংটা তাঁর কাছে গোলাপী ঠেকেছিল। এবং সে বাধ্য হাজার মত স্ত্রীর মুখ থেকে সেই দীর্ঘ অভিযোগ শুনেছিল। স্ত্রীর প্রতি তার সহানুভূতি অবিরল বর্ষিত হয়েছিল। ছোট ছোট দানায় চুমু খেয়ে স্ত্রীর উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, বউ বেচারির প্রতি বিলক্ষণ অবিচার করা হচ্ছে। মনে হয়েছিল সে যদি মাহুষ হয় তবে তার উচিত বউকে প্রোটেকশন দেওয়া। স্ত্রীকে তার মনে হয়েছিল অশোক বনে বন্দিনী জানকী। এবং এই ছবিটি তাব চিত্রপটে অঙ্কিত হওয়ামাত্র তার মনটা ম্যানিতে অল্পশোচনায় হু হু করে উঠেছিল। বউ-এর শিথিল বুক মুখ ঘসে সে বলেছিল, নেশায়, ক্লাস্তিতে, ঘুমে তার জিভ জড়িয়ে এসেছিল—মা আমি তোমার অধম সেবক, হুমান, এই বন্দীদশার যন্ত্রণা থেকে তোমাকে মুক্ত করব, এই প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি। তার পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওই জন্মেই তোমাদের বাড়ির কোনও ব্যাপারে আমি থাকতে চাইনে। দ্বিতীয় আবেক রাতে লম্বা অভিযোগের সেই ফিরিস্তিটা পেশ করার আগে তার স্ত্রী প্রস্তাবনাটার পুনরাবৃত্তি করলেন। সেদিন দু-তিন জনের কাছে ধার চেয়ে না পাওয়ায় বাড়ি ফেরার বাসে তার পিছনের লোকটা অসভ্যের মত কহুই-এর স্ত্রীতায় তাকে সরিয়ে সামনের সিটটা দখল করায় এবং মিছিলে মিছিলে ট্রাফিক জাম হওয়ার ফলে ঘণ্টাখানেক বাসে দাঁড়িয়ে বাড়ি ফেরায় মেয়েমানুষের চামড়া ছুঁতেই বমি আসছিল তার। তবু যে দ্বিগুণ না করে সে বউ-এর ভ্যাক্সর ভ্যাক্সর শুনে গেল, তার কারণ—সে খুব ক্লান্ত ছিল তাই আর নতুন কোন ঝামেলায় বা তর্কবিতর্কে বা কোনরকম বচসায় জড়িয়ে পড়তে চাইছিল না।

তার স্ত্রীর বক্তব্যটা এই রকম ছিল, যথা : (১) গোদরেজের ছাপ থাক চাই না-  
থাক, বিশ গেজ বডি আর আঠার গেজ দরজা, সত্য (স্ত্রীর ভাই) বলেছে গের

বাড়ির পক্ষে ষথেষ্ট মজবুত আলমারি, কাজেই এ নিয়ে পড়শীদের ঠোঁট উন্টোবার কোন কারণই থাকতে পারে না, (২) উনি তো যেচে কারও বাড়িতে যান না, তবে কেন আমাদের পেয়ারের পড়শীরা ( আমি অধিকাংশকেই চিনিনে ) বাড়ি বয়ে কথা শোনাতে আসে, (৩) যারা এত কথা বলে গেলেন তাদের বাড়িতে টিনের তোবন্ধ ছাড়া আর কোনও তৈজস আছে কি না সন্দেহ, অন্তত তার স্ত্রী মাঝে মাঝে ষে-কয়বার যে দু-একজনের বাড়ি ঘুরে এসেছে সে-সব বাড়িতে এমন কিছু লক্ষ্য করেনি, (৪) আলমারিটার দাম সত্যর পকেট থেকেই গিয়েছে, এখনও তাকে একটা পয়সাও দেওয়া হয়নি, (৫) এমন নয় যে সত্য এটা গছিয়ে দিয়ে গিয়েছে, (৬) রাখতে যদি জিনিসটা না চাই তবে সত্যকে জানিয়ে দিলেই ও লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবে জিনিসটা, লোকসান যা যায় ওর যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরেক প্রশ্ন অভিযোগ মায়ের সম্পর্কে। মা-ই গোদরেজ গোদরেজ বলে চোঁচালেন। তাঁর বোনের বাড়িতে এই ধরনের যে-কটা আলমারি আছে তার প্রত্যেকটির গুণগান করতে গিয়ে গর্বে মার বুক নাকি ফুলে ফুলে উঠেছিল, আর যে মুহূর্তে পড়শীরা রায় দিয়ে গেল, এটা গোদরেজ নয়, অমনি মার হ্র ঘুরে গেল এবং তিনি তাঁর বাপের বাড়ির কাঠের বাগানের মহিমা সবিস্তারে কীর্তন করতে বসলেন। সেসব কাঠের বাগানের কাছে এ আমলের ষ্টিলের আলমারি দাঁড়াতেই পারে না—বউ-এর পছন্দকরা আলমারি সম্পর্কে এই ছিল মায়ের হুচিস্তিত রায়।

ওই জগ্নেই আমি তোমাদের বাড়ির কোন ব্যাপারে থাকতে চাইনে। তৃতীয় এক রাত্রে তার স্ত্রী নিভূঁল ভাবে যখন কথাটা আবার আবৃত্তি করল, যদিও সেদিন অফিসে বা পথে তার দিনটা মোটামুটি ভালই কেটেছিল এবং নেশাটেশা না করা সত্ত্বেও বিছানায় শুয়ে আর পাঁচটা বিষয় ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আজ বউকে একটু আদর করলে মন্দ হয় না এমন চিন্তা—ব্যাপারটা খুব একটা আবশ্যিক নয়, ঐচ্ছিক মাত্র—মনে একবার ঘোরাক্ষেরা করেছিল, তখন ভয়ে সে ফুলে ঢোল হয়ে উঠল।

কিন্তু এটা কি তার স্বার্থপরতা নয়? সে অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করেছে। ভূমিও যদি আমাকে এড়িয়ে যাও তবে আমি বাই কার কাছে বল। কে আর আছে আমার, কথা বলার লোক কে আছে বল। বাড়ির বাইরে গেলেই ভূমি কথা বলার লোক পাও, আমার সঙ্গে কথা না বললেও তোমার চলে, কিন্তু আমি, আমি কার কাছে মুখ খুলি বল। দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছি জান। তোমার জন্ম জান। আমি কিন্তু ছোট ছিলাম না, ভালবাসা দিতে চেয়েছিলাম, ভালবাসা চেয়েছিলাম,

আমার প্রাণ্য আমি পেয়েছি, বল? সব যন্ত্রণা বৃকে পুষে পুষে রাখছি। ছোট হয়ে যাচ্ছি। একদিন দেখো, খুব শক্ত অস্থি হবে বৃকে। তার স্ত্রী এইসব কথা বলে একদিন কেঁদেছিল। কাউকে না শোনাতে পারলে তার স্ত্রী ফিসফিস করে বলেছিল, একদিন কিন্তু পাগল হয়ে যেতে পারি। সেইদিন তার ভয় হয়েছিল খুব। লেদিন থেকে সে ভয়ে ভয়ে আছে।

তার স্ত্রীকে সেই তো ভালবেসে এ বাড়িতে এনেছিল। এ বাড়িতে ভালবাসা এনেছিল। মুঠো করে ধরে রাখতে চেয়েছে বউকে, কিন্তু বৃকতে পারেনি মুঠো যতই শক্ত হোক, মাখনের মত সে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে পারে। পড়ছে। তাই তো সে শক্ত একটা আধারের ধাক্কায় ছিল, বিশ গেজ যার বডি, আঠার গেজ পাল্লা। যার ভিতর কোন কিছু রাখলে একেবারে নিশ্চিন্ত, নষ্ট হবে না, চোরে নিতে পারবে না, আগুনে পুড়বে না।

হই হই চিংকার শুনে সে লাকিয়ে উঠল। অল্প পরিসরে মুটেরা আলমারিটা কে নতুন ফ্ল্যাটে ঢোকাতে না পেরে সিঁড়ির রেলিং-এ তুলেছিল। স্নিপ খেয়ে বেশ খানিকটা নেমে গিয়েছে। একটা মুটের হাত হেঁচে গিয়েছে খানিকটা। এ সময়ে বেজায় রেগে যাওয়া উচিত ছিল তার। পারলে ভাল হত। কিন্তু না, সে শুধু আকার অবয়বহীন এক ধরনের ফিকে অস্থতির দ্বারা পীড়িত হতে থাকল। রাগের আগুন নয়, বিচলিত গাঙ্গা থেকে যে রকম নিস্তেজ ধোঁয়া বেরোয়, সেই রকম ভোঁতা ভোঁতা একটা অস্থুভুতি। যে সময়ে রেগে ফেটে পড়া উচিত সে-সব মুহূর্তে সে এর আগেও লক্ষ্য করেছে কেমন যেন জুড়িয়ে পড়ে, তার মস্তিষ্ক শীতল হিলাব কবে আত্মরক্ষার জন্ত তৈরি হয়ে থাকে। সে মনে করে দেখল, কখনও কাউকে আক্রমণ করেনি, প্রাণের দায়ে তার কাছে কেউ সাহায্য চাইলে সে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

শ্রম, বৃড়ো এক কেরানীবাবুকে তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখে সে চমকে উঠেছিল একদিন। শ্রম বাঁচান। লোকটি পাশের ওই বোসের সেকশনে কাজ করে। শ্রম আমাকে প্রোটেকশন দিন। তাকে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছে না বৃড়োটা। ভয়ে তার দুচোখ গর্তে ঢুকে গিয়েছে। কস বেয়ে লাল গড়িয়ে পড়ছে। শ্রম আমি লয়্যাল ওয়ারকার। কালকের স্ট্রাইকে আমি অফিস করেছি। বৃড়োটাকে টালুমানু চাইতে দেখে তার মনে হল, সে পা ঢাকা দিয়ে বাঁচবার একটা জায়গা খুঁজছে। টেবিলের ডয়ারে, চেয়ারের নীচে, ফাইলের ভিতরে যেখানে হোক সৈধিয়ে পড়তে চায়। শ্রম আমাদের মত নয়নি, স্ট্রাইক ডেকেছে। আর দেড়



বছর বাকি আছে রিটার্ন করার জন্যে, এর মধ্যে ব্রেক অব সার্ভিস হলে সারা জীবনের ঋটুনি বরবাদ হয়ে যাবে। তাছাড়া আপনারা স্ত্রীর অ্যান্ডিওরেন্স দিয়েছিলেন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। তাই পরশু থেকে বাড়ি বাইনি। অফিসেই লুকিয়ে ছিলাম। ওরা স্ত্রীর টের পেয়ে গেছে। ওরা স্ত্রীর খুঁজছে। পেলে আর আস্ত রাখবে না। মগের মূলুক নাকি। এটা সরকারি অফিস। মশে মনে সে আবৃত্তি করল। সে দেখল, বুড়োটা ভয়ে বলির পাঠার মত কাঁপছে। তার পায়ের গোড়ায় এই বাশের বয়সি লোকটা জবুথবু হয়ে বসে থরথর করে কাঁপছে আর কুঁই কুঁই আওয়াজ করছে। এমন জানলে কুঁই কুঁই বাড়িতেই থাকতাম কুঁই কুঁই কুঁই বাচান স্ত্রীর, এবারের মত প্রোটেকশান দিন কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই। সে টের পেল বুড়োটা ক্রমশ তার পা ঘেঁসে সরে আসছে। সে বলতে চাইল, উঠুন, কোন ভয় নেই। তার বদলে সে যখন শুনল সে বলছে, মিঃ বোস কোথায়, (সে জানত বোস আজ গা ঢাকা দিয়েছে। কোন ঝগড়ার মধ্যে সে থাকে না। বোসটা অনেক খলিফা)। তার কাছে না গিয়ে আমার কাছে এসেছেন কেন, আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা তো তাঁরই করার কথা, আমার লেকশনের বাইরে কিছু করার এক্সিয়ার তো আমাকে দেওয়া হয়নি, আপনি বরং সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে যান—তখন নিজেই খুব অবাক হল। ষে-রকম অনায়াসে ফাইলে একটি নোট মেরে দায়িত্বটা আর কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, তেমনি নিপুণতায় সে যে এই রকম একটা সমস্যাও স্ত্রীর সীমানায় চালান করে দিতে পারবে ভাবেনি।

কিন্তু তার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োটা এমন শুকনো এমন শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল যে সে হিম হয়ে গেল। আর তখনই সে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করল তার রাগ আসছে না। কোন ব্যাপারেই আর তার রাগ আসে না।

কিছুতেই সে রেগে উঠতে পারল না। অথচ তার চোখের সামনেই আলমারির হানডেলটা একটু একটু করে নামতে নামতে রেলিংয়ে গিয়ে ঠেকল। মুটেরা প্রাণপণে আলমারির পতন রোধ করতে চেষ্টা করছে। দুজনে শিঠ দিয়ে ঠেলে ধরেছে। আরেকজন উপর থেকে টানছে, এমন কি হাত-হাঁচা মুটেটাও এই সঙ্গীনের মুহুর্তে হাতের কথা ভুলে গিয়ে আলমারিটা চেপে ধরেছে। তার বউ এতক্ষণ এ ঘর থেকে ওঘরে বই গুছিয়ে রাখছিল, এবার উদ্বেগে অধীর হয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল। আলমারির হানডেলটা সিঁড়ির রেলিং-এ বসড়তে বসড়তে কি-ই-ই-চ করে একটানা আওয়াজ ছাড়তে লাগল। হানডেল হানডেল হানডেল! কি, তোমরা সব চোখের

মাথা খেয়ে রেখেছ, না কি ? জ্বরী ধমক খেয়ে মুটেরা আলমারিটার নিম্নগাত প্রাণপশে রোধ করল। তারস্বরে নিজেদের মধ্যে ঘোর বচসায় প্রবৃত্ত হল। মা-ও এই গোলমালে বিচলিত হয়ে উঠে আর কিছু না পেয়ে গোটা ব্যাপারটার (কী ঘটছে উনি জানেন না) জল্প আলমারিটাকেই দোষী করতে লাগলেন।

সেও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আলমারিটা ঠেলে ধরল। এবং ভাবতে লাগল কেউ যদি তাঁকে এখন প্রাণ করে, আচ্ছা বলত, আলমারির সব থেকে দরকারি জায়গাটা কী, তবে সে কী জবাব দেবে ? কোন জবাব তার মনে পড়ল না। আমার শরীরের সব থেকে দরকারি অংশ কোনটা ? এই পৃথিবীর সব থেকে জরুরি সমস্যা কী ? কোন্ লক্ষণে মাল্লুসকে মাল্লুস বলে চেনা যায় ? ইত্যাদি প্রশ্ন তাকে যদি কেউ করে তবে সে যে জবাবে একটা কথাও বলতে পারবে না, সে তা বুঝতে পারল। ফলে বেশ ভয় পেল। ওই বড়ো অসহায় কেরানীটাকে সে সেদিন আশ্রয় দিতে পারল না কেন ? ভাবতে সে ভয় পেল। আশ্রয় দেবার মুরোদ যে তার নেই সেকথা তাকে স্পষ্ট জানাল না কেন ? ভয়। প্রশ্নের মুখোমুখি হতে ভয়। সিদ্ধান্ত নিতে ভয়।

—আরে এ বাবু ছোড় দো। একেলা ঠেল ঠেলকে তু কা করব।

সে যে কখন থেকে আলমারি ঠেলছে তা বুঝতে পারেনি। মুটেদের কথায় সে সঙ্ঘি ফিরে পেল।

—তুমি ওখানে কি করছ, এই শরীর নিয়ে। উঠে এস।

তার জ্বরী ডাক শুনে সে হাত মুছতে শুরু করল।

—যা করবার ওরাই করবে। তোমার এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার কী।

বউ ব্যাপারটা আমার মত তলিয়ে দেখছে না বা দেখতে চায় না বা দেখতে পারে না বলে বুঝতে পারছে না যে এই আলমারিটা অক্ষত অবস্থায় আমাদের নতুন ক্ল্যাটে নিয়ে তোলার সমস্যাটা আমার কাছে জীবন মরণ সমস্যা। সে কথাটা স্বগতভাবে বলে একবার বউ-এর দিকে চাইল, তারপর আন্তে করে অবশ্য বউ যাতে শুনে না পায় এমনভাবে জবাব দিল, যাচ্ছি। তারপর নিজের দিকে চাইল এবং আবার স্বগতভাবে বলল, এখন এই আলমারিটাই ভরসা। আর কিছু নেই। এটাকে তাই অক্ষতভাবে ক্ল্যাটে ঢোকান দরকার। কেননা ভালবাসার অপচয় নিবারণের জল্প ও রকম শক্তপোক্ত একটা আধারই চাই।

হঠাৎ স্লিপ খাওয়া আলমারিটার গুঁতোয় সে দু-তিনটে সিঁড়ি টাল খেয়ে নেমে পড়ল। অভিকষ্টে রেলিং ধরে সামলে নিয়ে সে দেখল আলমারিটাও তার গায়ের

উপর এসে পড়েছে। সে ছুঁহাতে শরীরের সমস্ত জ্বোর এনে আলমারিটার গতি খানিকটা ঝুঁকে দিল। বেশ ভারি। বেশ জ্বরদস্ত মনে হল। মুটেরা তারস্বরে ঝগড়া করতে করতে এসে আবার ধরে ফেলল আলমারি।

আলমারির ফাঁক দিয়ে সে রেলিং বরাবর চেয়ে দেখল বেশ খানিকটা নেমে এসেছে তারা। বউটাকে এই নিচু থেকে বেশ মহীয়সী বলে মনে হচ্ছে তার বেশন হকুম দিলেই আলমারিটা হুড়হুড় করে উঠে যাবে তার পায়ের কাছে।

আলমারিটাকে সে ভেবে রেখেছে তার শোয়ার ঘরে পায়ের দিকে রেখে দেবে, যাতে ভোরবেলা চোখ মেলেই ওটা দেখতে পারে। তাতে তার ধারণা প্রতিদিন সে মনে জোর পাবে। আর সোয়েটার দিয়ে যেভাবে জাপান থেকে কিনে আনা দামী ক্যামেরাটা মুড়ে ফান্সারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল তেমনিভাবে ভালবাসাটাও সোয়েটারে মুড়ে ওই আলমারির ভিতরে তুলে রেখে দেবে, তাহলেই নিশ্চিন্ত।

সে শুনতে শেল বহুদূর থেকে তার বউ তাকে উঠে যেতে বলল। সে ততক্ষণে আলমারি ঠেলতে কাঁধ লাগাতে গিয়ে যেই একটু নিচু হল, অমনি সে দেখল আলমারির বডি, বাঁকানো রেলিং, তার বউ-এর পা হলধে শাড়ি পেট বুক মাথা তার উপর একটা বাল্ব, বাল্বটা জ্বলছে, বউ-এর মাথার উপর জ্বলন্ত বাল্ব, আলোর বলয়, তারপর একটু অবকাশ, আর তারপরই তার দৃষ্টিটা ঠিক করে সিলিং-এ ঠোকর খেল। একবার নিজের দিকে দেখল। তারপর আলমারিটা ঠেলতে ঠেলতে ভাবল, এই বোধ হয় তার সংসারের সীমানা। মুটেরা যখন তার চারপাশে হেঁইয়ো হেঁইয়ো বলে প্রচণ্ড সোর তুলেছে তখন সে তারই মধ্যে বলে ফেলল, আসলে আমি দাঁড়াতে চাই। আমি যে দাঁড়াতে পারি। এমন একটা বিশ্বাস আমার দরকার।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



ডাক্তার এসে পৌঁছতে পারেনি, এরই মধ্যে সব শেষ। মারা গেছে কলেরায়। মাছ খেয়ে হয়েছিল কলেরা।

ফজল আলি হাঁ করে পড়ে আছে। চোখ দুটো খোলা মাছের মতো, চোখকে খোলা রেখে যারা ঘুমায় হঠাৎ দেখলে সেরকমই মনে হয়। ঠোঁট দুটো যেন এইমাত্র একটা কথা বলে শেষ করেছে। আর সারা শরীর সিঁটিয়ে যাওয়া লতার মতো। শিরদাঁড়া ভাঙা, নেতানো। বিছানার সঙ্গে লেপটে আছে।

ডাক্তার ভেতরে চুকই সটান দরজার দিকে ফেরত গেল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললো, আর দেখার দরকার নাই। এমনি কলেরার কলু আরো তিন জায়গা থেকে এসেছে। ঐ মাছ খেয়েই কলেরা। যেতে হবে। বসলোও না, টাকাও নিলো না।

শুধু শুধু কলেরায় মরলে এতো কৌতূহল সৃষ্টি করে না। গাঁয়ের অর্ধেক লোক ভীড় করে আছে বাড়ীটায়, কেউ ভেতরে—আন্ডিনায়, বেশীরভাগ বাইরে, দঙ্গল করা। একজন বললো, একটু স্থর করে কথা বলে সে, ছন্দের মতো দোলা না লাগলে বলতেই পারে না : মাছ খাওয়া নিষেধ, সারা গাঁয়ে গাঁয়ে তিন দিন হইল কইয়া দেওয়া হইছে—আর খাইও না মাছ। ভূঁইকাপে আসামের পানি খারাপ হইল। সেই পানি সারা ছুনিয়ায় ছড়াইল, সেই পানির মাছ ষাই খাব তাই শেষ। কথা তো আর শুনব না! কথাত আছে, বুদ্ধি নিও তিন মাথার কাছে। তারা কি আর না বুইবি কিছু কয়। দেহ এলা।

ভূমিকম্পটা অকস্মাৎ! অসম্ভব ক্ষতি করেছে। আসামের মাটি চিঁরে ধাতু উঠেছে বলকিয়ে। ধসে গেছে রেল লাইন। শ্রোতের গতি ফিরেছে নদীর। দুটো ডিনটে

ধারা একখাতে একাকার হয়ে বইতে শুরু করেছে। কোনোটা বা উবর প্রান্তরকে ছাপিয়ে দিয়েছে বস্তায়। অদ্ভুত বস্তা, মাথা পাগলা বস্তা—মাগু, পশু আর মাছ-কুমীর একত্রোভে ভেসে যাচ্ছে। পুরো একটা পাহাড়ই নাকি গেছে ধসে। সেখানকার ত্রিশ মাইল ভায়গা জুড়ে এখন থৈ-থৈ জল। লোক গেছে মারা, বিরাট একদল সৈন্য ছিল পাহাড়ের চূড়ায়, তারাও নিখোঁজ। এর দোলা লেগেছে পূর্ব বাংলাতেও। তাছাড়া আসামের স্তূপ ধ্বংস-নজির ভেসে আসছে ষমূনার শ্রোত বেয়ে বাহাভুরাবাদ, ফুলছরিঘাট-ষমূনা পারের এখানে-সেখানে আটকে আছে বিরাট দেহ মরা হাতী, বাঘ ভালুক আর গলিতদেহ মাগুঘের শব। ছিন্নমূল গাছ ভেসে আসছে কাঁকে কাঁকে কচুরী পানা ঘেমন জাম হয়ে ভাসে।

জলে ফর্মালিনের গন্ধের মতো তীব্রতা। ডিসেকশন করা মড়ার কাছে গেলে এরকম ঠেকে। পানি, চাপ-চাপ কাদা। আসামের মাটির নীচে সালফার রয়েছে, তাই মিশে দূষিত করেছে জল। সালফারের গন্ধ পচা ডিমের মতো। এ কিন্তু সে রকম নয়। এতে তীব্রতর কাঁক। বাতাসের বৃকে বলকে বলকে উঠছে। নদীর পাড়ে বনতি যানের, হাওয়ার ঝাপটা লাগলে দরজা জানলা বন্ধ না করে খানসই টানতে পারে না তারা। ময়মনসিংহের উত্তরের দিকটায় ইতিমধ্যেই খাল, নালা, বিলঝিলের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে এই জল। অনেকেই মনে করছে, এবারের আমন পচে যাবে। এই পচাপানি যা কিছু স্পর্শ করবে না কেন, বিষাক্ত করে দেবে।

আতঙ্কে মাছ খাওয়া ছেড়েছে সবাই। জীয়ন্ত মাছের পাতলা চামড়াটুকু তুললেই পচা দগদগে মাংস বেরিয়ে পড়ে। ইসলামপুরের হাটে তিনটি বড় বাইগড় আর একটি শঙ্কর মাছ উঠেছিল এই হাটবারে। হাটের জীবনে এতো বড় মাছ একসঙ্গে এতগুলো এই প্রথম। হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেনি কেউ। শুধু শঙ্কর মাছের একটু-আধটু নিয়ে গিয়েছিলো কেউ-কেউ ওষুধ করার জন্তে।

এই আতঙ্ক এড়িয়েও বারা দু-একটা বড়ো মাছ অতি সহজে ধরে ফেলে খাওয়ার লোভ সামলাতে পারলো না, তারাও কাণ্ড করেছে কম নয়। হয়েছে কলেরা! আর ফষ্টি করেছে গবেষণার হৈ-চৈ শুধু। শুধু মাছ খেয়েই যে কলেরা হবে এও অনেকে মানতে চায় না। অনেকেই মাথা খুঁড়ে চালাচ্ছে তর্ক। কেউ কেউ মন্তব্যও করেছে একপেশে। আর সবারই চোখ দুটো হয়ে উঠেছে লাল। অদ্ভুত কৌতুহলে হয়েছে বড়ো বড়ো, ফাটা-ফাটা। ফজল আলির যতদেহটা ঘিরে অনেকেই অনেক রকম ভাবে শুরু করে দিল।

ই্যা, ফজল আলি একটা মাছ ধরেছিল বটে। রশিদের নৌকা নিয়ে ঘুর-ঘুর করছিল যমুনা কিনারায়। কানের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো কাতলাটা। ফজল আলি কায়দা করে সমান শ্রোতে নৌকাটা মাছটার পাশাপাশি ভাসিয়ে রেখে, শক্ত করে ধরে ফেলেছিল কানশাখাটা। তারপর ঠেলে পারে ভিড়িয়েছিল নৌকা আর মাছ এক সাথে। ডাকাডাকি করে কাকেও পায়নি কাছে, নৌকায় তুলতে হয়েছিল সেই মাছ অনেক কষ্ট করে তবে। মাছটা কেমন নিখর হয়ে পড়েছিল ইঁফ ছেড়ে দিয়ে। নড়েওনি চড়েওনি। কানশাখাটা কাঁপিয়ে খাস টানছিল শুধু। ডাকাডাকি করে টেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে হস্তদস্ত বৌকে বাঁইরে এনেছিলো ঘরের—দেহরে, কি আনছি দেহ, দেহ। কোনঠাই গেলা? বাড়ির ঘাটে নৌকা লাগিয়ে ইঁফ পেড়েছিল সে।

বৌ আর সে টানা-হেঁচড়া করে তবে মাছটা আঙিনায় ফেলতে পারে। অকস্মাৎ খুলীতে বুকটা আঁতকে উঠেছিল বৌর। ধকধক ধকধক করে কতক্ষণ, তারপর মুখটা কুঁচকে ছোট হয়ে আসে। নীল হয়ে যায় হতাশায়। বলে মাছ তো আনলা, খাওয়া ত আর যায় না। চারদিকে মাহুঘ মাছ ছাড়ছে; কয়, কি বলে, হৈছে মাছে।

তর যে আর কথা। কিসের আবার কি হইছে খাওয়া যাবে না। ষত না, হঁ।

নাগো না, না খাইলা। কি জানি কি আবার হয়।

বাড়াবাড়িটা খামাত তুই। সবটাতেই বাড়াবাড়ি করিস না কইলাম মাইয়া মাহুঘ হইয়া। জনমে ত আর কাতলা মাছ খাস নাই, জীবনেও জুটেবে না। পুঁটি মাছ কপালে জুটে না, তা আবার কাতলা। খাইয়া নি খাইয়া নি, বুঝলি? বৌ চূপ করেছিল।

ই্যা, ফজল আলির খাওয়ার শখ ছিল বটে। যে সন্ধ্যোটা ভাতে-মাছে গেছে ওর, ওকে মনে হোত অল্প মাহুঘ সেদিন। কিন্তু জুটেবে কেমন করে?

গ্রামে জমি আছে অটেল; তার জমি কোন্টা? গ্রামে নালাজলা অটেল, সে জাল ফেলবে কোথায়? নদী, বড়ো নালা বিল—জমিদারের দখলে। সেখানে মাছ ধরা নিষেধ। ছোট ছোট খাল জলা বা বাকী থাকে, সে-সবও বড়লোকের দাড়কি, ধুরোর দিয়ে দখলি নেওয়া। সে জায়গা পাবে কেন?

নিজের এমন যন্ত্র সরঞ্জামও নেই যে অল্প কোথায় ও চেষ্টা করতে পারে।

জাল নেই যে ছাপ দেবে। পাঁচা নাই যে বাই মারবে। খেওয়াল নেই যে টেনে তুলবে।

তবু হঠাৎ পাওয়া মাছে ভাতের সন্ধ্যাটা কি অপূর্ব গেছে ওর। মনের ভেতরে দাগ কেটে গেছে।

ফিকির ফন্দী করে আধসের তেল জুগিয়ে এনেছিলো। পের্যাজ, রহন, আদা, এসবও জোগাড় করেছিলো। কৌছায় করে এনে ঢেলে দিয়েছিল বোয়ের সামনে। বঁকে যাওয়া মনটা আর স্থির রাখতে পারেনি বো। লোভটা আবার চকমক করে উঠছিল চোখে-মুখে ওরও। উৎসাহে চনমন করে উঠছিলো রক্ত। বঁটি নিয়ে বসে গিয়েছিল সে।

ভীড় করে আছে সব মরা মানুষের চারিদিকে, আর বাড়ির চারিদিকে। মরার আগের দিন কি যেন বলতে চেয়েছিল ফজল আলি। বোকে ডেকেছিল হয়তো। নতুন বিয়ে করা বো, কেবল শর-সংসার পাতা। ছেলেমেয়েও হয়নি। শেষ সময়ে কিছুতেই ভুলে থাকতে পারে না। মুখ দিয়ে অক্ষুট অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে শুধু। কিছুক্ষণ ওর দিকে বুকে থাকে সবাই, তারপর একযোগে দৃষ্টি সরিয়ে এনে বোয়ের দিকে চায়। বো তখন মাটিতে লুট্টয়ে পড়ে বিলাপ করছে, শেষ আশাটুকুও ছেড়ে দিয়ে ডুকরে কাঁদছে, তার মনের কথাগুলোই গানের কলির মতো সুর করে সে বলছিলো আর ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল অসহায়ভাবে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়েই যেন চারপাশের সবার কথা মুহূর্তে একদম ভুলে গিয়ে।

আমি ক্যান আগে খাই নাই গো।

আদর কইরা আগেভাগে খিলাইলাম গো।

আমিই আগে মরলাম হনি গো।

ও হো হো হো।

অরণ্যের গাছগুলোর মতো মানুষগুলো স্তব্ধ হয়ে ছিলো। একজন টেনে দূরে সরিয়ে এনেছিল বোকে। ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওপরটান উঠেছিল ফজল আলির। ততক্ষণে বেহাশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল বো।

একজন খোলা চোখ বন্ধ করে দিলো ফজল আলির। বুজিয়ে দিল ফাঁক করা চৌঁটি। সটান করলো হাত-পা। মরে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এমন করে না দিলে জমে যায় অন্ধ-প্রত্যঙ্গ, লাশটাকে আর সহজই করা যায় না এরপরে।

স্বাভাবিক মরা নয়।

শুধু কলেরার মরার মতো সহজ নয় এ মৃত্যু। মানুষগুলো ছোট্টাছুটি করছে, কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ওদের ভেতরটা ঠেলে ঠেলে উঠছে। ফজল আলি শুধু মাছ খেয়ে নিজের দোষে মরছে বলে কেউ আর ভাবতেও পারছে না। একি

উপদ্রব এলো পৃথিবীতে? সারা ঠাই জুড়ে অভিশাপ। কেয়ামত নাকি অত্যন্ত কাছে এসেছে। আতঙ্কটা সবার। একজন বললো—লোকটা যুক্তিশীল। বলতে বলতে মাঝে মাঝে, নিজেই তার উত্তর দেয়। আত্ম-সমালোচনার কাঁচ থাকে কথোতে। কি এক জালা হইল কওত? আসামে হইছে ভূঁইকাপ, মানুষ মরছে সেহু—তাওব হইছে সেহু—তা এহেন যে মড়ক শুরু হইল এহানেও। তাও দেহ আবার মরে কারা? ঐ নেংটিখোলা আর নেংটিআলা। জানোয়ার আর মানুষ। বড় মানুষ ব্বেবাকার সবাই। ফজল আলি মরল কাঁ? না কি শালা হা-ভাইতা। পয়সা থাকলে কি, জনমে কোনদিন বড় মাছ খাইলে কি ও মরত? মরত ও? কওত? গরীবের সুখ আর কহন? কওত কহন?

ঘরের কোণে কান্নারত বোটের বিলাপের কথা এতক্ষণ ফুরিয়ে এসেছে। আশে-পাশের আলোচনার কিছু কিছু শব্দ তার কানে এসে বাজতেই—সে-কথার খেই ধরে সে আবার কথা খুঁজে পায়। তার রেশ ধরে আবার গীত শুরু করে সে :

কত সুখ চাইছিলরে—পায় নাই কোন দিন, কত আশা আছিলরে—পুরে নাই কোনদিন, ও-হো-হো-হো।

আর একজন বললো, কালো চিমসে মুখ, বিশ্বাসপ্রবণ, শ্রুতি কথার পিছনে ঘটনার উদাহরণ টেনে নিজেকে সমর্থন করে,—না! খোদায় গজব পড়ছে। সেই গজব পড়ছে খোদার। গজবের মাল যারাই নিব তারই আর রাহা নাই। গতবারের নোয়াখালির বানের কথা কই। সেই যে মানুষ আর গরু সব ভাইসা গেল একেবারে। পানিও খাইলে মরণ। মরা মানুষ সব জাগা বেজাগায় পইড়া আছে। কারো গায়ে গয়না, কারো গলায় হার, টাকার খতি বাইন্দা রাইথছে কেউ কোমরে। যাই যাই সেইগুলা নিল সঃ মরছে—এইড়া হোল খোদার গজব—

গজবের কথাটা শুনে বোয়ের কান্না আবার বেড়ে গেলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়ে আবার সে গীত করে কাঁদতে শুরু করলো :

গজবের মাল কতজন নিল গো—

তাগরে কিছু হয় নাই

কতজনের মাল কতজনে কাড়িলো গো—

তাগরে কিছু হয় নাই।

মিয়ারা কত গজবের কাঠ বাঙ্কিল গো

তাগরে কিছু হয় না

ও-হো-হো-হো।



ভূমিকম্প আর বন্যা যে কাঠ ভালিয়ে এনেছে তাই উত্তেজনার সৃষ্টি করছে সবচেয়ে বেশী। অনেকে বেদম খুশিও হয়েছে। গ্রামের আলসে চব্বিশটি লোকগুলোর তৎপরতা গেছে বেড়ে। খৈয়ের মত উত্তপ্ত ঠোঁটের উপরে ফুটছে, বিধ্বস্ত আসাম, আসামের মাছ, মাছ আর কৃপ ভাঙ্গা অজস্র কাঠের কথা। কাঠটাই সবচেয়ে বেশী আলোচ্য বিষয়।

আসাম কাঠ বন্ধ করেছিলো পাকিস্তানকে দেবে না বলে। সেই কাঠ বন্যায় ভেসে আসছে হু-হু করে পাকিস্তানের খালে বিলে। খোদা দিচ্ছে, কে বাধা দেয়! পাকিস্তানকে দিচ্ছে খোদা! উৎফুল্ল কণ্ঠে মন্তব্য করেছিলো আড়মোড়া ভেঙ্গে বড়মিয়া। তিনি নৌকা ভাড়া করে, মজুর রেখে অন্তত দশ বছরের খুঁড়ি কাঠ আটকিয়েছেন খামারে। যারই নৌকা আছে, আছে টাকা, সেই বেঁধেছে কাঠ ইচ্ছেমত। মৌলবী সাহেব ফতোয়া দিয়েছিলেন, নিওনা চেলী। ফওতী মাল নেবে না কোনো। প্রতিবাদ করেছিলো অনেকে। তখন মৌলবী সাহেব গল্প বলেছিলেন একটা, ইমাম হানিফার বৃজরগীর। কেবলা সাহেবেব কলব আল্লাহ আল্লাহ করতো হরওয়ারত। একদিন হয়েছে কি—দরিয়াতে ভেসে আসা একটা নাশপাতি খেয়ে ফেললেন পেরেশা হয়ে। ওমনি কি কদরত খোদার—কলব জেফের বন্ধ করে দিয়ে নিথর, হিম, ঠাণ্ডা একেবারে। গল্পে আর আর পস্তানিতে সালানীন ছাড়লেন হজরত। ভাবলেন, যার এই নাশপাতি মাগফেরাত নিতেই হবে তার কাছ থেকে। হেঁটে হেঁটে চললেন তিনি সাত বোজ। অনেক খোঁজাখুঁজির বাদ মোলাকাত হলো মালিকের সাথে অবশেষে। হজরত বললেন, মাফ করো। মালিক তো পাথর। কানেই তুললেন না কথা, আমার মাল আমি খাব তুমি খেলে কেন? মাফ আমি করতে পাবি না। হজরত কাঁদলেন, অনেক কৌশল করলেন, বোঝালেন। এই জিন্দেগীর তামাম মেহনত তাঁর বরবাদ বাবে, গজব নাঞ্জেল হবে খোদার। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বিপরীতধর্মী মাহুযের মুখোমুখি এমন অভূত মুহূর্তের উদ্ভব চিরকাল হয়ে আসছে, কিন্তু এর ফয়সালা আদাতক হলো কই?

চিরদিন মাহুযকে বঞ্চনা করে অভ্যস্ত যারা হয়ে উঠেছে, অথচ শাস্তি কোনদিন দেখেওনি, তাদের দুঃসাহসে বাঁধ মানলো না। আর একদল চিরদিন কিছুই না পেয়ে পেয়ে বঞ্চিত হয়ে, মাহুযের চিরস্থায়ী সত্তাকে কিছুতেই আর স্বীকার করে না। তাই মৃত্যুকে ভয় না করে গজবের ও অন্তের চলমহলের ছাড়া পাওয়া মাছ, দূষিত পানিতে গলিত মাছও জনমশোধ খেয়ে নিল। আর বড় মাহুযের

অনেক টাকায় ডাকা কুপ ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ছিটিয়ে পড়েছে যে অজস্র কাঠ তাই দেখে খুশীও হলো। ভাবলো সেখানে—আগামে নেংটিপরা মানুষ আর লেজওয়ালা কুকুর এক হয়ে গেছে। দাঙ্গা ভুলে হিন্দু মুসলমান একপাত থেকে খাবার কামড়াকামড়ি করে খাচ্ছে। হতভাগ্য উদ্বাস্ত মানুষগুলো যাদের ঠাই ছিল না কোথাও, তারা এবারে জায়গা পেয়েছে। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গ-বিহ্বল বৃকে, উত্তপ্ত জলের নিশ্চিত স্রোতের ভেতর। ভাসছে আর ভাসছে বিরাট বিরাট অভিজাত মাছ, কচুরী পানার মতো জাম বেঁধে কুপভাঙা কাঁককাঁক মাছ ভাসতে ভাসতে সেসব পাকিস্তানের চকমকে চোখের সামনে এসে গেছে। পাকিস্তানের শক্ত সমর্থ নিশ্চিত ডাঙ্গার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ধ্বসে যাওয়া আগামের কাঠ পেয়ে ধনী হয়ে উঠবে পাকিস্তান।

একে একে মানুষগুলো সরে যেতে লাগলো। মূর্দার কাছ থেকে। দাফন করাতে হবে। স্তব্ধ সমুদ্রের বৃকে ঝড় উঠলে ঢেউগুলো যেমন আকুলিবিহুলি করে তেমনি মানুষগুলো তছনছ হয়ে গেলো ভাবনায়। আতঙ্কে, অস্বস্তিতে, গায়েবী জ্বল্লার শিহরণে। ফজল আলীর মৃতদেহটার অস্তিত্ব ঝিরে থমথম করতে লাগলো ওদের অমুভূতি। কোন অবিশিষ্ট করুণা কিংবা সহানুভূতিতে নয় নিজেদের কথা ভেবেই ওদের বৃকগুলো ছলে উঠলো, শিউরে শিউরে উঠতে লাগল বারবার।

এতক্ষণে ঘরটা খালি হয়ে গেল একেবারে। মৃত স্বামীর সঙ্গে নির্জন একাকীত্বে বৌয়ের মনটা সহানুভূতিতে গলে গেলো এখন। অবধারিত প্রেমে ভরে গেলো। মোমের মতো নরম হয়ে গলতে লাগলো সে। তাই তার বিলাপের কথা গেলো কমে, কান্না উঠলো বেড়ে :

মাছ খাবার চাইছিল রে—ওহো হো হো

মাছে জিও বান্ধা আছিল রে—ওহো হো হো

মড়ার মাছ এখন কত হচ্ছে—ওহো হো হো।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



বৃষ্টি নামবে। ঈষৎ শিশির ছোঁয়া বসন্ত রাত্রে দক্ষিণ থেকে বইবে যে হাওয়া, তাতে থাকবে সমুদ্রের আর্দ্রতা, ফাটল ধরা শুকনো মাঠ আর পাতাঝরা গাছের শাখায় শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে সেই অতিদূরে পাহাড়ের চূড়ায় ঘনীভূত হবে, এর পর গর্জনে বজ্রে বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সারাটা আশমান, মঙ্গলসুধার মতো অজস্র ধারায় নামবে বৃষ্টি। গাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালপালাগুলি কচি পাতায় ভরে উঠবে, সারা খামার ছেয়ে যাবে সবুজ সবুজ। হুপুরের রোদে পাট খেতের চারা বাছতে গিয়ে শরীর থেকে হয়তো দরদর করে ঘাম ঝরবে, কিন্তু তাতে আসবে না এইটুকু ক্লান্তি। কেননা, নতুন ফসলের খোঁয়াব প্রাবনের মতো মিশে থাকবে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে।

কিন্তু সে বছর এসব কিছুই হল না। ফাস্তন চলে গেল, উত্তর দিকটা কিঞ্চিৎ কালোও হল না; চৈত্র শেষ হতে চললো, আকাশে হু-একদিন গুরু গুরু আওয়াজ হল, গুমোট হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি, কিন্তু এর বেশি কিছুই নয়।

এর পর এলো বৈশাখ। আর এখনও স্বর্ষ আঞ্জনের ফুলকি উড়িয়ে তীব্র তেজে অন্তেই লাগল, মাটির বুক চিরে মাথা উচিয়ে ওঠা পাটের চারাগুলি আস্তে আস্তে কুঁকড়ে গেল। ওপরে খাঁ-খাঁ শূন্য, নীচে আদিগন্ত মুক্ত স্বদূর, তারও নীচে বাঘবন্দী নক্শার মতো জমিগুলি রোদে-পোড়া, বিবর্ণ। হুপুর বেলা খেতের আলের ওপর গিয়ে দাঁড়ালে কল্জেটা সহসা ছাঁৎ করে ওঠে। ঝলসানো তামাটে জিহ্বা বার করে সারা মাঠটা ডাইনীর মতো হাঁ করে আছে। জলন্ত স্কুধা নিয়ে সে নিজে বৃকের শিশু-শস্ত্রকে গ্রাস করেছে, আগামী বছর যে গজব নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে। সেদিন জুমা নামাজের পর আলোচনা উঠল। মিশরের কাছে দাঁড়িয়ে মৌলানা মহীউদ্দিন বলতে লাগলেন,—বেরাদরানে-ইসলাম! আমি অধম বান্দা, আপনাদের খেদমতে কি ব্যয়ান করব, আপনারা সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল। কিতাবে আছে খোদাব গজব নামে তখনি, যখন দুনিয়া গুণাগারিতে ভরে যায়। আমরা এখন কি দেখছি? না, ছেলে বাপের কথা শোনে না, জেনানা বে-পর্দা, চুরি-ডাকাতি বদমায়েসিতে দুনিয়া পূর্ণ হয়েছে। এদিকে নামাজ নেই, রোজা নেই, হজ্ নেই, জাকাত নেই। আজ চলুন, আমরা তাঁর দরবারে জার-জার হয়ে কাঁদি। মাঠে গিয়ে সবাই হাত তুলে মোনাজাত করি, তিনি রহমানুর রহিম, ইচ্ছা কবলে একটু দয়া করতেও পারেন।

মৌলানা সাহেবের কণ্ঠস্বরের গুরু গভীর ধ্বনি-তরঙ্গে পাকা মসজিদের ভিতরটা গমগম করতে লাগল। মুসল্লিদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লাহ্। পুতনিতে একগুচ্ছ সাদা দাড়ি, মাথায় কিস্তি টুপি, নামাজ পড়তে পড়তে কপালেব মাঝখানটায় দাগ পড়েছে। তিনি প্রথমে গলা থাকরানি দিলেন, পরে আবেগকম্পিত গলায় বলতে লাগলেন, মৌলানা সাহেব যা বলবেন, তা অবশুই আমরা পালন করব। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা সকলের মনে রাখতে হবে, কু-কর্মের বিচার চাই। এই অনাবৃষ্টি কেন হল, আপনারা ভেবেছেন কি? খোলাখুলি বলতে গেলে, নিশ্চয় কোনো মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে, তোঁবা আস্তাকফোরোলা। এই অঞ্চলে, আশেপাশের কোনো গ্রামে অথবা আমাদের গ্রামেও হতে পারে। এদের তালাস করে বার করতেই হবে, নইলে এই আজাবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। এদের ছুঁবা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।

ডান হাতের আঙুলগুলি দাড়িতে একবার চালিয়ে গরমে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন হাজি কলিমুল্লাহ্, তাঁর মগজের কোষে কোষে সত্যিকারের অপরাধকে খুঁজে পাওয়ার ভাবনা।

দুপুরের কাঁ কাঁ রোদ্দুরে ফুটবল খেলার ময়দানে যেদিন ‘মেঘের নামাজ’ হওয়ার কথা, তার একদিন আগেই অস্থখে পড়লেন সূফী মৌলানা মহীউদ্দিন।

জামাতে ইমামতি করার জন্ত হাজি সাহেবকে গাঁয়ের তরফ থেকে অনুরোধ করা হল। প্রথমে বিনয় করলেও, সকলের খেদমতে পরে রাজি হলেন।

সেদিন নামাজ শেষ হওয়ার পরে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লা, বহুদূর চাউনি বুলিয়ে দেখলেন দুনিয়াটা এখনো জিন্দেগীর অযোগ্য হয়ে

উঠেনি, এখনো ডাক দিলে আলেমুল গায়েবের দরবারে হাজিরা দিতে হাজার লোককে পাওয়া যায়। তিনি চেয়ে রইলেন, আর দেখলেন অগণিত টুপির শোভা, হোক না সেগুলি তেল চিটচিটে অথবা ছেঁড়াখোঁড়া। খোলা প্রান্তরে গালভাঙা তামাটে মানুষগুলি বসে আছে অসহায়ের মতো, সবারই মনে একটুখানি রহমের প্রার্থনা। হাজি কলিমুল্লা হু'হাত তুলে দরাজ গলায় উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া বারে খোদা, তুই চোখ তুলে চা, একটু দয়া কর তোর বান্দাদের। তুই আশমান জমিন, চান-স্বক্জের মালিক, তোর অঙ্গুলি হেলনে সাগর দোলে, হাওয়া ছুটে চলে, নহর বয়, তোর একটুখানি ইচ্ছায় এই দুনিয়া ফুলে-ফসলে ভরে উঠতে পারে। মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে, শান্তি দে তুই!'

'আল্লাহ্মা আমিন! আল্লাহ্মা আমিন! সারা জামাতে জোড়া একই কাতর আওয়াজ। হাজি কলিমুল্লার সাদা দাড়ি চোখের পানিতে ভিজ গেল। কেঁদে হাজার হয়ে তিনি দোয়া খতম করলেন, 'সোবহানা'কা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতে আশ্মাইয়াসসেফুন, আস্সালামু আলাল মুরসালিনা, আলহামুহু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন!'

এইভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন ময়দানে গিয়ে জামাতে শানিল হল ছেলে-বুড়ো-জোয়ানেরা, তাদের এক চোখ আকাশের দিকে আরেক চোখ দল কুকড়ে যাওয়া খামারের দিকে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের এক মায়ের এক পুত্রের গায়ে চুন কালি মাখিয়ে, তার মাথার কুলোয় কোলা ব্যাঙ আর বিষকাঁটালির গাছ রেখে রাতের পরে রাত মেঘখেলা খেলল, নদীর ধারে সিমি রেখে কলা পাতায় ফকির-কাকরাকে খাওয়াল। তাদের ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল ওপরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে; কিন্তু সেই রোদ চূয়ানো কাক-চক্ষু নীল, একখণ্ড মেঘের আভাসও দেখা গেল না।

মগরেবের নামাজের পর পাটিতে বসে তসবিহ জপতে জপতে এসব কথাই ভাবছিলেন হাজি কলিমুল্লা, তাঁর চোখের পুতুলিতে অবসাদের ছায়া। গভীর ভাবনার কারণ আছে বৈকি! স্ত্রীর চোরাকারবার থেকে যে কয়েক হাজার টাকা পেয়েছিলেন তার অর্ধেক দিয়ে একটা গুদাম কিনেছেন মেঘনার বন্দরে, বাকি অর্ধেক দিয়ে কিনেছেন দুই দেড়েক জমি। নিজে পাট কিনে মজুদ করতে না পারলে গুদাম কেনার ফায়দা নেই। মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়া আর কী হয়। অথচ এ বছরও গুদামটাকে নিজে ব্যবহার করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে সবগুলি জমি নিজে চাষ করেছেন। এখানটায়ই

হয়েছে চরম বোকাই। যদি পত্তনি দিতেন, তাহলে হাজার দেড়েক টাকা নগদ পাওয়া যেত, কিন্তু মুনি-মজুর ও জমির তদারক করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। বীজ বোনা থেকে এক-নিড়ি পর্যন্ত পয়সা-কড়ি কম খরচ হয় নি, ভবিষ্যতে আরও হবে, অথচ এদিকে আকাশের যা হাল, তাতে ফসল পাওয়ার বিশেষ আশা নেই।

সুতোর কারবার ছেড়ে দিয়েও ভালো কাজ করেন নি। গত বছর হাওয়া-গাড়িতে চড়ে গিয়ে হজ করে এসেছেন; ভেবেছিলেন, অতঃপর সংসারের ঝামেলাতে নিভেকে এতটা জড়াবেন না, গুদামটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে জমি-জমা নিয়েই থাকবেন। কিন্তু টাকার অভাবে সব ভেঙে গেল। আসলে ব্যবসা ব্যবসাই, এতে সং-অসংএর প্রশ্ন নেই, নিয়ং ভালো থাকলে দান-খয়রাত করলেই হল।

দানালার বাইবে থেকে আমের বোলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল, বাঁশঝাড়ে শালিকের কিচির-মিচির অনেকটা মন্দীভূত। তসবিহর গুটিগুলি চকল হ'বে ঘুবছে হাজি কলিমুল্লার আঙুলে আঙলে, এই সঙ্গে তাঁর মনটা ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

জৈগুন ঘরে বাতি দিতে এসে যেন চমকে উঠল। বলল,—‘মিয়া সা'ব এখানে? মসজিদে যান নি?’

‘না, শরীরটা খুব ভালো নয়।’ হাজি সাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—‘তা ছাড়া তোর গিন্নিমা বোধ হয় একখুনি এসে পড়বেন।’

দিন পনেরো হল নতুন গিন্নি বাপের বাড়ি গিয়েছিল নাইওর করতে, আজকে তাকে আনবার তারিখ। হাজি নিজে যেতে পারেন নি, প্রথম তরফের তৃতীয় ছেলে খালেদকে পাঠিয়েছিলেন সকাল বেলায়। আসলে বোকে বাপের বাড়িতে বেশদিন থাকতে দিতে তিনি সব সময়ই নারাজ। প্রথম স্ত্রীকে দশদিন থাকতে দিয়েছিলেন, তাও একেবারে নতুন অবস্থায়। দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলায় দিনেব সংখ্যা আরো কিছুটা বেড়েছিল। তবে এখন পড়তি ব্যেস, সব ব্যাপাবে কড়াকড়ি চলে না। দু'বছর আগে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সংসার থেকে তাঁর মন একেবারে উঠেই গিয়েছিল। কিন্তু খোদার কুদরত, কার সাধ্য তার কিনারা করে? তিনি কপালে যা লিখে রেখেছেন, তা একদিন ফলবেই। গতবার যখন হজে যাচ্ছিলেন, তার মাসখানেক আগে সবাই ধরে বসলো, এমন সোনার সংসার, একজন গৃহিণী না থাকলে কোনো কিছুই ঠিক থাকবে না।

কিন্তু পাত্রী? বয়সে ষাট পুরো হতে চলল, এখন হাতে ধরে কে নিজের মেয়ে দিতে যাবে?

‘হাসালেন হাজি সাহেব, হাসালেন। আপনার কিনা পাত্রীর অভাব?’ মজু প্রধান দাডিতে হাত ব্লিয়ে বললেন,—‘আপনি ক’ন যে বিয়ে করবেন, আমি পাত্রী ঠিক করে দিচ্ছি! তাও যেমন তেমন নয়, এমন কল্যাণ দেব, চোখে পলক পড়বে না।’

হাজি কলিমুল্লার চোখের তারা ছোটো খুশিতে চক্‌চক্‌ করে উঠল। একটা অজানা স্নেহভূতিতে তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করছিল, কিন্তু বাইবে আগাগোড়া যান হয়েই বইলেন, আগেকার সহধর্মিণীদের স্মৃতি এতো শীগগির মলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি একটা ঢোক গিলে বললেন,—‘দেখুন, তিনকাল গিয়ে এককালে পড়েছি, এখন আমোদ-আহ্লাদ করার সময় নয়। ঘরের তদারক আর—আর আমার ফাই-নরমাইশটা করতে পারলেই হল।’

‘তাতো বুঝলাম।’ মজু প্রধান যুক্তি দেখালেন,—‘ভাঙা-নাওয়েও কাজ চলে, আবার নতুন নাওয়েও চলে। কিন্তু কোন্টা আমরা চাই! কোন্টা দিয়ে গাও পাড়ি দিতে স্মথ?’

এরপর সাতকানি জমি সাফ কাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল, সে মজু প্রধানেরই মেয়ে-ঘরের নাতনী। বয়স একুশ-বাইশ বছর হবে। এ-দেশের মেয়েরা কুড়িতেই বৃড়ি হয়, সে-হিসেবে হাজি সাহেবের সঙ্গে সখস্কটা মোটেই বে-মানান হয়নি!

রান্নাঘরের হাঁড়ি পাতিল গুছিয়ে জৈগুন এল। অর্থপূর্ণ গান্ধীরের সঙ্গে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলো। হাজি সাহেবের ওজ্রিকা তখনো শেষ হয়নি। মুখের বিড়বিড় খানিকক্ষণের জন্ত খামিয়ে তিনি জিগেস করলেন,—‘কিরে, কিছ খবর আছে?’

জৈগুন বলল,—‘আছে।’

‘কি শুনি!’ তসবিহর মালায় আঙুল থেমে গেল হাজি কলিমুল্লার, তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন। কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে গোপন খবর সংগ্রহের জন্ত তিনি জৈগুনকে নিযুক্ত করেছিলেন, আর সেজন্তই এই আগ্রহ।

‘আমি আন্ড গিয়েছিলাম বাতাসীর কাছে । গিয়ে দেখি, সে তার খামিটার ডন্ড আমপাতা পাডছে । আমাকে দেখেই সে নানান কথা বলতে লাগল, কিন্তু আমি চেয়ে রইলাম এব শরিলের দিকে ।’ দরজায় একবার চেয়ে নিয়ে জৈগুন বলল,— ‘ওর ভলপেটটা বেশ ফোলা মনে হল ।’

হাজি চিন্তিতভাবে জিগগেস করলেন,—‘ওর জামাই না কবে মারা গেছে ?’

‘তা সাত-আট মাস তো হবেই !’ জৈগুন বিশেষ করে বলল, ‘কিন্তু ওর পেট মনে হল চার-পাঁচ মাসের ।’

‘তাই নাকি ? তাহলে তো বেশ অনেক দিনের ফাঁক ?’ হাজি কলিমুল্লা বেন সত্যদর্শন করেছেন, তাঁর চোখে আশার আলো ফুলে উঠল । নিচু গলায় জিগগেস করলেন,—‘আচ্ছা বাতাসীর ঘরে যে লোকটা থাকে তাকে দেখলি ?’

‘হাঁ, দেখলাম । অসুখ এখনো সারে নি, তবে আগের চেয়ে একটু ভালো । আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি সে ঘরের ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে ।’

‘তা হোক, তা হোক ।’ হাজি অসহিষ্ণুর মতো বললেন,—‘শুয়ে থাকলে কি হবে ? শুয়ে থাকলে কি আর এসব কাজ করা যায় না ? নিশ্চয় যায় । তুই কি বলিস ?’

‘হাঁ, আপনি ঠিকই কইছেন । তা ছাড়া বাতাসীর চলাফেরা আমার ভালো মনে হয় না । রজবালি বেঁচে থাকলেই এর সম্বন্ধে কত লোক কত কথা বলেছে । নামা-পাড়ার ছমু যে ওর দরজা খুলেছিল, তা কি কেউ শোনে নি । রজবালি টের পেয়েছিল বলেই না দোষটা ছমুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল । না-হলে মেয়েমানুষেব চোখঠারানি ছাড়া কি অমন কাজ কেউ করতে সাহস পায় ?’

‘যদি এই ঠিক হয়, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই । আমার বিশ্বাস, বাতাসীই এ-কাম করেছে ! না হলে বৃষ্টি হবে না কেন ?’ হাজি আবার তসবিহ জপতে লাগলেন, খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন,—‘তবু রাখ, আমি নিজে একটু পরখ করে নিই, এরপর একটা কিছু করা যাবে ।’

জৈগুন চলে গেলে আবার গভীর চিন্তামগ্ন হলেন হাজি কলিমুল্লা । তাঁর কপালের বলি-রেখা আরো কঁচকে গেলো । তসবিহর গুটিতে ঘন ঘন আঙুল চলতে লাগল । বাতাসী, বাতাসী, বাতাসী । বাতাসী ছাড়া এ-কাজ আর কারো নয় । অল্প বয়সে স্বামী মারা যাওয়ার এই দোষ ! কেননা স্বামীসঙ্গ একবার বে পেয়েছে, সে সেই স্বাদ কি সহজে ভুলতে পারে ? এ হচ্ছে আফিমের মতো, ভাত ছাড়া যায়, তবু ছাড়া যায় না এর নেশা । তা ছাড়া ওর এখন পুরো জোয়ানী । যেমন তেমন



দু' একজন পুরুষ ওর কাছে কিছু নয়, এক চোখের বাঁকা চাউনিতেই কাত করে ফেলতে পারবে। অথচ কথা বলার কি কায়দা। মামাতো ভাই, দিন মজুরি করত, কালাজ্বরের কবলে পড়ে বিপদ হয়েছে, কেউ নেই, না দেখলে চলে না। এসব কথা দিয়ে আর চিঁড়ে ভেজে না। আসলে লোকটাকে এনেছে এক বিছানায় রাত কাটাবার জন্ত—এ বুঝতে বাকি নেই।

কিন্তু এর শাস্তি হবে কী? কিতাবের হুকুম মানলে, গলা-ইশুক মাটিতে পুঁতে এব মাথায় পাথর মারতে হবে, যতক্ষণ না প্রাণটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু এ যুগে কি তা সম্ভব? খানা আর পুলিশ রয়েছে যে। তাহলে উপায়? জুতো মারা? একঘরে করে রাখা? গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া?

হাজি কলিমুল্লা যখন এসব ভাবনায় তন্ময় হয়ে ছিলেন, তখন খালেদ তার নতুন মাকে নিয়ে মরা-গাঙের পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুণিমা-চাঁদ দেখা দিয়েছিল বাড়ি থেকে রওয়ানা দেয়ার অনেক আগেই, এইশার তা বাঁশ ঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠে ঝলমল করছে। চারদিক নিবাসুম, গাছ-পালায় বাতাসের নড়াচড়ার গরজ নেই।

মরা-গাঙে এখন হাঁটু পানি। দুই পাশে কাদা ঠেলে ডাঙার সঙ্গে যে সরু পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুরু ওপব দিয়ে ঝিরঝির করে কেটে চলেছে ফোয়ারার স্রোত। পানির ভিতর থেকে গুঁড়িয়ে ওঠা বোরো খেতগুলিতে কচি ধান-পাতার জড়াজড়ি।

নীচু হয়ে জুতো-জোড়াটা ডানহাত দিয়ে খুলে ফেলল জোহরা। তার কাঁধে ছোট ছেলেটা। তার অস্থবিধে হচ্ছে দেখে পিছন থেকে খালেদ পাশে এসে বলল,—‘সাজুকে আমার কাছে দিন।’

ওরা দুজনে প্রায় সমবয়সী। প্রথম প্রথম ‘আপনি’ বলতে লজ্জা করত খালেদের, কিন্তু এখন আর সে-ভাবটা নেই।

জোছনায় আলোকিত বড়ো ছেলের মুখের দিকে চাইল জোহরা, টানা ভুরু নীচে ওর সুন্দর চোখ দুটো আরো সুন্দর মনে হল তার, একটা অব্যক্ত অহুভূতির চলছলানিতে বনের অন্ধকারে শিহরিত নদীর মতো তুলে উঠল বুকুর ভিতরটা। আচ্ছন্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল,—‘তোমার কষ্ট হবে না তো?’

খালেদ হাসলো। বলল,—‘না, এ আবার কষ্ট কি?’

সাজুকে পাঁচ বছরের রেখে ওর আশ্রা এস্তেকাল করেছেন হু'বছর আগে, আদর বহু না পাওয়ান ওকে কান্নারোগে ধরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। নতুন মাকে

তার এমনি ভালো লেগেছে যে, সে এক মুহূর্তের জন্তও তার কাছ-ছাড়া হয় না। জোহরা যখন নাইওয়ার করতে যায়, তখন ও তার কোলে উঠে চলে গিয়েছিল।

অত্র কাঁধের ওপর থেকে অথোরে ঘুমিয়ে থাকা ছোটো ভাইটিকে নিজের কাঁধে নিতে গিয়ে খালেদের মনে হল, কপোতের বৃকের মতো উষ্ণ, প্রবালের মতো কোমল কিশোর মধ্যে যেন তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি ক্ষণিকের জন্ত হঠাৎ হাওয়ায় চাঁপার কলির মতো কাঁপুনি খেয়ে গেল। নিমেষে তার সমস্ত শরীরটা শিঁ শির করে উঠল ভরামেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো। পলকের জন্ত তার চোখে পড়ল, সহসা কেমন রাঙা হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, তার সারা চেহারায় রক্তের প্রবাহ বহির মতো ছড়িয়ে গেল। খালেদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না; আরেক জন্মের কোনো নিবিড় স্মৃতি অস্পষ্ট মনে পড়ার মতো কী এক অজানা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিরঝিরে পানির উপর দিয়ে স্তম্বে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু জোহরা দাঁড়িয়েই রইল। কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে তাঁদের দিকে মূগু উঁচিয়ে চাইল একবার, আবার চাইল সামনে চলমান মূর্তিটার দিকে। এরপর সে চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই রূপালি বালুর ওপরে ফোয়ারার স্রোতে বয়ে চলা রাস্তাটায় ত্রস্ত হরিণীর মতো পা ফেলে হাঁটু পানির কাছে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছন থেকে শাড়িটা কুঁচকে এনে ডান হাতে হাঁটুর কাছে ধরা, ভোছনা-উছল কালো পানির দিকে মুখ নিচু করে জোহরা দেখল, তার মূর্তিটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, এই সঙ্গে ছোটো ছোটো টেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে তাঁদের চেহারাও। হঠাৎ মুখ তুলে সে ডাকল,—‘খালেদ!’

‘কি!’—কিছুদূর থেকে খালেদ সাড়া দিল।

‘আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছে।’—স্বপ্নের স্বরে যেন জোহরা বলল,—‘আমি চলতে পারছি না। দেখ, দেখ। পানিটা কি সুন্দর!’

খালেদ ফিরে এল। বলল,—‘আপনার কি হয়েছে বলুন তো, চলুন তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।’

‘ও তাইতো। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে!’ পানি ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল জোহরা। ঝিলঝিল টেউয়ের দিকে চেয়ে বলল,—‘দেখছ, কি সুন্দর পানি! এমন পানিতে মরতেও সুখ।’

কোনো জবাব দিল না খালেদ, মুখ নীচু করে চূপচাপ এগুতে লাগল।

ওপারে কোথায় একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে—‘বৌ কথা কও।’

নদী পেরিয়ে এসে চপ্‌চপ্‌ পানি থেকে পা ছুটো ঝাড়া দিয়ে দিয়ে নতুন জুতো-

জোড়াটা পরার সময় জোহরার মনে হল তার বুকের ভিতরে কিছু নেই, বিবাগী হাওয়ার মতো কিসের এক রিক্ত হাহাকার গুমরে গুমরে মরছে। নিজেই কথ্য ভাবেই সে আঁতকে উঠল, তার শরীরটা ঝিম ধরে অবশ হয়ে এল।

খালেদ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। পিছন থেকে সে একটা কাতর-স্বর শুনতে পেল,—‘একটু দাঁড়াও!’

‘আবার কি হল আপনার!’

‘কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না! আমার চোখ দিয়ে এমন পানি পড়ছে কেন? জোহরা ব্যাকুলভাবে এগিয়ে গিয়ে খালেদের চোখের সামনে নিজের দুটো চোখ বিস্ফারিত করে দাঁড়াল, চাঁদের আলোয় দেখা গেল, তার টলটলে দুটো চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

খালেদ আবার উচ্চারণ করল,—‘কি হল আপনার?’

‘তুমি কিছু জান না, কিছু বুঝ না!’ কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে জোহরা অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল,—‘সাজকে দাও আমার কাছে। চল শীগগির। লোকজন নেই, আমার বড্ড ভয় করছে।’

ওরা যখন মুখোমুখি হয়েছিল, তার কিছু আগে থেকেই কিংকং হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, আর যখন চূপচাপ চলতে শুরু করল, তখন এক খণ্ড ঈষৎ কালো মেঘ দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসতে লাগল। খড়ম পায়ে উঠানে পায়চারি করছিলেন হাজি কলিমুল্লা, আকাশের দিকে চেয়ে তিনি চমকে উঠলেন। তাহলে তার আন্দাজই ঠিক?

‘জৈগুন! ও জৈগুন!’ তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,—‘দেখে যা, আমরা যা ভাবছি তাই ঠিক। আশমানে সাজ দেখা দিয়েছে।’

জৈগুন চৌকাটের কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললে,—‘তবু তো আপনি বলছেন আরো পরখ করতে। আমার মনে কোনে স্বা-সন্দে নাই। বাতাসী যা ছিনাল।’

আকাশে চলমান মেঘটার দিকে চেয়ে আবার পায়চারি করতে লাগলেন হাজি কলিমুল্লা, এর বিচারটা কি হবে তিনি তার কিনারা করতে পারছেন না।

আধ ঘণ্টা পরে জোহরা যখন এল, শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতেও বার বার বার তাল কেটে যেতে লাগল, অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না!

মনস্থির করে পরদিন সকালে তিনি গিয়ে উঠলেন বাতাসীর বাড়িতে, পূর্ব পাড়ার আম বাগানের ওধারে। বাঁশের চালার নীচটায় পাকালের ধারে বসে ও খুঁদের জাউ রাখছিল, হাজি সাহেবের সাড়া পেয়ে একটা চৌকি হাতে উঠানে এল। এমন

গণ্যমান্য লোক, সাত জন্মে একবার এসেছেন ওর এখানে, কি দিয়ে মেহমানদারি করবে সে ঠাহর করতে পারল না।

মাথায় কাপড় টেনে ও কি বলছিল সেদিকে হাজির মোটেই নজর ছিল না, তিনি গোপন আড়চোখে হরিভ্রাভ লাবণ্য-স্নিগ্ধ ওর দেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

এদিকে বাড়ির নাশতা-পর্বের তদারক শেষ হওয়ার পর জোহরা গুম হয়ে বসেছিল তার শোবার ঘরে চৌকির কিনারায়।

বিয়ে হওয়ার পর থেকে কিসের যেন এক আশ্চর্য মায়ার বিনা কাজের সময়টুকু সে এখানটায় বসেই কাটিয়ে দেয়। এ কিসের জাহু? কিসের মন্ত্রণা? জোহরা তা বুঝতে পারে না। বাড়ির চেহারা বোধ হয় অনেক দিক থেকেই অদল-বদল হয়েছে, কিন্তু এ কামরাটায় কোন পরিবর্তন নেই, দিনে দিনে নতুন জিনিস যোগ হয়েছে মাত্র। আগেকার গিল্লিদের হাতের ছাপ অনেক কিছুতেই এখনও টাটকা হয়েই আছে, অঙ্ককারে বসে থাকলে তাদের ঠোঁটের ফিস্‌ফিস্‌ আলাপ যেন সে শুনতে পায়। তখুনি ওর মনে হয়, এঘরে ঢোকবার কোনো অধিকার নেই, এখানকার সব দখল করে সে ডাকাতের কাজ করল।

‘কিন্তু আমার কি দোষ? আমি তো রাজি হতে চাইনি? নানা বলল, বোন, কাঁদিসনে, দু’একটা বছর সবুর কর, বুড়োটা মরল বলে। তখন বেশ জোয়ান দেখে একটা বর জুটিয়ে দেব। এখন সম্পত্তিটা হাত করে নে।’ জোহরা আপন মনে আওড়াল,—‘ছাই সম্পত্তি।’

দগদগে ঘা’র ওপর দিয়ে গরম বাতাস বইতে থাকলে ঘেমন করে জলে, তার বূকের ভিতরটা তেমনি করে জ্বলতে লাগল। দম যেন ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে। এক সময় সে প্রায় চেষ্টিয়ে উঠল। ওর চোখের দুটো তারায় জ্বলজ্বল করতে লাগল একটা ছুঁবিনীত বস্তুত।

মগজটা গিস্‌গিস্‌ করছিল, এলোচুলে ঝাঁকড়া মাথাটা একবার ঝাড়া দিয়ে জোহরা বাইরে চলে এল। চোখ তুলে চাইতেই ওর দৃষ্টি পড়ল কুয়ার ধারে মেহেদি গাছটার দিকে, ভিজ্জে মাটির রসে তাতে ঘন হয়ে কচিপাতা দেখা দিয়েছে।

ক'দিন সংকল্প করেও সে এই মেহেদি গাছটা কাটতে পারে নি। কিন্তু আজকে ডান হাতটা শিশু শিশু করতে লাগল। ত্রস্ত পায়ে সে চলে গেল রান্নাঘরের ভিতরে। সেখান থেকে ধারাল বঁটিটা এনে একেক কোপে একেকটি ডাল কেটে ফেলতে লাগল।

‘আহা হা, করেন কি গিন্নিমা’—জৈগুন দৌড়ে এল। বলল,—‘গাছটা অনেক দিনের, মানুষের মত কাজে লাগে। কর্তা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।’

‘তুই এখান থেকে যা তো। কে রাগ করবেন না করবেন, তোর চাইতে আমি ভালো বুঝি। আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি কাটবোই।’

‘আমি কাম করে খাই, আমার কি? আপনার ভালোর জন্তুই বলছিলাম।’

‘আশ্চর্য!’ জোহরা মুখ তুলে চাইল। বলল,—‘আমার ভালো মন্দের চিন্তা তোকে করতে হবে? ছুনিয়াতে আর লোক নেই!’

কর্তার প্রিয় গিন্নিকে খাটাতে সাহস করল না জৈগুন, মুখ কালো করে সে নিজের কাজে চলে গেল।

কেমন করে ছপুন্ন হল, কেমন করে এল বিকেল, আর কেমন করেই বা রাত্রি এসে পৃথিবীর মুখ ঢেকে দিল, জোহরা কিছুই বলতে পারবে না। তার হৃদয়ের একটা অংশ কে যেন ঝকঝক ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে, প্রতিদিনের উচ্ছল চেউ সেখানে লাগে না, সেখানে তুষের আগুনের মতো শুধু একটি জ্বালা।

এশার নামাজের পর বিছানায় শুয়ে হাজি কলিমুল্লা বললেন,—‘যা ভেবেছিলাম, বাতাসীই কুকাম করছে।’

‘কেমন করে জানলেন?’—জোহরা শুধাল।

‘এ সব জানতে কি আর খুব বুদ্ধি লাগে? তারে ঠিকমত যা দিলাম আর তা বেজে উঠল। ব্যস, আর ভাবনা নেই। বিচারটা করতে পারলে বিষ্টি হবেই।’ হাজি একটুখানি নীরব থেকে বললেন,—‘আগামী শুক্রবারে রাত বারোটার পর বিচার বসাব। দেখা যাক কী হয়।’

জোহরা চূপচাপ শুয়ে বাইরের দিকে কান পেতে রইল। আমের বোলের গন্ধ এমন মাতাল কেন? রাত কেন এমন কালো, অন্ধকার? সূর্য যদি আর না উঠত তাহলেই ছিল ভালো, সবার চোখের আড়ালে চির দিনের জঞ্জ সে হারিয়ে যেত, যেখানে কেউ থাকবে না।

কশালে কোমল হাতের হোঁয়া পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু করলেন হাজি কলিমুল্লা। ওই শব্দটুকু বাদ দিলে, জোহরার মনে হল, তার

পাশে শুয়ে আছে একটা মৃতলোক, বুক থেকে পা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। সে কোমল হাতটা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ চূপ হয়ে রইল। এরপর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। অতি সন্তর্পণে খিলটা খুলে উঠানের একপাশে আমগাছ-তলায় এল।

‘সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি?’ খালেদ চূপি চূপি বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সাঁ করে তার সামনে গেল জোহরা, চাপা-গলায় বলল,—‘আমি আর এত কষ্ট সহিতে পারব না। বাড়ি থেকে চলে যাও, চলে যাও তুমি!’

কাপড় দিয়ে মুগটা ঢেকে ও প্রায় দৌড়ে উঠে গেল বারান্দায়, ধরের ভিতরে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

খালেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তার হুই চোখ থেকে বন্ববন্ব করে পানি পড়ছে, কর্তরোধ হয়ে আসছে। ভোর বেলায় অন্তেরা ঘুম থেকে ঞঠার আগেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, নদীর ধারে ধারে জমির আলের ওপর দিয়ে মিছিমিছি সে হেঁটে বেড়াল, এর পর চলে গেল বন্দরে, তার বড় হুই ভাই সেখানে কাজ করেন, সেই গদিতে; কিন্তু কোথাও মন টিকলো না। শেষ পর্যন্ত কী যেন অজানা আকর্ষণে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছিল।

শুক্লাবारे রাত বারোটা বেজে গেলে একে একে সবাই হাজির হল মোলানা মহীউদ্দিনের বৈঠকখানায়। এর আগেই কানাবুযার মারফতে ব্যাপারটা সারা গ্রামে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার তো আর বিচারের ক্ষমতা নেই? আজকের মজলিস শুধু গ্রামের আলেম মওলী ও মাতব্বরদের নিয়ে। দরজা-জানালা বন্ধ করার পর আসামীদের মাঝখানটায় বসিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন।

তিনদিন তিনরাত্রি হাদিস-কিতাব ঘেঁটে একটা ফতোয়া তৈরী করেছিলেন হাজি কলিমুল্লা। মোলানার অহুমতি নিয়ে তা পড়ে শোনালেন।

বাতাসী অনেক আগে থেকেই বিনিয়ে গুনিয়ে গুনগুন করছিল, এবারে ডুকরে কেঁদে উঠল। বিলাপ করে বলতে লাগল, ‘ও মা গো, এ-ও আমার কপালে ছিল গো! ঐতুড়ঘরে কেন মুখে হুন দিয়ে মেরে ফেললে না গো!’

‘এই বেটি, কান্না থামা!’ হাজি ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন,—‘সে সময় বৃষ্টি খুব ফুঁটি লেগেছিল?’

মৌলানা মহীউদ্দিনকে বেশ চিন্তিত মনে হল। তাঁর সৌম্য মুখমণ্ডলে বেদনাজুর গাঙ্গীর্বের কাস্তি। ধীরে ধীরে মুখ তুলে শাস্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন,—‘কিগো, তোমার কিছু কওয়ার আছে?’

‘কি কইব বাবা, আপনারা তো গরিবের কথা বিশ্বাস করেন না। আমরা তো মানুষ নই, কুকুর বেড়াল! আমাদের আবার ইজ্জত কি!’ বাতাসী চোখ মুছে বলল,—‘না হলে এমন বদনাম আপনারা আমার উপর ফেলতে পারতেন!’

‘কিন্তু এসব কথা তো আর আশমান থেকে পড়ে না!’ হাজি কলিমুল্লা বললেন,—‘অন্ত কারো নামে তো ওঠেনি?’

‘সে আমার কপালের দোষ। না হলে, ও বেঁচে থাকতেই আমি কতবারা বমি করেছি, প্রতিরোজ পোড়ামাটি আর তেঁতুল না খেয়ে থাকতে পারিনি—এসব জিনিস কারো চোখে পড়ল না!’

একটা ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে বসে কৌকাচ্ছিল বাতাসীর মামাতে ভাই রহিমদি। তাকে সওয়াল করলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

বিচারের আলোচনা যখন এগিয়ে চলছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে পালে পালে কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। চাঁদ বারে বারে আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও খামারে নদীতে আলো-ছায়ার লুকোচুরি।

এক সময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি। ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে গুরু গুরু আওয়াজ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চমকাল বিদ্যুৎ। ঘরের ভিতর সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এমনি সময় হাজি সাহেবের বাড়ির পিছনটায় আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মাহুঘের ছায়াযুতি। পা টিপে টিপে খোলা জানালার কাছে এসে অনেকক্ষণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, ঘরের ভিতরে আলো নেই; নাম-না-জানা অরণ্যের ভিতর কোন প্রেতপুরীর মতো সমস্ত বাড়িটা রুদ্ধ-নিখাসে কিম্ব ধরে আছে।

জানালা থেকে সরে এসে মূর্তিটা ভিটির ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করল, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একেবারে বিজলি চমকায়, আর সে যেন শিউরে ওঠে গভীর আতঙ্কে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস বহিতে শুরু করল, মেঘে মেঘে সংঘাতে গর্জনে চারিদিক তোলপাড় হতে লাগল। দরজাটা হয়তো ভেজানো ছিল, আচমকা দমকা হাওয়ায়

তা সশব্দে খুলে গেল। মাহুঘটা ব্রহ্ম পদে এসে উঠল বারান্দায়। এদিক-ওদিক খানিক চেয়ে এক সময় সরিয়া হয়েই যেন ঘরে ঢুকে পড়ল। ওপরে নীচে কেবল শব্দ, শব্দ আর শব্দ। জোর বাতাসের তোড়ে একেবারে মোচড় খেয়ে ওঠে করগেটের চালগুলি, কাঠের বেড়ায় অবিরত ধূপধাপ আওয়াজ।

খাটের কাছে এসে ইতস্তত করতে লাগল মাহুঘটা, কি করবে যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। শরীরে রোমগুলি কাঁটা দিয়ে উঠেছে, চিবচিব করছে হৃৎপিণ্ড, চিন্‌চিন্‌ করে মস্তিষ্কে রক্ত উঠে চোখ ছুটো বাপসা করে দিচ্ছে। তার ভাবনা, কোথায় এল সে। একি জন্ম, না মৃত্যু? একি সব হারানোর হাহাকার, না মিলনের উন্নত সংরাগ? কান পেতে সে যেন শুনল, চুড়ির রিনিঠিনি; একটি গভীর শাস্ত নিশ্বাস, কাপড়ের মৃদু খসখস। ভ্রাণ আসছে, একি আমার বোলের, না চুলের গন্ধ? না, না, এখানে নয়। এ তো সে চায় না, চাইতে পারে না।

এক পা ছুঁপা করে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অল্পভব করল, একটা সুপুষ্ট নগ্ন মস্তক হাত অন্ধকার থেকে উঠে এসে গানের কলির মতো পরম আধামে তার হাতকে আকর্ষণ করল।

তখন সমস্ত আকাশে মেঘেদের ছড়োছড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মস্ত-গর্জনে একেবারে কঁপে কঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। একটানা বড়ের তীব্র বেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা, মত্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুণ্ঠনের উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতায়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল মছন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্চকিত শব্দের ভয়ঙ্কর-সুন্দর রাগিণী।

এইভাবে কতক্ষণ ঝড় চলল হয়তো কেউ বলতে পারবে না। বাতাস যখন কমতে লাগল, কখন অযুত মুক্তাবিন্দুর মতো নামল বৃষ্টি।

ধারাল হাওয়ার সঙ্গে প্রথম যখন বৃষ্টি নামল, তখন তাতে রইল শুধু নবজাতকের বিকোভ, ঘর-বাড়ির ওপর দিয়ে শুধু ঝর ঝর ঝাট্টা দিয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ এ রইল না। ঋপদ সংগীতের বিলম্বিত লয়ের মতো বাতাস যতই কমতে লাগল, বর্ষণে ততই এল নিবিড়তা। এর পর শুধু ঝমঝম শব্দ।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানা নেই। এক সময় খোলা দরজা পার হওয়ার পরে উঠানে নেমে বৃষ্টির মধ্য দিয়েই টলতে টলতে উত্তর ভিটির ঘরের ভিতরে অদৃশ হয়ে গেল মাহুঘটা। তার পিছনে পিছনে এসে জোহরা এলোমেলো কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীর ভিজে যেতে লাগল বৃষ্টির ছাঁটে।

খানিকক্ষণ পরে একটা ছাতা মাথায় ঝাড় নীচু করে ধুকতে-ধুকতে বাড়িতে



চুকলেন হাজি কলিমুল্লা। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে জোহরা বলে উঠল,—‘অত  
দেরি যে! আর এদিকে আমার বড্ড ডর লাগছে।’

‘কি আর করি বল, আপদ চুকিয়ে এলাম!’ ছাতাটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে  
হাজি বললেন,—‘সে একটা পাড়-হারামজাদী, শেষ পর্যন্ত কিছুতেই দোষ স্বীকার  
করল না। কিন্তু বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফা-ফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না?  
ঢটোকে দিলাম পঞ্চাশ জুতো করে, তার ওপর কালকে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে।  
দেখলে আল্লার রহমৎ? সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল!’

‘হ্যা, তাইতো বড় তাজ্জব ব্যাপার!’ কথাটা শেষ করে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে  
শারান্দা থেকে উঠানে নেমে গেল জোহরা, তার অঙ্গভঙ্গি রহস্যময়।

হাজি হৈ হৈ করে উঠলেন,—‘আরে, আরে করছ কি? তুমি পাগল হলে  
নাকি? এত রাত্রে ভিজছ, সর্দি করবে যে!’

‘না, সর্দি আমার কোনো কালেই করে না।’ জোহরা বারান্দার কাছে এল।  
চোখের উপর থেকে একরাশ চুল ডান হাতে সরিয়ে ফোটা-ফুলের মতো উচ্ছল মুখটা  
ভুলে মধুর হাসি-ওপচানো-ঠোঁটে বললো,—‘আপনি জানেন না? বছরের পয়লা  
বিষ্টি, ভিজলে খুব ভালো। এতে যে ফসল হবে।’





ইস্কুল নিয়ে এতো কাণ্ড। অথচ সবাই নির্ধিকার।

বাঘবন্দী খেলাটা জমে উঠেছে টুহু আর সানির মধ্যে। চারপাশে গোল হয়ে বসেছে আর আর ছেলেমেয়েরা। সানি হারছিলো বাঘ নিয়ে। হুখো খাচ্ছে এখন, ছোঃ, ও আবার একটা বাঘ নাকি? মরা কেঁদো। ছাগলের গুঁতোতেই ত্রিভুবন পার।

এরই মধ্যে একবার পেছনের দিকে চেয়ে নিয়ে হঠাৎ রাগু বলে উঠলো, ত্রিভুবন পার করাচ্ছে, দাঁড়াও! ছাগল-থেকো শাক আসছে!

ক্রফের নিমেষে ভেল্কি খেলে গেল। বাঘ-ছাগল এক সাথে ছিটকে দলের সবচেয়ে ছাংলা ছেলে রাশু ছেঁড়া 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগ খুলে স্বর ধরে দিলো, হুস্ব-ই ট ই-ট, হুস্ব-উ ট উ-ট।

ক্রফের কোণটা মুখের ভেতর গুঁজে দিয়ে মিটমিটিয়ে রাগু বললো, দিই বলে? পুঁইশাক আজ চিবিয়ে থাক তোদেরই।

সবকটি চোখ একবার ওঠা-নামা করলো। না, পুঁচকে ছুঁড়িটাকে আব জন্ম করার সময় নেই। পুঁইশাক এখন আঙিনার মধ্যে।

পুঁইশাক অর্থাৎ জমীর পণ্ডিত এসে পড়লেন। মাছারি গোছের আধমোটা, গৌরবর্ণ মান্নুষটি। মুখে একরাশ সাদা দাড়ি। বড়ো বড়ো চোখ দুটি শুকতারার মতো দপ্ দপ্ করে। সাধারণত সবাই ডাকে 'পণ্ডিত সাহেব' বলে। চাষীঘরের ছেলেমেয়েরা সংক্ষেপে বলে, 'পন সাব'। এর থেকে কবে যেন ঠিক মনে পড়ে না এখন আর, কোন ছুঁই ছেলে প্লেটের আড়ালে মুখ লুকিয়ে উপনামটা প্রথম উচ্চারণ করেছিলো, পন সাব না, পুঁইশাক।

জমীর পণ্ডিতকে দেখে পড়তে পড়তেই উঠে দাঁড়ালো সবাই। চোখ তুলে চাইলো একবার। ভাঁজভাঙা পুরোনো কোট, ফ্যানে-কাচা সাদা লুঙ্গি। কাঁচা চামড়ার পানাইয়ের বদলে পায়ে আজ মোটর-টায়ারের স্কাপোল। চোখ আর নামতে চায়না কারো।

একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ধমকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, পিট্ পিট্ কবে দেখেছিস কি, উদবেড়ালের দল? দরজা খোল্। সেকেও পণ্ডিত আসেনি এখনো?

ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে রাশু সবিনয়ে বললো, চাবি, প'ন সা'ব।

চাবি দিতে গিয়ে একেবারে আঁতকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, এঁ্যা, করেছিস কি, গাধার দল? শাকুলো মোটে তেরোজন? বলি, আমি কি শেয়ালপণ্ডিত যে, ইন্সপেক্টর-কুমীরকে তিরিশিজন দেখিয়ে দেব? বেরো, হতভাগারা। বেরো এখন থেকে।

বেকলো না কেউ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। শেয়াল-কুমীরের গল্পের প্রসঙ্গে হাসি আসছিল ওদের। ধমক শুনে সেটাও চেপে যেতে হল।

পণ্ডিত 'হায় হায়' করেই চলেছেন, সব গেল, স-ব। নিজেও মলো, আমাকেও মাবলো। ঘুণ লাগুক এমন ইস্কুলে।

রাশুই উঠে দাঁড়ালো সাহস করে, প'ন সা'ব, যাই না বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে আনিগে। টুহুও শাক আমার সাথে।

এক মুহূর্ত চূপ করে রইলেন পণ্ডিত। তারপর আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরলেন রাশুকে। হাত বুলিয়ে আদরে আদরে ভরে দিলেন মাথাটা, আহা-হা বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। আমার চুল-দাড়ির মত পরমাযু দিক তোকে আন্না। বড়ো ভালো বুদ্ধি বার করেছিস। শীগ্গির যা। আঁটকুড়ের বেটা খাবার বেলা একটার মধ্যেই এসে পড়তে পারে। আর, দেখবি তো, সেকেও পণ্ডিতের কি হল?

রাশু-টুহু বেরিয়ে গেল এক দৌড়ে।

পণ্ডিত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাক দিলেন, রাশু, শীগ্গির বাস খোল্। নামের খাতা বার করিসনি এতক্ষণও?

রাশুর দোষ নেই। চাবি পায়নি। কিন্তু জমীর পণ্ডিতের আজ আর ত্তর সইছে না। না সরবারই কথা। চল্লিশ বছরের ইস্কুল। এর প্রতিটি দিনের স্বতিতে স্বাক্ষর রয়েছে জমীর পণ্ডিতের। মা যেমন শিশুকে মাহুষ করে তোলে,

তিনিও তেমনি তৈরী করে তুলেছেন এই ইক্কুলকে। একে কি ছাড়া যায়, না ভোলা যায়? অথচ ষড়যন্ত্র চলেছে তারই।

আইন হয়েছে নতুন, জমীর পণ্ডিত স্তনে পান,—সক্রোধে বিক্রম করে বলেন, আইন নয়, পাগলা বাইন মাছ ছাড়া পেয়েছে, আঁচড়ে বেড়াচ্ছে,—ঘন ঘন পাঠশালা রাখা চলবে না, কোনো এলাকায়, যদি না ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষক থাকে। সাহায্য করা হুঃসাধ্য, ব্যবস্থাও অনিয়ন্ত্রনীয়। স্ততরাং দুটে চারটে এবার উঠিয়ে দিতেই হবে।

বাজারে গুজব,—রটিয়েছে ওই নতুন পাড়ার ছোঁড়াগুলো, যারা হুজুগ করে একটা পাঠশালা খাড়া করেছে এই সেদিন, যত রাজ্যের বোকাগুলোকে ধরে এনে বিনে পয়সায় মার্টার বানিয়েছে,—হ্যাঁ, বাজারে গুজব, জমীর পণ্ডিতের ইক্কুল এবার উঠেই যাবে। কারণ, পণ্ডিতের মতো ইক্কুলও এখন জীর্ণ। চৈত্রের পদ্মার পাড়ির নীচে হাওয়া লেগে বুর বুর করে বালি ঝরে পড়ে, গাঙশালিকগুলো বেগতিক দেখে গর্ত ছেড়ে উড়ে পালায়। ওই উপমাটাই লোকে ইক্কুলের উপর প্রয়োগ করে। দেওয়ালের বালি ঝরছে তো ঝরছেই হাওয়ায়, হয়তো বা পণ্ডিতের বিশ্বাসেও। ছেলেমেয়েরা সরে পড়েছে একে একে। পণ্ডিত সাহেব,—গ্রামীণ সংক্ষিপ্ত রূপ প'ন সা'ব,—এবার আপনিও সরে পড়ুন,—আড়াল-আবডাল থেকে দুষ্টলোকের কথা শোনা যায়, বাতের ব্যথাটা আর বাড়াবেন না এই বয়সে ইক্কুলে বসে থেকে। এদের নাকি ষড়যন্ত্র,—ইন্সপেক্টর পাঠিয়ে তদন্তের নামে একটা শাক-দিয়ে-মাছ-ঢাকা কাণ্ড করা। কিন্তু দেখে নেবেন জমীর পণ্ডিতও, কার পেটে কটা 'ক'। অমন অনেক ইন্সপেক্টর তাঁর দেখা আছে। অনেক ঘুঘু দেখেছেন তিনি। আজকালকার এরা আবার জানেই বা কি?

চিন্তায় থম্ থম্ করে পণ্ডিতের মুখখানা। রাশু-টুহুকে আদর করতে দেখে ছেলেমেয়েরা সাহস পেয়েছিলো একটু। আবার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। পড়াশোনায় অবধি ভুল হয়। কিন্তু জমীর পণ্ডিত সামান্য ধমকটিও দেন না।

ইক্কুলের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। ফসল নেই এখন, চষা-মাটির বৃকে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু ছোটো-বড়ো-মাঝারি টেলা। প্রথর দৃষ্টিতে মনে হয় বেলে পাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে বুঝি বা। মাঝে মাঝে বাবলা আর শিমুল গাছ! দূরে, বেশ খানিকটা দূরে পদ্মার ধু-ধু চর। আশে-পাশে গায়ের মাঙ্কষের আশাপীঠ ওই মাঠ আর চর। চাষ করে ছেড়ে দিয়ে গেছে। কি ফসল ফলাবে কে জানে।

ইস্কুল ঘরের দিকে তাকিয়ে জমীর পণ্ডিতের মনে হয়, এটাও যেন একটা মাঠ। কতদিন থেকে জ্ঞানের চাব করে আসছেন তিনি এখানে। আশা করেছেন মানুষের 'ফলন' আনবেন। মাঠ এতদিন ফসল দিয়েছে, ইস্কুলও। কিন্তু এবার কি হবে? ইস্কুল সম্বন্ধে এবার এ-চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকেছে, বিশেষ করে ইন্সপেক্টর আসার পর থেকে।

: পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন?

চিন্তায় বাধা পড়লো জমীর পণ্ডিতের। চকিতভাবে পেছন ফিরে দেখলেন, জানালার পাশ থেকে ঊঁকি দিয়ে কথা বলছে ওপাড়ার হাশিম। নতুন পাঠশালার এক নম্বর পাণ্ডা। প্রশ্নটা বিদ্রূপের মতো মনে হল তাঁর কাছে। বললেন, গুরু চরাচ্ছি। ইস্কুলে আর কি করে লোকে?

হাশিম একটু অপ্রস্তুত হল; কিন্তু সামলে নিল পরমুহূর্তেই, তওবা, তওবা, কি যে বলেন আপনি। ছেলেমেয়ে কাউকে দেখছেন কিনা। তাই ভাবছিলাম,—

একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলো, তা আজকাল আর বৃষ্টি কেউ আসে না? সেকেণ্ড পণ্ডিত সাহেবকেও দেখছেন।

ইন্সপেক্টর আসার পর থেকে একটু সকাল-সকালই আসেন জমীর পণ্ডিত। আশা নেই, বেশি করে খেটে ইস্কুলটাকে ভালো করে তুলবেন। কিন্তু অবস্থা খারাপ দেখে সেকেণ্ড পণ্ডিত প্রায়ই ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকেন আজকাল। আর, ছেলেমেয়েরা আসে সেই আগের মতোই দেরী করে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়ে, বাড়ির কাজ-কর্ম যথাসম্ভব সেরে তবে আসে। ধমক দিয়ে লাভ হয় না, দেওয়ান উচিতও নয়। সংসারের অভাব-অনটন উপেক্ষা করে, কাজের চাপ লাঘব করে ওরা যে ইস্কুলে আসতে পারে শেষ পর্যন্ত, এই-ই তো অনেক। কিন্তু এসব কথা রাগ দেখিয়ে শোনানো চলে না হাশিমকে। বললেন, আসেনি এখনো, আসবে। সময় হলে তবে আসবে। ইস্কুল চালাচ্ছো হৈ রৈ করে, আর এটুকুও জানো না।

হাশিম এবার মুখ-চোখ করুণ করে বললে সহায়ভূতিতে, পণ্ডিত সাহেব, ভুল বুঝছেন কেন আমায়? আপনার চেয়ে বেশি বৃষ্টি, এমন কথা বলে বেয়াদপি করতে চাইনে। এই ইস্কুলটা উঠে যাক, একি আমরা কামনা করতে পারি? হাজার হলেও একই গ্রামের ইস্কুল তো। ইস্কুল যতো বেশি হবে, লেখাপড়াও ততো বেশি শিখবে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা। গাঁয়েরই উন্নতি হবে।

জমীর পণ্ডিত তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন, ইন্সপেক্টর তোমাদের ওখানে গিয়েছিলো, না?

: হ্যা, আপনার এখানে কি বলে গেলো ?

: বলবে আর কি ? একি আর কানে কানে বলবার কথা ? বা বলবে, সবাই জানতে পারবে ।

জওয়াব দিয়ে জমীর পণ্ডিত ভাবলেন, এ মন্দ হল না, জওয়াব দেওয়াও হল, এডিয়ে যাওয়াও হল । ইন্সপেক্টর যে কি বলবে, তা এখনো জানা যায়নি । ভালো কিছু যে রিপোর্ট দেবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও খারাপ কিছু যে বলবে না, এমন আশা তিনি করতে পারেন । তার কারণ, ইন্সপেক্টরটিকে অত্যন্ত ভদ্র বলে মনে হয়েছে তাঁর । কাজও জানে । যতক্ষণ ইস্কুলে ছিলো, রীতিমতো সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতিময় ব্যবহার করেছে তাঁর সঙ্গে । পাকিস্তানী আমলের হঠাৎ প্রমোশন পাওয়া ইন্সপেক্টরদের মধ্যে এত গুণ তিনি এর আগে আব দেখেন নি ।

অবিশ্বি, একটা বিষয়ে খটকা রয়েছে তাঁর মনে । ইন্সপেক্টররা এসেই চা-নাশতা চেয়ে বসে এখন । সে জন্তে এবার আগে থাকতেই চা আনিয়ে রেখেছিলেন রাণুদের বাড়ি থেকে । ইন্সপেক্টর খাতাপত্র দেখবার সময় জমীর পণ্ডিতের ইঙ্গিত মতো রাণু এগিয়ে দিয়েছিলো মিষ্টি, ফলমূল আর ফ্লাস্কেব চা । কাপে মুখ লাগিয়ে অন্তমনস্কভাবে ইন্সপেক্টর বলেছিলো, বেলের সরবৎ গরম কেন ?

রাণু মেয়েটি মুখরা । স্মিতমুখে চট করে বলে উঠেছিলো, না সার, এখো গুড়ে পানা ।

এক মুহূর্ত রাণুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ইন্সপেক্টর হেসে বলেছিলো, তাহলে তো ছোবড়া বেছে খেতে হবে । আখ মাড়াইয়ের কলটা বোধহয় ভালো ছিলো না । তুমি দেখোতো এবার, একটা হাঁকনি পাও কি না ।

বলেই সে কাজে মন দিয়েছিলো ।

কাপের মধ্যে সত্যি সত্যিই চায়ের একটা পাতা ভাসছিলো । রাণু সেটা উঠিয়ে নিয়েছিলো অতি সাবধানে, সন্তর্পণে ।

শুধু এই ঘটনাটির জন্তেই ইন্সপেক্টরের মন-মেজাজের নিশ্চিত ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেন নি আজও জমীর পণ্ডিত ।

হাসিম আবার সাস্তনা দেওয়ার ভদ্রিতে বললো, ওপরে একটু খোজ-খবর নিলে হত না ?

জমীর পণ্ডিত কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন । রাণু এবং আরও

কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে ঢুকলো ঘরে। এই ওদের স্বভাব,—নানান দলে আসা। একা আসতে পারে না। ভালো লাগে না। বাড়ি থেকে ঝেরিয়ে বন্ধু-বান্ধব একে-ওকে ডাকাডাকি করে দল বানিয়ে তবে আসে।

দেয়ি করে আসায় লঙ্কিত বা অপ্রতিভ হল না। ছেলেমেয়েরা চূপচাপ বসে গেল নিজের জায়গায়। প্লেট বার করে হাতের লেখা লিখতে শুরু করলো। হাতের লেখা না দেখানো পর্যন্ত পড়া নেয়া হয় না কারো।

পেছন থেকে হাশিম বললো, আচ্ছা, আসি এগন, পণ্ডিত সাহেব। আপনি পড়ান।

জওয়াব দিলেন না জমীর পণ্ডিত, যুরে দেখলেন যদিও। অপস্বয়মাণ মাহুঘটির পিঠ থেকে তুলে নিঃসাড় দৃষ্টিটা পেতে দিলেন ঢেলা-ভরা দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের ওপর।

ভেতর বাইরে মাঠ। এবার কি ফসল ফলবে কে জানে।

শুজ্বব রটেছে গাঁয়ে, পুরনো ইন্স্কুলটাই উঠে যাবে, থাকবে নতুন পাড়ারটা।

জমির পণ্ডিত পাকড়াও করেন গিয়ে চৌধুরী সাহেবকে, এর একটা বিহিত করতে হবে। এতোদিনের পুরোনো ইন্স্কুল। গাঁয়ের যতো শিক্ষিত ছেলে সব বেরিয়েছে এখান থেকে। পুঁচকে ছোঁড়াদের জালায় এখন উঠে যাবে নাকি আপনারা থাকতেই?

চৌধুরী বেশির ভাগ সময়ই শহরে পড়ে থাকেন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে। গাঁয়ের দিকে তাকানোর অবসর কম। বললেন, কি করতে বলেন?

বলবেন আর কি? করতে যা ইচ্ছে হয় জমীর পণ্ডিতই জানেন। দোর্দণ্ড প্রতাপে ইন্স্কুল চালিয়েছেন প্রায় সারা জীবন। নতুন ইন্স্কুলের পান্নায় পড়ে এখন তাঁর ইন্স্কুলে ভাঙন ধরেছে। তারই স্বযোগ নিয়ে বাড়ি বয়ে গিয়ে অপমান করে আসে হাশিমের মতো মাহুষ। চাপা রাগে গর্জে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, ছ্যাঁচড়াদের ধরে 'চৌন্দো-পো' করে দাঁড় করিয়ে রাখুন সত্তর দিন, ইন্স্কুল বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন। আমার ছেলেমেয়ে পড়ে না ওখানে, পড়ে আপনাদেরই ছেলেমেয়ে।

চৌধুরী ভয়ে ভয়ে বললেন, কিন্তু ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট—

: রিপোর্ট বেরোয়নি এখনো, কবে বেরুবে খোদাই জানে। আপনি টাউনে খোজ নিন। দরকার হ'লে আমি গাঁয়ের লোককে দিয়ে দরখাস্ত করাবো।

ওই এক ভরসা আছে জমীর পণ্ডিতের। গাঁয়ের অনেক লোকই এখনো তাঁর পক্ষে। এমন কি, ইন্স্কুল দুটিকে কেন্দ্র করে রীতিমত দুটি দল গড়ে উঠেছে। পক্ষে-

ঘাটে তাদের ঝগড়া শুনতে পান তিনি অহরহ। জিনিসটা তাঁর ভালো লাগে না। লেখাপড়া পবিত্র কাজ। তার জন্তে ঝগড়া হবে; এ তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়। আব ঝগড়া করবার আছেই বা কি? তিনি তো চান না যে, নতুন পাড়ার ইস্কুল উঠে যাক। ইস্কুল যত বাড়ে, ততোই ভালো। নতুন পাড়ার লোকেরাও কি তা বোঝে না? বোঝে, তবু আলগা ফুটোনি করে তাঁকে ঠাট্টা করে এলো সেদিন হাশিম। সরকার শিক্ষক দিতে পারবে না? সাহায্য দিতে পারবে না অতো? ব্যয়ে গেছে তাতে। এতো দিনই বা সরকার কি করছিলো সাতটাকা করে সাহায্য দেওয়া ছাড়া? ছয় মাস, এক বছর পর পর সেই সাতটা টাকা পেয়েও যদি ইস্কুল চলতে পারে, তাহলে এমনিতেও চলবে। শিক্ষক যদি ওপরওয়ালারা দিতে পারে ভালোই। তিনি সানন্দে ছেড়ে দেবেন ইস্কুল। না দিতে পারে, দোষ নেই তাতেও। সে-রকম দুর্ঘটনা ঘটলে,—জমীর পণ্ডিত আজকাল প্রায়ই ভাবছেন,—নিজেই চালিয়ে যাবেন ইস্কুল, যতদিন বাঁচেন। আল্লার ইচ্ছে থাকলে খরচের জন্তে কাজ আটকে থাকবে না। ইস্কুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে, তাদের তিনি জানিয়েও দিয়েছেন সে কথা। এসব কি বোঝে না হাশিম? বোঝে, গাঁয়ের লোকেও বোঝে। তবু ঝগড়া করে।

এসব ঝগড়া খারাপ লাগে জমীর পণ্ডিতের। কিন্তু আবার ভরসাও আসে এরই মধ্যে থেকে। গাঁয়ের লোকের মতামত স্পষ্ট করে দিচ্ছে এই ঝগড়া। জানিয়ে দিচ্ছে, তাঁর মতামতটা একেবারে খেলো নয়। ট্রেনিং বা উচ্চশিক্ষা পাননি বলেই তাঁর এতোদিনের অভিজ্ঞতাও সরকারী মাপকাঠিতে রাতারাতি কুঁচিয়ে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। ইস্কুলে যে ছেলেমেয়ে বেশি আসতে পারে না, সেও তো তাঁর দোষ নয়। ওটা একেবারে আলাদা জিনিস। ছেলেদের ইস্কুলে দেওয়ার মতো পেটের ভাত কয়জননের বাকি রয়েছে? ছাত্রের অভাব ঘটেছে বলে যারা ইস্কুল তুলে দিতে চায়, তারাই বা কয়জন খোঁজ রাখে এসবের? আশ্চর্য,—জমীর পণ্ডিত মনে মনে বলেন,—আশ্চর্য এই মানুষগুলো!

চৌধুরী বললেন, আচ্ছা, আমার সাথে যতদূর কুলোয়, তার ক্রটি হবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না, পণ্ডিত সাহেব। চা খাবেন একটু? দাঁড়ান। রাগু, চা নিয়ে আস় তো মা কাপ দুয়েক।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন জমীর পণ্ডিত, একটা গোলমাল শুন খেমে গেলেন। বাড়ির পাশেই কোথায় যেন একদল ছেলে চাঁচামেচি করছে। কান পেতে শুনতেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো ছড়া,—



পুরোন পাড়ার পাঠশালা,—  
পুঁই-মাচানে আটচালা !  
বেঞ্চিগুলো সরু সরু,  
ছাত্রগুলো আদত গরু !

সঙ্গে সঙ্গে টিটকারী সহ আরেক দলের উত্তর এল,—  
নতুন পাড়ার পাঠশালা,—  
চালে খালি বারজালা,  
মাস্টারগুলো বকের ঠ্যাং  
ছাত্র ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাং !

খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, কি ! এতদূর  
আম্পর্ধা ! শিক্ষার নামে এতো নোংরামি শিখছে সব ! একুনি দিচ্ছি  
ঠাণ্ডা করে ।

চোখের পলকে উঠে দাঁড়ালেন হারেশ চৌধুরীও । তাঁর মোটা কোমরটা জড়িয়ে  
ধরে বললেন, পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন ?

না, না, ছেড়ে দিন আপনি, শিগগীর ছেড়ে দিন । এ নোংরামির শাস্তি দিতেই  
হবে ।

বুড়ো মাহুঘের গায়ে অসীম শক্তি । দোর্দণ্ড প্রতাপ চেহারা—দেখেই বাড়ির  
লোক থেকে শুরু করে ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠে, যা ক্ষেটে আবার  
আকস্মিক ভাবে গড়িয়ে পড়ে স্নেহের ধারা,—অতএব যে চেহারা ভয়ঙ্কর ভাবে  
রহস্যময় সেই চেহারা থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে । দাড়ি-গোঁফ যেন সেই  
আগুনের শিখা । ভয় পেয়ে গেলেন হারেশ চৌধুরী নিজেও । এ-মাহুঘকে ছেড়ে  
দেওয়া চলে না কক্ষনো । প্রাণপণে কোমর টেনে ধরে বললেন, জোড় হাত করছি,  
পণ্ডিত সাহেব, দোহাই আপনার—

রাগু এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই । কিছুই বুঝতে পারেনি সে । বাপের দেখাদেখি  
শুধু চোঁচাতে লাগলো, যাবেন না, পণ্ডিত সাহেব । নতুন পাড়ার ওদের ছড়া শুনেই  
তো এরা ছড়া বেঁধেছে । যাবেন না আপনি—

দোহাই শুনে থেমে গেলেন জমীর পণ্ডিত । বেগতিক বুঝে পক্ষ-বিপক্ষের সমস্ত  
ছেলেও ভক্তরূপে সরে পড়েছে ।

চৌধুরীর দিকে ফিরে তিনি বললেন, কি জঘন্য বেয়াদব ! আমি ওদের মুকুব্বী  
নই ? ওদের বাপ চাচাকে পড়াইনি ?

: কাজটা ওদের নিশ্চয়ই অন্য় হয়েছে। কিন্তু ছেলেমানুষ সব। অতো জ্ঞানই যদি থাকবে, তাহলে আর লেখাপড়ার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি ব্যস্ত হবেন না। ইস্কুলেও তো বলে দিতে পারবেন। কিংবা বাপ-মাকে—

: হ্যা, হ্যা, তাই করবো। বাপ-মাকে সুদ্ধ আমি আবার টেনে আনব ইস্কুলে। দেখে নেবেন আপনি।

পেছন ফিরে চৌধুরীর দিকে তাকাতে গিয়েই চোখে পড়ে গেল রাণুকে। তখন প্রচণ্ড ধমক লাগালেন তাকে, কি দেখছিস, হতভাগী মেয়ে? যা পড়বে যা!

হন হন করে বেরিয়ে পড়লেন তারপরই। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠলেন বাড়িতে। পুত্রবধূ উঠোনে ধানে পা দিচ্ছিল আন্তে আন্তে। নেহাৎই নতুন বউ, বিয়ের পর এই প্রথম এসেছে শশুবাড়ি। তাকেও ধমকে উঠলেন, খেলা করা হচ্ছে?

চমকে উঠে বেচারী পা চালিয়ে দিল অসংবত জোরে। উঠোনময় ধান ছড়িয়ে পড়লো।

পড়ানোর শেষে বহুদিন পর আজ গল্প বলছিলেন জমীর পণ্ডিত। সেকেণ্ড পণ্ডিত আগেই ছুটি নিয়ে চলে গেছেন। সমস্ত ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে এলে বসেছে। স্তনছিল উৎসাহ ভরে। কিন্তু গল্প করবার আগে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল পেছনের বেঞ্চির দিকে। দেখলেন, রাণু ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকদিন আগে—তখন ইস্কুল নতুন খোলা হয়, সেই সময় তাঁর প্রথম অভ্যাস হয় পড়ানোর শেষে গল্প বলা, সহজ কথার ছলে কঠিন জিনিস বুঝিয়ে দেওয়া। মন তখন তাঁর স্বপ্নে বিভোর, আদর্শের উদ্ভাদনায় মাতাল! কান পেতে স্তনতো সবাই, তাঁর স্বাভাবিক গাণ্ডীর্থ সত্ত্বেও। ইস্কুলের প্রতি, পণ্ডিতের প্রতি তাতে টান বেড়েছিলো ছেলেমেয়েদের। কিন্তু বেশিদিন সেই গল্প বলা চলেনি। একদা আকস্মিক পরিদর্শনে এসে কোনো ইন্সপেক্টর তাঁকে দেখে ফেলেছিলেন গল্প বলতে। ইস্কুলের তখন জোর স্তনাম। তাঁরই মেহনতের গুণে। স্ততরাং কারো কিছুই হল না, হল গল্প বন্ধ।

আজ আর এক কারণে ধমক দেওয়ার প্রবৃত্তি হল না জমীর পণ্ডিতের। সবাই শক্রতা করেছে তাঁর সত্ত্বে। কিন্তু তাই বলে অর্ধৈর্থ হলে তো চলবে না। রাণুকে ইঙ্গিত করলেন শুধু।

রাণু চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসতেই বললেন, তোদের বজ্র কষ্ট হচ্ছে, না? আচ্ছা, এবার থেকে সপ্তাহে একদিন করে ছুটি দেব ডাংগুলি খেলার জন্ত।

সত্যিই নিরেট মাথা রাণুর। বিক্রপটা বুঝলো না। পিট পিট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাল ছুটি প'ন সা'ব?

হাল ছেড়ে দিলেন জমীর পণ্ডিত। ছুটি দেওয়ার শেষ আয়োজনে সারাদিনের জমানো নালিশ শুনতে চাইলেন এবার, থাক ও সব, কার কি নালিশ বল দেখি এখন।

নালিশ নিয়ে এল রাণুই প্রথম, প'ন সা'ব, কাল হাটে ফরিদ আমার আধশের সিম ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছিলো।

নৈতিক দায়িত্বে ঘরে বাইরে সমস্ত বিচারের অধিকার নিয়েছেন জমীর পণ্ডিত। কিন্তু নালিশের ধারা দেখে শিউরে উঠলেন। ইস্কুল উঠে গেলে এদের কি হবে? সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলেন, কার সিম রে, ফরিদ?

উত্তরও দিল রাণুই; আমার সিম, প'ন সা'ব। বেচতে গিয়েছিলাম।

বাজার দর যাচাই করে পণ্ডিত জরিমানা করলেন ফরিদকে, দুটো পয়সা এনে দিবি কাল।

বিচার শেষ হতেই নজরে পড়লো, কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার ওপাশে। মিটিমিটি হাসছেও বুঝি বা। গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, কে?

এগিয়ে এলো ফরিদের বাপ। মাথা চুলকে বললো, একটা কথা ছিলো প'ন সা'ব। ফরিদের—

: কি হয়েছে ফরিদের?

: জী, গেরস্থ ঘরের ছেলে,—কাজ-কর্ম বেড়ে গেছে এখন—

একমুহুর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের কাছে। তিত্তকবঠে বললেন, এ-গায়ের আর কোনো গেরস্থর ছেলে লেখাপড়া শেখেনি?

ফরিদের বাপ আবার মাথা চুলকে শুধু বললো, জী—

নিজের কাজের কথায় এসে এবার জমীর পণ্ডিত পান্টা আক্রমণ চালালেন। হারেশ চৌধুরী তদ্বির করছে শহরে। গ্রাম থেকে একলাখ দরখাস্তও লেখা হয়েছে। সেখানা সকালবেলা ফরিদের বাপের হাতেই দেওয়া হয়েছিলো সই নেবার জন্তে। তারই ফলাফল জানতে চাইলেন এখন, সই নেওয়া শেষ হয়েছে?

ফরিদের বাপ ভয়ে বললো, জী না। দিতে চায় না। বলে—

: দিতে চায় না! কি বলে?

ভীক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জমীর পণ্ডিত। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো ফরিদের বাপ, ইতস্তত করে একবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালো। তারপর মাথা নীচু করে আশ্বে বলে যেতে লাগলো, বলে যে, উনি আর পড়াবেন কি করে? বুড়ো মানুষ, মাথার ঠিক নেই। তার উপর বাতের রোগী। নামাজ পড়ার সময় সেজদা দিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসতেও পারেন না। হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সারাজীবন ছাত্রদের 'নিল ডাইন' করিয়ে এসে এখন প্রায়শ্চিত্ত করছেন—

: কি—কি বললে?

ধমক দিলেন বটে জমীর পণ্ডিত। কিন্তু পরেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

ফরিদের বাপ কি যেন বলতে বাচ্ছিল আবার। কিন্তু বাধা দিয়ে চিংকাব করে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, থাক, থাক, আর বলতে হবে না। ভুল আমারই হয়েছে। হবে না? খন্টার কাজ নরুন দিয়ে হয় কখনো? কোথায় সে দবখাস্ত? বার করো, বার করো শিগগীর।

ফরিদের বাপ হাতের মুঠো থেকে একখানা মোচড়ানো কাগজ বার করে দিলো। হঠাৎ ইস্কুলের ছুটি দিয়ে জমীর পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন।

ইস্কুলের সিমেন্ট ওঠা বারান্দায় পায়চারি করছেন জমীর পণ্ডিত। পায়চারি করছেন বেলা ন'টা থেকে। এখন হয়তো বারোটা বাজে। ভাবছেন, এতো বেলা হল, তবু ছেলেমেয়েরা আসছে না কেন? সময়-জ্ঞান আর এদের কোনোদিন হবে না দেখছি। না কি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরে আনতে হবে সকলকে?

ভাবতে ভাবতে চকিতে একটা সন্দেহ দেখা দিলো মনে। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। তবে কি—গাঁয়ে খবর রটে গেছে, এ ইস্কুল সত্যি সত্যিই উঠে যাবে। ইন্সপেক্টরের অফিস থেকে খোলাখুলি কোন চিঠি অবশ্য এখনো আসেনি। হারেশ চৌধুরী চিঠি দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। তিনিও পরিকার করে কিছু জানাননি। কিন্তু যা আভাস দিয়েছেন, তাও ভরসাজনক নয়। এদিকে নতুন পাড়ার ইস্কুলে নাকি খবর এসে গেছে, তাদের ইস্কুল থাকবে। তার মানেই হল—

গাঁয়ের পথে বেরুনো এখন দায় হয়ে উঠেছে তাঁর পক্ষে। নতুন পাড়ার দল তো আছেই। তারপর, যারা এতোদিন ছিলো তাঁর পক্ষে, বোধ হয় বিফল হওয়ায় তারাও সরে পড়েছে। চকুলজ্ঞান সহী দিয়েছিলো বোধহয় তখন। কেউ

কেউ আবার নানান ছলে নতুন পাড়ার ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে শুরু করেছে। যেমন ফরিদের বাপ। কেউ কেউ বা মুখের উপরই পট্টাপট্টি বলে দিয়েছে, তখনই তো বলেছিলাম, প'ন সা'ব, লাভ হবে না দরখাস্ত করে।

কিন্তু লাভ যে হবে না তাই বা কে জানে! সত্যি খবর তো কেউই জানে না এখনো। যদি জানবেই, তাহলে এদিকে আট দশদিন ধরে কেন কতকগুলো লোক ছেলেমেয়েকে আসতে দিচ্ছে তাঁর ইস্কুলে? ইচ্ছে করে তো কেউ নিজেব ছেলেমেয়ের মাথা খেতে চায় না।

তাহলে? তাহলে খবরটা সত্যি নয়। সিদ্ধান্তটায় পৌঁছতেই নতুন শক্তি পেলেন জমীর পণ্ডিত। নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর মনটা। ঠিক হয়েছে, ইস্কুল তাঁকে চালাতেই হবে। যারা তুলে দিতে চায় ইস্কুল তাদের দেখিয়ে দেবেন, ইচ্ছে কবলেই এ ইস্কুল তুলে দিতে পারে না কেউ। গোমূর্খ সব! স্বাধীন হলে কি হবে? শিক্ষার মর্ম এরা এখনো বোঝেনি। রহুল্লাহকে একবার কে যে জিজ্ঞেস করছিলো, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে কতো বছর ব্যয়স থেকে? হজরত জওয়াব দিয়েছিলেন, তাদের জন্মের পচিশ বছর আগে থেকে। অর্থাৎ তাদের বাপ-মাকে আগে লেখাপড়া শেখাতে হবে। গোমূর্খরা কি আর কখনো এ হাদীসের মর্ম বুঝেছে? বোঝেনি। কিন্তু তিনি এবার বোঝাবেন।

অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস জাগলো পণ্ডিতের মনে। আনন্দে বুকখানা ভরে উঠলো। ভাবলেন, না, কোনো ভয় নেই। ছেলেমেয়েরা আজ দেরি করছে, তাতে কি হয়েছে? এমন দেরি তো ওরা বরাবরই করে। এই তো বছর খানেক আগে একদিন কেউই আসেনি মোটে। ছেলেমাত্র সব। হয়তো বা কোনো কাজে আটকেই পড়েছে। পড়া আর কাজের চাপে কতো পারে ওরা; আবার শুনতে পান, তাঁকে দেখে ওরা ভয়ও পায়। আহা, আহুক না, আজ আর পড়াবেন না, গল্প শোনাবেন। আর, মুহু হাসি ফুটে ওঠে পণ্ডিতের মুখে,—গোটাকতক ইটের কুচিও কুড়িয়ে রেখে দেওয়া যাক। ফাঁক পেলে একবার বাষবন্দীও খেলে নেবে ওরা। প্রশ্নয়ের চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো স্নেহভাজন শিশুর ছুঁমি দেখছেন যেন, এমনি ভাবে মুখ টিপে হাসতে হাসতে আলতো হাতে কুচি কুড়োতে থাকেন তিনি।

কুচি কুড়োনো শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় সহসা পেছন থেকে ডাক শোনা গেল, প'ন সা'ব।

পেছন ফিরে সলজ্জ চাপা আনন্দে প্রায় নেচে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, রাগ? এসেছিস? এতো দেরি কেন রে?

রাস্তা বিষয় মুখে জগয়াব দিলো, আমার আশা তো নয় প'ন সা'ব। তাই, সময় করতে দেরি হয়ে গেল। কপালে নেই আমার লেখাপড়া। খোঁসা মাথায় কিছু দেয়নি। নিজের পড়াশোনা বন্ধ হলে দুঃখ নেই। কিন্তু বাপজান বলছিলো—

মড়ার মুখের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের মুখ। ধরা গলায় বললেন, কি বলছিল রে ?

এক মুহূর্তে তাঁর মুখের দিকে চেয়েই মুখ নামিয়ে নিলো রাস্তা, ওদের ইস্কুল খবর এসে গেছে, প'ন সা'ব। আমাদের শেষ দলের কয়েক জনও গিয়ে জুটেছে দেখলাম।

অর্থহীন চোখে চেয়ে পণ্ডিত শুধু বললেন, এঁ্যা! কিন্তু রাণু, বিস্তু—

কথা আর শেষ করতে পারলেন না জমীর পণ্ডিত। রাস্তাও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

অনেকক্ষণ পর পণ্ডিত অসমাপ্ত কথাটা শেষ করলেন, রাণু, বিস্তুরা কি আর পড়বে না।

: রাণু নাকি টাউনের ইস্কুলে পড়তে যাবে।

: কই আমাকে তো কিছু বলেনি। একবার বলেও গেল না—ইস্কুলটা—

রাস্তা একবার ইতস্তত করে বললো, রাণুকে ডেকে নিয়ে আসবো, প'ন সা'ব ?

জমীর পণ্ডিত নীরবে ঘাড় নামিয়ে সন্মতি জানালেন।

বাড়ি কাছেই। অল্পক্ষণের মধ্যে রাণু এসে পড়লো। মুখখানা করুণ। বললো, কাল টাউনে চলে যাবো, পণ্ডিত সাহেব। আশ্মা বলেছে, খালামাদের বাড়িতে থেকে পড়তে হবে এবার।

জমীর পণ্ডিত বহুক্ষণ সাড়া দিলেন না। তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এক হুনিয়ায়। ইস্কুলটা একবারে চোখের সামনে ভেসে উঠলো যেন। তিরিশ বছর আগের সেই চকচকে দেওয়ালটা। চাষীঘরের তাজা তাজা, ধুলোবালি মাখা ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে আড়িনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু—কিন্তু এরা যেন—এদের যেন পথ চলতে চলতে আজকেও দেখছেন, মনে হচ্ছে, আর,—আর, ইস্কুলের আড়িনাও যেন একটা নয়, দুটো, নাকি, আরো বেশি ? হয়তো। উহঁ, ঠিকই। সারা গাঁয়েই খেলা করে বেড়াচ্ছে ওরা, পণ্ডিত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

দলগুলো ছড়িয়ে পড়তে পড়তে এক সময় মিলিয়ে গেল। জমীর পণ্ডিত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। সাঁদা দাঁড়ি গৌফের ফাঁকে ভাঁজ-পড়া মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠলো দুই একবার। সংশয়ের দৃষ্টিতে ইস্কুল ঘরটার দিকে তাকালেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ছবিটা আবার ফিরে আসতে লাগলো তারপর। আর ফিরে

এলো—স্পষ্ট হয়ে আর একটি জিনিস, যেটা এতোদিন অস্পষ্টভাবে ঘোরাফেরা করছিলো তাঁর মনের মধ্যে। নিজেকে সংযত করে এবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, তোরা কাল কখন যাবি, মা ?

বলতে বলতেই রাগুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন তিনি।

: নটার গাড়িতে।

: চ, আমিও যাবো তোদের সাথে।

রাস্তা, রাগু দুজনেই বিস্মিত হয়ে বললো, আপনি কোথায় যাবেন ?

জমীর পণ্ডিত হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, বেটারা ভেবেছে কি ? পুঁইশাকের কতো ডগা কেটে খায় লোকে, তাই বলে কি গাছ মরে ? এক খোঁচা খেয়েই আমি ইঙ্কুল তুলে দেব ? দেখে আসি, দাঁড়া, একবার ইন্সপেক্টরের অফিসটা। আর, না হয় তো নিজেই মাইনে দিয়ে একটা মাস্টার ধরে আনি কোথাও থেকে।

ঈশং উত্তেজিতভাবে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে একটুখানি থামলেন জমীর পণ্ডিত। তারপর আদেশের স্বরে রাস্তাকে বললেন, শোন, তোর বাপের ওসব বাহান। তুই পড়াশোনা নষ্ট করিসনে। নতুন ইঙ্কুলেই ভর্তি হয়ে যা। আর, রাগু, তুই টাউনে যা, ইয়া টাউনেই—এখন বাড়ি যা—তোরা—

কিন্তু আদেশের স্বর ক্রমে ভেঙে এলো, গলার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটছে। রাগুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জমীর পণ্ডিত আবার বলতে চেষ্টা করলেন, ইয়া মা—যা,—তোরা—

হাতখানা এবার মাথা থেকে নেমে কাঁধের পাশে ফ্রকটা চেপে ধরলো। পণ্ডিতের মনে হল, এদের যদি একেবারে বৃক্কের লক্কে মিশিয়ে রাখা যেতো। নইলে যে লাদা গোঁফের তলায় ঠোঁট দুটিকে এতোক্ষণ পর আর বাগ মানানো যায় না !



## একটি তুলসী গাছের কাহিনী □ সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্



ধনুকের মত বাঁকা ইট-সিমেন্টের চওড়া পুলটির একশ গজ পরে বাড়িটা। দোতলা, মস্ত, রাস্তা থেকে খাড়া উঠে গেছে। এদেশে ফুটপাথ নেই তাই বাড়িটারও একটু জমি ছাডবার ভদ্রতার বালাই নেই। তবে বাড়িটার পেছনে কিন্তু অনেক জায়গা। গোসলখানা—পাকঘর, পায়খানার মধ্যকার খোলামেলা পরিষ্কার স্থানটি ছাড়াও আরো ঢের জায়গা। সেখানে আম-জাম-কাঁঠালের দুর্ভেজপ্রায় জঙ্গল, মোটা ঘাসে আবৃত সঁায়াতসঁেতে মাটিতে ভাপসা গন্ধ আর প্রথর সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের স্নান অন্ধকার।

অত জায়গা যখন, সামনে খানিকটা ছেড়ে একটা বাগানের মত করলে কি দোষ হতো?—সে কথাই এরা ভাবে। মতিন ভাবে, বাগান না থাক, সামনে একটু জমি পেলে ওরা নিজেরাই বাগান করে নিতো, যত্ন করে লাগাতো মরশুমী ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হান্নাহানা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার দিকে আপিস থেকে ফিরে ওখানে বসতো। বসবার জন্ত না হয় একটা হাঙ্কা বেতের চেয়ার নয় ক্যানভাসের আরাম কেদারা কিনে নিতো। গল্প করতো বসে-বসে। আমজাদের হুকোর অভ্যাস। সে না হয় বাগানের সম্মান বজায় রাখার মত মানানসই একটা নলওয়ালী সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো সন্ধ্যার বিশ্রামবিলাসের জন্ত। গল্প-জমিয়ে কাদেরও ছিলো। ফুরফুরে খোলা হাওয়ায় তার গলাটা কাহিনীময়, হান্নাহানার গন্ধের সঙ্গে মিশে মধুর হয়ে উঠতো। কিংবা, জ্যোৎস্নারাতে কোন গল্প না করলেই কী এসে যেতো? মুখ বরাবর আস্তে চাঁদটার পানে চেয়ে চূপচাপ কী বসে থাকা যেতো না?—আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকে ওঠা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সে কথা আরো বার-বার মনে নয়।



এরা দখল করেছে বাড়িটা। অবশ্য দখল করবার সময় লড়াই করতে হয়নি, অথবা তাদের সামরিক শক্তি অসুস্থ করে কেউ এমনি হার মেনে নেয়নি। দেশ-ভ্রমের হুজুগে এ শহরে আসা অবধি উদ্যান্ত তারা একটা যেমন-তেমন ডেরার সন্ধান ঘুরছিলো। একদিন দেখলো ওই বাড়িটা, মস্ত বড় বাড়ি জনমানববিহীন অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে। প্রথমে তারা বিস্মিত হয়েছিলো। পরে সদলবলে এসে দবজার তালা ভেঙে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে, বৈশাখের আমকুড়ানো ক্ষিপ্ত উন্মাদনায় এমন মত্ত হয়ে উঠলো যে, ব্যাপারটা তাদের কাছে দিনহুপুরে ডাকাতির মত মোটেই মনে হলো না। মনে কোন অপরাধের চেতনা যদি বা ভার হয়ে নাববার প্রয়াস পেতো সে ভার তুলোধুনো হয়ে উড়ে যেতো তীক্ষ্ণ সে হাসির বলকে।

বিকেলের দিকে শহরে যখন খবরটা ছড়িয়ে গেলো তখন অবাঞ্ছিতদের আগমন শুরু হলো। মাথার উপর একটা ছাতের আশায় তারা দলে দলে আসতে লাগলো। এরা কিন্তু রুখে দাঁড়ালো। ডাকাতি নাকি? যথাসম্ভব মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বললে, লাগগা কোথায়, সব ঘর ভর্তি। বললে, দেখুন সাহেব, এই ছোট অঙ্ককার ঘরেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো বিছানা পড়ে ছ ফুট বাই তিন ফুটের চারটে চৌকি, খান ছয়েক চেয়ার বা টেবিল এলে ঘরে জায়গা বলে কোন বস্তু থাকবে না। কেউ সমবেদনা করে বললো, আপনাদের তকলিফ বুঝতে পারছি। আমরা কী এ কদিন কম কষ্ট করেছি? তা ভাই আপনার কপাল মন্দ। যদি চার ঘণ্টা আগে আসতেন। চার ঘণ্টা কেন, ঘণ্টা দুয়েক আগেও তো নীচে কোণের ঘরটা অ্যাকাউন্টস অফিসারের মোটা মত একটা লোক এসে দখল করলো। রাস্তার উপর ঘর, তবু মন্দ কী। জানালায় কাছেই সরকারী আলো, কোনদিন যদি আলো নিবে যায় রাস্তার ওই আলোতেই তোফা চলে যাবে।

দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন হয়েছে বটে তবু কোন প্রান্তে সঠিক মগের মূলুক বসে নি। কাজেই পরে এ বে-আইনী কাজের তদারক করতে পুলিশ এসেছিলো।

পলাতক গৃহকর্তা যে বাড়ির উদ্ধারের জগ্ন সরকারের কাছে ধর্না দিয়েছিলেন তা নয়। দখলের কথা জানলে দিতেন কিনা সন্দেহ। যিনি প্রাণের ভয়ে এতবড় একটা পরিবার দু'দিনের জগ্ন স্বেচ্ছ দেশ থেকে উধাও করে দিতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি! পুলিশে খবর দিয়েছিলো ওরাই যারা শহরের অল্প কোন প্রান্তে তখন ডাকাতির ফিকিরে ছিলো বলে এখানে চারঘণ্টা আগে বা

ছ'বটা আগে এসে পৌঁছতে পারেনি। নেহাত কপালের কথা হচ্ছে, এদের কপালে, মন্দ হবে না কেন। ভাগ্যের ফলে নিরীহ লোকেরাও আবার রীতিমত লেঠেল হয়ে উঠতে পারে। সত্যি সত্যি লাঠালাঠি না করলেও তার জন্ত তৈরী হয়ে থেকে এরা সমগ্র ব্যাপারটা পুলিশকে এমন ভাবে বুঝিয়ে দিলো যে সাব-ইন্সপেক্টর বিরক্তি না করে সদলবলে ফিরে গেলো। রিপোর্ট দেবার কথা। তা এমন ঘোরালো করে রিপোর্ট দিলে যে মর্মান্থ উদ্ধারের ভয়ে তার ওপরওলার কাছে সে রিপোর্ট চাপা দিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে হলো। তাছাড়া তাড়াতাড়িই বা কী। যারা পালিয়ে গেছে তাদের প্রতি সমবেদনার কোন কথা ওঠে না এবং বাড়ির নিরুদ্দিষ্ট মালিক যদি এসে কিছু না করে তবে কেন অনর্থক মাথাব্যথা করা। তাছাড়া, এরা কেরানী হলেও ভ্রলোকের ছেলে, দখল করে আছে বলে জানালা দরজা ভেঙ্গে ফেলেছে বা ছাতের আস্ত আস্ত বীম সরিয়ে সোজা চোরাবাজারে চালান করে দিচ্ছে, তা নয়।

রাতারাতি সরগরম হয়ে উঠল বাড়িটা। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন, খালাসী পড়িতে, বৈঠকখানায় দপ্তবীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেনে তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অথবা কমরু খানসামা লেনের অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাসানে দেওয়ালে মস্ত মস্ত জানালা, পেছনে খোলামেলা উঠোন, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মত আম জাম কাঁঠালের বাগান এদের কী যে ভালো লেগেছে বলবার নয়। একেকজন বেলাটের মত এক-একখানা ঘর দখল করে নেই সত্যি তবু ঘরে নির্ঝঙ্কাট হাওয়া চলাচল, এবং আলোর ছড়াছড়ি দেখে অভ্যস্ত খুশি। এবার মনে হয় বাঁচল, ফরাগত মত থেকে আলোবাতাস খেয়ে জীবনে এবার সতেজ সবুজ রক্ত ধরবে, হাজার দু' হাজার-ওয়ালাদের মত মুখে জৌলুস আসবে, দেহ ম্যালেরিয়া কালাজরের জীবাণু থেকে মুক্ত হবে।

যেমন ইউরুস থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। সাহেবী নাম হলে কী হবে, গলিটার এক এক অংশ যেন সকালবেলাকার আবর্জনা-ভরা আস্ত ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের কাঠের দোতলায় কচ্ছ দেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সে থাকতো। কে কবে বলেছিলো চামড়ার গন্ধ নাকি ভালো, বন্ধার জীবাণু ধ্বংস করে। তাছাড়া সে উৎকট গন্ধ ড্রেনের পচা ভোসকা গন্ধও বেমালুম ডুবিয়ে দিত; ঘরের কোণে দশ দিন ধরে ইঁদুর কিংবা বিড়াল মরে পচে থাকলেও নাকে টের পাবার জো ছিল না। ইউরুস ভাবতো মন্দ কী। সন্ততপক্ষে জীবাণু ধ্বংস হবার কথাটা মনে বড় ধরেছিলো। শরীরটা তার ভালো নয় তেমন; রোগাপটকা দুর্বল মাছ। এখানে দোতলার

দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায় জানালার পাশে শুয়ে স্বর্ষালোকের সোনালী ঝলকানি ম্যাকলিওড স্ট্রিটের আন্তানার কথা মনে করে শিউরে ওঠে। ভাবে, এতদিনে কী হয়ে গেছে কে জানে! টাকা থাকলে বুকটা একবার দেখিয়ে আসতো ডাক্তারকে। সাবধানের মার নেই।

ভেতরে রান্নাঘরের বাঁ ধারে একটা চৌকোনে আধ হাত উঁচু ইটের মঞ্চের ওপব একটি তুলসী গাছ। একদিন সকাল বেলায় নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাকের উঠোনে পাশ্চাত্তরী করছে হঠাৎ তার নজরে পড়লো তুলসী গাছটি। মোদাকের হুজুগে মাহুয, ঐকটু কিছু হলোই প্রাণ শীতল করা রৈ রৈ আওয়াজ উঠিয়ে দেয়। এরা সব উঠে এলো। যতটা আওয়াজ ততটা গুরুতর না হলেও কিছু তো অস্তুত ঘটেছে।

এই তুলসী গাছটা। এটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা যখন এসেছি বাড়িতে কোন হিন্দুয়ানীর চিহ্ন থাকবে না।

সবাই তাকালো সেদিকে। খয়েরি রঙের আভায় গাঢ় সবুজ পাতাগুলো কেমন স্নান হয়ে আছে। নীচে ক'দিনের অযত্নে শ্বাস গজিয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, এটা এতদিন চোখেই পড়েনি, কেমন যেন লুকিয়ে ছিলো।

ওরা কিছু হঠাৎ শুরু হয়ে গেল। যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছে, সিঁড়ির ঘরের দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা কটা নাম থাকলেও এমন বে-ওয়ারিশ ঠেকেছে, সে-বাড়ির চেহারা হঠাৎ বদলে গেলো। তুলসীগাছটা আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে অনেক কথা যেন বলে উঠলো।

এদের স্তব্ধতা দেখে মোদাকের আরেকটা হুঙ্কার ছাড়লো। ভাবছো কী? কথা নেই, উপড়ে ফেলো।

হিন্দু রীতিনীতি এদের ভালো জানা নেই। তবে কোথায় শুনেছে হিন্দু বাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্তী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালান, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। শ্বাস গজিয়ে ওঠা পরিত্যক্ত চেহারার এ-তুলসী গাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারাটি বলিষ্ঠ একাকীত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, ঠিক সেই সময় ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁড়রের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শাস্ত্র ধীর প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন, হয়তো বছরের পর বছর এমনি জ্বলেছে। ঘরে দুদিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন-প্রদীপ নিবে গেছে, তবু হয়তো এ প্রদীপ দেওয়া অস্থগ্ঠান এক দিনের জন্তও বন্ধ থাকেনি।

যে গৃহকর্ত্তী বছরের পর বছর এ তুলসী তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়?

কেন চলে গেছে ? মতিন এক সময় য়েলওয়েতে কাজ করতো। সে ভাবে হয়তো কলকাতায়, নয় আসানসোল, নয়তো বৈজ্ঞাণ্টিক, হাওড়ায় কোন আত্মীয়ের আন্তানায়। লিলুয়াও বা নয় কেন। বিশাল রেলইয়ার্ডের পাশে মন্ডন একটি কালো চওড়া লাল পাড়ের শাড়িটা ঝুলছে হয়তো। সেটা এ গৃহকর্তীরই। কিন্তু যেখানেই থাকুন, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিষে ওঠে তখন হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় এ তুলসীতলার কথা মনে করে গৃহকর্তীর চোখ ছল ছল করে।

গতকাল থেকে ইউহুসের সর্দি সর্দি ভাব। সে কথা বললে,—থাক না ওটা। আমরা তো আর পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে একটা তুলসীগাছ থাকলে ভালোই। সর্দি কফে তার পাতার রস উপকারী।

মোদাক্ষের এধার ওধার চাইলো। সবার যেন তাই মত। ওদের মধ্যে এনায়েত মৌলভী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আছে, সকালে নাকি কোরাণ তালাওয়াতও করে। সে পর্যন্ত চূপ। প্রতি সন্ধ্যায় ছলছল করে ওঠা গৃহকর্তীর চোখের কথা কী ওর মনে হলো ? অক্ষত দেহে তুলসী গাছটা বিরাজ করতে থাকলো। বাড়িটার আবহাওয়া ভালো। কলকাতায় বিমিয়ে আসা নিস্তেজ ভাবটা যেন কেটে গেছে। আড্ডাও তাই জমে ভালো, দেখতে না দেখতে মুখে ফেনা-ওঠা তর্ক বিতর্ক লেগে যায়। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সবারকম আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতার কথাও ওঠে মাঝে মাঝে।

—ওরাই তো মূল, মোদাক্ষের বলে।

বলে হিন্দুদের নীচতা ও গোঁড়ামির জন্তাই তো আজ দেশটা এমন ভাগ হয়ে গেল।

ভারপর তাদের অবিচার-অত্যাচারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেয়। রক্ত গরম হয়ে ওঠে সবার। দলের ভেতর বামপন্থী নামে চালু মক্হুদ মিঞা কখনো কখনো প্রতিবাদ করে। বলে অতটা নয়। এতটা হলেও আমরা কম কৌ। মোদাক্ষের দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। দেখে তথাকথিত বামপন্থীর কাঁটা নড়ে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে, কে জানে বাবা! আমরাও হলফ করে বলতে পারি দোষটা ওদের, ওরাও শালা তেমন হলফ করে বলতে পারে দোষটা আমাদের। ব্যাপারটা বড় ঘোরালো, বোঝা মুশকিল। ভাবে, হয়তো, আমরাই ঠিক। আমাদের ভুল হবে কেন ? আমরা কি জানিনা আমাদের ?

কাঁটা সংশয়ে ছলে ছলে হঠাৎ ডানে হেলে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো। কাঁটাটি কখনো কখনো না বুঝে বাঁয়ে হেলে আসে বলেই ওর বামপন্থীর অপবাদ।

পায়খানার দিকে যেতে যেতে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটি চোখে পড়ে। কে আগাছা সাফ করে দিয়েছে। পাতাগুলো শুকিয়ে উঠে থয়রী রং ধরেছিল, আবার ঘেন গাচ বড়ের মধ্যে কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। কে তার গোড়ায় পানি দিচ্ছে। অবশ্য খোলাখুলি ভাবে, লোক দেখিয়ে দিচ্ছে না। সমাজে চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা তো আছে।

ইউনুস ভেবেছিলো ম্যাক্লিরড স্ট্রীটের চামড়া-ব্যবসায়ীদের নোংরা আঙ্গানায় আর কখনো ফিরে যেতে হবে না—এখানে আলোবাতাসের মাঝে জীবনের জন্তু সে বেঁচে গেলো। কিন্তু সে ভুল ভেবেছিল। শুণু ইউনুস কেন, সবাই—যারা ভেবেছিল এ-মন্দার দিনে ভালো করে খেতে না পাক, বাড়িতে প্রয়োজন মত জীবনের দুস্পাপ্য আদামটুকু করবে—তারা প্রত্যেকে ভুল কবেছিলো। তবু যাহোক সামনে জমি নেই। থাকলে ওরা আজ বাগান করতো এবং সেই সময়ে অন্ত কিছু না হোক, গাঁদাফুলেব গাছ বড় হয়ে উঠতো। তাহলে কী প্রচণ্ড ভুলই না হতো।

মোদাকের হস্তদস্ত হয়ে এসে বললো, পুলিশ এসেছে। কেন? ভাবলো, হয়তো রাস্তা থেকে পালিয়ে একটা ছাঁচড়া চোর বাড়িটায় এসে ঢুকেছে। কিন্তু সেটা খরগোশের মত কথা হলো। শিকারীর সামনে পালাবার আর পথ না পেয়ে হঠাৎ বসে পড়ে চোখ বুজে খরগোশ ভাবে, কই আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তারাই তো চোর, কেবল গা ঢাকা দিয়ে না থেকে চোখ বুজে আছে।

পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর সাবেকী আমলেব হাট বগলে রেখে তখন দাগ পড়া কপালের ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। পিছনের বন্দুকধারী কনফেবল দুটোকে মস্ত গৌফ থাকা সত্ত্বেও আরো নিরীহ দেখাচ্ছে। ওরা নিশ্চল ভাবে কড়িকাঠ গুনতে লাগলো। ওপরে ঘুলঘুলির খোপে এক জোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। একটা সাদা আরেকটা ধূসর। তাও দেখতে পারে তারা তাকিয়ে। হাতে বন্দুক আছে কিনা।

মতিন সবিনয়ে বললো,—

—আপনার কাকে দরকার?

—আপনাদের সবাইকে। আপনারা বে-আইনী ভাবে এ বাড়ি কল্লা করেছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের এ বাড়ি খালি করে দিতে হবে—ব'লে অর্ডার দেখালো।

বাড়ির কর্তা তাহলে ফিরে এসেছে। ট্রেন থেকে নেমে এখানে এসে কাণ্ডটা দেখে সোজা থানায় চলে গেছে। এখন সঙ্গে এসেছে কিনা দেখবার জন্তু আফজল

একবার গলা উচিয়ে দেখলো। কেউ নেই। পেছনে কেবল গৌণ্ডালা বন্ধুধারী কনস্টবল দুটো।

—কেন? বাড়িওয়ালা কী নালিশ করেছে?

—গভর্নমেন্ট বাড়ি রিকুইজিশন করেছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলো তারা। অবশেষে মতিন বললে,—

—আমরা তো গভর্নমেন্টেরই লোক।

মাঝে মাঝে মাহুশের নিবুদ্ধিতা দেখে অবাক হতে হয়। কথা শুনে নিস্তব্ধ কনস্টবল দুটো পর্ষস্ত কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে তাকালো তাদের পানে, ভাবাচ্ছন্ন চোখ হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো।

বাড়িতে এরপর একটা ছায়া নেমে এলো। ভাবনার অস্ত নেই। কোথায় যাই এই চিন্তা। কেউ কেউ রেগে উঠে বলে, কোথাও যাব না, এইখানেই থাকবো। দেখি কে গুঠায়। কেউ যদি এ বাড়ির চৌকাঠ পেরোয় তবে সে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসবে। (কোথায় ছাত্ররা নাকি এমনি গায়ের জোরে একটা বাড়ি দখল করে আছে। তাদের গুঠাবার চেষ্টা করে সরকারের উচ্চতম কর্তারা পর্ষস্ত নাকি নাস্তানা হুদ হয়ে গেছে। সে কথাই স্মরণ হয়।) অবশেষে রক্ত তাদের গরম হয়ে ওঠে। বলে, কখনো ছাড়বো না। যে আসে আত্মক, কিন্তু সে যেন একথা জেনে রাখে যে, তাকে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসতে হবে।

ক’দিন গরম রক্ত টগবগ করলো। কাজে মন নেই, খাওয়ান মন নেই। কেবল কথা, তিক্তরসে সিক্ত ঝাঁঝালো কথা। কিন্তু ক্রমশ কথা কমতে লাগলো। এবং এদের কথা খামলে রক্ত ঠাণ্ডা হতে ক-দিন।

এরা তো আর ছাত্র নয়। এরা যে কী, সে-কথা দর্প ক’রে সেদিন পুলিশকে নিজেরাই তো বলেছিলো। বাড়ি রিকুইজিশন হবার কথা শুনে কিছুক্ষণ বিমুখ থেকে বলেছিল, কেন, আমরা তো গভর্নমেন্টেরই লোক।

একদিন তারা সদলবলে চলে গেলো। যেমন ঝড়ের মত চলে গেলো, ঝরময় ছিটিয়ে রেখে গেলো পুরোনো খবর কাগজের টুকরো, কাপড় ঝোলাবার দড়ির একটা দুর্বল অংশ, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, বা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালীটা। নীলকুঠি-

বাড়ির ফ্যাসানে তৈরী দরজা-জানালাগুলো খাঁ খাঁ করতে লাগলো। কিন্তু সে আর ক-দিন। রঙ-বেরঙের পর্দা বুলবে সেখানে।

পেছনে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় আবার খয়েরী রঙ ধরেছে। যে দিন পুলিশ এসে বাড়ি ছাড়বার কথা জানিয়ে গেলো সেদিন থেকে তার গোড়ায় কেউ পানি দেয় নি। তুলসী গাছের কথা না হোক, গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও কী এদের আর মনে পড়েনি ?

কেন পড়েনি সে কথা কেবল তুলসীগাছ জানে, যে তুলসীগাছকে মাহুষ বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পারে, ধ্বংস করতে চাইলে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে, অর্থাৎ যার বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়া আপন আত্মরক্ষার-শক্তির উপর নির্ভর করে না।





আজিমপুর হয়ে যে-রাশ্ଟ্রাটি সোজা পিলখানা রোডের দিকে চলে গেছে, তারি বাঁ-পাশে, গাছ-পালার ভেতর এগিয়ে গিয়ে একখানি ছোট্ট কুটির। ঘরের মেটে-দেয়ালগুলোর উপরিভাগ চ'লে গেছে অনেক দিন, রোদ-বৃষ্টি আর হাওয়ার অব্যাহত যাতায়াত এই ঘরের মধ্যে। মরচে-ধরা বহু পুরোনো টিনের সুরাখ দিয়ে দেখা যায় নীল আশমানের ছিটে-ফোঁটা।

মা' ও ছেলে শুয়ে আছে চাটাই বিছিয়ে।

সন্ধ্যাবেলা হালিমা খুবই মেরেছিলো নবীকে। ছ'বছর গিয়ে সাত বছরে পা দিয়েছে নবী। হালিমা তাকে এক বিড়ির দোকানে ভর্তি করে দিয়েছে। কাজ না শিখলে দিন-গুজরানের উপায় থাকবে না। নবীকে ছুধের বাচ্চা রেখেই বাপ তার ইনতেকাল করেছে। একা হালিমা কীই বা করতে পারে তার জন্তে? নিজের পেট পালতেই সাত বাড়ি ঘুরতে হয় তার, কাজ না পেলে ভিক্ষে করতে হয় এবং সন্ধ্যাবেলা গিয়ে ব'সে থাকতে হয় গোরস্তানের গেটের কাছে। কবর জেয়ারত করতে এসে অনেকেই দান-খয়রাত করে, তাঁদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা হালিমার বরাতেও জুটে যায় কখনো-কখনো। নবী অবশি বিনে মাইনেতেই বিড়ির দোকানে কাজ করে, দোকানী শুধু ছপূরবেলা একবার খেতে দেয় নবীকে। এখনো সে পাকা হয়ে ওঠেনি বিড়ি বাঁধায়। কাজ সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেলেই সে মাস-মাস পাঁচ টাকা ক'রে পাবে দোকানীর কাছে। কিন্তু নবী ফাঁকি দিতে শুরু করেছে আজকাল, কোনো অহিলায় দোকান থেকে বেয়িয়েই সে যে কোথায় চলে যায় কেউ বলতে পারে না। সন্ধ্য পৰ্বন্ত আর দেখাই মেলে না তার। এ নিয়ে দোকানের মালিক তিনদিন নালিশ করেছে হালিমার কাছে, আজ তাকে হ'শিয়ার করে দিয়েছে, সে



কাজ ছাড়িয়ে দেবে নবীর, এমন তুষ্টি ছেলেকে দিয়ে দরকার নেই তার। সারাটা বিকেল গোস্বায় আশ্রয় হয়ে ছিলো হালিমা—ছেলে যদি কোনো কাজ না শেখে, তার কি কোন ভবিষ্যৎ আছে আজকের দুনিয়ায়? অথচ, এমন মগড়া যে, এদিকে মনই বসে না তার। মন বসবেই বা কেন? মা তো রয়েছে তার জন্তে ভিক্ষে করতে, বাঁদিগিরি করতে! সন্ধ্যায় নবী বাড়ি ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে হালিমা ধুম-ধুম করে কতকগুলো কিল বসিয়ে দেয় নবীর পিঠে। সারাদিন কাটায় কোথায় নবী? —জানতে পীড়াপীড়ি করেছিলো হালিমা, কিন্তু নবীর কাছ থেকে জওয়াব পাওয়া কঠিন, সে শুধু ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কাদতে কাদতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে নবী।

হালিমা খেতে বসেছিলো, কিন্তু দু-এক লোকমা গিলেই সে উঠে পড়ে—তার পেটেও ভাত গেল না আজ। কতো অহুনয়-বিনয় করেছে হালিমা, কিন্তু তাতে মন গললো না অভিমানী শিশু। শুধু দু-একবার চোখ মেলে হালিমার দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর মুখ গম্ভীর করে সে নিজেই সপে দেয় ঘুমের কোলে।

গলে যাওয়া দেয়ালের ওপর দিয়ে হালিমা তাকিয়ে আছে আশমানের দিকে। একটা হাত তার নবীর ওপর রাখা, নবীর পিঠে কঞ্চি ভেঙেও কোনদিনই খুব ব্যথা পায় না,—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, ঘুমিয়ে পড়া ছেলের ওপব হাত রেখে, তার মনটা হ হ করে ওঠে দুঃখে। সত্যি, এতোটুকু ছেলে কী-ই বা বোঝে? বাপ তো মরে গিয়ে রেহাই পেয়েছে চিরদিনের জন্ত, বাপ-মার যুগল দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছে হতভাগিনী হালিমা। যখন তখন ওকে মারপিট করা সত্যি অস্বাভাবিক। কিন্তু আজ যদি কিছুই না শেখে, ও বাচবে কী কবে সংসারে? হালিমা তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না যে, নিজের দিন গুজরানের কথা নবীর না ভাবলেও চলবে!

হালিমার চোখ আঁসতে ভরে আসে, আশমান থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে সে চুমো খায় নবীর কপালে।

নবী আঁসতে আঁসতে চোখ মেলে চায়—আর হঠাৎ একবার দরজাব দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই মা, এইডা কে?

—কইরে? বিস্মিত হালিমা প্রশ্ন করে।

—উই যে গেলো,—ডান হাত বাড়িয়ে নবী দেখিয়ে দেয় অপরিচিতের যাওয়ার পথটি।

—কেউ না। নিঃসন্দ্বিগ্ন উত্তর দেয় হালিমা।

—তুমি লুকাইবার চাও? —নবীর অভিমান যেন ফুলে ওঠে—খুব ছন্দর একটা মাহুষ গেছে না? রাডা ধবধবা আর পিন্দনে ছন্দর কাপড়?

—ছন্দর মাহুষ ? হালিমার বিস্ময় এবার আরো বেড়ে যায় ।

—হ, চোখ ছুটো বড়ো বড়ো করে নবী—মিঠাই নিয়া আইছিল,—তোমার কাছে দিয়া গেছে, না মা ?

—হ, দিয়া গেছে । একটা করুণ হাসিতে প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে হালিমা—তারপর একটু শান্ত হয়ে বলে, নবী, এখন তুই ঘুমা,—বিহান বেলা খাবিনে মিঠাই ।

—লোকটা কোন্‌খান থে আইছিল, মা ? নবী আবার প্রশ্ন করে—তুইটা পাখ'না দেখছো পিঠে ?

—পাখ'না ?—হালিমার আক্কেল সত্যি হার মানে এবার । আপো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে সে তাকায় নবীর মুখের দিকে, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারে না হালিমা ।

নবী আবার বলে—হ, পাখ'না ।—মউরের পেখমের মত ছন্দর !

হালিমা আরো কাছে টেনে নেয় নবীকে, পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—ফিরিছ'তা আইছিল রে—ফিরিছ'তা । আজ ছবে-বরাত না ! ঘরে ঘরে আইয়া খোঁজ-খবর নিছে মান'ছের । ফিরিছ'তার তো আজ ছুটি ।

ফেরেশ'তা এসেছিলো ! নবীর সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে । এক দারুণ উত্তেজনায় সে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে । সুন্দর আজকের রাতটা—রূপা-গলা জ্যোছনায় ঘুয়ে ঢল ঢল করছে সারা পৃথিবীর গা । সন্ধ্যায় ঘরে ফেরবার সময় আজ সে দেখেছে মসজিদে মসজিদে কোরআন-তেলাওৎ-রত ছেলেমেয়েদের । রাত হয়েছে অনেক, তবু শাহ-বাড়ির মসজিদ থেকে কোরআন তেলাওত্তের শিরীন আওয়াজ ভেসে আসছে এখনো—গোরস্তান গমগম করছে মাহুষে । আজ ঘুমিয়ে নেই কেউই, ফেরেশ'তার সঙ্গে মৃতদের রূহের সঙ্গে আজ মোলাকাত করবে সবাই ; নিজেদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাজ্জার মারফত জানাবে আল্লাহ'র কাছে । শুধু নবী আর হালিমাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে এ সুষোগটা । তাদেরই দুয়ারের লম্বুখ দিয়ে চলে গেছে আল্লাহ'র ফেরেশ'তা, তাদের চাওয়ার কথা—জীবনপিপাসার কথা কিছুই জেনে যায়নি—কিছুই জানানো হলো না তাকে ।

বাতি ধরিয়ে হালিমা পরীক্ষা করে ছেলের হাবভাব । একবার বলে—কিরে, তোর খিদে লাগছে খুব ? ভাত খাবি এখন ? নবী কোনো জবাব দেয়না তার, খিদে'র কথা সে ভুলেই গেছে একদম । মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক মধুর কঠিন ভাবনায় । ফেরেশ'তার খবর নিয়ে যায় আল্লাহ'র কাছে । তাদের খবরও কি

নিয়ে গেছে ফেরেশতা ? সে কি গিয়ে বলবে না, বরাতের রাতেও সে ঘুমে দেখে গেছে নবী আর হালিমাকে—ফিরিছ্তারে কিছু কইয়া দিছো মা ? আবার জিজ্ঞাস হয় নবী ।

কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে হালিমা ।

—দুয়ারের কাছ দে' গেলো আর কিছু কইয়া দিলা না ? অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে নবী, আমারে ডাকলা না ক্যান তুমি ?

—আরে পাগলা ! হালিমা তার জালা চেপে রাখতে পারে না, ফিরিছ্তা আমাগো কথা ছুনব ক্যান ? বড় লোকগো খোজখবর করবার নাই না আসছে ? আমাগো দুয়ারের কাছ দে' তাগো বাড়িই হে গেছে ।

নবী চুপ ক'রে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—তুমি নামাজ পড়ো না ক্যান মা ? অসহ মুকন্নিয়ানার স্বর বেজে ওঠে তার প্রশ্নে ।

—কী হইবো নামাজ পইড়া ? একটা পরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় হালিমার কণ্ঠে ।

—কী, অইবো কি ? এতোটুকু নবী জলে ওঠে বিরক্তিতে, যারা নামাজ পড়ে, তাগো বাড়িতেই না ফিরিছ্তার আছে ; আল্লা তো তাগো কতাই হোনে ।

—না-রে না, হালিমা একরকম চিংকার ক'রে ওঠে এবার, আল্লা তো মুমাইয়া রইছে কেঁতা গায় দিয়া । ছুনা-রুপা দিয়া ছেজ্জা করলেই হে চায় । গরীবের সোদা নামাজে হের মন ভিজে না ।

আল্লাহ'র এই মহৎ গুণের কথা ভেবে একান্তভাবেই ঘবেড়ে যায় নবী । কাঙাল যারা, মিসকিন যারা, তাদের আর কোন ভরসাই নেই তা'হলে । এতো সোনা-রুপাও তারা পাবে না, তাদের দিলের আরজুও গিয়ে পৌছবে না খোদার কাছে । আর তাই তো গরীবদের যারা নামাজ পড়ে তাদের তো মালদার হতে দেখা যায় না ; দুঃখ তাদের ঘুচ্ছে কই ? সোনা-রুপার শিরীন আওয়াজেই তাহলে ঘুম ভাঙে খোদার ! সেই জন্তেই বুঝি মালদার আরো মালদার হয়, একগুণ দিয়ে পায় সত্তর গুণ !

কিন্তু খোদা তো পয়সা করেছেন সবাকেই । তিনি কেন তাঁর রহমত একতরফা বিলিয়ে দেবেন মালদারদের মধ্যে ? কোনো দিন কি খুয়ের ষোরেও দরিদ্র বান্দার দুঃখে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে না তাঁর-চোখ ? সত্যি কি গরীবেরা ঘুম ভাঙতে পারে না তাঁর ?

হতাশার আধারে হাতড়ে কিয়তে থাকে নবীর মন । দুয়ারের স্বমুখ দিয়ে গেছে

ফেরেশতা, দবদবে আগুনের মতো রঙ, ময়ূরের পেখমের মতো বিচিত্র বর্ণের দুটো ডানা তার পিঠে, তার সারা গায়ে সে কী খোশবু! সাদা ধবধবে তাজী ঘোড়া কোমর নাচিয়ে চলেছে ফেরেশতাকে নিয়ে। নবী জেগে থাকলে আজ শুয়ে পড়তো ফেরেশতার পথে, আর মিনতি ক'রে বলে যেতো, তার রক্তের টেউ-ওঠা অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী। কথা না শুনলে সে বুকে পড়তো ডানা ধ'রে—ফেরেশতার সাথে সাথে উড়ে সেও চলে যেতো একেবারে আল্লাহ'ব কাছে। অমনি চোখ না মেললে নবী চিংকার করতে গলা কাটিয়ে, খামচিয়ে রক্তাক্ত ক'রে ঘুম ভাঙাত আল্লাহ'র।

কিন্তু তা তো আর হলে না। অখচ সব কিছুরই চাৰি রয়েছে খোদাব হাতে; তাঁর ঘুম ভাঙাতে না পারলে কেই বা আর খুলে দেবে ভাগ্যেব মণিকোঠা?

বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে নবী। রাজ্যের যতো চিন্তা এসে জটলা পাকায় তার মনে। হালিমাও বাতি নিৰিয়ে গা এলিয়ে দেয় নবীর কাছে। ছেলে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, হালিমা তা দেখছে না, শুধু বুক দিয়ে অল্পভব করছে নবীর বুকভরা অস্থি। একবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হালিমা বলে, নবী, অনেক রাত অইছে—তুই ঘুমা।

নবী আশমানের দিকে চেয়ে থাকে চূপ ক'রে, আর একটা পথেব খোজের কল্পনা তার হয়বান হয়ে যায়। আকাশ ভরে পৃথিবীতে এতো জ্যোৎস্না—তবু যেন কতো অন্ধকার, চোখের সঙ্গে মনও হারিয়ে যায় সে-অন্ধকারে।

হঠাৎ একবার বিজলি ঝিলিক দিয়ে যায় তার চোখে, অকূল দরিয়ায় যেন নারিকেল কুঞ্জ-ছাওয়া উপকূলের আভাস পেয়েছে নবী। খুশিতে, আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা দেহ। হয়েছে, আর ভাবতে হবে না! আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে টান দেবে সে। রশি তো হাতেই রয়েছে তার। এবার থেকে নির্বিকার ভাব শুচে যাবে খোদার।

পরদিন। আগের দিনকাব পানি-ভাত দুটো খেয়ে দোকানে কাজ করতে যায় নবী—যাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না, হালিমাই তাকে পাঠিয়েছে অনেক শাসিয়ে। হালিমা বলে, নিজের হাতেই আজ গড়তে হবে কপাল, আল্লার কাছে আরজি পেশ করলেই চলবে না।

কয়েকটা ছেলের সাথে নবী বিড়ি বাঁধছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে পিলখানার ওপাশে ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। দোকান পালিয়ে লোক-চক্কর আড়ালে ঐখানে সে রোজই ঘুড়ি ওড়ায় আপন মনে। এ-খবর সে ছাড়া আর কেউ জানে না সংসারে। পৃথিবীকে লুকিয়ে শিশু তার কচি হাত দুটো

বাড়িয়ে দেয় আশমানের দিকে। কিন্তু হাত আব কদরূই বা ওঠে? নবীকে তাই নিতে হয়েছে ঘুড়ি—ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে সে তার বাণীকে এতোদিন অজান্তে ওপর হতে আরো ওপরে আরশের দিকেই পাঠিয়েছে।

পেট ব্যথার অজুহাত তুলে নবী বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। মহূর্তের জন্তেও সে স্থির থাকতে পারছে না। আজ অতি সন্তর্পণে বাড়ি পৌছে নবী। মা বাড়ি নেই। আনন্দের সীমা থাকে না নবীর। তিনটা পাতিল তচ্‌নচ্ করে সে বার করে দু'আনা পয়সা—ওহ! দুই আনা পয়সা তো নয়, সাত রাজার ধন। পয়সাগুলো মূঠোয় পুরে নবী ছুটে যায় নবাবগঞ্জে। স্মৃতো কিনে আবার সে দৌড়তে শুরু করে দেয়। এক নতুন অভিযানের নেশায় বুক তার কাঁপছে। জ্বলের ভেতরকার এক পরিত্যক্ত ভাঙা মসজিদের অন্ধকার গুহা থেকে নবী বাব কবে আনে একটা ঘুড়ি আর লাটাই। এই ঘুড়িই তাকে রোজ দোকান থেকে বেব করে আনে কাজ ভুলিয়ে, এই ঘুড়িই তাকে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আশমানের পথে নিয়ে যায়। আর সব ব্যাপারেই খই ফোটে নবীর মুখে, কিন্তু এই ঘুড়ির কথা কাবো কাছে সে বলে না। এ যেন তার নেহাত পুশিদা খেলা, একান্তভাবেই নিজস্ব।

এক সময়ে নবী চলে যায় পিলখানার ওপাশে সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। পুরোনো স্মৃতোটার সঙ্গে নতুন স্মৃতোটা। গেরো দিয়ে সে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আশমানে। ঘুড়ি যতোই ওপরে উঠতে থাকে উল্লাসে অধীরতায় ততোই বিচলিত হয়ে ওঠে নবী, একটা স্থিতহাস্তে তাব মুখ থেকে চোপ পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বারবার। আরশের পায়ে রশি লাগিয়ে আজ সন্ডোরে টান দেবে নবী।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসে ঘুড়িটা। এক সময়ে যখন হাতের স্মৃতো শেষ হয়ে, গেল, নবীর দুঃখের সীমা থাকে না। স্মৃতো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঘুড়ি যে দেখা যাচ্ছে এখনো। খোদা কি এতো কাছে? তাতো নয়, মাহূষের দৃষ্টিসীমার বাইরে অনেক দূরে আরশের ওপর ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এতো কাছে হলে তো গালি চোখেই দেখা যেতো আল্লাহকে। স্মৃতো চাই তার, আরো অনেক স্মৃতো,—যে তার ঘুড়িকে নিয়ে যাবে মেঘের ওপারে, আরশের একেবারে কাছটিতে! কিন্তু এখানেও দরকার পয়সার। সে যে স্মৃতো কিনবে সে পয়সাই বা কই নবীর? তাদের দুর্দশা তাহলে আর যুচবে না। নবী আশমানের দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থতায় আর্ভনাদ করে ওঠে। ঘুড়ি ওড়ানো যতোদিন একটা শখ ছিলো, নেশা ছিলো, ততোদিন শুধু ঘুড়ি উড়িয়েই আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন ওই ঘুড়ি একটা গভীর অর্থ নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে, সহস্র বেদনায় সম্ভাবনার পথও অব্যাহত হয়ে গেছে তার জন্তে!

কিছুক্ষণ ঘুড়ি উড়িয়েই বাড়ি চলে আসে নবী। এই স্ততোয় হবে না, আরো অনেক স্ততো চাই। বামনের হাত বাড়িয়ে আরশের পায়্যা ধরা অসম্ভব। পরম যত্নে সে ঘুড়িটা লুকিয়ে রাখে ভাঙা মসজিদের নির্জন অন্ধকারে।

বেলা চলে যাচ্ছে, ঘরেও পয়সা নেই। মার কাছে পয়সা চাইতে গেলে হালিমা কঞ্চি দিয়ে তার পিঠের ছাল না তুলে ছাড়বে না। যে ছ' আনা পয়সা আজ সে চুরি করেছে তার জন্তেই তার বরাতে কী আছে কে জানে? তবু লোভ সামলাতে পারে না নবী। আজকালের লিখা পাল্টাতে হলে কিছু খরচ—কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বইকি। মার অবর্তমানে নবী উন্টে পান্টে দেখে ঘরের সব কটা হাফি-পাতিল—ছেঁড়া কাপড়ের খাঁজে তন্নতন্ন করে। একটা পয়সা নেই কোথাও। পয়সা থাকবেই বা কী করে? ভিক্ষে করে পরের বাড়িতে কাজ করে বা দু'চার পয়সা পায় তাতে করে মা-ছেলের আধপেটা খাবারই হয় না কোনদিন, তারা আবার জমাবে পয়সা।

হঠাৎ নবীর মনে পড়ে যায় : ইষ্টিশনে গেলে দু'চার পয়সা পাওয়া যেতে পারে। তার বয়সী ছেলেরদের সে কুলিগিরি করতে দেখেছে অনেকদিন। নবী আর ভাবতে পারে না, একপেট ক্ষিধে নিয়েই সে ছুটে যায় ইষ্টিশনের দিকে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় তাকে। তারপর গাড়ি মখন এলো, তাজ্জব বনে যায় নবী, কতো বিচিত্র রকমের মানুষ, আর কতো রঙবেরঙের পোশাক! বাকস, বিছানা, পেটরা প্রভৃতিতে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে লাইনের কাছটুকু। 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' চিংকারে হারিয়ে যায় আর সব আওয়াজ।

সবার বরাতেই একটা না একটা কিছু জুটে যায় : কিন্তু নবীর কপাল বড়ো খারাপ, 'মুটে চাই' বলে চিংকার করতে গিয়ে আওয়াজ এলো না তার গলায়—হাত ছুটো চাওয়ার ভঙ্গিতে ওপর দিকে উচিয়ে যেন ছুটে যায় এক কামরার স্তম্ভ থেকে আরেক কামরার স্তম্ভে।- চোখ তার করুণ আঁসুতে টলোমলো। ভিক্ষুক মনে করে কেউ কেউ তাকে নসিহত করলে শ্রমের মর্ধাঙ্গা সম্বন্ধে, আর অতি আধুনিক কেউ দিলে গলাধাক্কা। কারো কাছ থেকেই নবী কিছু পেলো না।

ট্রেন চলে গেছে। ইষ্টিশনে বসে বসে নিজের বদ নসীবের জন্তে বেদনায় ভরে আসে নবীর মন। দুঃখটা এবার আরও বড়ো হয়ে দেখা দেয় নবীর কাছে। মায় বেটায় কোনদিন একেবারেই উপোস করতে হয় তাদের। বছরে একবার করেও যদি কাপড় কিনতে পারতো তারা! তার বাপ সেই যে ছেঁড়া শততালি দেয়া কাপড়গুলো রেখে গিয়েছিলো সেইগুলোই আরো তালি দিয়ে গেরোর ওপর গেরো দিয়ে পরছে তারা দুজনে। ঘরের মেটে দেয়াল তো প্রায় সবটাই গলে গেছে, বৃষ্টি

হলেই টিনের সুরাখ দিয়ে পানি পড়ে ঘর ভেসে যায়। হৃদশার আর সীমা পরিসীমা নেই তাদের। আল্লাহর কাছে তাদের দিলের আরজু পৌছাতে পারলেই অবদান ঘটতো দুঃখরাজির। কিন্তু হালিমা নামাজ পড়ে না, নবীও আরতরী সুরা এবং রাকাতগুলো শিখবার সুযোগ পায় নি কখনো। আল্লাহ্ কেনই বা শুনবেন তাদের কথা।

ষট্টিখানেক পরে আরেকটা ট্রেন যখন এলো, নবীর আনন্দ দেখে কে! ট্রেন থামবার আগেই ‘মুটে চাই’ ‘কুলি চাই’ বলে সে চিৎকার শুরু করে দেয় প্রাণপণে। ট্রেন থামলে একটা ঘড়ি-পরা বলিষ্ঠ হাতের ইশারায় নবী এসে দাঁড়ায় এক প্রথম শ্রেণীর কামরার স্মুখে। ভদ্রলোক একটা এটাচি ও হোল্ডঅল্ দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওয়েটিং রুমে নিয়ে যেতে পারবি?

—ক্যান পারুম না? তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয় নবী, দেন আমার ঘাড়ে তুইলা। আমার বহুত পইছার দরকার—চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে উচ্চারণ করে নবী—আমনে কতো দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক এবার দৃষ্টি প্রথরতর করে নবীর মুখের নিকে তাকাল, ঞ্জুত হেলে তো! বলেন—অতো পয়সা দিয়ে কি করাবি?

—বারে, পইছার বুঝি কাজ নাই। নবী রীতিমতো বিগ্নয় প্রকাশ করে, খুড়ির রছি কিছুম যে—অনেক রছি।

ভদ্রলোক এবার সত্যিই হেসে ফেলেন এবং হোল্ডঅল্ টা নবীর মাথায় দিয়ে এটাচিটা হাতে করে নেমে পড়েন গাড়ি থেকে। ওয়েটিং রুমে কমে এসে চার পয়সার জায়গায় চার আনা দিয়ে বলেন—এই নে, অনেক সুতো হবে।

নবী সিকিটা ছুঁড়ে মারে ওয়েটিং রুমের মেঝেয়—না, আমি নিমু না। চার আনায় আমি কি করুম? আমার অনেক রছি লাগবো। আমার খুড়ি আছমান হুইবো গিয়া।

সবাই অবাধ হয়ে যায় নবীর মেজাজ দেখে। ভদ্রলোক সিকিটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—খুড়ি আশমান ছুঁলে তোর কি হবে?

—ক্যান, আরছের পায়ায় বাজাইয়া টান দিমু। এক স্বপিল নেশা আর শক্তির ক্ষুতিতে নবী মুহুর্তে যেন বিষট হয়ে কিছু ওঠে—আল্লা খালি আপনাগো কথাই ছুনবো, আমাগো কথা বুঝি ছুনোন লাগবো না হের?

এবার সকলে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। পরিবেশটা মুহুর্তে যেন কেমন ধম্ধমে বিষন্ন হয়ে ওঠে। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। রাজভক্তদের সামনে

যেন রাজদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে শিশুর মুখে। ভদ্রলোক পকেট হতে একটা আধুলি বের করে বলেন—এই নে, এখন হবে তো ?

আধুলিটা হাতে নিয়ে রুতজ্ঞতায় আঁধি ছল্ ছল্ করে ওঠে নবীর। আশ্চর্যিকতা মিশিয়ে বলে, আমাগো যখন অনেক পইছা আইবো, আমাগো বাড়ী তখন আইয়েন—আপনের জেব ভইরা দিমু হেদিন।

নবীর কথায় হেসে ফেলে সবাই। ষিনি আধুলিটা দিয়েছেন, তিনিও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে। তাঁর আজকেব এই মেহেরবাণীর কথা ভুলতে পারবে না নবী—দিন যখন ফিববে, নবী দুই জেব ভাঁত করে পয়সা দিয়ে শোধ করবে তাঁর ঋণ। হাসতে হাসতেই বলেন, হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই আসবো, আমরা সবাই আসবো সেদিন।

নবী এসব শুনবার জন্য অপেক্ষা কবে না। সে সোজা চলে যায় চক্কেব দিকে। অনেকটা স্ততো কিনে যখন বাড়ি ফিরলো তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। স্ততোটা সে লুকিয়ে রেখে আসে মসজিদে—তার ঘুড়ির পাশে।

হালিমা ভিক্ষা-করে আনা চালগুলো জ্বাল দিচ্ছে। গাছতলা থেকে ভিজ়ে বন কুড়িয়ে এনেছে আশুন ধরাবাব জুতে। নবীকে দেখেই চোখ কচলাতে কচলাতে বলে,—কিরে,—অতোক্ষণে কোন্থে আইলি ?

মাব দরদভরা প্রশ্নে অত্যন্ত খুশি হয় নবী, তার মেজাজ তাহলে বিগড়ে যায়নি আজ। হযতো পাতিল তচ্ নচ্ কবে পয়সা নেবাব খবরটি সে জানতেই পারেনি এখনো। মনে মনে আল্লাহ্কে সে শুকরিয়া জানায়।—দোকান তে বার আইয়া একটু ঘুইরা আইলাম মা,—মার দিকে চেয়ে সে বলে সহজভাবে।

চুলোয় বন ঠেলতে ঠেলতে হালিমার কঠে দরদ ভেঙে পড়ে—দোকান তে পালাস নে যেন! কাজটা ছিখে ফেললে অনেক পইছা আইবো ঘরে। কাজ না জানলে কি আর ভাত-কাপড় জুটে? আমাগো মা-পুতের কি এ-ছাড়া আর উপায় আছে?—এবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হালিমা প্রশ্ন করে—হাঁবে নবী, তোর খিদে লাগছে, না ?

মায়ের আশ্চর্যিকতায় নবী একরকম ভুলেই যায় তার খিদেয় কথা। তাছাড়া, একদিকে রশি কেনার আনন্দ, অল্পদিকে মার স্নেহ—দুটোতে মিলে আজকের দিনটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে নবীর কাছে। হেসে সে বলে—না মা, আমার খিদে লাগছে না। দোকানে আমাগোরে খাওয়ায় কিনা দুপুরবেলা।

—তাই ভালো—হালিমা সায় দেয়—ভিক্ষার ভাত যতো কম পেটে দেয়া যায় ততোই ভালো। এ ভাতে ছেলেমাইয়া গো 'বাইড়' থাকে না।



রান্না হলে নবী ও হালিমা, দুজনই কিন্তু ভিক্সের ভাত পেটে ঢেলে স্বস্তিবোধ করে কিছুটা।

পরদিন দোকানের কথা বলে নবী একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। আজ আবহাওয়া খুবই অস্বস্তিকর—এবং নবীর হাতে অনেক স্নাতো। পাখবীতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আজ সে তার হাত পৌঁছিয়ে দিতে পারে আশমানে।

নবী ঘুড়িটাকে বৃকের কাছে চেপে ধরে—বৃক তার টিপ টিপ করছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘুড়ি উড়লো আশমানে,—হাওয়ায় ভরে নেচে নেচে। দুঃসাহসের দোলায় কেঁপে কেঁপে ঘুড়ি উঠে যায় ওপর হতে ওপরে—আরো ওপরে! স্নাতো আজকে ছুবোতে চায় না,—ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে—অই বৃকি ঘুড়ি হারিয়ে যায় দৃষ্টির ওপারে অসীম শূন্যতায়। আবেগে, ঔৎসুক্যে বড়ো হয়ে এলো নবীর চোখ দুটো। তার বৃকের শ্বাস দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে আসে, ঠোঁটের বাঁধন খুলে গিয়ে একটা অদ্ভুত হাসির আমেজ লাগে তার সারা মুখে। ঘুড়ির নাচের সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব চঞ্চলতার নাচতে থাকে তার বড়ো-হয়ে-আসা চোখের চকচকে তারা দুটো।

এক সময় টের পায় নবী—লাটাই আর ঘুবছে না। স্নাতো শেষ হয়ে গেছে। সেই নির্জন ফর্ণামনমার ঘেরা জায়গাটুকুতে নবীর চোখ পানিতে ভরে আসে। ঘুড়ি এখনো দৃষ্টিসীমার ভেতরেই।

নবী ঘুড়ি নামিয়ে আনলো। আরো বেশি রশি চাই তার, অনেক রশি। খোদা তাঁর আমন এতো দূরে পেতেছেন কেন, বুঝতে পারে না নবী। কিন্তু আমন দূরে পাতলেই কি আরশে বসে ঘুমোনো এতো নিরাপদ? সংসারে কি রশি নেই যে, তাঁর আরশ ছোঁওয়া যাবে না, টলিয়ে নেয়া যাবে না পাখায় রশি লাগিয়ে? নবীর আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল হয়ে ওঠে বাধা পেয়ে।

চিরদিনকার নতো মসজিদে ঘুড়ি আর লাটাই লুকিয়ে আজ সে চলে যায় ইন্সিটনে। পয়সা চাই তার, রশি কেনার পয়সা—যে রশি সে আরশের পায়ার বেঁধে খোদাকে বেঁধে নামিয়ে আনবে মাটির মানুষের মধ্যে!

শেষ পর্যন্ত ছ'আনার বেশি আর জুটে না। কতোটুকু স্নাতোই বা আর কেনা যায় এ দিয়ে!

এমনি করে রোজ কিছু কিছু পয়সা আয় করে নবী—আর তাই দিয়ে স্নাতো কিনে পুরোনো স্নাতোটোর সাথে জুড়ে দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আশমানে।

পিলখানার ওপাশে ওই স্থানটুকু নবী একান্ত আপন করে নিয়েছে অনেকদিন। অমন নির্জন নীরব পরিবেশে আশমান ছাপিয়ে ওঠে নবীর দুর্জয় সাহস। কিন্তু হাতের

স্বতো যখন শেষ হয়ে যায়, এবং ছোট হতে হতেও ঘুড়ি যখন থেকে যায় দৃষ্টির ভেঙেয়েই, নবীর তখনকার দুঃখ আর আক্রোশ দেখে কে? তবু মন তার ভেঙে পড়ে না—সাকল্যের নিকট সম্ভাবনা তাকে করে তোলে আরো সাহসী, আরো জেদী।

রোজ নবী দোকানের কথা ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—কিন্তু কোথায় বা দোকান আর কোথায় বা নবী? ইষ্টিশনে, বাজারে মুটেগিরি ক'রে যা ছ'চার পয়সা পায় সবই খরচ করে স্বতো কেনায়। দিনে দিনে স্বতো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে।

একদিন সত্যিই ঘুড়ি ছোট হতে হতে একটা কালো বিন্দু মতো হয়ে আশমানের অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেলো। ডোর ধরে রেখে আশমানের দিকে চেয়ে আছে নবী! আর প্রচণ্ড কাঁপুনিতে থর থর ক'রে উঠছে তার শরীর। উত্তেজনার কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে এলো তার, বিশ্বয়ে আশঙ্কায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসে—একটা ককরণ হাসিতে মধুর হয়ে ওঠে শিশুর মুখ। আজ যেন টানাটানি পড়ে গেছে আশমান আর পৃথিবীর মধ্যে—কে হারে, কে জেতে—এবং ভারি আকর্ষণ সে অমুভব করছে হাতের রশিতে? শুধু একটা রশি টন্টন্ করছে আশমানের আকর্ষণে। হয়তো দৃষ্টির আড়াল থেকে কে টানছে রশিকে ধরে—আর সেই টানে ফুলে ফুলে উঠছে নবীর শিবা উপশিরা।

রশি বেয়ে বেয়ে নবীর বিস্মিত দৃষ্টিও হারিয়ে যায় আশমানে। আজকে আর ঘুড়ির রশি গুটোবে না নবী; লোকচক্ষুর ওপারে ঘুড়ি উড়ে বেড়াক আপন ইচ্ছায়—আপন ধর্মে। এক সময় হয়তো আটকে যাবে আরশের পায়ায়—আর শক্ত টান পড়বে হাতে, রশিতে টান দিয়ে নবী টলিয়ে দেবে আল্লার আরশ। ভয়-চকিত আঁখি মেলে আজ তিনি তাকাবেন মাটির মাহুঘের দিকে, অনিচ্ছায়ও শুনতে হবে দুঃখী বান্দার কাহিনী—তাদের ইতিহাস!

নবী চেয়ে আছে ওপর দিকে. শুধু একটা স্বতো—সে-রাতের পুলের মতো স্বন্দ একটা সিঁড়ি বেহেশত্ আর ছুনিয়ার মাঝখানে। মাঝে মাঝে সাদা, কালো নানা রঙের মেঘ আনাগোনা করছে, আর আঁৎকা টান পড়ে পড়ে বন্ বন্ করে উঠছে স্বতোটুকু—মেঘ ছ' টুকরো হয়ে যাচ্ছে সে স্বতোর ধারে! নবীর চোখ দুটো পানিতে ভ'রে আসে। আল্লাহর আরশ ঠিক কোনখানটিতে তা সে জানে না, কিন্তু আজ তার মনে হলো—সে যেন তার বিক্রোহের নিশান আরশের কাছাকাছি কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যেন দূর নয় বেশি!

পেটের ক্ষিধে, মা ও সমস্ত সংসার—সব কিছু ভুলে যায় নবী। সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ ‘ডোর’ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। কই, কোথাও তো আটকে গেলো না ঘুড়ি! এক সময়ে সে স্ততো গুটিনে ঘুড়ি নামিয়ে আনে নীচে এবং জমিন হোঁবার আগেই ঘুড়টাকে চেপে ধরে তার বৃকের মাঝে, ঘাড় নীচু করে সে পরশ নেয় ঘুড়ির, কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ পায় নাকে, আর ঘুড়টাকে মনে হয় ভেজা ভেজা। আহ্—নবীর বৃকে খুশি আর থামাই পায় না যেন। বহুদিন পরে খোদা তার গরীব বান্দার হুখে কেঁদেছেন, আর তাঁরই আঁহর ধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে নবীর ঘুড়ি।

আরশের পায়ী ধরে টান দিতে হল না আর, এর আগেই খোদা কেঁদে ফেলেছেন তার বান্দার হুখে। নবী আজ সত্যি বিজয়ী—সে সার্থক হয়েছে তার অভিযানে; আজ থেকে আর কোন হুখ থাকবে না তাদের।

বাড়ি ফিরে দেখে, হালিমা বিছানায় পড়ে কৌকাচ্ছে—জ্বর এসেছে তার। জ্বাহরের সময়েই চলে এসেছিল ঘরে—আজ আর কিছুই জোটেনি কপালে। মনটা খারাপ হয়ে যায় নবীর—খোদা যদি তার বান্দার হুখে কাঁদবেন তো তার মার জ্বর হবে কেন আজ? তাদের ঘরে আজ ভাত জুটবে না কেন? এ তাহলে আল্লার আঁহু নয়—ণয়তানের পেশাব! শয়তান চায় না যে মাহুষের দিলের আরজু পৌঁছুক গিয়ে আশমানে।

নবী বুঝতে পারে, আরো অনেক স্ততোর দরকার হবে তার। সাত তবক আশমান পেরিয়ে গিয়ে তবেই না আল্লাহর আরশ! সকালবেলা জ্বর নিয়েই উঠে পড়ে হালিমা। কয়েক বাড়ি ঘুরে কিছুটা খাবার যোগাড় ক’রে নিয়ে আসে নবীর জন্ত। নবী বলে—তুমি খাইবা না মা?

না—হালিমা ধীরে ধীরে বলে—তুই খাইয়া দোকানে যা। নবী পিয়ে পিয়ে কেনটা গিলে নেয়। তারপর মাকে শাস্বনা দিয়ে বলে—তুমি চিন্তা কইরোনা মা—আল্লা আমাগো উপরে মুখ তুইলা চাইবো। এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা ছেলের দিকে চেয়ে একটু করুণ হাসি হাসে—কিছু বলে না। টলতে টলতে এক সময় সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে জানে না যে নবী দোকানে যায় না একদিনও—বাজারে ইষ্টিশনে মুটেগিরি করে, আর পিলখানার ওপাশে ঘুড়ি ওড়ায়।

নবী মুটেগিরি করে করে রোজ কিছুটা স্ততো কেনে। উধ্ব হতে আরো উধ্বলোকে পাঠিয়ে দেয় তার বিক্রোহের নিশান। কিছুতেই থামতে পারে না নবী;

তার নূরের জেলিতে দিনাই পাড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তার দিকে হাত বাড়িয়েছে দুঃসাহসী শিশু!

কিন্তু যতই স্ততো জুড়ে দিচ্ছে—ঘুড়ি ততোই উপর হতে আরো উপরে উঠছে—কোন কুল কিনারাই পায় না নবী। অতোদূরে—মাছবের নাগালের বাইরে এ-ভাবে আত্মগোপন করার কী মানে থাকতে পারে, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন নবী সন্ধ্যার সময় ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে এসে দেখে—মা আজ বড়ো খুশি। পরনে তার নতুন শাড়ি—শান্‌কি আর বাটিতে ভাত-সালুন বেড়ে বসে আছে নবীর অপেক্ষায়।

বহুদিন পর শান্‌কি-ভরা ভাত দেখে পেট জ্বালা ক'রে ওঠে নবীর। সে সোজা গিয়ে বসে পড়ে হালিমার কাছে। খেতে খেতে মাকে বলে—মা অহো ছব্‌ পাইলা কই আইজ্‌ ?

আজ্ঞো জ্বর ছিলো হালিমার। কিন্তু এই মুহূর্তে নবীর খাওয়া আর খুশি দেখে সে যেন স্নহ হয়ে ওঠে হঠাৎ। ধীরে ধীরে বলে—কাহারটুলির জমিদার বাড়ির বউ মরছিল না, তারি ফাতিহা আইছে আইজ্‌, বহুত কাপড় চোপড় আর টা‌হা পয়ছা দান-খয়রাৎ করছে তারা। দেখ না—তো‌র লাইগা একটা লুঙ্গিও আনছি চাইয়া। হালিমা উঠে পড়ে এবং একটা ছোট্ট নতুন লুঙ্গি এনে দেয় নবীর হাতে।

বিশ্বয়ে অবাক হয়ে যায় নবী। আজ বুঝি সত্যি তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন আল্লাহ, যুম তাহলে ভেঙেছে তার আজ! শুক্রিয়্যার বান ডেকে যায় তার বৃকে। ছলোছলো চোখে মার দিকে চেয়ে বলে—কইছিলাম না মা—এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা নবীর এ-কথায় সায় দিতে পারতো না কোনোদিনই। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সায় না দিয়ে পারে না। নবীর চোখে যেন সে পরিচয় পেয়েছে তাদের উজ্জল ভবিষ্যতের।

জমিদার বাড়ির দেয়া পয়সা আর চালে দুদিন ভালোই যায় তাদের; আবার শুরু হয় আধ-পেটা খাওয়া আর উপোসের পালা। নবীর মন ভেঙে পড়ে—রাগে জ্বালা ধরে যায় তার সমস্ত সত্যায়। একি ছলনা—একি ছিনিমিনি খেলা বান্দার জীবন নিয়ে? তাদের আরজু তাহলে এখনো গিয়ে পৌছায়নি খোদার কাছে।

নবী রোজ ঘুড়ি ওড়ার আর মনে মনে বলে—আল্লাহ্‌র আরশ পর্বন্ত পৌছতে পারে এতো স্ততো যদি সে কিনতে না-ই পারে এতো কে‌রেশ্‌তা রয়েছে কী জন্তে তারাই তো মাছবের দিলের আরজু পৌছয় গিয়ে খোদার কাছে। আল্লাহ্‌র

কাছ হতে তারাই পয়গাম নিয়ে আসে মাহুকের কাছে। আজকাল এতো নিজিয় কেন এই ফেরেশ্তারা? কেন তারা নবীর ঘুড়িকে নিয়ে যায় না আল্লাহর কাছে।

সেদিন সোমবার। নবী না খেয়েই ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকু! নবী দুবার ওপর বসে নতুন স্তোত্রটাকে জুড়ে দেয় পুরোনো স্তোত্রটার সঙ্গে। আশমান কেমন যেন মেঘলা মেঘলা। সূর্যের আলো পড়ে মেঘগুলো সাদা হয়ে গেছে। আর ফাঁকে ফাঁকে চক্চক্ করছে গাঢ় নীল আশমান। এই সময় নব ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দেয় আশমানে,—তাতে তার লাটাই আর ঘুড়ি শনশন করে ধাওয়া করছে উর্কদিকে। নবী অপলক চোখে চেয়ে আছে ঘুড়ি পানে—আর রশিতে টান পড়ে পড়ে বিন্ বিন্ করে উঠছে তার সারা শরীর। অস্বাভাবিক উল্লাসে ভরে উঠছে নবীর মন। নবী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। মন তার আবেগ-উৎসাহে থর থর করে কেঁপে উঠছে, কল্পনা স্বর্ণ ঙ্গলের মতো ডানা মেলেছে আশমানে!

ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে এলো। একসময় নবী বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলো, তাব ক্ষুদ্র ঘুড়িটার চারপাশে একটা বৃহৎ পাখি উড়ছে আর ঘুরছে। মাঝে মাঝে পাখিটা হারিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে, আবার দেখা যাচ্ছে ডানা মেলে ঘুড়িটাকে কেন্দ্র করে। আশ্চর্য, একবার ঘুড়ির রশি আটকে যায় পাখির গায়। নবীর হাতে টান পড়ে আর তাতেই সারা দেহ অজানা আশঙ্কায় চলে ওঠে—পাখিটা ঘুড়ি নিয়েই সুবতে থাকে আরো দ্রুতবেগে। রশি আরো প্যাঁচ খেয়ে লাগে পাখির ডানায় আর পায়ের। হঠাৎ এক সময় নবী টের পায়, স্তোত্র টিল হয়ে গিয়ে নেমে আসছে, আর ঘুড়ি ঘুরছে পাখির পিছে পিছে। নবীর এতোদিনের অহংকার মাটি হয়ে যায় আজ। আরশের পায়ের রশি লাগিয়ে আরশকে টলিয়ে দেয়া আর সম্ভব হল না জীবনে।

একাকী শূণ্য মাঠে ডুকরে কেঁদে ওঠে নবী। ছুচোখ-ভরা অশ্রু নিয়েই সে একবার তাকায় ঘুড়ির দিকে। একটা কালো বিন্দুর মতো পাখির পিছে পিছে ঘুরছে ঘুড়ি, আর পাখিটা শুধু ঘুরে ঘুরে উপরের দিকেই উঠছে। আচম্কা নবীর মনে হলো—এ তো পাখি নয়—এ যে ফেরেশ্তা, জিবরাইল এসেছে পাখির স্বরত ধরে তার ঘুড়িকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাবার জন্তে। ছুচোখ কেটে এবার কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নবীর গাঙ্গ বেয়ে; তার অশ্রুধোয়া মুখে ফুটে ওঠে একটা অপূর্ব হাসি—বেদনায় আর আনন্দে ঝলমল করা।

নিজের বোকামির কথা ভেবে শরম হয় নবীর। এতোদিন পর ফেরেশ্তা

এসেছে তার দিলের আরজু আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে বাবার অস্ত্রে । আর সে কিনা কাঁদছে, পাখি তার ঘুড়ি নিষে গেল বলে ! চোখ মুছে সে তাকায় আশমানের দিকে—পাখি ত নেই—ঘুড়িও নেই, শুধু সাদা মেঘ, আর তারি ফাঁকে চক্‌চক্‌-করা গাঢ় নীল আশমান । অনেকক্ষণ নবী চেয়ে থাকে আশমানের দিকে, আবার তাব চোখ ফেটে দরদর করে বেরিয়ে আসে কৃতজ্ঞতার অশ্রু । আজকে সে সার্থক—আজকে সে জয়ী ! আর কোনো ভাবনা নেই তার, জিবরাইল এসে নিয়ে গেছে তার ঘুড়ি—নতুন পাতা খুলবে এবার জীবনের ।

আবার আশমানের দিকে চেয়ে, এক পলক হেসে নবী বাড়ি ফিরে আসে । খুশিতে তার সারা শরীর আজ নেচে নেচে উঠছে । হালিমা উঠোনে বসে শাক বাচ্‌ছিলো—‘মা-মা—হুনছো’—বলে নবী ঝাঁপিয়ে পড়ে হালিমার কোলে ।

হালিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে—তারপর রাগে ঠোঁট কামড়ে টিপে ধরে নবীকে ঘাড়—গরুগরু ক’রে বলে—কোথে আইলিরে হারামজাদা ? আইজ তোর রঙ্‌ আধি না বাইর কইরা ছাড়ু ম না ।

নবী তার মার রাগের কারণ বুঝতে পারে না—তবু, তার খুশির খবরটুকু সে না দিয়ে পারছে না তার মাকে,—মা, আইজ জিবরাইলেরে দেখছি—আমাগে’ খবব...

নবী কথা শেষ করতে পারে না—ধুম ধুম করে হালিমার শক্ত হাতের কিল পড়তে থাকে তার পিঠে ।—কিলোতে কিলোতেই বলে—ওরা দিবো আর আমব’ খামু বইয়া বইয়া—ঝাঁটা মার জিবরাইলের মুখে শতবার !

—মা, মা—তুমি গাল দিয়ে না, চিৎকার ক’রে ওঠে নবী—গুণা অইবো মা, আল্লা রাগ করবো ।

হালিমার রাগ আরো বেড়ে যায়, গালের ফোয়ারা থামতে চায় না তাব’ নিরুপায় নবী কামড়ে ধরে তার মার হাত ।

এবার যেন আগুন লেগে যায় হালিমার গায় । বিড়ির দোকানের মালিক আজকে ব’লে গেছে—নবী দোকানে যায় না কোনোদিনই ; সুতরাং কাজ তাব ছাড়িয়ে দেওয়া হলো আজ থেকে । দোকানীর কাছেই শুনেছে হালিমা—নবী নাকি কোথায় ঘুড়ি ওড়ায় সারাদিন, আর সময় সময় ছুটে বেড়ায় বাজারে, ইষ্টিশনে । খবরটা পেয়ে অবধি গোস্বায় আগুন হয়েছিলো হালিমা । এমন অবাধ্য শয়তান ছেলেকে দিয়ে কাজ কি ? হালিমা এবার কঞ্চি হাতে নিয়ে সপাং সপাং মারতে থাকে নবীর পিঠে, হাতে, মাথায় ।—হারামজাদা, তোর ভালার লাইগাই না আমার





কোন সকালে উঠে গোছগাছ শুরু করেছিল গীতা। স্টোভ জ্বলে চা করেছে। চায়ের কাপ স্ববলের শিয়রের কাছে টুলটার উপর রেখে মশারী তুলতে তুলতে ডেকেছে—এই ওঠো, চা এনেছি, উঠে পড়ো এবার—

তখনো রোদ ওঠেনি। অত্নানের আকাশ অল্প ফর্সা হয়েছিল।

স্ববলের চোখে ঘুম। ভার-ভার গলায় বলেছিল—তুমি এত সকালে উঠলে কেন—  
—বাঃ, আজ আমরা যাবো না—

—সে তো শাব বেলা আড়াইটের গাড়িতে, টেবিল-ঘড়িটার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললো—এখন সাড়ে পাঁচটাও বাজেনি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, আমি এখন উঠবো না—গায়ের চাদরটা ভাল করে টেনে পাশ ফিরতেই পিঠে খোঁচা দিয়েছিল গীতা—এই ওঠো, নয়তো আমি জল ছিটিয়ে দেব, ওঠো বলছি, ওঠো শিগগির—

অগত্যা উঠতে হয়েছিল। ব্যাজার মুখে হাই তুলে মস্তব্য করেছিল স্ববল—বিয়ে করে মহা ঝামেলা হল দেখছি, স্বাধীনভাবে একটু ঘুমতেও পারবো না, একা একা বেশ ছিলাম, এরকম হবে জানলে কোন শালা—

—এই মুখ খারাপ করবে না, বাসিমুখেই যত বাজে কথা শুরু করলে—

—বাজে কথা আর কি বললুম, ওটা হল মুখের লব্জ—চায়ের কাপটা তুলে নিল স্ববল—রাত্রিরে ভাল ঘুমতে দাওনি, সকাল বেলা যে একটু আরাম করে শুয়ে থাকবো—

—এই অসভ্য চূপ করো—চোখ পাকাল গীতা—আমি তোমাকে ঘুমতে দিইনি, তুমিই তো—বলতে বলতে হেসে ফেলেছিল।



তারপর সকালের সূর্য হুপুরের আকাশে উঠে এসেছে। এখন এই শেষ হুপুরে শেয়ালদা স্টেশনের দিশেহারা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললো—স্ববল—অবস্থা দেখেছ—  
স্ববলের এক হাতে সন্দেশের বাঁজ, আরেক হাতে ফলের ঠোঁড়। গীতা কিন্তু ভিড়ের দিকে জ্ঞেপ না করেই বললো—ওই ছাখো, কেমন বড় বড় আপেল—

স্টেশনের গেটের পাশে ফলের দোকান। ওপাশে পানের দোকান থেকে স্নগন্ধি জর্দা দেওয়া পান কিনছিল স্ববল। আপেলগুলির দিকে এক শলক তাকিয়ে বললো—আপেল তো কিনলাম তখন—

যাদবপুর স্টেশন থেকে আড়াইটের গাড়ি ধরার মুখে তাড়াহুড়া করে কয়েকটা আপেল, কমলালেবু কেনা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি তেমন পছন্দ হয়নি গীতার। দেখেওনে বাছাবাছি করে কেনার মত সময় ছিল না। সেই কথাই বললো—ওগুলো দেখেওনে নিলে না, খেতে কেমন হবে, কে জানে—

কোন জবাব না দিয়ে পানের খিলি মুখে দিল স্ববল। স্নগন্ধি জর্দা দেওয়া পান। গন্ধে ভুরভুর করছে। এই একটি মাত্র বিলাসিতা স্ববলের। গীতাকে লক্ষ্য করে বললো—তুমিও নাও—পান খাওয়ার তেমন অভ্যাস না থাকলেও মিষ্টি মশলা দেয়া মিঠে পান খেতে আপত্তি নেই গীতার। কিন্তু এখন শান্তিটির সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় একগাল পান মুখে দিয়ে ঠোঁট লাল করে যেতে ভরসা পেল না। এই প্রথম দেখা হবে। কেমন মানুষ কিছুই জানে না গীতা। যদি কিছু মনে করেন। আগের দিন স্ববলের মুখে যখন শুনেছে, মা আসবেন, যাঁয়ের সঙ্গে দেখা হবে, তখন থেকেই উবেগে উত্তেজনার মনে মনে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল।

স্ববল বলেছিল—তুমি নার্তাস হয়ে পড়েছ, আরে আমার মা সাদাসিদে ভাল মানুষ, তাকে খুশি করা খুব সোজা, তোমার কোন ভয় নেই—

—কি জানি, আমি তো সন্দরী নই, যদি আমাকে পছন্দ না করেন—

—কে বলেছে সন্দরী নও, তুমি তো আমার চোখে বিশ্ব-শ্রী—

—যাও, ফাজলামি করতে হবে না। এই অসভ্য, সব সময় খালি—একটু সরে বসেছিল গীতা, স্ববলের অবাধ্য হাত হুখানি সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মন থেকে ভয় ভয় ভাবটা পুরোপুরি সরাতে পারেনি। ভয়সা দিয়ে বলেছিল স্ববল—আরে, আমি যে নিজে পছন্দমত বিয়ে করে সংসারী হয়েছি, এতেই দেখবে মা মহাখুশি, আমার মাকে তো আমি চিনি—

এখন আবার সেইরকম কথাই বললো—তুমি যে এত ফল মিষ্টি কিনছ, মা এর কিছু মুখে দেবেন না, আমার মাকে তো আমি চিনি—

—কেন মুখে দেবেন না কেন ? গীতা যেন হতাশ হল।

—মা পথে বেরোলে কিছু খেতে চান না, এই যে চাঁদপুর থেকে এতটা পথ আসবেন, যাতায়াতে ধরো দুটো দিন, এর মধ্যে এক ডাবের জল ছাড়া আর কিছুই মুখে দেবেন না, উপোস দিতে মা দারুণ শুভ্রাদ—বলতে বলতে একটু হাসল সুবল—  
আজকাল যে কথায় কথায় এত অনশন ধর্মঘট চলে, মাকে এনে এদের সঙ্গে বসিয়ে দিলে অনায়াসে মা হাঙ্গার স্ট্রাইক চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন—

গীতাও হাসল—তা হলে কি করব, নেব না, আপেলগুলি কিন্তু বেশ বড় বড় ছিল—

—নাও কিনে, তোমার যখন এত ইচ্ছে, অল্প আসার কথা আছে, যদি আসে খেতে পারবে—

এক জোড়া আপেল কেনা হল। সুবলের দু হাতে আর কুলোচ্ছে না। গীতার হাতে একটা প্রাস্টিকের বালতি-ব্যাগ ছিল। তার মধ্যে মায়ের জন্তু প্রণামীর কাপড়, শাদা থান। তাছাড়া এক বোতল গন্ধাজল, খানিকটা গন্ধামাটি, কালীঘাটের পট, শালপাতায় মোড়া আশীর্বাদী ফুল, প্রসাদ। এগুলি সব মায়ের ফরমাশ।

সুবল বললো—ওই ব্যাগটা দাও, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি—

আপত্তি করলো গীতা—নোংরা ফলের ঠোঙার সঙ্গে কালীবাড়ীর প্রসাদ রেখে না—

—আরে ফলের আবার নোংরা কি, ঠোঙার কাগজটা ফেলে দিচ্ছি, এত জিনিস হাতে নেয়া যায় নাকি—বলতে বলতে ব্যাগের মধ্যে আপেল কটা সাজিয়ে রাখল সুবল। সন্দেশের বাস্কাটা পাঞ্জাবির পকেটে নিল। পানওয়লা আরেক গিলি পান সেজে ফেলেছে। গীতা কিন্তু রাজি হল না। অগত্যা সুবলকেই নিতে হল। নেবার আগে বললো—মিষ্টি মশলা সব বাদ দাও, শুধু হুপুঁরি এলাচ জর্দা—

—তুমি খুব জর্দা খাচ্ছ আজকাল, দাঁতগুলি সব কালো হয়ে গেল—

গীতার অল্পযোগের উত্তরে বললো—আমার তো আর কোন নেশা নেই, বিড়ি সিগারেট নস্টি কিছুই উপর লোভ নেই, এই একটি মাত্র শখ, তবে ইয়া, আর একটি জিনিসের উপর লোভ আছে বলতে পারো—চোখের ইঞ্জিত করে হাসল।

একটু লাল হল গীতা—এই অসভ্য, চূপ করো—

—প্রাটফর্মে পাশাপাশি ঢুকল দুজনে। সুবলের বাঁ হাতে বালতি-ব্যাগ ডান হাতে পানের বোঁটায় চুন। সাদা পায়জামা, গেরুয়া পাঞ্জাবি কাঁধে ঝাঁজ করা এণ্ডির চাদর। গীতার হাতে বাটিকের কাজ করা চামড়ার ব্যাগ, ছিমছাম ছাপা শাড়ি। মাথার

আটোশাটো মন্ত একটা খোঁপা আছে বটে, কিন্তু আঁচলটা সেখানে থাকছে না। খসে খসে পড়ছে। মাস তিনেক আগেও বেণী ছলিয়ে কলেজে যেতো। মাথায় আঁচল রাখার অভ্যাসটা এখনো রপ্ত হয়নি।

কাল রাত্তিরে বলেছিল স্ববল—তুমি মাথায় আঁচলটা রেখো, পায়ের ধুলোটুলো নিনও, আর দেখো গঙ্গাজল গঙ্গামাটি পেলেই মা খুব খুশি হয়ে যাবে, কলকাতার কলেজে পড়া মেয়েদের সত্বে ধারণা বদলে যাবে—

—মায়ের বুঝি কলেজে পড়া মেয়েদের সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই—

—ভাল মন্দ কোন ধারণা নেই, তবে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব থাকটা অসম্ভব নয়, চিরকাল গ্রামের বাড়িতে কেটেছে, আমার বউদিরা কেউ কলেজে পড়েনি। তা ছাড়া ভালবেসে বিয়ে আমাদের বংশে আমিই প্রথম করলুম কিনা—স্ববলের চোখেমুখে চাপা গর্বের হাসি।

গীতা কিন্তু স্বস্তিবোধ করেনি। আশাস দেবার ভঙ্গিতে আবার বলেছিল স্ববল—তোমার ভাবনার কিছু নেই, কারো চালচলনে খুঁত ধরার অভ্যাস নেই মায়ের, তা ছাড়া মা তো আর আমাদের সঙ্গে থাকতে আসছেন না, তোমার মুখ দেখে ওখান থেকেই ফিরে যাবেন।

এই অদ্ভুত খবরটা শুনে অবাক হয়েছিল গীতা—সে কি, উনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না, এখানে এসে থাকবেন না ?

—আমাদের দেশের বাড়িতে তিন পুরুষের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে, তুমি তো শুনেছো, রাধামাধবের যুগল মূর্তি, তার নিত্যপূজার তার মায়ের উপর, রোজ মা নিজের হাতে ঠাকুরের ভোগ রান্না করবেন, তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না, ঠিক মাহুষের মত সেবা করেন মা, সকালবেলা ঠাকুরের মুখ ধোয়ানো থেকে শুরু করে রাত্তিরে পরিপাটি বিছানায় পাখার বাতাস দিয়ে মশারি ফেলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ মা নিজের হাতে নিখুঁতভাবে করবেন, এ আমার জ্ঞান-বয়স থেকে দেখে আসছি। ওই ঠাকুর ছেড়ে মা কোথাও গিয়ে একটা দিনও থাকতে পারেন না, থাকতে চানও না। ছোটবেলায় দেখেছি জন্মাষ্টমীতে, রাস পূর্ণিমায় আমাদের বাড়িতে খুব ধুমধাম হত, এখন অবশ্রুতেমন কিছু হয় না—

এখন শেয়ালদা স্টেশনে অসম্ভব ভিড়ের সামনে প্রায় অসহায় স্ববল। গীতাও বিমূঢ়। চার নম্বর প্রাটফর্মে বনগাঁ লোকাল দাঁড়িয়ে আছে। ছাড়বে তিনটে সতেরোয়। স্টেশনের মন্ত বড়িটায় তিনটে বেজে পাঁচ। স্ববলের হাতঘড়ি মিনিট তিনেক এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভিড় ঠেলে কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারছে না স্ববল।

এইমাত্র একটা গাড়ি এসে ছু নম্বরে দাঁড়াল আর সঙ্গে সঙ্গেই একরাশ মানুষ বেন উগরে দিল। পিল পিল করে মানুষ ছুটছে। একদল আসছে, একদল যাচ্ছে। একটু একটু করে যেতে যেতে বললো সুবল—অবস্থা দেখেছো। আজ যে শনিবার আমার খেয়াল ছিল না, অল্পদিন এ গাড়িটায় এত ভিড় থাকে না। বনগাঁ লোকালের প্রতিটি কামরায় ঠাসাঠাসি লোক, প্রতিটি দরজার মুখে দলা পাকানো মানুষের দল। সুবল জিজ্ঞেস করলো—এই ভিড়ে উঠতে পারবে—

—অসম্ভব—মাথা নাড়লো গীতা।

—চলো তোমাকে বরং মেয়েদের কামরায় তুলে দিই, ওখানে অস্তুত দাঁড়াবার জায়গা পাবে—

—আর তুমি—

—আমি দেখি দরজার মুখে পা রাখার জায়গা যদি পাই, দমদম জংশনে হয়তে ভেতরে ঢুকতে পারব—

—না, ওভাবে বুলে যেতে হবে না—

—তা হলে কি করবো ?

—পরের গাড়িতে চলো—

—পরের গাড়ি এক ঘণ্টা পরে, তখন আরো ভিড় হবে—

—আমি কিন্তু মেয়েদের গাড়িতে উঠবো না, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো—

—কি করে থাকবে, অবস্থা দেখেছো না—সুবলের গলায় বেশ কাঁক।

—ফার্স্ট ক্লাসে চলো, ওখানে ভিড় কম—অল্পান মুখেই বললো গীতা।

—ফার্স্ট ক্লাস।—নাকমুখ কঁচকে তাকাল সুবল—তিনগুণ ভাড়া, তোমার তে! বলতে আর গায়ে লাগলো না—

মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল গীতা। হাসিমুখে বললো—তুমি আজকাল এত খিটখিট করো কেন, বিয়ের আগে তো এমন করতে না, তখন দেখতুম ট্যাকসি করে নিয়ে ষাবার স্তম্ভ কত সাধাসাধি, তখন তো এত টাকার হিসেব করতে না—

অপ্রতিভ মুখে সামান্য হাসল সুবল, নিরুপায়ের মত বললো—চলো ফার্স্ট ক্লাসেই উঠি—

ফার্স্ট ক্লাসের দরজার সামনে কালো কোর্ট, কাঁচা পাকা চুল, চশমা চোখে গোলগাল গম্ভীর মুখ চেকারবাবু অনধিকারীদের ভিড় ঠেকাচ্ছেন—আগে যান, আগে যান, এটা ফার্স্ট ক্লাস—

বাড়তি ভাড়া দিয়ে রসিদ নিল সুবল। মোটামুটি কাঁকা কামরা। ছু চারজন

বসে আছেন এদিক-ওদিক। জানালার পাশে বসার জায়গা পেল গীতা। বসতে বসতে বললো—এমা, গদি হেঁড়া—

—গদি যে আছে এই যথেষ্ট, মাথার উপর তাকিয়ে দেখো একটাও পাখা নেই—  
স্ববলের কথা মত উপরে একবার তাকাল গীতা। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে বললো—  
ছিঃ, কি সব লেখা—

কাঠ কয়লার আকাবাঁকা অক্ষরে কয়েকটি অশ্লীল শব্দ। তার পাশেই আবার  
লাল হরফে বিপ্লবের বুলি। জয় আমাদের হবেই, বিপ্লব জিন্দাবাদ, লাল সেলাম—  
ইত্যাদি।

স্ববল মস্তব্য করল—এ আর কি দেখলে, এর চেয়েও কত খারাপ কথা লেখা  
থাকে, এর নাম দেয়াল-সাহিত্য, ইদানীং আবার পাশাপাশি বিপ্লবের বাণীও লেখা  
হচ্ছে, স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে কলকাতার বড় রাস্তার পাশে কোন বাড়ির নতুন  
চুনকাম করা দেয়াল আর পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় নেই, দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লব হচ্ছে—  
ততক্ষণে গদি হেঁড়া আসন সব ভর্তি হয়ে গেছে। হু চারজন জায়গা না পেয়ে  
দাঁড়িয়ে আছেন।

—জানলার ধারে গীতা, পাশে স্ববল। বালতি-বাগটা মাথার উপর তুলে  
রেখেছে।

টঙটঙ করে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বাজল। বাঁশির শব্দ হল। চশমা চোখে কালো  
কোট গম্ভীর মুখে কয়েক পা যেতে না যেতেই ছড়মুড় করে একদল ছেলে উঠে পড়ল।  
কাছাকাছি এদিক-ওদিক দাঁড়িয়েছিল ছেলেগুলি। এখন ছুটে ছুটে এসে উঠতে  
লাগল। টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছিল।

—এই উঠিস না, এটা ফাস্ট ক্লাস, মামা দেখছে—

—দেখুক, তুই উঠে আয়—

—মামা ধরবে—

—আসুক না শালা, টেঙরি খুলে নেব—

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। শেষ মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে আরো অনেকে উঠল।  
দেখতে দেখতে ঠাসাঠাসি ভিড় দাঁড়িয়ে গেল। চাপা গলায় জানতে চাইল গীতা—  
ছেলেগুলি মামা বলছে কাকে ?

—টিকিট চেকার, এ লাইনের সরকারী মামা, ছেলেরা ওই নামে ডাকে—স্ববলের  
জবাব শুনে মুখ টিপে একটু হাসল গীতা। আবার জিজ্ঞেস করল—এদের কি টিকিট  
আছে ?

ভিড়ের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আন্তে আন্তে বললো স্ববল—ওগব কথা আর জিজ্ঞেস করো না, আমরা যে টিকিট কেটে বসে যেতে পারছি, এই আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য—

গাড়ির চাকায় চাকায় তখন নানা শব্দের ছন্দ। নারকেলডাঙ্গা শেড, বেলঘাটার খাল পেরোবার পর গতি বাড়ল। উর্টাডাঙ্গার কাছাকাছি উঁচু উঁচু বাড়িগুলির মাথায় শেষ বেলার রোদ।

বাইরের দিকে তাকিয়েছিল গীতা। সামান্য সময় চুপচাপ থেকে আবার বললো স্ববল—কি বলছিলে তখন, আমি আজকাল টাকা পয়সার খুব হিসেব করি, খরচপত্র নিয়ে খিচখিচ করি—

—তা তো করই—হাসিমুখে এক পলক তাকাল গীতা; তারপর জানালায় চোখ রাখল।

—সে কি আর এমনি করি, কাল টিউবওয়েলের মিস্ত্রি আসবে, টাকা দিতে হবে, এদিকে রান্নাঘরটা বর্ধার আগেই পাকা না করলে তোমারই অসুবিধে হবে, এখনো অনেক কাজ বাকি, অথচ চতুর্দিকে ধার জমে যাচ্ছে।

নতুন বাড়ি তুলছে স্ববল। যাদবপুরের এক বাস্তুহারা কলোনীর একপাশে কাঠা তিনেক জমির উপর একতলা ছোট ছিমছাম বাড়ি। গত এক বছর ধরে আন্তে আন্তে বাড়ি উঠছে। এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। এর জন্তু কম বামেলা পোয়াতে হয় না। কোথায় ইঁট, কোথায় চুন, কোথায় স্তরকি, কোথায় কাঠের মিস্ত্রি। স্কুলের চাকরি বজায় রেখে ছুঁবেলা টিউশনি করে সবদিকে ছুটে ছুটে একা এসব সামলাতে হয় স্ববলের। মুখ টিপে হেসে বললো গীতা—বাড়ির ভাবনায় তোমার মাথার চুল সব উঠে গেল, কদিন পরে চকচকে টাক পড়ে যাবে।

—বাড়ির ভাবনায় নয়, তোমাকে তো বলেছি, এখানকার জলটা আমার সহ্য হচ্ছে না, পেটের গণ্ডগোল লেগেই আছে, চাঁদপুরে গিয়ে তিনটি মাস থাকতে পারলে আমার শরীর ভাল হয়ে যেত, কিন্তু তা তো হবার উপায় নেই—যেন একটা বিষয় স্মৃতির মধ্যে থেমে গেল স্ববল।

গাড়ি দমদম জংশন ছাড়াল। ঘটাং ঘটাং শব্দে লাইন বদল করতে করতে এবার ডানদিকে মোড় নিল। গীতা জিজ্ঞেস করল—ওই লাইনটা কোনদিকে গেছে—

—ওটা মেন লাইন—জবাব দিল স্ববল—নৈহাটি-রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর হয়ে একে-বারে বহরমপুর লালগোলা, আর আমরা যাচ্ছি বনগাঁর দিকে। আগে এই লাইনে সোজা খুলনা যাওয়া যেত, এখন শুধু বনগাঁ পর্যন্ত—

আবার কিছুক্ষণ চূপচাপ থাকার পর যেন স্বভির ভেতর থেকে কথা বললো  
স্ববল—পাঁচ বছর আগে যখন পাকাপাকি এদেশে চলে এলুম, তখনও এই পথে  
এসেছিলুম, তারপর সেই হঠাৎ যুদ্ধের সময় থেকে এই পথটা বন্ধ হয়ে গেছে।  
ভেবেছিলুম দেশের জমি-জায়গা বিক্রি করে, বিনিময় করে আন্তে আন্তে সবাইকে  
নিয়ে আসব, দাদা আমাদের ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে এখানে এশে নতুন করে শুরু করবেন,  
নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি তুলবেন, আমায় এসব ঝামেলা পোয়াতে হবে না, কিন্তু  
হঠাৎ সেই বাইশ দিনের যুদ্ধে সব বানচাল হয়ে গেল। তারপর ভেবে দেখ গীতু, এই  
পাঁচটা বছর এখানে আমি সম্পূর্ণ একা, কাউকে চিনি না, কোন আত্মীয় নয়, বান্ধব  
নেই, একটা পরিচিত মুখ চোখে পড়ে না, কলকাতার পথঘাটও ভাল জানা নেই, কার  
কাছে যাব, কোথায় দাঁড়াব কিছুই ঠিক নেই, আমার সঙ্গে তখন টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের  
কয়েকখানা সার্টিফিকেট ছাড়া আর কোন সম্বল নেই, কোন পরিচয়পত্র নেই।  
তারপর তোমাদের বাড়িতে টিউশনি পেলুম, তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল, আমি যেন  
একটা আশ্রয় পেলুম, তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা হ'ল, আমার সহায়-সম্বল বাড়ল—  
বলতে বলতে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল স্ববল।

গাড়ি ছুটছে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি ছাড়িয়ে গেল। ভিড়ের চেহারা কিছু  
বদল হয়েছে। তখনও যেন একটা গভীর স্বভির মধ্যে ডুবে রয়েছে স্ববল। বেশী-  
ক্ষণ কিছুক্ষণ চূপচাপ গম্ভীর থাকা গীতার স্বভাবে নেই। সহজ হবার জন্ত ঠাট্টার স্বরে  
বললো—তোমাদের বন্ধু জীবনবাবু বলেন, তোমার ঐ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের  
সার্টিফিকেটের কোন দাম নেই, তোমার নাকি উচিত, আবার স্কুল ফাইনাল থেকে  
শুরু করা।

আরে জীবন বাোসের কথা বাদ দাও—হাত নেড়ে জবাব দিল স্ববল—আমরা  
ডক্টর শহীদুল্লাহ ছাত্র ছিলুম, ওরকম একজন অধ্যাপকের কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয়  
ক'জনের, বাজে কথা বললে তো হবে না, ঢাকার সিলেবাসে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা  
দিতে হলে জীবনের ইয়ে ফেটে যেত।

এই—মুখ খারাপ করবে না—স্ববলের হাতে চিমটি কাটল গীতা। তারপর  
চাপা হাসির স্বরে বললো—তুমি নাকি কিছু জানো না, কিছুই পড়াতে  
পারো না—

—জীবন বুঝি বলেছে—স্ববল গজ গজ করে জবাব দিল—পড়াতে না পারলে  
অতবড় স্কুলে চাকরি পেয়েছি এমনি—

—চাকরি পেয়েছো খাতিরের জ্বোরে, তোমাদের রাখালদা'র খোশামোদ করেছে,

সেক্রেটারী মণ্টবাবুর বাড়িতে ছ' বেলা ধর্না দিয়েছ—বলতে বলতে মুখে আঁচল তুলে হাসি চাপলো গীতা।

—জীবন বুঝি বলেছে এই সব কথা, ওকে আর আমি বাড়িতেই ঢুকতে দেবো না—হাত নেড়ে বললো স্ববল—জীবনের আর বলতে অসুবিধেটা কি, মামা-বাড়ির তিনতলায় তোফা আরামে থাকে, গায়ে আঁচটি লাগে না, কাজের মধ্যে দেখি টিচার্সরুমে বসে ষত রাজ্যের রাজনীতি নিয়ে কুতর্ক করে, আমার মত স্ট্রাগল করতে হলে বাবা জীবনের লাল স্নতো বেরিয়ে যেত—

মুখে আঁচল তুলে খুকখুক করে হাসল গীতা। হাসি চাপার চেষ্ঠায় ফর্সা মুখশ্রী রক্তিম হয়ে উঠল। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি লুকোতে হল। আশেপাশের লোকেরা কি ভাবছে কে জানে।

স্ববল হঠাৎ ডাক দিল—এই পান, এদিকে—

ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। হরেকরকম ফেরিওয়ালার ডাকাডাকি। কৃত্রিম ঙ্গুধ থেকে সুগন্ধি চন্দন ধূপ কিংবা দাঁতের মাজন থেকে শনির পাঁচালী পর্যন্ত গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সব নিত্যঘাত্রীদের সুবিধার্থে নামমাত্র মূল্যে বিক্রিয়ে যাচ্ছে। বিচিত্র কণ্ঠে বিভিন্ন শ্রব্যের গুণকীর্তন শুনতে শুনতে আবার হাসি পাচ্ছিল গীতার।

প্রায় বালক বয়সের এক পানওয়ালো এসে সামনে দাঁড়াল। বৃকের সামনে ঝোলানো একটা টিনের বাস্ক। খোপে খোপে নানা মসলা, মোরী, সুপুঁবী, চুন, খয়ের ভেজা গ্ৰাকড়ায় পান পাতা, সিগারেটের প্যাকেট, বিড়ির বাগুিল, দেশলাইয়ের বাস্ক। ওইটুকু জায়গার মধ্যে কেমন নিপুণভাবে গুছিয়ে নিয়েছে। পরিপাটি সাজানো গোছানো কিছু দেখলেই ভাল লাগে গীতার। সারাদিন একা একা সে নিজেও ওই করে। সব সময় ছ'জনের সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চায়। আলনা গোছায়, টেবিল সাজায়। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বসবার আর শোবার ঘর ছ'খানি, সামনে শিছনের বারান্দা দিনের মধ্যে ছ' তিনবার ধোয়ামোছা করে। স্ববল ফরমায়েশ করল—সুপুঁরি এলাচ দিয়ে জর্দী পান লাগাও—

—তুমি আবার পান খাচ্ছ, এইতো খেলে একটু আগে—

—বাজে কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, এখন এক খিলি না খেলে আর চলবে না—

—এটা কোন্ স্টেশন—

—হৃদয়পুর, এর পর বারাসাত—



—বেশ স্থান্য নাম তো, হৃদয়পুর,—বারকয়েক বিড়বিড় করে নামটি আওড়াল গীতা। জানালায় মুখ ঠেকিয়ে পরিপূর্ণ চোখে বাইরে তাকাল। প্রাটকর্মের উলটো দিকে লাইনের কাছেই একটা পুকুর। তালগাছের গুঁড়ি ফেলা ঘাট। ঘাটের পাশে একজোড়া পাতিহাঁস মধ্যে মধ্যে জলে মুখ ডুবিয়ে কি যেন খুঁজে খুঁজে ঘুরছে। লাইনের ধারে এক রাশ আকন্দের ঝোপ। পুকুরের পাশে গেরস্থ বাড়ির মাটির ঘর। ওপারে মস্ত একটা বাঁশঝাড় ঘিরে নিবিড় বন। বাঁশঝাড়ের মাথায় শেষবেলার নরম রোদ। পুকুরের ঢালু জমিতে জলের কিনারা ঘেঁষে একটা সাদা বক পা টিপে টিপে চলাফেরা করছিল।

কয়েক মুহূর্তের বেশী দেখার স্থযোগ হ'ল না। গাড়ি আবার ছুটল। বাইরের চলমান দৃশ্যাবলী প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছিল। এর পরেই মস্ত মাঠ। মাঠের মধ্যে খাপছাড়াভাবে ছোট ছোট পাকা বাড়ি উঠছে। একদল লোক বোধ হয় এই ট্রেন থেকেই নেমেছে, ওই বিশাল মাঠের উপর দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। লোকগুলির মাথার উপর অনেকদূর পর্যন্ত অপরাহ্নের আকাশে কমলা রঙের রোদ। বিকেলের সূর্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

গীতা জিজ্ঞেস করল—আমরা কখন পৌঁছব—

—সাড়ে পাঁচটা হবে বোধ হয়—হাতঘড়ি দেখে জবাব দিল স্থবল।

—চাঁদপুর থেকে মা আসবেন কার সঙ্গে ?

—আমার বন্ধু জিয়াউল নিয়ে আসবে—যেন একটা তৃপ্তি আর স্বস্তির সঙ্গে বললো স্থবল, জিয়াউল ইসলাম আমার ছোটবেলার বন্ধু, ক্লাস ওয়ান থেকে এম-এ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি, ও পড়েছে ইতিহাস নিয়ে আর আমার বাংলা, ও থাকত সলিমুল্লা হলে, আমি ছিলুম জগন্নাথ হলে। তোমাকে বোঝাতে পারবো না গীতু, সে সব দিনগুলি কি চমৎকার কাটিয়েছি—

—সলিমুল্লা হল, জগন্নাথ হল কি ?

গীতার কথার জবাবে বললো স্থবল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বোর্ডিং-এর নাম, হিন্দু ছেলেদের জগন্নাথ হল, মুসলমানদের সলিমুল্লা হল, আর মেয়েদের উইমেনস্ হল—

গাড়ি বারাসাত জংশন ছাড়ল। আবার শুরু করল স্থবল—জিয়াউলের খুব ইচ্ছে ছিল আমার বিয়েতে বরষাত্রী বায়, ওর বিয়েতে আমি গিয়েছিলুম, কলেজে পড়তে পড়তেই ওর বিয়ে হয়েছিল, আমরা নৌকো করে গিয়েছিলুম, চাঁদপুরের পাশে মেঘনা—যেন একটা দুয়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে কথা বলছে স্থবল—কত দিন, কত

রাত মেঘনাম্ব নৌকো নিয়ে ঘুরেছি, আমি আর জিয়াউল হুজনেই ভালো নৌকো বাইতে পারি, জ্যোৎস্না রাত্রে মেঘনার বৃকে সে যে কি অপূর্ব তোমাকে বোঝাতে পারবে না—

—তুমি আবার নৌকো বাইতে পারো নাকি, বিশ্বাস করি না—মুখ টিপে হাসল গীতা।

—তুমি তো আমার কোন কথাই বিশ্বাস করো না, তোমার কাছে সব সত্যি কথা বলে এক জীবন বোস। আবার কুলকুল করে হেসে উঠল গীতা। আবার কিছুক্ষণ চূপচাপ স্থবল।

বামনগাছি, দস্তপুকুর চলে গেল। ভিড় অনেক পাতলা হয়েছে। এখন বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়। কাছাকাছি কেউ নেই। গীতার কানের কাছে মুখ নিয়ে গুন্‌গুন্ করে বললো স্থবল—জিয়াউলের খুব ইচ্ছে ছিল তোমাকে দেখতে আসে—

—উনিও আসবেন নাকি? সামান্ত মুখ ফিরিয়ে স্থবলের চোখে চোখ রাখল গীতা।

—আসবে কি করে, যাতায়াতে এক কাঁড়ি টাকা খরচ, আমার ইচ্ছে ছিল টাকাটা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু এখন হাত টানাটানি, এই যে মা আর অণু আসবে, এর জঙ্গে সামন্ত মশাইয়ের হাতে দুশোটি টাকা ধরে নিতে হবে—

—সামন্তমশাই কে?

—পাড়াপারের দালাল, উনি মাকে নিয়ে আসবেন, আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার ওপারে জিয়াউলের জিম্মায় পৌঁছে দেবেন—প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছিল স্থবল—স্টেশনে সামন্ত মশাই আমাদের নিতে আসবেন—

বনগাঁ প্রাটফর্মে যখন গাড়ি দাঁড়াল, তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচ। হেমন্তের ছোট দিন ফুরিয়ে যাচ্ছিল।

মোটাসোটা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বললেন— এই যে মার্টারমশাই, এনে গেছেন, বউমা বুঝি, বেশ বেশ, নমস্কার নমস্কার—

আধময়লা সাদা হাফশার্ট, রুপোর বোতাম। ধূতি, পাম্পশূ, বাদামী রঙের মাফলার। গলার আওয়াজ ভারী, ভাঙা ভাঙা। কাঁচা পাকা চুলের মাঝ বরাবর লম্বা সিঁথি। ভদ্রলোকের গায়ের রঙটি দেখবার মত। দেখেই মনে হল গীতার, টেলিফোন রিসিভারের মত কালো এবং উপমাটি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক হাসি পেল। মাথায় ঝাঁচল তুলে মুখ নিচু করে সামলে নিল।

স্থবল বললো—এই যে গীতা, ইনি সামন্তমশাই—

ছোট একটা নমস্কার করল গীতা আবার চোখ নামাল। চব্বরচব্বর করে পান চিবুচ্ছেন ভদ্রলোক।

পকেট থেকে ডিবে বার করে স্তবলকে লক্ষ্য করে বললেন—চলবে নাকি এক খিলি—

একটু ইতি-উতি কবে একটা গিলি নিল স্তবল। বউ-এর মুখেব দিকে তাকিয়ে কিস্ত-কিস্ত ভাবে হাসল। সামান্য ভুক কৌচকাল গীতা। আরেক পকেট থেকে সোনালী রঙের চকচকে সিগারেট কেস বার করলেন সামন্ত মশাই। গীতা অগাধ হয়ে দেখল তার ভেতরে পরিপাটি সাজানো এক বাঙালি বিড়ি। স্তবলের সামনে ধবে বললেন—এ জিনিস চলবে—

আবার হাসি পেল গীতার। মুখ ঘুরিয়ে অন্তর্দিকে তাকাল।

হাত ছোড় করে বললো স্তবল—না দাদা, আমার ওসব চলে না—

একটি বিড়ি ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন সামন্তমশাই—আপনারা হলেন কলকাতার বাবু, এসব বিড়ি-টিড়ি কি আপনাদের পোষায়—

—আজ্ঞে না দাদা, বিড়ি সিগারেট কোন নেশাই নেই আমার, শুধু এই জর্দা পান—

—তা' জর্দা নেবেন নাকি, নিন না—এবার পকেট থেকে বেরোল জর্দার কোটো।

গীতা ভাবছিল, ভদ্রলোকের দুই পকেটে আরো কি কি আছে, কে জানে। বুক পকেটে ভাবী একটা নোট বই, দুটি কলম। ঘেরকম উঁচু হয়ে আছে, তাতে মনে হয় ভেতরের পকেটে নিশ্চয়ই কিছু কাগজপত্র রয়েছে। বোধ হয় পাঁচ দশ টাকা নোটের তাড়া।

আগে আগে যেতে যেতে বললেন সামন্তমশাই—আসুন, রিকশা ঠিক করে বেথেছি—

পাটকর্মের বাইরে এসে হাঁক দিলেন—এই হরেরাম, হরেরাম, এদিকে আয়—

সাইকেল রিকশা ঠুন ঠুন করে সামনে এলো। হরেরাম। বাইশ-তেইশ বছরের পাকানো শরীর, মুখময় বসন্তের দাগ। স্তবলকে লক্ষ্য করে বললেন সামন্তমশাই—একে তিনটে টাকা দেবেন—

টাকা বার করতে ষাচ্ছিল স্তবল। বাধা দিয়ে আবার বললেন সামন্তমশাই—এখন নয়, ও আপনাদের ক্ষেঁরার ট্রেন ধরিয়ে দেবে, তখন দেবেন, খুব বিশ্বাসী লোক। আপনাদের কোন অস্ববিধা হবে না—

ওরা দুজনেই এবার হরেরামের আপাদমস্তক দেখে নিল। ক্যাষিসের জুতোব সঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত সবুজ রঙের মোজা। খাকি হাফ প্যাট। ছাই-ছাই রঙের একটা স্ফতির কোটের দু'তিন জায়গায় দু'তিন রঙের তালি। মাথায় মাংকি ক্যাপ। হরেরামের রিকশায় চাপল দু'জনে। পাশে পাশে সাইকেলের সোয়ার হলেন সামন্তমশাই। শহরের দোকানপাট পেছনে পড়ে রইল। তাবপর শহরতলি। টিন টালি আর মাটির ঘরের গেবস্ব বাড়ি। বস্তির চালাঘরের মাথায় মাথায় পৌয়াব পুঁটুলি। এদিকটায় বেশ শীত শীত শুরু হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় এখনো তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি। স্ফল জিজ্ঞেস করল—এই বাস্তাটার নাম জানো—

মাথা নাডল গীতা।

—যশোর রোড।

স্বলেব কথা শুনে সামসেব দিকে তাকাল গীতা। কালো পিচের রাস্তাটা সোজা সামনে যেতে যেতে সন্ধ্যাব অন্ধকাবে হারিয়ে গেছে। দুই পাশে বড় বড় গাছ—শিয়ুল, শিবীষ, সেগুন, মেহগিনী। আশ্বে আশ্বে জিজ্ঞেস করল গীতা—এই রাস্তাটা কি যশোর পর্যন্ত গেছে ?

—হ্যাঁ বউমা—এবাব জবাব দিলেন সামন্ত মশাই। পাশে পাশে যাচ্ছিলেন তিনি—শুধু যশোর নয় একেবারে খুলনা পর্যন্ত, আমাদের দেশেও এই পথে যাওয়া যেত। স্টেশনের নাম ফুলতলা, দৌলতপুরেব কাছে, ইংবেজ আমলে যুদ্ধেব সময় আমি যখন মিলিটারী কনট্রাক্টের কাজ করতুম, তখন এই পথে হবদম যাওয়া আসা করেছি। এখন আর সোজাসুজি যাবার উপায় নেই। মাইলখানেক দূরেই বর্ডারের চেক-পোস্ট, আমরা এবার ডানদিকে যাব—

বলতে বলতে জোরে প্যাডেল করে সামান্ত সামনে গেলেন সামন্তমশাই। তারপব ডানদিকে ঘুরে একটা মাটির রাস্তা ধরলেন। পেছন পেছন হরেরামের রিকশাও ঘুরল। এবার দুপাশে খোলা মাঠ, ফসলের ক্ষেত। মাঠের মধ্যে দু'চারটে হাডসার কাঁকড়া-মাথা খেজুর গাছ। বাস্তার পাশে আকনের বোপ, দু একটা রোগা চেহারার বাবলা গাছ, কুল গাছ। মেটে মেটে জ্যোৎস্না ফুটেছে। দূরে দূরে দু একটা আলো। গীতার কেমন গা ছমছম করে উঠল। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—আমরা কোথায় যাচ্ছি—

—আমিও ঠিক জানি না, বোধ হয় সামন্তমশাইয়ের বাড়ি, তোমার ভয় করছে নাকি—বলতে বলতে গীতার হাতখানি ধরল স্ফল—ভয় কি, আমি তো তোমার সঙ্গে রয়েছি—

স্ববলের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল গীতা। মাটির রাস্তায় হুলতে হুলতে যাচ্ছিল  
রিকশাটা।

এক মুহূর্তে মনে হল গীতার, যেন পালকি চেপে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে।

পবক্ষণেই স্ববলের গলা শুনল—ওই ছাণে—

মুখ তুলে তাকাল গীতা। হাত দিয়ে বাঁ দিকটা দেখিয়ে বললো—স্ববল—ওই  
মাঠের ওপাশে পাকিস্তান, এখান থেকে বোধ হয় সিকি মাইলও হবে না।

অল্প অল্প কুয়াশাময় আবছায়। অন্ধকাব মাঠের দিকে বিশ্বয়েব চোখে তাকাল  
গীতা।

ওই মাঠের ওপাশে, দিগন্তলীন অন্ধকাবের ওপাশে আরেকটা বাঙলা দেশ।  
যেখান থেকে মা আসবেন। মাটির রাস্তায় মিনিট দশেক চলার পর একটা গায়ের  
নব্যে ঢুকল হরেরাম। আগে আগে সামন্তমশাই। তেমন বড় গ্রাম নয়। কয়েক  
ঘব মাগুঘেব বস্তি। ছ'চারটে দোকান। পুকুর, বাঁশবাগান, বটগাছ।

বাস্তার পাশে একটা টিনের ঘরের সামনে দাঁড়াল রিকশা।

সামন্তমশাই ঘরের তাল খুলে ডাক দিলেন—আসুন স্ববলবাবু—তারপর শকে  
সেন ট্রু গলায় ডাকলেন—ওরে ও ফুলি, এ-ঘরে একটা আলোটালাে কিছু দিয়ে যা—

টিনের ঘর হলেও মেজেটা পাকা। বেশ চওড়া বারান্দা। বারান্দায় এসে উঠল  
গীতা।

হরেরাম রিকশা ঘুরিয়ে খানিকদূরের একটা চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে  
দাঁড়াল।

বারান্দা থেকেই আবার হাঁক দিলেন সামন্তমশাই—ওবে হরেরাম, নিকুগকে বল,  
হ' কাপ চা পাঠিয়ে দিতে—

—আরে না না—আপত্তির সুরে বললে স্ববল—আবার এসব করছেন কেন—

—একটু চা খান, কতক্ষণ বসতে হবে কে জানে, তাছাড়া ঠাণ্ডাটাও পড়েছে  
বেশ—

—দাদা, ফেরার ট্রেন পাব তো, এই শীতের রাতে সঙ্গে নতুন বউ, ডোবাবেন  
না—

—না, না, ট্রেন ঠিক পেয়ে যাবেন—আস্বাসের সুরে সামন্তমশাই বলেন—নিতান্ত  
না পেল, আমরা আছি কি জন্তে, না হয় গরীবের ঘরে একটা রাত—

—না দাদা, বাড়ি খালি রেখে থাকতে পারবো না, আমাদের ফিরতেই হবে,  
মাঠের পাশে নতুন বাড়ি তুলেছি, চোরে সব ফাঁক করে দেবে—

ততক্ষণে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ফ্রক পরা মেয়ে, নাম বোধ হয় ফুলি, একটা লঠন নিয়ে এল।

ঘরের ভেতর ছ'খানি কাঠের চেয়ার, একটা টেবিল, মাদুর-পাতা তক্তাপোশ।

একখানা চেয়ার টেনে বসল গীতা। টেবিলের উপর লঠন জ্বলছে। বিষয় হল—  
আলে। টেবিলের নিচে, তক্তাপোশের তলায়, আনাচে-কানাচে অন্ধ কার। ওপাশে  
একটা কাঠের আলমারি। পাল্লার কাঁচ ভাঙা।

ভেতরে কিছু পুনো বই, খবরের কাগজ। চায়ের দোকানের একটা ছেলে এ-  
কাপ চা রেখে গেল।

এক চুমুক মুখে নিয়েই প্রায় আঁতকে উঠল গীতা। কেমন সোঁদা সোঁদা বিটকেল  
গন্ধ।

আরেক কাপ চা হাতে নিয়ে ভেতরে এল জ্বল। হাদি হাদি মুখে বলনো—চ  
পাও—

চোখ বড় বড় করে বললো গীতা—তুমি এই চা মুখে দিতে পারলে, বাড়িতে হলে  
তো ছুঁড়ে ফেলে দিতে—

—আরে অসময়ে যা পেয়েছি, বুঝলে না, এই ঠাণ্ডার মধ্যে পেটে যে গরম কি-  
যাচ্ছে—

—কতক্ষণ বসে থাকতে হবে—

—ঠিক বলতে পারছি না, সামস্তমশাই তো গেলেন খোঁজ নিতে—

—শেষকালে ট্রেন ফেল হলে এখানে থাকতে হবে নাকি!

—অসম্ভব নয়, সামস্তমশাই তো বললেন, একটা রাত থাকতে—

—রক্ষে করো, এদের এই নোঁরা বিছানায়, যাগো—নাকমুখ কৌচকাল গীতা—  
আমি বরং এই চেয়ারে বসে থাকবো সারারাত—

—আহা, আস্তে বলো, ওই সামস্তমশাই আসছেন বোধ হয়—আবার বাইরে গেল  
জ্বল।

তারপর সামস্তমশাইয়ের সঙ্গে গুজগুজ করে কথা বলতে বলতে রাস্তায় নামল।  
কিছু সময় পরে দোকানের ছেলেটি এসে চায়ের কাপ নিয়ে গেল। আর এক চুমুকও  
মুখে দেয়নি গীতা। ঠায় বসে আছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে একটা খড় বোঝাই গরুর গাড়ি চলে গেল। চারপাশ ক্রমশ  
কেমন চুপচাপ মনে হচ্ছিল। সারাদিনের ক্লাস্তির পর বসে থাকতে থাকতে ঘুম  
পাচ্ছিল গীতার। পায়ের কাছে ছ'একটা মশা পিন্‌পিন্‌ করছে। বার কয়েক হাই

তুলল। কিছুতেই আর চোখ খোলা রাখতে পাবছে না। কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল। একটা পেঁচা ঘরের উপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল।

টেবিলের উপর মাথা রেখে কতক্ষণ তন্দ্রাব মধ্যে ছিল খেয়াল নেই গীতাব। শ্যং বাবান্দায় পায়ের শব্দ শুনে সোজা হয়ে বসল। পরক্ষণেই ভেতবে এসে হাসি মুখে খবর দিল স্থবল—এই যে, মা এসে গেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল গীতা। স্থবলের পেছনে ঘবে ঢুকলেন মা। পাতলা চেহাবার ছোটখাটো মাহুঘটি। পরনে আধময়লা সাদা থান। শনেকটা পথ নাঠের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে হয়েছে

খালি পায়ে, পায়ের গোছে মাঠেব ধুলো। মায়েব মুখে বসনেব বেখা, দীর্ঘ পথেব হান্তি।

হাতে একটা কাপডেব পুঁটলি। টেবিলেব উপর রাখলেন।

মাথায় আঁচল তুলে হাঁটু গেড়ে বসে পায়েব ধুলো নিল গীতা। পায়েব কাছে প্রণামীব জন্তু নতুন থান ধুতিখানা রাখল। এই পরিপাটি প্রণামেব ভঙ্গি দেগে আশ্চর্য হল স্থবল। মনে মনে তারিফও কবল।

বেশ বুদ্ধিমতী, মাকে খুশি করতে পারবে। ততক্ষণে পুঁটলি খুলে কয়েকটি ধান আব শুকনো দুর্বা বার করে গীতাব মাথায় দিলেন মা। আক্ষেপের স্বরে গিড়গিড় কবে বললেন—আমাব এমন কপাল, এইভাবে বউমার মুখ দেখতে হল, না একটা পাঁখেব শব্দ, না একটু উলু—

—ওসব কথা ভুলে যাও—বললো স্থবল—তোমাকে যে এনে দেখাতে পাবলুম, এই আমার ভাগ্য। ওকি, তুমি কাঁদছ কেন, এত কষ্ট করে এখানে এলে কি কান্নাকাটি করার জন্তে ?

মায়ের চোখে জল। সেকলে গড়নের এক জোড়া মকরমুখী বালা বউ-এর হাতে পরিয়ে দিলেন।

গীতারও চোখ ছুটি জ্বালা করে উঠল। চোখের জলে মায়েব মুখখানি ঝাপসা দেখাচ্ছে।

একহাতে ডাব আরেক হাতে ঝকঝকে একটা কাঁসার গেলাস নিয়ে দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন সামস্ত মশাই।

স্থবল জিজ্ঞেস করল—দাদা, আপনি উলু দিতে পারেন—

গলার ভেতর থেকে ঘটিডোবার মতন গুবগুব শব্দ করে হাসলেন সামস্ত মশাই—  
আগে বলে রাখলে তেমন ব্যবস্থাও করা যেত—

গীতা তখন অঁচল দিয়ে মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছিল। একটা রূপোর সিঁদুরকোটা থেকে সিঁদুর নিয়ে বউ-এর কপালে সিঁথিতে দিতে দিতে মা বললেন—  
রাধামাধবের পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুর, এটা তুমি যত্ন করে রেখো—

আবার মাকে প্রণাম করে হাত দুটি ধরে বললো গীতা—আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন—

—যাবার তো খুব ইচ্ছে বউমা, কিন্তু রাধামাধবকে ছেড়ে আমার কোথাও গিয়ে দু'দিন থাকার উপায় নেই, তাছাড়া তোমার ভাস্কর রয়েছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে অতবড় সংসার, বড় বউমা একা সামলাতে পারবে না, ইচ্ছে তো ছিল সবাইকে নিয়ে আসবো, রাধামাধবকে তুলে এনে এখানে বসাবো, কিন্তু সে রকম কিছু ব্যবস্থা এখনো করা গেল না, দেখি ঠাকুরের যা ইচ্ছে—একটু সময় চূপ থেকে বললেন—এ যাত্রা শুধু অঙ্গুকে তোমার কাছে রেখে যাবো, এখানে স্কুল পড়বে, ওকে দেখো, অঙ্গু কোথায়—

মায়ের কথা শুনে যেন খেয়াল হল স্নবলের—আরে সত্যিই তো, এই অঙ্গন এদিকে আয়, ও বড় লাজুক ছেলে। বারান্দা থেকে সাত-আট বছরের রোগামত অঙ্গনের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল স্নবল। হাফ-প্যাণ্ট হাফ শার্ট, পায়ে স্ত্রাণ্ডেল, একমাথা কৌকড়া চুল। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল।

—কাকিমাকে পেরান্না করো—ঠাকুমার কথা মতো সামনে ঝুঁকল অঙ্গন। গীতা তাড়াতাড়ি কোলের কাছে টেনে নিল। একটা আপেল হাতে দিল।

স্নবল বললো—মা, তুমি ডাবের জলটা খেয়ে নাও, তোমার জ্বর সন্দেহ, আপেল, কমলা এনেছি।

—আমি এখন ওসব কিছু খাবো না—

—তাহলে এসব আনলুম কেন, এখন না খাও, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে, এই ব্যাগের মধ্যে গঙ্গাজল, গঙ্গামাটি, কালীঘাটের প্রসাদ, সব রয়েছে—

—আচ্ছা, তুই খাম—স্নবলকে থামিয়ে দিলেন মা। তারপর অঙ্গুকে লক্ষ্য করে বললেন—দাছুভাই, তোমার কাকিমাকে একটা কবিতা শুনিয়ে দাও তো, সেই যে মুখস্থ করেছিলে—

ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাল অঙ্গন। তারপর একপলক কাকীমার দিকে, শেষে মুখ নিচু করে লাজুক হাসিমুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—

আসমানীরে তোমরা সবাই দেখতে যদি চাও—

রসমুদির ছোট্ট গ্রামে তোমরা সবে যাও,



আসমানীর নয় পাখির বাসা, ভেঙ্গাপাতার ছানি,  
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গডিয়ে পড়ে পানি,  
একটুখানি হাওয়া দিলেই ধর নডবড করে  
তারই তলে আসমানীরা থাকে বছর ভরে—

তারপর একটু থেমে—আর মনে নেই—বলে ঠাকুমার কোলে কাঁপিয়ে পড়ে মুখ  
লুকুলো।

—ওরে ছাড়, ছাড়, আমি কি তোকে আব সামলাতে পারি। নতুন কাশীমার  
কাছে ভাল হয়ে থাকবি, মন দিয়ে পড়াশোনা করবি—

বাইরের বারান্দা থেকে গলা থাকারি দিয়ে বললেন সামস্ত মশাই—স্ববলবাবু,  
দেবী হয়ে যাচ্ছে, আটটা বাজল।

কেউ কোন কথা বললো না। ঘড়ির কাঁটা যেন অব্যবহার মত দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে।  
কাপড়ের পুঁটুলিটা খুলে একখানা ঢাকাই শাড়ি বার করে গীতার হাতে দিলেন  
মা। চমৎকার তাঁতের শাড়ি।

স্ববল বললো—তুমি আবার শাড়ি আনতে গেল কেন, নিছেরই হেঁটে আসতে কষ্ট  
হয়—

—আমি আনিনি, জিয়াউল দিয়েছে। কিছুতেই শুনল না, ছোর করে দিল,  
তোমার বিয়েতে আসতে পারেনি বলে কি আপসোস—

সহসা কোন কথা বলতে পারল না স্ববল। একটু সময় নেড়েচেড়ে শাড়িখানা  
দেখল। শেষে ভারি গলায় আশ্বে আশ্বে বললো—জিয়াউলকে বোলো আমার বাড়ির  
কাজ হয়ে গেলে পর শুকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবো, কয়েকটা দিন এসে থেকে  
যাবে—

—জিয়াউল এখন মস্ত কাজের মালুম, ওর কি আসার সম্ভাব্য হবে, আমাকে খুলনা  
থেকে জিপগাড়িতে করে নিয়ে এল, একটুও কষ্ট হতে দেয়নি—

তারপর বালতি ব্যাগের মধ্যে আপেল, কমলা, সন্দেশের বাক্স, প্রণামীর কাপড়,  
গঙ্গাজলের বোতল, গঙ্গামাটি, কালীঘাটের পট, প্রসাদী ফুল বেলপাতা, সব গুছিয়ে  
সামস্ত মশাইয়ের হাতে দিল স্ববল।

এক হাতে ব্যাগ, আরেক হাতে একটা টর্চবাতি। মাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন  
সামস্ত মশাই।

আবার সেই হরেরামের রিকশা। এবার তিনজন। গীতা, স্ববল আর ছুজনের  
কোলের সামনে অঞ্জন।

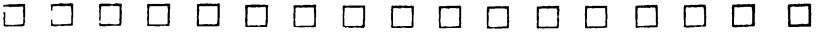
একবার শুধু জিজ্ঞেস করলো অঞ্জ—ঠাকুমা, আবার কবে আসবে—

গীতা জানতে চাইল—কিভাবে যাবেন, এই অন্ধকারে অস্ববিধে হবে না ?

—সামস্ত কিছুটা দূর হাটতে হবে—জবাব দিল স্ববল—ওপারে গিয়ে আবার যশোর রোড ধববে। সামস্ত মশাই পাকা লোক, ঠিক পৌছে দেবেন—

মাঠের ওপারে ওই অন্ধকারের মধ্যে আবেকটা বাঙলা দেশের সীমানায় যশোব রোডের কোথাও জীপ গাড়িতে অপেক্ষা কবছে জিয়াউল। অল্প অল্প কুয়াশার মধ্যে ম্লান জ্যোৎস্নায় মায়ের সাদা থানেক মূর্তি ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে। সামস্ত মশাইয়েব টর্চের আলো এক-একবার দেখা যাচ্ছিল। এদিকে তুলতে তুলতে এগিয়ে যাচ্ছে হবেরামের রিক্শা। ডানপাশে মাঠেব দিকে মায়ের আবছায়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে গীতা। মুখ উঁচু হয়ে দেখছে অন্ন। ওই যে সামস্ত মশাইয়েব টর্চের আলো এক-একবার চোখে পড়ছে। আশু আশু বললো স্ববল—আমাব কি ইচ্ছে কবছে জানো গীতা, মায়ের পেছন পেছন দেশে ফিবে যাই। তুমি না থাকলে ঠিক চলে যেতুম।

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



লোকটা উবু হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর হাত-পা সামনে পিছনে মটান করে দিলো। দেখলে মনে হবে মানুষটা এই হিমেল নীতে যোগা শাস কবছে! মানুষটার গায়ে জোব্বার মতো আলখাল্লা, লম্বা পকেট, শিঠের উপর টুটা-কাটা জামগাটা দেখলে মনে হয় ভারতবর্ষের মানচিত্র পিঠে লটকিয়ে মানুষটা নিরস্তর হাঁটছে। চুল লম্বা, অথবা চুলে ভট, চোখ লাল এবং গোলাকৃতি, আর হাত-পা বড় শীর্ণ। চোখ লাল গোল গোল, কোটরাগত চোখে অন্ধকারের মতো সামান্ত উত্তাপ—কিছু দিনের ভিতরই সেটা মরে যাবে। মবে গেলে কি আর থাকে, স্তবরাং মানুষটা সময় সময় হাঁকছিল, আগুন। আগুনের জ্বালা, অথবা আগুন জ্বালো! তারপর চিং হয়ে পড়ে থাকার মতো বলত, নফর হে, নফর, তুমি তো চোর-ছেছোরের বংশধর—যার কোনো ইতিহাস নেই—গোলাম ইতর ভাতি, তুমি কেবল নিরীক্ষণ করে। বলতে বলতে মানুষটা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, তাবপর দাঁড়াল এবং ছুটতে থাকল, হে নফর, তুমি মণিহার পবাও গলে। ফুলের মালাতে ফুল সাজাও। আর কি বলে মানুষটা, বলে অস্বাভাব শরীরে উত্তাপের কল লাগাও। বলে মানুষটা ঘুরে ফিরে নাচতে আরম্ভ করল।

সামনে একটা কুন্দ ফুলের গাছ, গাছের নিচে হরিমতী ছিল। হরিমতী অনেকদিন পর আবার কুন্দ গাছটার নিচে এসে আস্তানা গেড়েছে। কোথায় কবে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় হরিমতী, কেউ জানে না; আবার একদিন এই কুন্দ গাছের নিচে হরিমতী ওর পোটলাপুঁটলি নিয়ে ফিরে আসে; সে কাল হরিমতীকে কুন্দ ফুলের গাছটার নিচে বসে থাকতে দেখেছে, জলে ভিজে গেছে সব। ওর পোটলাপুঁটলি সব ভিজে গেছে। এখন নেই হরিমতী। সে ছুটে এসেছিল হরিমতীর কাছে,

হরিমতীকে পেলে সামান্য আগুন চাইত। কারণ হরিমতীর পোটলাপুঁটলির ভিতর গোটা সংসার। ভাঙ্গা মগ হাতা খুস্তি খুরি এবং উচ্ছিষ্ট খাবার সে কোথেকে কোন হেঁসেল থেকে সংগ্রহ করে বড় যত্নে রেখে দেয়। হরিমতী দয়ালু। হরিমতীর চুল শনের মতো। রাস্তার কলে চান করে টেনা-কানি পরে বসে থাকলে কে বলবে হরিমতী পাগলিনীপ্রায়! মনে হবে গুর বুদ্ধির অগম্য কিছু নেই। গরমের দিনে হাতপাখা নেড়ে সে একবার তাকে ঘুম পাড়িয়েছিল। কুন্দ ফুলের গাছটাতে তখন পাতা ছিল না। শীর্ণ গাছ, প্রথর রোদ্রে ওলা গুঠার মতো হলে হরিমতী এই গাছের নিচে বসে গুকে আলো এবং বাতাস দিয়ে রক্ষা করেছিল।

এম্মে রাত বাড়ছে। ক্রমে হিমেল ঠাণ্ডাটা আরও শক্ত হয়ে নামছে। একটু আগুনের জ্বল হরিমতীর কাছে ছুটে আসা। অথচ গাছের নিচে হরিমতী নেই। চারিদিকে তাকাল—না কোথাও নেই। কিছু দূর হেঁটে গেলে শহরের চৌরাগু এবং মোড়ে পাঠার মাংসের দোকান। দোকানী এই শীতে, হিমেল শীতে, সকাল সকাল কাঁপ বন্ধ করে চলে গেছে। রাস্তা-ঘাট ক্রমে নির্জন হয়ে আসছিল! শীতের দিনে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি এবং ঠাণ্ডা এই নগরীকে হিমের মতো অথবা মৃত মানুষের মতো অসাড় করে ফেলছে। একবার এই মাংসের দোকানে—কবে কোন দিন মনে পড়ে না, কেবল মনে পড়ে—সামান্য পাকস্থলীর নাল চামড়ার মতো মাংসটুকুর লোভে সে হাত জোড় করে অপেক্ষা করলে এক বাবু মানুষ অণ্ডকোষের লোভে বসে থাকার সময় প্রশ্ন করেছিল, তোমার নাম?

—আমার নাম রাজা হরিশ্চন্দ্র।

রাজা! বাবু মানুষটা চোখ উন্টে ব্যঙ্গ করেছিছিল। তারপর সে প্রাতদিন দেখেছে, বাবু পাঠা কাটা হলেই এক জোড়া অণ্ডকোষ নিয়ে পান চিবুতে চিবুতে বাড়ি ফিরছে। কি করে দোকানীকে কাঁসির দড়ি থেকে রেহাই দিয়েছিল। দোকানীর গৌফ জোড়া হলে উঠলে টের পায় হরিশ, মানুষটা একটা আস্ত মানুষকে এই দোকানের খুশির ঘরটাতে এনে পাঠা কাটার দা দিয়ে কুপিয়ে কেটেছিল—লোভ ছিল কার উপর—সে একদিন শুধু হরিমতীকে দেখেছিল রাস্তা দিয়ে যেতে—হরিমতী মানুষটার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে বড় রাস্তায় ছুটে গেছে এবং হাত তুলে যেন সে এক পাখির পালক উড়াচ্ছে বাতাসে তেমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সেই থেকে কি যেন এক সম্পর্ক মনে হতো। হরিমতী বাবু এবং দোকানীর গৌফজোড়া হলে উঠলে কুন্দ গাছের নীচে বসে তার মানুষের জন্ত কাঁদত। আর কেবল বাবু মানুষটার সন্ধানপনে এক জোড়া অণ্ডকোষের জন্ত বসে থাকা। বসে থাকতে থাকতে মহড়া দেওয়া—

আমি এক মাহুয, থানার বড়বাবু, বয়েস এই তিন কুড়ি হবে—খাতায় কলমে দুই কুড়ি দশ—ঘরে আমার যুবতী বৌ। বুঝি অশুকোষ খেলে অনন্ত শৌবন মেলে তেমন মুখ করে বসে থাকত বাবু মাহুযটা। অন্ধকারে যেতে যেতে হরিশেব মনে হলো, এই বাবু মাহুয এবং দোকানী মিলে হরিমতীকে পাগল করে দিয়েছে। সে ভিতরে ভিতরে কষ্ট অনুভব করল। কোথায় হরিমতী। সে ফের কুন্দ গাছটার নিচে ফিরে এসে দেখল—না, এখনও হরিমতী ফিরে আসেনি। কোথায় গেল। এমন বৃষ্টি এবং হিমেল ঠাণ্ডাতে হরিমতী কোথায় গেল! গুর চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে, হাত-পা ফুলে গেছে—আর নগরীর উপর তীক্ষ্ণ হিমেল ঠাণ্ডা অবিরাম চললে ফুটপাথের সব মাহুযেরা মরে যাবে। সে আগুনের জ্বল ছটফট করছে। হায়, একটু আগুন জ্বালাতে পারলে এমন শীতের রাতে অন্তত নিজেকে রক্ষা করতে পারত। হরিশ এবার একটু আগুনের জ্বল কাঙ্গালের মতো ছুটেতে থাকল। সহসা সহসা কোনো মাহুযের ছায়া অন্ধকারে ভেসে উঠলে অনুসরণ—পোড়া সিগারেট অথবা সামান্য আগুন—দিক্ত হায়, পথ কর্দমাক্ত বলে এবং পিচ্ছিল বলে সে ছুটেতে পারছে না। সে আগুন খরতে পারছে না। পোড়া আগুন জ্বোনাকির মতো জ্বলতে না জ্বলতেই নিভে যাচ্ছে। শীতে হরিশ ঠক ঠক করে কাঁপছিল। বাস-স্ট্যাণ্ডেব নিচে অথবা পার্কের কোণে পরিত্যক্ত ভাঙ্গা টালির ঘরে হরিমতী আছে কিনা দেখল। থাকলে হয়তো কাঙ্গালের মতো এমন ছুটেতে হতো না। হরিমতীর কাছে আগুন পাওয়া যেত। হরিমতী পাগলিনীপ্রায়, তবু হরিমতীর সংসারে সামান্য আগুন আছে। কারণ হরিমতীব বয়স আর কত! ত্রিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশ হতে পারে, আবার পঞ্চাশ হতে পারে। গুর নোংরা, ছেঁড়া এবং কিল্বুতকিমাকার পোশাকের ভিতর বয়সটা কিছুতেই ধরা যায় না! একবার হরিশ, কবে যেন হরিশ দেখেছিল, হরিমতী ফুটপাথের কলে স্নান করছে। এমন শরীর হবিশ দীর্ঘকাল দেখেনি। ঐ দেখে হরিশের হাত-পা যখন শীতের দিনের মতো ঠক ঠক করে কাঁপছিল—হরিমতী ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে তখন। রাস্তায় কোনো জনমনিগ্রি সে দেখতে পাচ্ছিল না। একমাত্র জনমনিগ্রি বলতে এই হরিশ। পাগল হরিশকে দেখেই সে লজ্জায় ভাঙ্গা মগ দিলে যেন বা শরীর ঢাকার চেষ্টা করে। বিয়ের পিঁড়িতে যেমন বধু বসে থাকে, তেমন এক বধুর মতো মুখে ব্যাণ্ডের মতো উপড় হয়ে সে হরিশকে দেখে—যেন হরিশ তার কডকালের নাগর। হরিমতীকে স্নানের ভিতর বড় কাতর দেখাচ্ছে। এত লোক নগরীতে এবং রাজপথে আর রাজপথের কলে হরিমতী সব তঞ্চকতা গিলে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে করতে হরিশের সঙ্গে পিরীত করছে, পিরীত করার সময়

মনে হয়েছে বড় অভাবী সে, স্মৃতরাং সারা দিনমান ঘুরে বেড়ানো। যেন পাখি ধরার মতো ঘুরে বেড়ায় হরিমতী। ঘুরে ফিরে, পায়ের উপর পা তুলে নাচতে নাচতে—পয়সা নাই, ঘোড়া নাই, সংসারে জল নাই, অন্ন নাই—কি যে নাই বলতে বলতে, হরিমতী নাচে গায়, হেঁড়া কানি উড়িয়ে বেড়ায় এবং কোনো এক আত্মিকাল থেকে সংসারের সব স্মৃতি ও মোহ থেকে মাঝে মাঝে মৃত স্বামীর আহত মুখ ভেসে উঠলে কুন্দ গাছের নিচে বসে হায় হায় করে কাঁদে।

হরিশ বলেছিল, মতি তুই কান্দস ক্যান ?

—নাগর, আমার নাই বইলা কান্দি আমি।

—কি নাই তর ?

—আমার হাতি নাই, ঘোড়া নাই।

—আমার হাতি ঘোড়া আছে, নিবি ?

—ইতর, তুমি নাগর ইতর।

হরিশ রাতের বেলাতে হাসতে হাসতে মতিকে ছড়িয়ে ধরেছিল। রাতের অন্ধকারে ফুটপাথের বাসিন্দারা ঘুমোচ্ছে। হরিশ মতির কোমরে হেঁড়া কানি-টেনা দেখে ভাবল—এই হায় হ্রৌপদীর বসন-ভূষণ। গোটা অন্ধ কত বিচিত্র বাস। কত রকমের হিজিবিজি তালিমারা সংসারের যাবতীয় অনাচার-অবিচারের বসন-ভূষণ—অন্ধ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে প্রায় ব্যাঙেজের সামিল করে ফেলেছে। রাগে দুঃখে সে টেনা-কানির মধ্যে যে মতি, তাকে ধরতে চায়। হায় এই ঠাণ্ডা থেকে পরিত্রাণ! বসন্ত হরিশ ছিঁড়ে ফুঁড়ে অন্তরে প্রবেশ করতে চাইলে মতি তালে তাল দিতে থাকে। মতিকে সোহাগ করতে করতেই হরিশ মাহুরের নিচে হাত বাড়িয়ে দেয়। বালিশের নিচে উচ্ছিন্ন হাড়-মাংস চোমা—শত লক্ষসবার চুষে শুধু সাদা হাড় মতি কিছু সংগ্রহ করতে না পারলে দিনমানে ফুটপাথে বসে অথবা রাতের বেলায় এই নগরীর ট্রাম-বাস এবং মাহুশ-জন যখন ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসে তখন তার ডেরায় শুয়ে শারারাত সেগুলো কড়মড় করে খায়। দাঁতে কি শক্তি হরিমতীর। যত অভাব বাড়ছে, অনাচার বাড়ছে, তত দাঁতে শক্তি বাড়ছে। হরিশ তালে তাল দেবার সময় মতির ভাঁড়ারে পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে দিলো। স্মৃতি মতি যত ডুবে থাকছিল, হরিশ তত সেয়ানা হয়ে উঠছিল। পিরিতের ফাঁদে আটকে সে মতির পোটলাপুঁটলি থেকে সব চুরি করে নিচ্ছিল। সেই মতি এখন কুন্দগাছের নিচে নেই, পার্কে নেই, ফুটপাথে নেই—কোথায় যে গেল! মতিকে না পেলে যেমন অন্তঃসময় চীৎকার করে ট্রাম-বাস কাটিয়ে রুমাল উড়িয়ে যায়—তেমনি সে ছুটতে ছুটতে হাঁকল, কার হাতি ? কে

ঘোড়া নিশ্চয় যায়! বাঘ বাজে কেন? ইতর এই সংসারে তোমার কি ইচ্ছা যুবতী! সে রাজপথে দাঁড়িয়ে স্থল্লরী যুবতী দেখলে হাসত। আর ঐ মাহুঘটা, দারোগাবাবু—যার ঘরে তার বিবি, নাকে এখন নথ, কোমরে বিছেহার এবং ছাগলের অণ্ডকোষে যে-মাহুঘের প্রাণ-পাখি পোষা ( শুধু কেন জানি মাঝে মাঝে সরলার চোখ ভাসতে থাকলে সে হাঁকে—কার হাতি? কার ঘোড়া? বাঘ বাজে কেন? )—সেই দারোগাবাবু হরিশকে এখন আর চিনতে পারেন না। হরিশের বড় দাড়ি, কোটরাগত চোখ এবং গোল গোল চাউনি। পাগল হরিশ পাকস্থলীর নীল চামড়ার মাংসের জন্তু বসে থাকলে কেবল শুনতে পায়—কারা যেন বাঘ বাজায়। কিসের বাঘ? যুবতী, কি বাঘ বাজে? যুবতী, যবে যুবতী কলেজে যায়, সিনেমায় যায়—কি তাড়না তার ভিতরে—সে ভেবে পায় না—কেবল সেই এক দৃশ্য। সে এবার জেরে হাঁকল, মতি, মতি আছ নি! ফুটপাথে, কবরভূমির এপাশটায় এবং দালানের বড় আলোটার নিচে দাঁড়িয়ে ডাকল, মতি, মতি আছ নি! ইট্ট আগুন না হলে বে প্রাণপাখি রাখা দায়!

ফুটপাথ পার হলে নোংরা বস্ত্র অঞ্চল, পাশে বড় আঁস্তাখুড়—পাহাড়-সামিল আঁস্তাখুড়ে পচা ইঁহর-বিড়ালের গন্ধ। মতি এখানে থাকতে পারে—নির্জন নিরালাতে আঁস্তাখুড় পেলে মতি শুয়ে থাকে। তখন বুষ্টি ছিল না, আকাশটা ধরে এসেছিল—ছাইগাদায় পোড়া কয়লা—ঝুড়িতে বস্তিবাসীরা পোড়া কয়লা তুলে নিচ্ছিল, হরিশ সব্ব করতে পারেনি, পায়ের উপরে গোটা শরীরের বোল তুলতে তুলতে বাঘ বাজাতে বাজাতে দুটো ঝুড়ি চুরি করে যেন হরিশ যুদ্ধে যায়, দামামা বাজিয়ে যুদ্ধে বার... হরিশ ঝুড়ি চুরি করে পালিয়ে গিয়ে বুদ্ধ গাছটার নিচে মতির অপেক্ষাতে বসে ছিল। রাত হলে, হিমেল ঠাণ্ডা ক্রমে বাড়লে, সে এবং মতি খড়কুটোতে ঝুড়ির বেতে বাঁশে আগুন জ্বলে চুরি করে এই নগরীতে আর একটা রাত কাটিয়ে দেবে। কিন্তু কোথায় মতি, কোথায় সামান্য আগুন। সে ডাকল ফের, মতি, অ মতি, আছ নি! তিনদিন থেকে ভিজে ভিজে এখন এখন একটু আগুন না হলে প্রাণ রাখা দায়। মতি, মতি আছ নি? অ মতি। বড় বড় গাড়ি রাতের আঁধারে খুরগি গিলতে গিলতে চলে যাচ্ছে। সে ডাকল, মতি, অ মতি, মতি আছ নি! বড় বড় বাড়ি দু-পাশে স্থির, সে ডাকল, মতি, অ মতি, মতি আছ নি! বড় বড় দেয়ালে হলুদ সব ছবি রঙীন চিত্রের মতো ভিজে ভিজে তেলাপোকর সামিল। দেয়ালে ছবিগুলো বুষ্টিতে ভিজে নড়ছে। সে ডাকল, মতি, মতি আছ নি! সে আবার সেই নির্জন জায়গাটা পার হবার সময় দেখল, অনেক উঁচুতে একটা জানালা

খোলা। সেই আলোতে সে উত্তাপ পাবে ভেবে নিচে চূপচাপ ভালো মানুষের মতো ঠাঁড়িয়ে ডাকল, মতি, অ মতি, মতি আছ নি। শীতে সে যত ঠক ঠক করে কাঁপছে, তত হস্তে হয়ে নগরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে—মতি, মতি আছ নি! হরিশ ছুটে ছুটে ক্রমে এক কবরখানায় পৌঁছয়। মতি এখানে গোসা করলে চলে আসে—ভাঙ্গা টিনের ছাউনির অন্ধকারে চূপচাপ পুঁটুলি শিয়রে রেখে শুয়ে থাকে। সে ডাকল, মতি, মতি আছ নি! অন্ধকার মানুষের মতো ছায়া ভেসে উঠল। বোপ-জঙ্গলের ভিতর ছোট এক ছাউনির নিচে দু-বাহু বিছিয়ে মতি উপুড় হয়ে আছে—সে এতক্ষণে লক্ষ্য করল ক্রমান্বয় এই হাঁটা এবং অনুসন্ধিৎসা তাকে মতির কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে।

সে প্রথমে কানের কাছে মুখ এনে কিস কিস গলায় ডাকল, মতি, মতি জাগে নি! কোনো উত্তর পেল না। মতি, তুমি আমার ভালোবাসার জীব। সে মতিকে ছুঁতে চাইল। মতির হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা। সে মতিকে জড়িয়ে ধরতে চাইল—এই মতি। সে মতিকে ঠেলা দিলো এবার—এই মতি! মতির শরীর শক্ত। কতদিন এমন শরীর শক্ত কবে রেখেছে—আজ হয়তো শীতে তা আরও শক্ত হয়েছে। আবার চারা গাছটির মতো শীত পার হলে নতুন পাতা মেলে ধরবে—সুতরাং সে মতির ঠ্যাং ধরে টানতে গেলে দেখল—যথার্থই হুঁশ নেই তার। সে এবার কবরখানায় দুহাত তুলে চীৎকার করে উঠল, মতি রে! এখন কি তার করনীয় সে ভেবে পাচ্ছিল না। সে খাবলে খুবলে মতির পোটলাপুঁটুলি খুলে আঙুন খুঁজতে থাকল। মতির কত কিছু রাগার অভ্যাস। খালি সিগারেটের বাক্স, ভাঙ্গা হাঁড়ি, হেঁড়া কানি-টেনা—যা কিছু পথের, সব মতির পোটলাপুঁটুলির ভিতর—মায় পাখির পালক পর্যন্ত! কিছু খাণ্ড্রব্য, মুসুরীর ডাল এবং পোড়া রুটি—কতদিনের পচা কে জানে। বাসি দুর্গন্ধ, মাছি উড়ে উড়ে জায়গাটাকে পুত্তিগন্ধময় করে রেখেছে। খাবলে খুবলে পোটলাপুঁটুলি খুলে হরিশ আঙুন আবিষ্কার করতে পারল না। সে হতাশায় এবং দুঃখে লম্বা হয়ে গেল, পায়ের নিচে মতি উঁচু হয়ে পড়ে আছে—আঙুন জ্বালতে পারলে মতি বাঁচত। সে শেষবারের মতো মতি যেখানে পয়সা লুকিয়ে রাখে—প্রায় ঘাগরার নিচে, ট্যাঁকে—সেখানে হাত ঢুকিয়ে দিলো। ছোট নীল রঙের থলে, কিছু পয়সা, কানাকড়ি এবং পোড়া বিড়ির দুটো অংশ, আর ম্যাচ বাক্স। প্রায় যেন রাক্ষসের প্রাণ রূপোর কৌটায় ভ্রমরের ভিতর, মতির প্রাণ এই থলে—নীল রঙের থলে। সে এবার থলে নিয়ে দু-লাফে সদর-রাস্তায় নেমে ছুটতে থাকল। মতির প্রাণ এই রাজপুত্রের হাতে।



সে দুই ঝুড়ি এবং খড়কুটোর অল্পসন্ধানে ছুটতে থাকল। আগুন জ্বালতে পারলে মতি আর একবার বাঁচবে। সে আলো-জাঁধারিতে নগরীর এমন নিস্তব্ধ রাতকে ব্যঙ্গ করে হেঁকে উঠল, শহরে কে জাগে। উত্তর এলো, কারা যেন দূরে কোলাহল কবে যাচ্ছে—রাক্ষসের ভাই খোকস জাগে। একসঙ্গে একদল খোকসের গলা পাওয়া গেল! সে নিজের ভয় দূব করার জগ্ন হাঁকল, কে জাগে! এবার যেন অন্ধকার থেকে উত্তর এলো, আমি মতি জাগি! কে জাগে। সে এবার জবাব পেল, আমি অমানুষ জাগি।

হরিশ যত সত্বর পারল খড়কুটো এনে আগুন জ্বলে ফেলল। আগুন জ্বাললে রাক্ষস-খোকসের ভয়টা কমে, সে প্রথমে আগুন জ্বলে কেমন জড় পদার্থের মতো মুখ গুঁজে বসে থাকল। তারপর মতিকে দেখতেই মনে হলো ওর তাতে মতির প্রাণপাখি পোষা, সে তাড়াতাড়ি আগুন থেকে উত্তাপ নিয়ে মতির গালে কপালে দিতে থাকল। মতিকে চিত করে শুটয়ে দিলো। জলে সব ভিজে শপ শপ করছে। সে মতির শরীর মুছে দিলো। ঠাণ্ডায় বেহুঁশ মতির চোখ ছুটো শুধু সাদা সাদা, হাত পা সাদা সাদা পাণ্ডুর এবং নাকের নিচে কাটা দাগ। রক্ত গড়াতে গড়াতে বরফ হয়ে গেছে। মতির থেকে থেকে শ্বাস পড়ছে। এবং মনে হয় কিছুক্ষণ কি ভেবে ভেবে তারপর মতি খাসের কথা মনে হলে একবার নিঃশ্বাস ফেলছে। সে মতিকে তাড়াতাড়ি কাত করে দিলো। পিঠের কাছে আগুন পেলো মতির ফুসফুস পরিষ্কার হতে পারে ভেবে পিঠে এবং পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুনের উত্তাপ দিতে থাকল। কিন্তু মতি যেমন অসাড় হয়ে পড়েছিল, এখনো তাই। সাদা ফ্যাকাশে চোখ যেমন ছিল, হাতে পায়ের যেমন জলের ঘা ছিল, এখনও তেমনি সাদা চোখ, পায়ের পাতায় সাদা মাংস উঠে আসছে, জলে জলে মতির পায়ের ঘা হয়ে গেছে—মতির চারপাশে মশা-মাছি উড়ছে কেবল। সে ডাকল, এই মতি, তুমি কথা কও। কথা না বললে ভয় লাগে। হায়, সর্বত্র এক নিদাকণ তৃষ্ণা, বেঁচে থাকার তৃষ্ণা—মতি বেঁচে থাকার জগ্ন এতদূর হেঁটে এসে জলের বাপটা থেকে প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন মতি জানে না, মতির প্রাণবায়ু ঠাণ্ডায় এবং শীতে অথবা অনাহারে উড়াল দিচ্ছে। সে দুই হাতে উত্তাপ এনে মতির গালে কপালে বৃক এবং পায়ের ঘসতে থাকল। পা ঘসলে গাল-কপাল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, গালে কপালে দিলে পা সাদা এবং উরুমূল বরফ হয়ে যান্ন। মতিকে সে আগুনের দিকে মুখ করে মরা মাছের মতো কাত রাখল। আর কাত করতেই মনে হলো মতি বুঝি প্রাণ পাচ্ছে। মতির নিঃশ্বাস পড়ছিল। থেমে থেমে, আগের চেয়ে দ্রুত। সে তাড়াতাড়ি মতির

ভেজা বসন-ভূষণ সব চিপে আগুনের উপর টানিয়ে দিলো। গরমে গরমে শুকিয়ে গেলে শুকনো কাপড়ে আবার মতিকে ফুলমতী মনে হবে। কিন্তু আগুন যে সামান্য। চারিদিকে জ্বল, আর কর্দমাক্ত বস্তু—জীবনে এই নগরীতে কেবল মৃতমুখ ভেবেড়াচ্ছে। হরিণ আগুনের উত্তাপে বল পাচ্ছে। সে মতিকে কাঁধে নিয়ে আগুনের চারপাশে ঘুরতে থাকল—ওর কেবল নৃত্য করতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু আগুন সামান্য সময় জ্বলে নিভে যেতে থাকলে যেমন সে মরা মাছটির মতো কাত করে রেখেছিল এবার সে তেমনি মরা মাছটির মতো মতিকে চিত করে রাখল। আগুন ক্রমে কমে এলেই নিঃশ্বাস কম-বেশি পড়ছে। সে দেখল—এব খড়কুটো শেষ, বেত-বীশ শেষ এখন শুধু মতির বসন-ভূষণ আছে। বসন-ভূষণ সে এক-তুই করে আগুনের ভিতর ছুঁড়ে দিতে থাকল। কারণ এই আগুন এখন প্রাণের চেয়ে মূল্যবান। ভোবের দিকে তুই আদিম নরনারী দরকার হলে সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকবে। এই রাত, শীতের হিম ঠাণ্ডা, ক্রমে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আগুন নিভে গেলে সে এবং মতি মরে যাবে। ক্রমে এই আগুনের জন্ম হরিণ স্বার্থপর হয়ে উঠল। মতির যাবতীয় তৈজস, মায় খালি সিগারেটের বাক্স, পাখির পালক এবং নীল-থলে আর কানাকড়ি, যদি, পায়া যায় তো এমন কি মতির অঙ্গ কেটে তাজা মাংস রক্ত চর্বি আগুনের ভিতর নিক্ষেপ করতে পারলে বৃষ্টি প্রয়োজনীয় উত্তাপ হয়। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর মতির বয়স বিশ কিংবা বাইশ, পঁয়ত্রিশ কি পঞ্চাশ ধরা যাচ্ছে না। মতির চোখের নিচটা ফুলে গেছে, হাত পা ফুলে গেছে। মতিকেও আর মতি বলে চেনা যায় না। হরিণ মতির শরীরে হাত রেখে বুঝল, এ-শরীর আর গরম হবার নয়। সে খুব সংলগ্ন হয়ে বদল। বলল, মতি, তুমি আমার ভালোবাসার জীব। বলে সে তার মতিকে নিয়ে এবং সামান্য আগুনের উত্তাপ নিয়ে কেমন জড়াজড়ি করে বাকি রাতটুকুর অপেক্ষাতে পড়ে থাকল—আশা, ভোর হলে সূর্য উঠতে পারে আকাশে।

প্রাতঃকালে সূর্য আকাশে কিরণ দেবে ভেবেছিল কিন্তু হরিণ চোখ মেলে দেখল আজও ঈশ্বর তাঁর নীল উজ্জ্বল ছায়া ছায়া আগুনের ঘর আকাশের গায়ে টানিয়ে দেননি। তার গায়ের জোকা—যার পিঠের দিকটা টুটা-কাটা ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো এবং যা তাকে অগ্নি শীতের রাতে উত্তাপ দিতে সাহায্য করবে—সেই পরম প্রয়োজনীয় বস্তুটি—যা না হলে কাল রাতে অথবা পরশু রাতে সেও মতির মতো অস্থানে কুস্থানে মরে পড়ে থাকবে—শরীর থেকে খুলে সে মতির শরীর ঢেকে দিলো। ছেঁড়া তালিমারা পাজামা খুলে মতিকে পরিয়ে দিলো—যেন সাদা থান কাপড় অথবা

কাফনের মতো বস্তু ; কারণ মতির কি জাত এবং কি ধর্ম সে এ সময় আর ঠিক করতে পারছে না। কেবল ওর এখন মতির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছে। নৃত্য না করলে, ঘুরে ফিরে না নাচলে কঁদলে হিম ঠাণ্ডাতে তার শরীর বরফ হয়ে যাবে। সে এবার মাথায় ডান হাত রেখে, পাছায় বাঁ হাত রেখে, কোমর হুলিয়ে মতির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছিল আর গাইছিল—মাগো, তুই ভারতবর্ষ, টুটা-ফাটা তুর শরীর, ( আমি মা ) রেতের বেলা পোকামাকড়, দিনের বেলা পাগলা হরিশ।





### এক

মাহমুদ গল্প কবিতা লেখে। পেশার দিক থেকে বেকার। ওর বড় বোন পাগল হয়ে গিয়েছিলো। ডাক্তার বলেছিলো, বিয়ে না হওয়াতেই পাগল হয়েছে।

ওর বড় ভাই ট্রেনের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করেছে। এখন ও একা। একটি মেয়েকে ভালবাসতো। কিন্তু বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে পারেনি। কেননা ওব রোজগার নেই। কয়েকদিন আগে ও বলেছিলো, আমি একটা নতুন গল্প লিখছি, পড়ে দেখো, তোমার ভালো লাগবে।

গল্পটা আসলে তখনও মাহমুদ লেখে নি।

### দুই

মাহমুদ যে কোন উপায়ে রোজগার করার জ্ঞান তৈরী ছিলো। ওর একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু (হ্যাঁ, আমারও) শামিম সে সময়ে অসুখে পড়লো। শামিম যে বাঁচবে না সে কথা জানিয়েছিলো ডাক্তার।

এবং গীতি জানালো একদিন [ জানালো না, বলা যায় বোঝালো ] যে ওদের সম্পর্কটা নেহাৎ ছেলেমানুষী সম্পর্ক। তার মধ্যে কোন রকম বাস্তবতা ছিলো না। প্রেম করা আর ঘর-সংসার করা এক ব্যাপার নয়। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা বিবেচনা না করে দেখাটা বোকামি। তার চাইতে……

তার চাইতে কী, মাহমুদ আমাকে খুলে বলে নি। সেদিন ও খুব হেসেছিলো। গীতাকে ছেলেমানুষ বলেছিলো, বোকা বলে উপহাস করেছিলো এবং অন্ধকার হবার মুখে বিদায় নিয়েছিলো।

গল্পের ফর্ম সম্পর্কে নতুন কী ভাবছে তা নিয়ে কোনরকম আলোচনা করিনি সেদিন। একবার বোধ হয় বলেছিলো, আমার নতুন গল্পটা আরম্ভ করেছি, যেও কাল একবার আমার ঘরে, পড়ে দেখো।

মাহমুদের বয়স চব্বিশ। ওর কেউ নেই। সেদিন একটা বিদেশী গান গুন গুন করতে করতে রাস্তায় নেমেছিলো। মনে আছে, গানের প্রথম কলি ছিলো হাভ যু এভার বিন লোনলি। তখন ঢাকার রাস্তায় হাওয়া বইছিলো। পথের দু'পাশের গাছে শন শন শব্দ বাজছিলো। আমি কোন কথা বলিনি। শুধু দূর থেকে দেখেছি।

## তিন

সবাই তখন চুপ করেছিলো।

ফুফুচুড়া গাছ, মাঠ, শিরীষের ফুল, মেঘ, সূর্যালোক এবং দীর্ঘ পথটা। সবাই চুপ করে প্রতীক্ষা করছিলো কোন শব্দ এমনি একটা গুরুত্বের মধ্যে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে কি না।

মাহমুদগুলো সবাই যেন একেকটি বিদ্যুতের বিন্দু। ওরা দ্রুতগতিতে নড়ছিলো, কিন্তু কেউ কারো অবয়বে এসে আঘাত হানছিলো না। নিসর্গের হুচতুর কোন কবি যদি অবয়বের নাম দিয়ে থাকে বিন্দু তাহলে আত্মার কোন নাম নেই। হয়তো তা চোখে এসে লাগে না। বরং বলতে পার, শুধুমাত্র অল্পভূতির প্রগাঢ় অন্ধকারেই যা উজ্জ্বল হয়ে দীপ্তি পায়—সেই আলোই হয়তো আত্মা।

সবাই তখন স্তব্ধ। কান পেতে রয়েছে প্রতীক্ষু স্তব্ধতার বৃক্ষে; যদি কোন শব্দ সোনালী ভোরের লগ্নে গুন গুন মৌমাছির ধ্বনির মতো বেজে ওঠে; অথবা সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনার গীতির মতো গভীর হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু কোন শব্দ এসে বাজে নি। আমি প্রতীক্ষা করে ক্লাস্ত এবং বধির। কোন শব্দ আমার চারপাশে এখন আর নেই!

কমেন করে থাকবে। ক'দিন ধরে যে আমার চারপাশ ঘিরে প্রচণ্ড প্রমত্ত করণ আকুল কতগুলো শব্দের কোলাহল ছিলো। তা ছাড়াও তখন একটা গভীর অন্ধকার বিবরে ঢুকে পড়েছিলাম। তখনই হয়তো সেই অন্ধকারের মধ্যে চিরকালের জন্তে হারিয়ে যেতাম। অল্পভূতির এই স্তব্ধতা এমন আদিম এবং বন্য যে তার বৃক্ষে আমার আলো কোনদিন উজ্জ্বলরথ অচঞ্চল শিখায় প্রতিষ্ঠিত হতো না। এখন আমি ক্লাস্ত, প্রহত, এবং আত্মহত্যায় উন্মুখ। সে জন্তাই [আমি শুধু কি আমি?] চুপ করে রয়েছে।

এ নিঃশব্দ অন্ধকাবে একাকী পথ হাঁটছি, সেই তখন থেকে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এসেছি। শীতল, শক্ত এবং কালো রাস্তা পায়ের নিচে, তবু এই রাস্তায় পা দিয়েও যেন কিছু স্বস্তি রয়েছে। অশেষ শূন্যতায় যে ভাসছিল...এ চেতনাটা তবু বেঁচে আছে এমন স্বস্তির সাবলীলতায় এসে এখন আমি নিঃশব্দ অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছি। চিরকাল ধরে আমি হাঁটতে হাঁটতে গভীরতর কোন অন্ধকারে এবং নিঃশব্দতায় ডুবে যাচ্ছি। কৃষ্ণচূড়া চূপ, মাঠ চূপ, শিরীষের শাখা চূপ। কেউ কিছু বকছেন।

অন্ধকার এবং নিঃশব্দ বেদনার বৃকে কান পেতে রয়েছি সর্বক্ষণ। যদি কোন শব্দ পাওয়া যায়। ক্লাস্ত, প্রহত এবং আত্মহত্যা উন্মুখ হয়ে যে মিষ্টি শব্দের জগে নিরবধিকাল ধরে আমার কান পেতে থাকা—তা আমরা কেউ শুনতে পাবো না।

অন্ধকারে বাহুড়েরা বাসা ছেড়েছে। আলোকময় দূবনগরীর চারপাশে কয়েকটা চক্রাকারে উড়ছে। কয়েকটা পেচক শিরীষের ডালে বসে ঠোঁট আর নখর ঘসে ঘসে শানিত করে রাখছে। কখন ইঁহরের দল এক এক করে নিঃশব্দ প্রান্তরের বৃকে সিঁদ কাটতে আরম্ভ করে।

আকাশ থেকে হিম ঝরতে আরম্ভ করেছে এখন। শেষ রাতে ঘাসের উপর কুয়াশার পর্দা ঘেরা থাকবে অনেকক্ষণ, পূর্বের আলো এসে না পড়া অবধি। তখন আলোকবিদ্ধ আমার এই নিম্প্রাণ উপহার এবং করুণা আমার লাশের ওপব প্রতিফলিত হবে।

কিন্তু তবু সেই শব্দ থাকবে না। সেই শব্দের অমৃতধ্বনির আবহে আমি কোনদিন গিয়ে পৌছতে পারব না। মৃত্যুর আগেও না, পরেও না। এই গাছ, বাহুড়, পেচক এবং দীর্ঘ পথ—এরা সবাই এখন আমার সহোদর। ওদের নিঃশব্দ ভাষা শুনতে পাচ্ছি যেমন শুনতে পেতাম মাতৃগর্ভে। আনন্দ কল্লোলিত যৌবনের সমুদ্রে যাবার আকাঙ্ক্ষায় দেহ সরোবরের একটা পদ্মবীজ কর্দমাক্ত এবং উর্বরা গর্ভে গিয়ে পৌছেছিলো। সেইখানে নিটোল এবং গোলাপী একটি আবরণে পৌছবার জ্ঞান যে আঘাত লেগেছিলো সেই আঘাত প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো দিনরজনী। আমি আকাশের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেই অন্ধকারে ফুটে উঠলাম। নিঃসঙ্গ সমুদ্রে যেন ফুটলাম আঁধার-কোকনদে। আমার চারপাশের অন্ধকারে ছিলো আরো একজন, আমি তার নাম জানি না। দেখতে পাইনি কিন্তু তাকে অল্পভব করতে পারছিলাম। এই এখনকার মত।

আকাশ আমার মা। মাগো, বলোনা সেদিন কে ছিলো আমার কাছে।

জারুল আমার ভাই, শিরীষ আমার ভাই।

ওরা ডাকলো, এসো ভাই।

ডাক শুনলাম মনের ভেতবে। দাঁড়ালাম চূপ করে। শিরীষেব উদ্ধত নিঃখাসেব  
নিচে।

মবে কি লাভ? অন্ধকাব ফিস ফিস করে আমার কানে কানে বললো।

আমি কেমন করে ওদেব বোঝাই দিনের আলোয় এ মুখ ওদের কাউকে আমি  
দেখাতে পারবো না। কেমন কবে বলি সর্বক্ষণ আমি মাতুষেব নুখেই নয় দেখছি।

ওদের ভীত মুখ দেখে কতবার চিংকার করে উঠেছি। ওদেব ভয়, সবার থেকে  
সব বন্ধ বেয়িয়ে পড়ে। অন্ধকাবে হারিয়ে যাবে। এতো ভয়ের মাঝখানে আমাব  
অসহিষ্ণু চিংকার শুনে ওরা আমাকে বলে দিয়েছে, আমি অভিশপ্ত। আমি না  
মবলে ওবা কেউ স্বস্তি পাবে না।

দৃশ্য দেখে মাতুষ যেমন ভয় পায়, তেমনি ওরা আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে।  
আমি এখন কি করবো। কেমন করে আতঙ্ক এবং পাণ্ডুর মাতুষগুলোর মুখেমুখি  
দাঁড়াবো।

কখনো আবার ঘণা, হিংস্রতা এবং পিপাসা দেখে দেখে আমি ক্রান্ত। হাসবে।  
সমবেত সাহসের উৎসে আমার শক্তি ছিলো, সেই উৎস খুঁজে পাই না কেন?

শব্দ, শব্দ, শব্দ, যে শব্দে আমি নিরবধিকাল ধরে বিচ্ছুরিত, যে শব্দের আবহে  
বলয়িত হয়ে আমি আদল খুঁজে পেয়েছি সেই শব্দ যে এখন আমার প্রাণের অতীত।  
এসে পৌছেছি এমন এক মৃত নগরীর মাঝখানে যেখানে থেকে আমার আর নিষ্ক্রান্তি  
নেই।

না। তখন ভয় করছিলো না। বরং সবেব ভিতরে ধীরে ধীরে অচেনা সাহস  
সঞ্চিত হচ্ছিলো। সেই সাহস নিয়ে বার হয়ে পড়েছি পথে।

নিশ্চয়ই এখন রাত্রি। নইলে চারিদিক এতো নিঃশব্দ কেন। ঘর থেকে  
বেকবাব সময় যে সাহসের সম্ভটা কেঁপে উঠেছিলো মনের ভিতর এখন দেখছি সেই  
সাহসটা আমার শূন্য।

এখন কি করবো?

যদি সমুখের রেললাইন ধরে হেঁটে যেতে পারি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহলেও কি  
এই নিঃশব্দতা এবং অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে পারি না? কেন না শীতল এবং  
শক্ত লোহার সমান্তরাল এই পাত ছোটোর ওপর দিয়ে শব্দের সেই অতুলনীয় সম্রাট  
যন্ত্র এবং সহচরী বিদ্যুতি আলো সগোরবে এসে যাবে। এই নিঃশব্দতা এবং

অন্ধকারের বুক চিরে ছুঁটুকরো করে শব্দের জয় ঘোষণা করে এবং আলোর জয়ধ্বজা উড়িয়ে চলে যাবে। একদিক থেকে অন্ধদিকে। কে জানে হয়তো তার গতিব বিকিরণে আমার আত্মাও গতিবান হবে।

তখন এই দেহ ?

এই টুকরোগুলো পড়ে থাকবে রেললাইনের ছুঁপাশে ছড়িয়ে। পাথরের টুকরো-গুলোতে দুর্গন্ধ, রস, আর পচা রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে। প্রথর ছপুৱে শকুনেরা চক্রাকারে উড়বে আমার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন লাশের টুকরোগুলোর ওপর দিয়ে।

আর আমার এই আত্মা, যা দেহের সর্বত্র প্রসারিত অথচ অল্পভূতির মধ্যমণিতে একটি বিন্দুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত, তখন অণু অণু হয়ে ধুলোয় শিশিরে গাছে লতায় রৌদ্রে এবং বায়ুমণ্ডলে মিশে যাবে।

আমি তখন কি কববো ?

আমি কি তখন মুক্তি পেয়ে যাবো ?

কে জানে এই আধ্যাত্মিক যুক্তির সত্যিকার কোন মানে আছে কি না। কিম্বা এ সবই শুধুমাত্র একটি কবিতার কয়েকটি চিত্রকল্প। যাই হোক, এসব এখন আমার অপরিচিত এবং বিচিত্র কতকগুলি অল্পভূতি থেকে স্বতোৎসারিত। এই অনন্ত মুহূর্তগুলিকে চিরকালের জন্ত হারিয়ে ফেলতে চাই না। এগুলো আমি ধরে রাখতে চাই। মাল্লবের আত্মা যেন এমনি অন্ধকারে আর কোনদিন এসে পথ না হারায়, সেজন্ত।

অনেক দূর হাটলাম মুক্তি পাবো এই আশায়। জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা থেকে কবে যে মুক্তি পাবো। আনন্দ কাকে বলে ? শৈশবে কি আমার আনন্দ বলে কোন সম্পদ ছিলো ? মফস্বল শহর, ছায়া ঢাকা গ্রাম্য পথ—শাদা দেয়াল টিনেব তাল। ইক্কুল ধর...চশমা চোখে হেডমাষ্টার মশাই...কালো মোটা পণ্ডিত মশাইয়ের হাতে সপাং সপাং বেত...চ্যাংডা ছেলে সদানন্দের মুখে হাসি। কি একটা কথায় যেন সবার একসঙ্গে হাততালি দিয়ে গুঠা... এই কি আনন্দ ?

না টুটু নামের সেই মেরুন রঙের ফ্রক পরে সলজ্জ হাসা মেয়েটার জন্তে আমার সারা বুক অস্থির তোলাপাড়, রেলোয়ে ব্রীজ থেকে বান-ডাকা, পাক-খাওয়া, নদীর বুকুে ঝাঁপ দেয়া দুঃসাহসী মন নিয়ে গোরস্তানে গিয়ে সাহসের পরীক্ষা দেয়া—এ সবই কি আমার আনন্দ ?

না আনন্দ আরো কিছু ? যদি আরো কিছু থাকে তবে আমি তা জানি না।

যৌবন কবে এলো। আমি কি যুবক হয়েছি কোন দিনও ? অন্ধকার একাকী



শয্যায় কোন স্বন্দরী নারীর শরীর কল্পনা করে করে কৃত্রিম উত্তেজনায় অধীর হয়ে শেষটা ঝিমিয়ে পড়ায় কি যৌবনের কোন লক্ষণ প্রমাণিত হয় ?

কে জানে যৌবন তাহলে কি ? কেউ তো কোনদিন বলে দেয়নি আমায় । আমার অস্থূতি এই রাজ্যে যৌবন কোনদিন আসবে না । যদি কোন কামাতুরা নারীকে নিয়ে আমি এক শয্যায় শুয়ে তার উত্তপ্ত এবং অধীর শরীরকে তৃপ্ত এবং শান্ত করে দিতে পারি—তবুও যৌবন আসবে না ।

কেন আমি অনন্তকাল ধরে এমন কি একটা অন্তহীন অন্ধকারের বৃকে মাথা কুটে মরবো ? একটুখানি শব্দ আর এক ঝলক আলোর পিপাসায় বন্দী থাকবো ? কী জানি, আমি নিজেইই গুপের নির্ভূর প্রতিহিংসা নিতে পারি না ।

আমি কি খুঁজেছি, আমার প্রার্থনার সেই লক্ষ্য যে কী তা বলতে পারিনা । শুধু বুঝতে পারি তা এমন কিছু যা আমাকে এই ছঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে দেবে কিন্তু তা কী, কে বলে দেবে আমাকে ?

হঠাৎ এক ঝলক আলো পড়লো । আমি সেই আলোতে প্রতিফলিত হয়ে জলে উঠলাম । সাথে এলো সেই নিঃসঙ্কোচ স্বপ্নের বিজয় ঘোষণা । মাটির ভেতরে কোথায় যেন গুম গুম শব্দ হচ্ছে । মাটি কাঁপছে । শীতল শব্দ ইম্পাতের পাত ছুটো জ্বলছে, যেন সে ছুটো স্বর্গে যাবার সেতু । উজ্জ্বল এবং পবিত্র ।

চলো যাই, চলো যাই । শত সহস্র কণ্ঠ যেন আমায় ডাকছে । চারিদিক এই মুহূর্তে আলোয় আলোময় । আমি কি এখন মৃত্যুর দরজা অতিক্রম করে যাচ্ছি ? সেই কালো অন্ধকার, বাহুড়, পেচক, নিঃশব্দ -কৃষ্ণচূড়া, তন্দ্রাচ্ছন্ন শিরীষ এবং শক্ত বাজপথ—সবাই কি আমার ফেলে আসা খোলস ?

চলো যাই, চলো যাই । ব্যগ্রকণ্ঠ আহ্বান আমার চেতনায় বিদ্যুৎশিখার মতো চমকিত হচ্ছে । এই কি তবে আমার মুক্তির আয়োজন ?

গাড়িটা চলে গেলো । অন্ধকার এবং নিঃশব্দতার বৃক চিরে দু'ভাগ করে দিয়ে । এখন আমি আবার মুখোমুখি অন্ধকারে একাকী ।

তারপর আবার নির্জন পথ । যে পথে আমি হেঁটে এসেছিলাম ।

একটা গাড়ি চলে গেলো । মুহূর্মুহু আহ্বান জানিয়ে । কিন্তু আমি যেতে পারলাম না ।

আমি মুক্তি চাই । আমি মুক্তি চাই । আমার এই তীব্র আর্তনাদ কি কেউ কোনদিন শুনবে না ?

না, শুধু নারীর স্তন এবং ঠোঁট দেখে দেখে সেই পিচ্ছিল এবং পাশব এবং

অঙ্ককার অহুত্বতির ভেতরে হারিয়ে যেতে পারি না, তিল, তিসি এবং যবের হিসেব করতে করতে স্থূল ও নিশ্চাণ একটি স্বর্ণপিণ্ড হতে চাই না।

বা, অঙ্গলীল চাটুকারের কুমিকায় অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত নিরাশ এবং অসহায় অবস্থায় বিন্দুমাত্র আর্তনাদ না করে মরে যেতে পারি না।

নিজের স্বরে আবার ফিরে এসেছি। সেই অঙ্ককারের পাথরে পার হয়ে। কিন্তু একি সেই ঘর যা মাথার ওপর আশ্রয়ের মতো চিরকাল শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি জানি থাকবে না। কেননা একটু আগে উন্নত ও অস্থির কটি অহুত্বতির পাকে গিয়ে পড়েছিলাম।

আমি কি এখন ঘুমোবো ?

আমার ঘুমোনো উচিত। কিন্তু কেন ঘুম আসে না আমার ? যদি ঘুমোতে পারতাম।

সবাই ঘুমিয়েছে এখন সুখী এবং স্থূল মাছবের পয়সা দিয়ে পুবে রাখা স্ফীতবোবনা নারীর সঙ্গে মধ্যরাত্রির রমণের শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। সেই স্বর্ণলোভী বণিকেরা। যাদের কাছে আমি কিছু খাণ্ড প্রার্থনা করেছি, তারা আরো স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছে। নারীর পাশে কুঁড়েঘরে কিছু আমারই মতো জীবিকাহীন পশু বাস করে—তারাও ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে।

শুধু আমি একাকী জেগে। আমার সম্মুখে অনন্তকাল ধরে একটা কালো শক্ত আর শীতল রাজপথ, আমার চারপাশের শূণ্যতার রঙ কালো। সবকিছু চূপ। কৃষ্ণচূড়া চূপ, শিরীষ চূপ, আর গাছের অঙ্ককারে ঘষে ঘষে পেচকের কাঁক তাদের নখ এবং ঠোঁট শানিত করে রাখছে।

অঙ্ককারের ভেতরেও আমার ঘরখানাকে দেখতে পাচ্ছি। চোখ দিয়ে নয়। জাগ্রত চেতনা দিয়ে। ভাইনে হাত বাড়ালেই ভাঙা টেবিলটা হেঁব। একটু হাতড়ালে পাওয়া যাবে সেই ভ্রুয়ারটা ষার ভেতরে একটা কোটো রেখেছি।

আমি হাতের কাছে যন্ত্রের সবকিছু পেতে পারি। যদিও আমার দু'চোখের মধ্যে সমস্ত রাত্রির অঙ্ককার। আমি অহুভব করছি, পেছনে রয়েছে অনেকদিনের ব্যবহৃত ঘামে ধুলোয় ময়লা হেঁড়া জামা কাপড়ের জাক। দেয়ালের ফোকরে খালি দেশলাইরের বাস্ক, আধপোড়া সিগ্রেট, আধপোড়া মোম, কয়েকখানা আধহেঁড়া সাময়িকী, বেগুলোতে আমার লেখা গল্প ছাপা রয়েছে। সব আমি দেখতে পাচ্ছি। সেই গল্পগুলোর অক্ষর পর্যন্ত।

আমি এখন আধপোড়া মোমবাতিটা জালাবো। তারপর লিখতে বসবো।

লিখবো সেই বিদ্যুৎগতি আলোর উল্লাসের কথা, সেই চিরমুক্ত গতিবান পবিত্র শব্দের কথা। লিখবো, সেই শব্দ সেই আলো আমায় ডাক দিয়ে গেছে। আমি নিজে পারিনি।

কিষ্ণা আমি এখন ঘুমিয়ে পড়বো, ভুলে যাবো এই অন্ধকার প্রকাণ্ড গুহার কথা, এই নিঃশব্দ গাছপালা, ফুল এবং রাস্তার কথা। ভুলে যাবো এই কথা। ভুলে যাবো অদৃশ্য বাহুড় শেচক এবং ইছুরের কথা। সব ভুলে আমি ঘুমোব আবার জেগে উঠবার জন্তে। জেগে উঠে আবার আমায় ছুটতে হবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। অনেকদিন ভালো করে খাইনি। জেগে উঠে আমায় যন্ত্রণায় ছটফট করতে হবে। গীতির কথা মনে পড়বে। আমার মনে ঘৃণা হবে, নিজের ওপর, পৃথিবীর মাহুষের ওপর। নিজেকেই তখন অভিশাপ দেবো। এমনি দিনের পর দিন। তারপর ? তার চাইতে যদি অল্প কিছু হতো। যদি এর থেকে মুক্তির পথ বলে দিতো আমায় কেউ।

## চার

মাহমুদের গল্প এখানেই শেষ। একটু আগে আমি এবং আমার বন্ধু মাহমুদের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছি! লোকজন এসেছিলো কিছু। ওরা সবাই পুলিশে খবর দিতে গিয়েছে। আমি বসে বসে লাশ পাহারা দিচ্ছি। এই অবসরে টেবিলের ওপর রাখা পাণ্ডুলিপি পড়ে ফেললাম। নতুন ফর্মে লেখা মাহমুদের গল্প। আমারই সম্মুখে মাহমুদ ভাঙা তক্তাপোশের ওপর শুয়ে। কুঁকড়ে রয়েছে। বিষ খাওয়ার পর নিশ্চয়ই ওর কষ্ট হয়েছিলো। মনে হয় বেশ কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। অথচ কি আশ্চর্য, কেউ টের পায়নি।





আমার কিছু বলাব আছে

বলতে গেলে একটা উঁচু টুলের দবকার  
ভাল গলাব দরকাব  
আমাব উঁচু টুল নেই  
আমার ভাল গলা নেই  
টুল ধার চেয়েছি কেউ দেয়নি  
ভাঙা গলা ঠিক করার চেষ্টা করেছি পারিনি  
অথচ আমাকে বলতে হবে বলার আছে  
আমি বলব

আমি বলব বিরুদ্ধে সবার বিরুদ্ধে সব কিছুর বিরুদ্ধে গাছের পাতা গজানোর বিরুদ্ধে  
ঝরে পড়ার বিরুদ্ধে যৌবনের বিরুদ্ধে বার্ধক্যের বিরুদ্ধে সূর্যের বিরুদ্ধে অন্ধকারের  
বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে মরে যাওয়ার বিরুদ্ধে সাহিত্যের বিরুদ্ধে রাজনীতির  
বিরুদ্ধে কাপড়ের বিরুদ্ধে প্যাণ্টের বিরুদ্ধে চুলের বিরুদ্ধে টাকের বিরুদ্ধে সাদার বিরুদ্ধে  
কালোর বিরুদ্ধে মানুষের বিরুদ্ধে পশুর বিরুদ্ধে স্ত্রীজনের বিরুদ্ধে মাংসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের  
বিরুদ্ধে শাস্তির বিরুদ্ধে প্রেমের বিরুদ্ধে ঘণার বিরুদ্ধে পেন্সিলের বিরুদ্ধে কলমের  
বিরুদ্ধে পেরেকের বিরুদ্ধে জুর বিরুদ্ধে হাতের বিরুদ্ধে পায়ের বিরুদ্ধে সত্যের বিরুদ্ধে  
মিথ্যার বিরুদ্ধে ফুলের বিরুদ্ধে কাঁটার বিরুদ্ধে জলের বিরুদ্ধে মরুভূমির বিরুদ্ধে মা-র  
বিরুদ্ধে বাবার বিরুদ্ধে স্ত্রীর বিরুদ্ধে মেয়ের বিরুদ্ধে তোমার বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে  
সকলের বিরুদ্ধে

আমি বলব

আমার কিছু বলার আছে  
জানি আমার টুল নেই  
জানি আমার গলা নেই  
জানি বলতে গেলে আমার চার ফুট দেহ দেড়ফুট হয়ে যায়  
জানি আমার হাত হারিয়ে যায়  
জানি কাপড়ে আমার পা জড়িয়ে যায়  
জানি আমার চুল ঝরে যায়  
জানি আমার জিভ নাড়াতে পারি না  
জানি আমার দাঁত আলাগা হয়ে যায়  
তবু আমাকে বলতে হবে

আমি বলব

আমার কিছু বলার আছে

আর এই তার উপযুক্ত সময়

এখন রাস্তায় অনেক লোক

এদের মধ্যে বৃড়া আছে বৃড়ি আছে যুবক আছে যুবতী আছে কিশোর আছে  
কিশোরী আছে বালক আছে বালিকা আছে

কেউ নীল জামা পরে কেউ সাদা জামা কেউ হলদে জামা কেউ কাল জামা  
কেউ লাল জামা কেউ গোলাপী জামা কেউ ধূতি পরে কেউ প্যান্ট কেউ ফুলসার্ট  
কেউ হাফসার্ট কেউ পাঞ্জাবি কেউ ফতুয়া

কারো মাথায় চুল কারো টাক কারো দাড়ি আছে গোঁফ আছে কারো দাড়ি নেই  
গোঁফ নেই

কারো পায়ে জুতো কারো নেই কারো বুট কারো শ্যাঙল কারো চটি কারো  
পাম্পস্ কেউ হেঁটে যাচ্ছে কেউ দাঁড়িয়ে কেউ গাড়িতে উঠছে কেউ নেমে পড়ছে কেউ  
হাসছে কেউ চুপ করে আছে

এখন এই সময়

এই তার উপযুক্ত সময়

কেসে গলাটা পরিষ্কার করলাম

বন্ধুগণ

কেউ তাকাল না

বন্ধুগণ

কেউ তাকাল না

বন্ধুগণ

কেউ তাকাল না

বন্ধুগণ

কেউ তাকাল না

আমি বোধ হয় দেড় ফুট হস্নে গেছি আমার হাত হারিয়ে গেছে কাপড়ে আমার  
পা জড়িয়ে গেছে আমার চুল ঝরে গেছে জিভ আটকে গেছে দাঁত আলগা হলে  
গেছে

তাহলে

তাহলে কি করব এখন

অথচ আমাকে বলতে হবে

আমার কিছু বলার আছে

অবশ্য আমি লিখতে পারি লিখে সব বলতে পারি লিখে রাস্তায় পড়তে পারি

ছাপিয়ে বিলি করতে পারি

রাস্তার দেওয়ালে আঁটতে পারি

আমি লিখব

লিখেই সব বলব

আর আমার লেখার কোন অস্ববিধে নেই

আমার কাগজ আছে

আমার কলম আছে

আমার টেবিল আছে

ফেরার পথে একটা লোক ধাক্কা দিল

কিছু বললাম না

ফেরার পথে একটা লোক গায়ে পানের পিক ফেলল

কিছু বললাম না

ফেরার পথে একদল মেয়ে আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে গেল

কিছু বললাম না

ফেরার পথে কারা যেন মাথায় ময়লা ফেলল

কিছু বললাম না

আমি লিখব লিখেই সব বলব আর আমার লেখার কোন অস্ববিধে নেই

আমার কাগজ আছে আমার কলম আছে আমার টেবিল আছে

ফেরার পথে কিছু খেয়ে নিলাম

ভাতে কঁকর ছিল

কিছু বললাম না

ডাল পোড়া ছিল

কিছু বললাম না

মাছটা পচা ছিল

কিছু বললাম না

ভাতের দাম বেশী নিল

কিছু বললাম না

আমি লিখব লিখেই সব বলব আর আমার লেখার কোন অস্ববিধে নেই

আমার কাগজ আছে আমার কলম আছে আমার টেবিল আছে

ঘরে ফিরে দেখি জানলা খোলা

কিছু বললাম না

দেখি হুঁটের টুকরো

কিছু বললাম না

দেখি ভাঙা গেলাস

কিছু বললাম না

দেখি বিছানাটা ভেজা

কিছু বললাম না

আমি লিখব লিখেই সব বলব আর আমার লেখার কোন অস্ববিধে নেই

আমার কাগজ আছে আমার কলম আছে আমার টেবিল আছে

তবে এখন নয়

আর একটু পরে

আর একটু রাত হোক

মাহুষ ঘরে ফিরে থাক বিছানায় ফিরে থাক চারদিক শান্ত হোক রান্ধা কাঁকা হোক

আমি ততক্ষণ শুয়ে থাকি বিছানায় শুয়ে থাকি ভেজা বিছানায় শুয়ে থাকি শুয়ে  
ভাবতে থাকি বাইরে রাত্রি বাডুক ঘরে রাত্রি বাডুক

আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকি ততক্ষণ ভেজা বিছানায় শুয়ে থাকি ততক্ষণ  
শুয়ে ভাবতে থাকি

পাশে টেবিল পড়ে আছে

টেবিলে ড্রয়ার আছে

ড্রয়ারে কাগজ আছে

ড্রয়ারে কলম আছে

আমার এখন শুধু উঠে বসি উঠে লিখতে শুরু করা

তবে এখন নয় আর একটু পরে আর একটু রাত হোক

আমি শুয়ে রইলাম ভেজা বিছানায় শুয়ে রইলাম শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম

তারপর রাত্রি হল

চোখে ঘুম এলেও তাড়িয়ে দিলাম

মানুষ ফিরে গেছে ঘরে ফিরে গেছে চারদিক শান্ত হয়েছে রাস্তা ফাঁকা হয়েছে

আকাশে ফর্মা চাঁদ খমকে আছে ঘর ভরে গেছে আলোয় ভরে গেছে

আমি এবার উঠব

উঠে আলো জ্বালব

আমি লিখব লিখেই সব বলব

আমি বলব

আমার কিছু বলার আছে

আমি এতকাল পারিনি আজ পারব পারতে হবে

আমি উঠব এবার উঠব

উঠতে গিয়ে দেখি শরীরটা সোলা হয়ে গেল উঠতে গিয়ে দেখি বালিশ কাঁথা  
পিঠের তলা থেকে সরে গেল উঠতে গিয়ে দেখি তক্তপোশ ছুঁভাগ হয়ে গেল উঠতে  
গিয়ে দেখি টেবিল ছুঁভাগ হয়ে গেল

বালিশ কাঁথা পিঠের তলা থেকে সরে গিয়ে শূঁতে ভাসতে লাগল তক্তপোশ  
ছুঁভাগ হয়ে শূঁতে ভাসতে লাগল তার পায়ী খসে পড়ল শূঁতে ভাসতে লাগল টেবিল  
ছুঁভাগ হয়ে শূঁতে ভাসতে লাগল তার পায়ী খসে পড়ল শূঁতে ভাসতে লাগল ড্রয়ার খুলে  
পড়ল শূঁতে ভাসতে লাগল কাগজগুলো ড্রয়ার খুলে পড়ল শূঁতে ভাসতে লাগল  
কলম ড্রয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ল শূঁতে ভাসতে লাগল



ওদের ধরতে গিয়ে আমার ডান হাত খসে গেল  
ওদের ধরতে গিয়ে আমার বাঁ হাত খসে গেল  
উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আমার হুপা খসে গেল  
খাড় ঘোরাতে গিয়ে আমার মাথা খসে গেল  
সব আলাদা হয়ে গেল

সব শূন্যে উঠে গেল

সব ভাসতে লাগল

ঘরে চাঁদের ফর্সা আলো ছিল

সব ঘুবতে লাগল

ঘরে চাঁদের ফর্সা আলো ছিল

সব ঘরময় ঘুবতে লাগল

বালিশ কাঁথা ঘুবতে লাগল তক্তপোশ দুভাগ হয়ে ঘুরতে লাগল টেবিল দুভাগ  
হয়ে ঘুরতে লাগল তক্তপোশের চারটে পা চারদিকে ঘুরতে লাগল টেবিলের চারটে  
পা চারদিকে ঘুরতে লাগল ডয়্যার ঘুরতে লাগল কাগজ ঘুবতে লাগল কলম ঘুরতে  
লাগল আমার হুহাত হুদিকে ঘুরতে লাগল আমার হুপা হুদিকে ঘুবতে লাগল আমার  
মাথা ঘুরতে লাগল আমার ধড় ঘুরতে লাগল

ঘরে চাঁদের ফর্সা আলো ছিল

সব ঘরময় ভাসতে লাগল

সব ঘরময় ঘুবতে লাগল





বলার পরেও ওরা আরও কিছুক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বেরিয়ে দরজায় তাল দিল। নিচে নামামাত্রই আটদশটা বেয়ারা ওদের দিকে তাকিয়ে কিসব বলাবলি করতে লাগল। নিচু গলায়, উঁচু গলায়, কখনো ঝগড়ার ভঙ্গিতে। শুভ, মীরা ওদের ভাষা একবর্ণও বুঝতে পারল না।

ও কোণায় বসে ছোটো লোক ওদেব দিকে তাকিয়ে রুটি খাচ্ছিল। আব কোনো পদেব নেই। বৃষ্টি পড়ছিল সমানে। শুভ আর মীরা এপাশেব ছোটো চেয়ারে বসল। একটু পরে বেয়ারা এল। তাগড়া চেহারা। পরণে লুঙ্গি, গায়ে কালো কোট। মীরা ফিসফিস করে বলল—গুণ্ডা। শুভ জোরে বলল—কি আছে? বেয়াবা বুঝতে পারল না। শুভ তখন ইংরেজীতে মেহু চাইল। বেয়ারা ওপাশের কালো বোর্ডের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। চক দিয়ে মেহু লেখা। হাতের লেখা আর খাবারের নাম এমনই উদ্ভট যে অনেকগুলো বোকাই গেল না। শুভ তিন আর এগারো নম্বর অর্ডার দিল।

প্রথমে জল। তারপর এল প্লেটভর্তি কাঁচা পেঁয়াজ আর চাটনি। বেশ কিছুক্ষণ পরে ডিমের কারি আর ভাত। ভাত ঠাণ্ডা ডিমের কাবি গবম।

দুখানা হাত ছোটো প্লেটে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে দিল।

—কিছুইতো খাচ্ছ না

—তুমিওতো না

—ভালু লাগছে না

—আমারও না

—চল ওঠা যাক

—চল

কলে জল নেই। একটা ছোট ছেলে মগে করে জল নিয়ে এল। তোবড়ানো মগ। তলাটা যাচ্ছেতাই কালো। কোনরকমে মুখ ধুয়ে মীরা আস্তে বলল—স্বপুন্নী। শুভ জোরে বলল—স্বপুন্নী। বেয়ারা বুঝতে পারল না। শুভ আর বোকাবার চেষ্টা করল না। বিল মিটিয়ে ওপরে উঠে এল। নিচে আবার, নিচু-উঁচু গলায়, ঝগড়ার ভঙ্গিতে কথা শুরু হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে খিল দিতে দিতে শুভ বলল,

—এই রে।

—কি?

—খিল ভাঙা

—তাহলে !

—সবটা না, একটুখানি ভাঙা

—জোরে ধাক্কা মারলে—

—মারবে কেন ?

মীরা ঘড়ি খুলে টেবিলে রাখল। তারপর ড্রয়ারে। ড্রয়ার বন্ধ করতে গিয়েও করল না। স্ম্যটকেস খুলল। স্ম্যটকেসের পকেটে নিজের আর শুভর ঘড়ি রাখল। টেবিলের পরে সাজিয়ে রাখল শাড়ি, পাজামা, চাদর, টুথপেস্ট, ব্রাস্ আর ফেসক্রিম।

শুভ প্যাণ্ট খুলে পাজামা পরল। মীরা শাড়ি পার্টাল। শুভ জামা খুলল। জামার তলায় সোয়েটার ! সোয়েটার খুলতে গিয়েও খুলল না। মীরা দেয়ালেব দিকে ঘুরে ব্লাউজ খুলল। শুভ দুহাতের তালু ঘসতে ঘসতে উ-উ-উ-উ করে নীত তাড়াবার আওয়াজ করল।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। ‘কে ?’ শব্দ আরো বেড়ে গেল। ‘কে—  
—এ—এ ?’ কোনো উত্তর এল না। মীরা ততক্ষণ চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। শুভ দরজা খুলল। সেই কালো কোটপরা বেয়ারাটা। দুহাতে দুটো বিছানার চাদর। চাদর পেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুভ আবার খিল দিল।

—অসভ্য

—কে ?

—কে আবার ! লোকটা

—কেন ?

—কেমন করে তাকাচ্ছিল যেন

• শুভ কি যেন উত্তর দিতে গিয়ে দিল না। তারপর বলল,

—বাথরুম যাবে ?

—না

—জল খাবে ?

—না

—আলো নেভাব ?

—না

—তাহলে শুয়ে পড়, ভোরে উঠতে হবে

মীরা বিছানায় চাদরের পরে আরো দুটো চাদর পাতল। বালিশ দুটো একটু চাপ দিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল। পায়ের কাছে দুটো গায়ের চাদর রাখল।

—তুমি কোথায় শোবে ?

—আমি ?

পায়ের গোছায় ইলাষ্টিকের মোজার দাগ পড়েছে । সেই দাগে হাত বুলোতে বুলোতে শুভ আবার বলল—আমি ?

এমনসময় দরজায় টোকা পড়ল । ‘কে ?’ শব্দ বেড়ে গেল । ‘কে—এ—এ ?’ উত্তর এল না । শুভ ইতস্তত করে দরজা খুলল । সেই কালো কোটপবা লোকটা । হাতে কাচের জাগ্‌ভর্তি জল আর দুটো গ্লাস । টেবিলে রাখল । বেগে চলে গেল । শুভ আবার দরজায় খিল দিল ।

—ওজুহাত

—কিসের ?

—জল দেবার

—বাঃ, জল দেবেনা ?

—আমাদেরতো ওয়াটারবুটল আছে

—জল আছে কিনা কি করে জানবে ?

—জানে

—কি করে ?

—জানে...বদমাইসী...

শুভ উত্তর দিল না । হাসল । হাসতে হাসতে হাই তুলল । তারপর শুয়ে পড়ল । মীবা কিছুক্ষণ একইভাবে বসে থাকল । উঠে গিয়ে ঠোঁটে গালে ক্রিম ঘসল । খুঁকে পড়ে দরজার খিল পরীক্ষা করল । তারপর শুয়ে পড়ল ।

—বাসটা পেলো এতক্ষণ পৌঁছে যেতাম

—ভালই হয়েছে একদিক থেকে

—কেন ?

—এই ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের মাথায়

—হোলোইবা, নিশ্চিন্ত হওয়া যেত

—কিসের থেকে ?

—কিসের থেকে আবার । একটা ভাল হোটেল অস্বস্ত

—এটা কি খারাপ ?

—খারাপ না । ভালোয় ভালোয় রাত্তিরটা

—তুমি খুব ভয় পেয়েছ ?

—মোটাই না

—মোটাই হ্যাঁ

মীরা হাসল। হাসতে হাসতে ঢেকুর তুলল। আঙুল দিয়ে চোখের কোণা চুলকে গায়ের চাদর গলা অবধি টেনে তুলল। শুভ হাসল। ধাক্কায় তক্তাপোষ ক্যাচক্যাচ করে উঠল। সিগারেটের ছাই ভেঙে পড়ল বিছানার পরে।

এমনসময় আবার দরজায় টোকা পড়ল। ‘কে?’ শব্দ বেড়ে গেল। ‘কে—  
—এ—এ?’ উত্তর এল না। শুভ ইতস্তত করে দরজা খুলল।

সেই কালো কোটপরা লোকটা। চৌকাঠে পা রেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে জিগ্যেস করল—‘বেড়টি কটায়?’ শুভ পেছনে ফিরে বলল—‘কটায় বলব?’ মীরা উঠে বসেছে। ‘দরকার নেই।’ শোনা কথাটা ইংরেজীতে অনুবাদ করল শুভ। লোকটা বুঝতে পারল না। দরজায় ভর দিয়ে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। শুভ তখন বলল—‘আটটায়, না না ঠিক সাতটায়।’

লোকটা চলে যেতেই মীরা বলল, ‘ওকে বলে দাও রাতে যেন আর না আসে।’ শুভ বাইরে উঁকি মারল। নেই। লোকটা চলে গেছে।

শুভ গম্ভীর হয়ে মীরার দিকে তাকাল। দরজায় খিল দিল। কেসে গলা সাফ করল। একবার শিশ দিল। তিনহাত জায়গার মধ্যে পায়চারি করল। তাবপব দরজার দিকে একবার তাকিয়ে শুয়ে পড়ল। মীরা কাত হয়ে শুয়ে বিহুনিটা ঠেনে দিল মাথার দিকে।

মাথার ওপরের ছোট্ট জানলা দিয়ে একঝলক হাওয়া ঢুকল। ঠাণ্ডা হাওয়া। দেওয়ালে ঝুলে থাকা শুকনো চূনের দলা, মাকড়শার জাল, লালচে বালবের ঝুল, আয়নার ধুলো, মেঝের বালি, শুভ আর মীরার মুখের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। দেয়ালের ড্যান্‌স্‌ কেমন যেন শুকিয়ে এসেছে। ঘরের আলো আর একটু উজ্জ্বল। শুভ সিগারেট ধরাল। লম্বা একটা টান মেরেই সিগারেটটা মেঝেয় চেপে নিভিয়ে ফেলল। হাতটা তুলল না কিন্তু তফুনি। হাতটা হুলতে লাগল ছটো তক্তাপোষব মধ্যের একহাত জায়গায়। হুলতে হুলতে এক সময় উঠে এসে মীরার তক্তাপোষব কোণা ধরল। কোণা ছেড়ে মীরার হাত। মীরা চাদরটা বুক থেকে গলায় টেনে তুলল।

—ঘুম পাচ্ছে না?

—পাবেনা! ভীষণ

—আমারও

কেউ চোখ বুজল না। পাশ ফিরল না। বিরাট হাই তুলে চোখের কোণের জ্বল মুছল না। শুভর আঙুলগুলো খুব ফর্সা। আরও ফর্সা পাথরের একটা আংটি আঙুলে। চারপাশের লোমগুলো খুব বড় বড়। মীরা লোমগুলো আস্তে আস্তে টানতে লাগল।

ঠিক এমনসময় ঘরের আলো নিভে গেল। ‘কি হল?’ ‘আলো নিভল কেন?’ সামান্য আগেপিছে দুজনেই উঠে বসল। শব্দ হল দুটো তক্তাপোষেই। ঘবের মধ্যে গাচ অন্ধকার। মাথার ওপরের ছোট জানালাটা ফ্যাকাশে। একটা উজ্জ্বল আলোব ফালি আসছিল জানালা দিয়ে তাও নেই।

শুভ দেশলাই জ্বালল। এই আলোয় মীরা জড়মড় হয়ে বসে। এই আলোয় দেয়ালের ড্যাম্প, মাকড়শার জাল, বুল, আয়নার ধুলো অনেক বেড়ে গেছে। আগুনটা আঙুল ছুঁতেই শুভ কাঠিটা মেঝেয় ফেলে দিল। ঘরের অন্ধকার আঁবা বেড়ে গেল।

শুভ সিগারেট ধরাল। মীরা একভাবে বসে। মীরার চোখ দুটো বড়। আঁবা বড় লাগছে। চোখের মণিটা কালো। আরো কালো লাগছে। ঠোঁটের পবে কুচিকুচি ভাঁজ পড়েছে অনেকগুলো। কি যেন বলতে যাবে এমন সময় বাবান্দায় অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। সেই ভাষা। এক বর্ণ বোঝার উপায় নেই। এলোমেলো পা-ফেলা আর গলার স্বর আস্তে আস্তে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

শুভ উঠে দাঁড়াল। মীরাও। শুভর গা ঘেঁষে। জুতোর আওয়াজ জড়ানো শব্দগুলো দরজার সামনে এসে থেমে গেল। মীরা শুভর হাত খামচে ধরল জোরে। সিগারেটের আগুনে আঙুলে ছাঁকা লাগল শুভর।

সামনের ঘরের তালা খোলার শব্দ হল। এলোমেলো পায়ের শব্দ ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল। কি যেন ঝনঝন করে মেঝেয় পড়ল। কয়েকটা তক্তাপোষ ক্যাচ ক্যাচ করে উঠল। আর কোন শব্দ শোনা গেল না। আরো কিছুক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর শুভ মীরার কাঁধে আলতো করে চাপ দিল। মীরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল। হাতদুটো ভীষণ ঠাণ্ডা। গলার কাছে বিহুনিটা দলা পাকিয়ে ছিল। সমান করে পেছনে ঠেলে দিল শুভ। ‘ঘুমোও।’ মীরা শুয়ে পড়ল। শুভও।

অন্ধকার এখন আবছা। মীরার একটা হাত মাথার পেছনে। একটা না দুটো হাত ঠিক বুঝতে পারল না শুভ। না বুঝতে পেরে গলার চাদর খুঁতনি পর্যন্ত টেনে

তুলল হাই তুলল। তারপর চোখ বন্ধ করল। গলার কাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। কপালের দুপাশের শিরাটা দপদপ করছে সমানে। আর শরীরটা কেমন দুসছে। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে যেমন হয়। আড়াইদিনের ট্রেন জার্নি। তারপর কাল সকালে আবার ঘণ্টাখানেক বাসে যেতে হবে। কয়েকবছর বাদে আবার পাহাড়ে ওঠা। এ পাহাড়ে আবার লেক আছে। লেকে বোট। পাশে পাইন গাছের সারি। দূবে বরফের পাহাড়। ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ছবিটা চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সেবাব বন্ধুবা ছিল। এবার সঙ্গে মীরা। মীরা কখনো পাহাড়ে ওঠেনি। নাকি ছোটবেলায়...কি যেন বলছিল সেদিন।

—মীরা

—ঘুমোও নি ?

—আচ্ছা তুমি কখনো পাহাড়ে উঠেছ ?

—কটা বাজে এখন ?

—কখনো সমুদ্র দেখেছ ?

—ভাল লাগে না ছাই। কখন ভোর হবে !

—ইচ্ছে করে পাহাড়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিই

—কি হোটেলরে বাবা...বুকের মধ্যেটা এখনো

—ইচ্ছে করে

—ঘুমোওতো

ছুটো তক্তাপোষেই ক্যাচক্যাচ করে শব্দ উঠল আবার। ঠাণ্ডা হাওয়া ঘুবতে লাগল ঘরের মধ্যে। অন্ধকার ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। মীরা দেয়ালের দিকে তাকাল। যেখানে ড্যান্স্ সেখানে অন্ধকার বেশী। চুনের দলা জমে থাকা জায়গাগুলি সামান্য পরিষ্কার। শুভ শুয়ে আছে চিং হয়ে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর ঢাকা। চাদরের টেউগুলো হাওয়া আর নিখাসের ধাক্কায় দুসছে অল্প অল্প। শুভ এমনিতেই লম্বা। আরও লম্বা লাগছে চাদর মুড়ি দেওয়ার জন্তে। ছুটো হাত চাদর টেনে মাথার পেছনে জড় হয়ে আছে। ছুটো হাত না একটা হাত ! বুঝতে না পেরে মীরা চোখ বুজল।

ঠিক তক্তুনি নিচে কারা উঁচু গলায় কথা বলতে শুরু করল। উঁচু থেকে আরও উঁচু। ঝগড়ার মত। কিচ্ছু বোবার উপায় নেই। সেই বিচিত্র ভাষা। ভারী কি একটা আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কাপ না প্লেট ভেঙে গেল খান খান হয়ে। কে যেন দৌড়ে দৌতলায় উঠে এসে আবার নেমে গেল।







অমনি যে অলকার ফুলে রাজকণ্ঠা চূলে মালা সাজায়—তার ম ম করা গন্ধে ; যে  
অজানা স্বরে তিনি বীণা বাজান—তার আকুল স্বরে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম ।  
আমার মুগ্ধ দুই চোখের সামনে চন্দ্রালোকে, কতকালের কে জানে, পুরোনো জং-ধরা  
তালা খুলে গেল, ফুলের নিঃখাস লাগল বৃকে ।

ঠাস করে আত্মা আমার গালে চড় দিলেন ।

ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললেন, কাণ্ড দেখ, ডর লাগে অমুক লাগে, সমুক লাগে—এখন  
বীদরামি করে জানালা খুলে আকাশের তারা দেখছে ।

বড় আশা কবে জননী, জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম ।

## । তুই ।

হাত থেকে ট্রে পড়ে গেলে চায়ের কাপ ডিসগুলো যেমন একই সঙ্গে ভাঙে এবং  
চামচগুলো শুধু ভদ্রতা করে সর্বনাশের সাইরেন শোনায়, তেমনি পাশ করার পর  
আমার অস্তিত্ব আর অহঙ্কারের একই দশা হল । অস্তিত্বটা চায়ের কাপ, না চামচ  
বৃথতে পারিনি । আশৈশব যত্নে লালিত অভিমানে সিক্ত আমার অহঙ্কারের টুকরো-  
গুলো আমি আর খুঁজে পেলাম না । আমি ধীরে আশ্রয়হীন রাস্তার কুকুরের মত  
হয়ে গেলাম । তখন আমি শহরের সরকারী-বেসরকারী সওদাগরী অফিসে আত্ম-  
বিক্রয়ের নোটশ খুঁজেছি—দারুণ রোদে, দারুণ শীতে, নিদারুণ বসন্তে ও বর্ষায় ।  
এখন আমার মনে হয়েছে, আমি কুকুর হয়ে গেছি । নিজেই নোংরা গন্ধে আমি  
পাগল হয়ে যেতাম । আমার দগদগে ঘাগুলো, লোমহীন খসখসে দেহ আমাকে তাড়া  
করেছে । ইন্টারভিউতে আমি গলগল করে ঘামতাম, স্বরযন্ত্রের সাহায্যে কত কণ্ঠে  
নির্ধারিত ধ্বনি তুলতাম, প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে (কোন্ রেড দিয়ে আপনি শেভ  
করেন,—এ প্রশ্নটি, এই একটি মাত্র প্রশ্ন করার সাহস আমার কোনোদিনই হল না )  
এমন একটি দীন ভঙ্গি করে তাকাতাম, যার অর্থ হল, হুজুর, আপনার ক্রীচরণ পাতুকা-  
সহ আমার মস্তকে স্থাপন করুন, আমি পুলকিত চিত্তে পদলেহন করি, ধন্য হই,  
প্রসন্নচিত্তে কেঁউ কেঁউ করি ।

অথচ তিন বছর আমার কোনো চাকরি হল না । এক মন্ত্রী ছিলেন আমার  
পরলোকগত জনকের বন্ধু । তিনি চেঁচাটেঁচা না করেই বড় বড় আশ্বাস দিতেন,  
আমি সেই আশ্বাসের উপর স্বপ্ন দেখতাম । সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন । সেই স্বপ্নকে কথায়  
ধরে রাখলে কবিতার সুন্দর পংক্তি হতে পারে । কিন্তু আমি ধরে রাখিনি । প্রতিটি

স্বপ্নের মৃত্যু আমাকে বাস্তবতা নামক সত্যের দিকে ঠেলে দিল, আমি খুব কাঁদলাম অঝোরে, স্বপ্ন হননে কাঁদলাম। তাঁর স্ত্রী, অত্যন্ত রোগা এবং শীর্ণ, কৃতজ্ঞ থাক আসাদ, তুমি তাঁকে চাচী-আম্মা বলাব স্মরণ পেয়েছিলে, একদিন চিঁচিঁ কবে বললেন, 'এই কাপড়-চোপড়ে এলে তোমাব চাচার মান থাকে?' চাচার মান রাখাব জ্ঞে নয়, কোনো আশা নেই ভেবে আমি আর ও বাসায় যাইনি। অপমানিত না হয়ে, কোনো বিকেলে ভেবেছি, ওদেব বাসায় ভালো রেগের চা খাওয়া হচ্ছে এখন।

সারমেয় বিজনে হাড় পেলে যে বিজয়ী ভক্তি করে, মতিবিলের পঞ্চাশ টাকার ট্যুইশানিতে সে ভক্তি করাব সাহস আমার কোনোদিন হয়নি। তিন তিনটি বছরে আমার গাধা ছাত্রটি তিন ধাপ উঠেছে, কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন এসেছে, সম্মতি তার মান অপমান বোধও এসেছে, সঙ্গে এসেছে নাকের নিচে গৌফাভাস।

গাধাটার কথা যাক।

এই দুঃসময়ে রকীবের বাসায় গিয়েছিলাম। ওর ছেলের জন্মদিন ছিল সেদিন। একটা চাকরীর আবেদনপত্র টাইপ করার পয়সাও ছিল না আমার। কোনো সামাজিক অহুষ্ঠানে, লৌকিকতার জালে, আমি এতদিন নিজেকে জড়াইনি।

## । তিন ।

—দোস্ত হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তখন শালাব সব দোকান-পাট বন্ধ।

হ্যাঁ, এই সংলাপটিই বিভিন্ন ধনি-তরঙ্গে আবৃত্তি কবে করে হেঁটে গিয়েছিলাম কাওয়ারান বাজার।

—তাতে কি? তাতে কি হয়েছে? (চোয়ালে ঘুসি মেরে আদর করছ কেন আএশা রকীব?)

বন্ধুটি দেখে ও অভ্যর্থনায় এসেছিল।

(আমি এক সময় ভালো অভিনয় করতাম। দিলীপকুমার হবার ইচ্ছা ছিল। কলেজে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলাম। ছোটবেলায় যাত্রার অভিনয় দেখে চিত্ত ডাক্তার বলেছিল সোনার মেডেল দেবে। হঠাৎ মেডেল টেডেল না দিয়ে বউ-কিটি নিয়ে ইণ্ডিয়া পালিয়ে গেছে। শালা!)

—বুঝলে আএশা আমি সত্যি ভীষণ দুঃখিত। এখন মনে হল, ইট ইজ টু লেট, স্কুটারে গোটা ঢাকা খুঁজেও কোনো দোকান খোলা পেলাম না।

ওরা হাঁ করে শুনছে।

—বারবার ওকথা বলছিস ক্যান ?

আএশা, রকীবের কানে কানে কি যেন বলছেন। (আমি সব কথা বুঝতে পারি। আমার অভাব ও হীনমন্ত্রতা আমাকে অতি আত্মসচেতন করে তুলেছে। ওরা যা বলেছেন, যদিও আমি শুনিনি, তবু ওঁরা এসব কথাই বলছিলেন—

আহা, বলুক না। তিন বছর পাশ কবে বেকার। প্লিজ কড়া কিছু বোলটোল না।

পাগল হয়েছ। মনে নেই, হাসপাতালে থোকাকে দেখতে টয় নিয়ে গেছল।)

আএশার বোন শাড়ি পরেছে বিস্কুট রঙের, মারাত্মক, সে বোন, দুলাভাই ও আমাকে,—আমাকে একটু বিশেষভাবে দেখছে। আমি যে চেয়ারে বসেছি, সেখানে আলো কম, ওর মুখে (ও বুকে) পর্যাপ্ত আলো। আমাকে নিরাপদে কুকুব বিবেচনা করে বলল, আপনি এ্যাতো দেবী করে এলেন। ভাবলাম, বুঝি আসবেনই না। আপনি না এলে এসব ফ্যাশিটবল এতো ড্রাই লাগে।

আমি ওর বুকের দিকে তাকাতেই হেসে কাপড়টা সামলে নেয়। আমি কোনো কথা না পেয়ে বললাম, তুমি তো এবার অনার্স ফাইনাল দিচ্ছ, না ?

—সেকি, জানো না, মেরী তো এবার অনার্সে ফার্স্ট কেলাস পেয়েছে। রকীব বললে, একটা তৃপ্তি তৃপ্তি মুখে। আমি খুশি হয়ে আত্মহারা হয়ে বলে ফেললাম, ঠিক হায়, এবার খাওয়াও।

বলেই চুপসে গেলাম। আমার কাপড়-চোপড়ের কথা, বুকের কাঙালপনার কথা মনে পড়তেই চুপসে গেলাম। স্বামী-স্ত্রীতে ফিসফিস। এখন, ওদের গোপন কথাটি দশজনকে বলব না।

চোখের সুন্দর একটা কাজ করে মেরী বলল, বেশ ত, কী খাবেন বলুন না ?

তোমাকে। না, বলিনি, শুধু গানের মত মনে মনে গেয়েছি। বললাম, উর্দু একসেস্টে, রসিকতার করুণ চেষ্টা : এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি।

মেরী হাসি গোপন করার চেষ্টা করেনি। আএশা হাসতে হাসতে বলল, ফ্রীজ থেকে বোতলটাই নিয়ে আদিস মেরী।

মেরী ফেরে এক গ্লাস পানি নিয়ে, টেবিলে আমার হাতের নাগালে রাখল। আমি নিজের আঙুলগুলোর দিকে চোরের মত তাকালাম।

—কই, কি খাবেন, বললেন না তো আসাদ ভাই। বড় বড় চোখ ছুটোতে তুমি প্রত্নবোধক চিহ্ন মাখাও কী করে।

—কোথায় তুমি ফার্স্ট কেলাস পেয়েছ, আমরা খাওয়াব, না তোমার কাছে থেকে খাব ?

নিজের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে গেছে। আন্তরিকতা এসেছে চাঁদ ? কেন ? সত্যি বলছি, আমি জানিনে।

মেরী কি বুঝে জানিনে, কিন্তু চূপ করে রইল। মেরী, তুমি যদি তোমার বোনব মত অল্পকম্পা করো, আমি বাঁচবো না। আএশা সময় জানতে চাইল, আমার হাতের দিকে তাকিয়ে আছ কেন আএশা, জানো না অভাবের সময় বিক্রী করেছি। সময় আমার কাছে সামগ্রী নয়, আএশা, যে হিসেব রাখব। সময় এবং যৌবন শীতের পাতাব মত, বিদেশী সিনেমা দেখে কথাটা শিখলাম, বারে গেলে কেউ কাঁদবে না।

মেরী বলল, এগাবোটা দশ।

মেরী তুমি নখ খাচ্ছ কেন ? নখ খেয়ো না, ওতে পেটের অস্থখ হয়, আবে জানি কি কি হয়, ভুলে গেছি, কিন্তু প্রশ্নটা আমি করিনি।

—রকীব তুমি গপপো ( কেন গল্প নয়, আএশা, আমি আসাদ চৌধুরী জানতে চাই, কেন গল্প নয়, তুমি আমার সতীর্থ ও বন্ধু-স্বী, তুমি দর্শনের প্রফেসার, তুমি কি জানো না, গপপো একটি সময়ের অপচয়ের অর্থ বহন করে, এবং অপমানজনক ) কর এদের সঙ্গে ( আমাদের সঙ্গে বলতে তোমার জিভে বাধল কেন—কি হয়েছে আমার, নিজের দীনতায় কেউ যদি হত্যা করে তাতে আমি আগের মত চাট না, কিন্তু মেরীর উপস্থিতি কি আমার ব্যক্তিত্বে রূপান্তর এনেছে ? )

ধকলটায় অর্ধেকের মালিক আমি। বোসই না একটু।

আএশা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমিও হাসলাম। সত্যি হাসলাম। শব্দ করে নয়, হৃদয় ই উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটের যে অবস্থা হয়, সে রকম। কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। এটা যে হাসি নয়, আধুনিক পৃথিবীর সবাই স্বীকার করবেন, আমার জীবনে এরকম মিথ্যে হাসি কম ছড়াইনি, জীবনকে এই হাসি দিয়েই তো সাজিয়েছি। আসাদ, তুমি দর্শন ফলাচ্ছ কেন ? না, না—কাব্য নয়, শিল্পও নয়—সরল সত্য ভীষণ। আমি রাগ করেছিলাম, রাগ প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম, আন্তরিকতাহীন সভ্যতা, না সভ্যতা নয়—সংস্কৃতি—আমাকে দিয়ে ঠোঁটের ব্যায়াম করিয়ে নিল, আমি লজ্জিত, এই ব্যায়ামেরও অর্থ আছে, এই শ্রম আপোদের প্রতীক, যা আমি ঘৃণা করি।

আমি যখন এসব ভাবছি, রকীব মোজা খুলছে, আএশা লাইটারটা জ্বালাচ্ছে

আর নেভাচ্ছে, মেরী প্রেক্ষেণ্টেশানগুলো দেখছে একটু ঝুঁকে, এই ভঙ্গিটি, হুন্দর ভঙ্গিটির পশ্চাতে যথেষ্ট সাধনার কথাটা মনে পড়ে গেল কেন এই মুহূর্তে, ঝি, কার যেন মা, হুঁনহুঁন করে টেবিলের ওপর থেকে জ্বিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। একবার লাইটারটা জ্বলতে সময় নিল, যখন জ্বলল, চমকে আমার দিকে তাকাল আএশা। আমিও। আমরা হাসলাম। সেই কোন শৈশবে কী যেন কী খেলতে গিয়ে শত্রু-মিত্রহীন সরল খেলার সরল হাসি, যা আমি আর দেখি না, আএশাকে আমার ভাল লাগল। রকীব চটেছে, কী খুট খুট করছ। রকীব লাইটার হাতে নেয়। এমন সময়.

### । চার ।

এমন সময় আমার বন্ধু এলেন। তার কোনো শরীব নেই, ভাষা নেই, সময় ও স্থান নেই, তার জগ্গে মানব ভাষায় অগ্গাবধি কোনো স্তোত্র রচিত হয় নি। সংস্কৃত, আরবী, হিব্রু ভাষায় তার বর্ণনা তোমরা পাবে না। আমি তার বর্ণনা দেব না। আমি অক্ষম কথক। আমিই শুধু তাকে অল্প ভব করলাম। এবং মুহূর্তের অভিজ্ঞতার বর্ণনা মানব ভাষায় বোধ হয় সম্ভব নয়। তিনি এলেন সেই ঘরে, যে ঘরে আমরা বসেছিলাম। লাল নীল কাগজে মনোরম সাজানো ঘর। প্রত্যাশিত মেহমানদের চলে যাবার পর সেই ঘরে যেখানে দামী টেলিভিশান রয়েছে, মনোরম স্থানের কমনীয়তা ও লালিত্যবর্ধক অতিকায় রেডিওগ্রাম ইত্যাদি।

তিনি এসে চলে গেলেন, কেউ দেখল না।

রকীবের হাতে লাইটার যেভাবে ছিল, সেভাবেই আছে। মেরীর চোখ যেন গেথে আছে জাপানী ডলের ওপর, সেই স্বর্গীয় হাসি চোখে, চোটে, ছবিব মত লেস্টে আছে আএশার। গেলাসের ঝুটা পানি ঢালছিল ঝি, পানি ঝরছেই, না, কেও তাকে দেখেনি। সেই বন্ধু আমার হাতে, চেয়ারের পেছনে রেখে গেল প্যান্থুলেটার, যার লোভনীয় বিজ্ঞাপন সম্প্রতি কাগজে বেরিয়েছে। আএশা নিশ্চয়ই দেখেছেন, লোভী রোজগরে মাগীর চোখ ছুটো পাওয়ার আশায় চকচকে হয়ে উঠেছিল, পরে অক্ষমতার এক ফুঁয়ে নিভেও গেছে নিশ্চয়ই। এদের বড় হবার ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা কোনো দিনই সম্ভব হবে না। অথচ কত ত্যাগ স্বীকার করে অভিজাত ঠাট রাখার প্রয়াস সে তো আমি জানি।

আমার হিংসুক মধ্যবিত্ত মন এদের আঘাত দেবার জন্তু পাগলা হয়ে গেল।







—কি দিতে পারো ? সেতারা পালটা প্রশ্ন করে ।

বুলাম সে আমার কাছ থেকেই শুনতে চায় । জ্বীলোকের স্বভাবই কি এঁ ?  
বিদ্যুৎচমকের মতো এ প্রশ্নটাও সহসা মনে জাগে ।

—কি না দিতে পারি ! জেওর, কাপড়...

শেষ করতে দেয় না সেতারা আমাকে । বলে : ও তো সকলেই দেয় ।

—সিক্কের শাড়ি, হীরের আংটি...

—মামুলী জিনিস । সেতারা আবার বাধা দেয় ।

—গাড়ী, বাড়ী—

—দুস্তর যত সব । এবার সে ছোট করে ধমক দেয় ।

—রেডিও, টেলিভিসন, টেলিফোন—

—ওগুলো যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকে ।

পাশাপাশি চলছিলাম, হঠাৎ করে সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায় সেতারা । আব  
কি প্রস্তাব করতে পারি । মাথা চুলকাই । হঠাৎ মনে পড়ে আসল কথাটাই  
এখনও বলা হয় নি । বুকে সিংহের সাহস নিয়ে বলি : দেনমোহর—আরো দেব  
দেনমোহর ।

—কত টাকার ? এবার বাধা দেয় না সে । বরং সমুখ থেকে আবার পাশে  
আসে এবং আমার হাতের তালুতে তার হাতের তালু লাগায় ।

আমরা আবার চলতে থাকি । আশা হয় তার আসল দাবি বুঝি বা বুঝেছি ।  
বলি : এক লাখ, দু লাখ—যত চাও, তোমার জন্ত কোন অঙ্কেই আমি অরাজি নই ।

—খেং, তুমিও দেখছি সব পুরুষের মতোই বোকা । তুমি বীর, তুমি সংগ্রামী,  
তুমি বিপ্লবী, তুমি মোজাহেদ । তোমার মুখে এসব মামুলী প্রস্তাব শুনবো কে  
ভেবেছিল ! দেনমোহর তো সকলেই দেয় । যাও—

সেতারা হাত ছাড়িয়ে নেয় । হতাশ হয়ে পড়ি । ছুরু ছুরু বুকে বলি : তবে  
তুমিই বলো কি চাও ! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই । বল সেতারা, বলো  
কি চাও তুমি ?

—শোন তবে । তোমার কাছ থেকে এমন জিনিস চাই কেয়ামত পর্যন্ত যার  
ধ্বংস নেই, পুরুষ পরম্পরায় যার ক্ষয় নেই !

—সে কি সেতারা ?

—এমন অধিকার যার মধ্যে কোন শরিক নেই ।

—সে কি সেতারা ?

—এমন অবস্থা যার মধ্যে কোন গৌজামিল নেই।

—সে কি সেতারা ?

—এমন প্রশান্তি যার মধ্যে কোন রব নেই।

—সে কি সেতারা ?

—এমন আধিপত্য যার মধ্যে অগ্র কারো দাবি নেই, কলরব নেই। দেবে এসব ?

—দেবো, যা চাও তাই দেবো। কিন্তু সে কি জিনিস যার এতো গুণ ?

—ডানে-বীয়ে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ না মাঠে কত আগাছা, আন্তাকুঁড়, কত কোলাহল, কত কলরব ?

—হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি সেতাবা।

—এ গুলো সাফ করো, তবেই আমাকে পাবে।

—কেমন কবে সাফ করবো ? ভড়কে গিয়ে বলি।

—কেন, সড়ক বানাও—খুব লম্বা আর চওড়া সড়ক।

—সড়ক ?

—হ্যাঁ, সড়ক, আর কিছু নয়।

—সড়ক দিয়ে আমরা কি করবো সেতারা ? সড়ক ত অস্থাবর মাল নয়, কি কাজে লাগবে তা আমাদের ? আমি প্রশ্ন করি।

—অস্থাবর নয় বলেই ত সড়ক চাইছি।

—কিন্তু সড়ক দিয়ে কি করবো আমরা তা ত' বললে না। আমার কঠোর স্বমিয়ত দেখে আমিই বিস্মিত হই।

—তুমি একটা আস্ত গাধা আসাদ। দিনের আলোয় এবং রাত্রির গভীরে তুমি আমি—শুধু তুমি আর আমি বেড়াবো।

—কিন্তু...। আমি তবু ইতস্তত করি।

—কিন্তু ? ফের কিন্তু কেন ? সেতারা গরম হয়ে ওঠে।

—অত লম্বা-চওড়া সড়ক তৈরী করলে বহু জঞ্জালের সাথে যে বহু কুঁড়েও সাফ হয়ে যাবে।

—তাতে হয়েছে কি। রাণীর এক মুহূর্তের আনন্দের জগ্রে কত কুঁড়ে জলে পুড়ে থাক হয়ে যায় জানো না কি ?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেছিলাম। বললাম : জানি, কিন্তু কুঁড়ের বাসিন্দারা কোথায় যাবে ?

—কোথায় কে যাবে সে-ভাবনায় তোমার কি কাজ ? এ-ভাবনা যিনি ওদের তৈরী করেছেন তাঁর । চিরকাল তারা স্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়েছে, বঙ্গাঙ্কুর সাগর-বুকের সাম্পানের মতো । বিতাড়িত হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু নতুন স্থান খুঁজে বসতি বানিয়েছে । আসলে তুমি ভয় পাও । তাই না ?

সেতারা আচমকা একটা ঘুরপাক খেয়ে পথ আগলে দাঁড়ায় এবং খিল খিল করে হেসে ওঠে । তার কটি ঘূর্ণনের ক্ষিপ্রতা, বুকের দোলা এবং দাঁতের ঔজ্জ্বল্য আমাকে পাগল করে তোলে । ভীকৃতার অপবাদ শুনে পৌরুষেও আঘাত লাগে ।

কণ্ঠ চড়িয়ে বলি : তুমি আমাকে ভীকৃ বলে সন্দেহ করো সেতারা ? তার চাইতে যে আমার মরণ ভালো ।

—মরে কাজ নেই, তার চাইতে বরং সড়ক কেটে প্রমাণ করো তুমি ভীকৃ নও । সেতারা হাসতে হাসতে বলে ।

—তুমি আমার হবে তো সেতারা ? নিঃসন্দেহ হবার জন্ত প্রশ্ন করি ।

—সড়ক কেটে এসো, পরে দেখা যাবে ।

তথাস্তু বলে বিদায় হই ।

হাজার হাজার লোকলস্কর লাগাই । বন কেটে, পাহাড় ভেঙে, কুঁড়ে আর আস্তাকুঁড় সাফ করে, নদী নালা বন্ধ করে অথবা পুল দিয়ে সড়ক তৈরী করি ।

সড়ক তৈরী হয়ে যায় ।

সেতারা আবার আমার সঙ্গিনী হয় । বলি : দেখো দেখো ! তোমার মনের মতো সড়ক বানিয়েছি । তুমি যেমনটি চেয়েছিলে ঠিক তেমনি লম্বা এবং চওড়া—কোথাও একটি ফাঁক নেই । খুশী হয়েছ ।

—খুশী ! ই্যা খুশী হয়েছি । কিন্তু সেতারার নাক মুখ কুঁচকে ওঠে । আমার মুখের হাসির উপর রাহুর পাখনা পড়ে । একসঙ্গে হাজার জিজ্ঞাসা এসে ভিড় করে মনে । আবার কি শর্ত আরোপ করতে চায় সেতারা ?

ভাবনার সূত্র কেটে যায় । সেতারার কথা শুনি : কিন্তু এ সড়কে যে বড় ভিড় আসাদ । সড়ক বানালে যে শহরও গড়ে উঠবে তা ত ভাবিনি ।

—ভালোই তো হয়েছে শহর গড়ে উঠেছে । সাহস করে তার কথায় বাধা দেই ।

—এবং শহর গড়ে উঠলে সড়কে ভিড় হবে তাও ত ভাবিনি এবং... সেতারা আমার কথাগতর করে না, বলতেই থাকে ।

—সড়কে ভিড় হয়েছে, ভালই ত' হয়েছে, সঙ্গী-স্বজন মিলবে, একা একা লাগবে না । আমি আবার সাহস করে বলি ।

এবারও সেতারা যেন আমার কথা শোনেই না, তার মতো সে বলতেই থাকে ।  
—এবং ভিড়ে ভিড় জমাবে হাজার হাজার যুবক যুবতী—ঠাট্টা করবে, ভাঁট করবে,  
বই নেবে, সই খুঁজবে ; ঝোলা ঝুলাবে, পোলা ভুলাবে, সোনালী রুশালী শাড়ী  
লটকাবে, রঙ-বেরঙের হাওয়াই আর ট্রাউজার পরবে ; খুট খুট খট খট করে নিতম্ব  
নাচিয়ে চলবে—না, এমন সড়কে আমার কাজ নেই ।

সেতারা শেষ করে । চেয়ে দেখি তার মুখে হাসি নেই, চোখে জ্যোতি নেই ।

আমার মাথার ওপর হঠাৎ যেন একটা তালগাছের ওপরের অর্ধেক বিনা ঝড়ে  
ভেঙে পড়ে । তার পত্রাঙ্কে তৈরী বাসায় শকুনীর তা দেয়া ডিমগুলো আমার মাথার  
ওপরেই খান খান হয়ে যায় ।

সব কিছু এলোমেলো । শকুন-হানাগুলো কিলবিল করছে । এতো করার  
পরেও আরো কি চায় আমার জানের জান, প্রাণের প্রাণ, চোখের মণি, হৃদয়ের ধন  
সেতারা ?

—আরো কি চাও সেতারা ? আশাহত স্বরে তার বিমর্ষ মুখের দিকে চেয়ে  
প্রশ্ন করি ।

—বলেছি ত । ব্বলে না ? উদাসভাবে উত্তর দেয় সেতারা ।

—বোঝার চেষ্টা করছি । তুমি বরং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দাও । আমি উত্তর দেই ।

—সড়ক...

—হ্যাঁ সড়ক তো করে দিয়েছি ।

—হ্যাঁ করেছ, সে জন্তে ধন্যবাদ । এখন এ-সড়ক সাফ করো !

—সাফ ! সাফ তো আছেই ।

—কোলটারের সাফ নয়, ভিড় সাফ করো । সব জঞ্জাল দূর করো ।

—কেমন করে ?

—যেমন করে সড়ক তৈরী করেছিলে ।

—কিন্তু কেন ? আমি হেঁটে যাই আর বলি ।

—আমি পরদা পুশিদায় চলতে ভালোবাসি আসাদ । ওদের আমি ডরাই ।

—ডর ! কিসের ডর সেতারা ?

—হ্যাঁ, ওদের আমি ডরাই । বড় গোলমলে লোক ওরা । ষখন-তখন রাস্তায়  
নৃত্য শুরু করে দেয়, কখন কার পরদা তুলে নেয় ঠিক-ঠিকানা নেই । না, কোন  
কথাই নয় আসাদ, ওদের আমি সত্যি বড় ডরাই ।

—কিন্তু





যাবো নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সহসা বলশালী বিদ্যুত মস্তকের ছ' পাশের 'তার' বেয়ে বেগবান হওয়ায় হতচকিত। বিমূঢ় অতি সেই নির্ভুর আঘাতে। বজ্রাঘাতে নিহত মূর্তির মতো, প্রথমে বিশ্বয়বোধক চকিত এবং পরক্ষণে স্থিরীকৃত দুটি প্রবাহ ধৈর্যবান স্তম্ভ শিল্প-কারিগরের নিপুণতায় ক্রমশ বারান্দার নিকট অক্ষকারের পলেস্তারা কেটে কেটে আবিষ্কার করে চেয়ারের খোপ-বন্ধ অতি প্রাচীন একটি সম্পূর্ণ মহাশয় প্রতিকৃতি।

পিতা আমার পিতা, জনক এ প্রাণের; আপাদমস্তক বিস্তারিত স্ফীত শিরার অন্তর্গত প্রণালীতে প্রবাহমান নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যরক্তিম রক্তের নিরংকুশ অধিকারী। সুপুষ্ট দেহের যাবতীয় অস্থিমজ্জা এবং সাবলীল মাংসপেশীসমূহ একমাত্র তাঁর দ্বারাই স্বজিত। তিলে তিলে সমগ্র সঞ্চয় ব্যয়িত আমার হৃদপিণ্ডে স্পন্দন সচল চলাচলে, স্ব-হৃদয়ের স্পন্দন-ধ্বনিতে এক সঙ্গীকে আয়ত্না শোনার বাসনায় ভবিষ্যৎ ভাবনা তখন অতিদূর নির্বাসিত। বাইশ বসন্তের দ্বারে উপনীত বক্ষে ধারণরত অমিততেজা অশ্ব এবং তার কালোচূলে গ্রীবায দৃঢ় স্বকে আলা-হাওয়া জ্বালানি যুগিয়ে একক কৃতিত্বে, বিবর্ণ বিরল কেশ, কুঞ্চিত দৃষ্টি, শিথিল চর্মাবরণে মেছেতা আক্রান্ত, শূণ্য কলাপে কুঞ্জ কুশ উপস্থিত তিনি।

আমার চোখের কালো দর্পণে প্রতিবিম্বিত এক প্রাগৈতিহাসিক তরুণ বর্তমানে পদার্পণ করে হীনশক্তি, নিঃশ্ব সত্রাট; তাঁর যৌবন অপাত্রে হস্তান্তরিত, তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারী হাতে হত, পচন ক্রিয়ায় সমর্পিত শবদেহ, ভাগাড়ে নর্দমার শ্রোতে গলিত অস্তিত্বে প্রাণ ধারণ করে আছে জ্বালাময়ী কীট। কীট দংশনে তিনি বিক্ষত, রুদ্ধবাক দর্শক আপন পটভূমিকার কৃষ্ণ চলচ্চিত্র দর্শনে।

তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর দৃষ্টিতে আমি সম্পূর্ণ সমাহিত। চতু-স্পার্শ্ব শব্দহীন। রাস্তায় কোন ভারী বৃট খট খট আওয়াজ তুলছে না। কুকুরগুলো, যাদের একমাত্র কাজ চীৎকার করা, আজ এ সময়ে অহুপস্থিত। নিখর বৃক্ষের পাতা দালান কোঠা দেয়াল, বিদ্যুৎবাহী তার, পিলার প্রভৃতির সাজানো বাগানে শহরের মধ্যস্থ রজনীতে জীবিত, উন্মিলিত চোখে, মুখোমুখী, অতীত বর্তমান ছকালের দুজন শিকারী, যাদের মধ্যে একজনের অরণ্যে প্রবেশ লাভের চেষ্টা ভয়াল বাঘের থাবায় প্রতিহত, অপরজন লড়াই করে চলেছে। ফলাফল যোর অমাবশ্য কর্তৃক লুপ্তিত। কংক্রিট বাঁধানো বাতাসের কুঞ্জিত শব্দে হেঁটে হেঁটে আমার শ্রুতি-শুভার বন্ধ দ্বারে আঘাত করে পিতার কর্তৃনির্গত অক্ষরবন্দী ধ্বনিসমূহ। ফিরে ফিরে ঘড়ির কাঁটার মতো একই প্রবল এবং আমি অতিশয় পায়দর্শী নই। ওষ্ঠ ও কর্ণকে



পরম কৌশলে নিয়ে যাই আপন অবয়বে। চোখে, ললাটে নিঃশব্দে প্রতিকলন করে প্রকাশ করি নিদারুণ বার্তা, ঘুরে ফিরে একই পদ্ধতির অভিনয় চলে যে কোন সময়ে, কিছুদিন অন্তর অন্তর।

সম্মুখস্থ অদৃশ্য শূন্যতায় অমুভবের রূপোলী পর্দায় দৃশ্যমান ক্রমশ ছুপুরের সেই মহাপুরুষ। পর্দায় প্রক্ষেপিত দৃশ্যালোকে প্রাক্তন ঘটনার বিন্দু বিশ্লেষিত অমুভূতি দর্শক দৃষ্টিসীমায় উপস্থিত। তিনি যেহেতু মহাপুরুষ, কেননা তাঁর ইচ্ছায়, অমুরাগে, বিরাগে অনায়াসে নির্ণীত হতে পারে একাধিক ভবিষ্যৎ। যেমন আজ ছুপুরে তিনি আমাকে বাতিল করে দিলেন। আমার অতিশয় বন্দিত অলংকার, যা এখনও উজ্জল ওজনে ফোলা-ফাঁপা নয় এবং তা তাঁর জানার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কান্ডিত পুষ্পউত্তানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমি তাঁর প্রাচীরবেষ্টিত, এখানে প্রাচীর সংরক্ষণার্থে নয়, পদমর্বাদার বিজ্ঞাপন, কক্ষ অভ্যন্তরে অমুভব করি উন্মুক্ত প্রকৃতির বিপরীত মেরুতে তখন তাঁর অবস্থান। হাতে কলম নিয়ে একটু বই পঠনরত। সে কলমে লাল কালি ছিল। তিনি পড়ে পড়ে লাল কালিতে বইয়ের অংশ চিহ্নিত করছিলেন। আমার আগমন শব্দে বই বেখে আমার দিকে মনোযোগী হলেন। পূর্বে গৃহীত এবং শ্রুত কিছু ধনিপুঞ্জ তাঁকে টেপরেরকর্ডারে বাজিয়ে নিজে নিবেদিত হলাম। তাঁর খেত ওঠের প্রত্যন্ত প্রদেশের মোহন শ্রুতে, কালীযুঁতিতে সহসা প্রলম্বিত স্থাপদ জিহ্বা, চকচকে মক্ষণ ধারালো আঙ্গুলে বিম্বনী কেটে আমার জনকের দেহ টিপে টিপে তান্ত্রিক মন্দিরের পুরোহিত এক চট করে শুইয়ে দিল উপুড় করে এবং শিরযুক্ত গণ্ডদেশকে নকসা অঙ্কিত দু ফালি কাঠের মাঝে। আমি অভূতপূর্ব দৃশ্য দর্শনের আনন্দে অবাক শিহরণ নিয়ে ছিলাম নিবিষ্ট দর্শক। বাল্যে দেখা পুতুল নাচের অবোধ্য পারদর্শিতায় গুণমুক্ততার নিগঢ়াবন্ধ বর্তমানে তিনি আমার রুদ্ধবাক শ্রেণী বিস্ফারিত চোখের কুঠুরীতে উন্মোচন করলেন নীল সেই নাটকের অন্তর্গত পর্দা।

অসীম সাহসে আশায় ভর করে টেপরেরকর্ডার বাজাতে উজোগী হলাম পুনর্বার। তিনি এবার শোনালেন স্তমধুর ঘটাক্ষনি। মেরুদেশে অবস্থান আমার দীর্ঘতর করা গেল না এবং বাইরে রোদ গুণ্ড পেতে ছিল।

অচিকিৎস ক্ষত নিয়ে তিনি ফিবে গেলেন হাতলহীন চেয়ারে। পারিপার্শ্বের করুণ আধারে সার্চলাইট নিয়ে প্রবেশ করি তাঁর দেহের পাতালে। যেখানে তিনি অশ্রুপাত করছেন এবং ঐ করুণপর্ব অমৃত পান করে আছে। কোন শব্দ নেই, তরঙ্গ অথবা শ্রোত নিয়মুখী গতি নিয়ে শুধু ফোঁটা ফোঁটা সঞ্চিত হচ্ছে নিশ্চিহ্ন

একটি পাত্রে। একদিন হয়তো তরল পদার্থ সঞ্চয়ী সেই পাত্রভাণ্ডার দুর্মর বিস্ফোরণে রক্তিম করে দেবে আয়ত্তাধীন পৃথিবীটাকে।

নিজের ঘরে আশ্রয় নিয়ে দরোজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি তখনও তিনি তেমনি বসে আছেন। প্রচুর দূরত্বে অবস্থান তাঁর এবং আমার, তবুও চোরা চোখে তাকাবার দৃষ্টি পাই না। একটা কুয়াশা ঢাকা কাঁচ আমার চোখের মণিতে জাপটে বসে। সূত্রবিহীন ক্লাস্তির সর্বব্যাপী ডানার কবলে প্রথমে বন্দী ও পরে আহতাবস্থায় বিমোতে বিমোতে গা উদ্যম শয্যায় মৃত মানুষের শায়িত শবের মহড়া দেই।

উর্ধ্বে, অর্ধোন্মিলিত দৃষ্টিসীমায় ছাদের কড়িকাঠ নির্দিষ্ট দূরত্বে পরস্পর সাজানো উত্তর দক্ষিণে লম্বমান। যুগান্তরেও যাদের সংখ্যা নির্ণয় হলো না। বহুবার সচেষ্ট হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছি প্রতিবার। কড়িকাঠের খোপে খোপে ভেসে ওঠে অস্পষ্ট ঘোলাটে চিত্রাবলী। সংখ্যার আধিক্যে একটি চিত্র প্রদর্শনী যেন আয়োজিত আমার এ প্রকোষ্ঠে। কিন্তু দৃষ্টি তার তীব্রতায় কোনক্রমেই আবিষ্কার করতে পাবে না তাদের অবয়ব সমূহ। অল্পভবের অণু-পরমাণু ঘোলাটে ডানায় ভর কবে নিষ্ক্ষেপণ কেন্দ্রে ফিরে আসে। আন্তরিকতার অভাব অদৃশ্য বহুদূরত্বে নির্বাসিত, তবু ধরা দেয় না, ধরতে পারি না। ক্ষমতা, শক্তি বাসনা নিদারুণ পরাজিত। একতাল যন্ত্রণার অতল উদরে আহার যোগান দিবে দিয়ে এ-যাবৎকাল, তাকে বেগবান, অমিততেজা করে তুলেছে।

নদীর পারে ভাগাড়, সেখানে শকুনিদের চিংকার। অপর পারে সঁাতার কাটছি। দূর থেকে তীর দেখা যায়, নদীর নিকট গমনে চোখের পলকে উধাও। কুয়োব ভেতর সঁাতার কাটার মতো, অল্পজলে। তলদেশে প্রচ্ছলমান বিকট একটি অগ্নিকুণ্ড অফুরন্ত প্রাণশক্তি ভরপুর। ভেতরের পানি ছান্দিক শব্দ তুলেছে। ধোঁয়াচ্ছন্ন চতুষ্পাখী তাতে রন্ধন প্রক্রিয়ায় নির্বাসিত। দেহের সূচ্যাগ্র বিন্দু বিন্দু রক্তিম তর-তা ঝলসানো চর্মাধরণের অনির্গম সূক্ষ্ম পথে চুইয়ে চুইয়ে সঞ্চরণশীল গোলাকার পদ-র ক্ষুধায়, পুরু অস্থির প্রলেপ এতকালের লালিত, ক্রমাগত প্রবল উত্তাপে খসে খসে থমথমে সমগ্র কুয়োর জল। মাংসহীন দেহের খাঁচায় আচমকা প্রবাহিত বাতাস সোঁ সোঁ শব্দ বাজায়। অকল্পনীয় রূপান্তরে এই আমি, আলমগীর রহমান নামক একটি যুবকের আকার অস্তিত্ব পরিচয় ভবিষ্যৎ কালসূচক দিনশঞ্জির বিবরে অতীত বিষয়ক তথ্যাক্রান্ত গবেষণাপত্রের নির্বাচিত বিষয় ও বস্তু।

একসময় ধনিলোকে জেগে উঠি পূর্ণাবয়ব শরীর, আত্মা, হৃদয়, রক্তপ্রবাহী শিরা উপশিরা ইত্যাদির সমাহারে। এখন আমার ছুঃখ আছে, স্বঃখ, আনন্দের

আশা আছে। রৌদ্রতাপ চন্দ্রালোক মরা দহন দংশন যন্ত্রণা সর্বত্র ছড়িয়ে যায় মুহূর্তে।  
বোধ ও অনুভবেব তীক্ষ্ণতায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় বিভাগ সতর্ক গ্রহরীকে আশ্রয় চেষ্টার  
পরও ফাঁকি দিতে পারে না। বর্তমানে সম্পূর্ণ জাগতিক রেখায় অবস্থান কবছি।

শীতের আচ্ছাদন বোনার মতো কয়েকটা মশা লেপটানো মাংসে হল চুকিয়ে পরম  
নির্ভয়ে ধীরে ধীরে টেনে নিচ্ছিল লৌহ-কণিকা, স্বেত-কণিকা মিশ্রিত তরল সমষ্টি,  
জীবনধারণের অপরিহার্য জালানী। সজাগ দেহটা হঠাৎ নড়ে চড়ে প্রতিবাদ জানালে  
শুরু হয় তাদের সমবেত নৃত্য।

শরীর নির্গত জলে আমি সম্পূর্ণ স্নাত। আপাদমস্তক ছড়ানো ছিটানো অজস্র  
চুলের মূলদেশ এক একটি বর্ণার উন্মুক্ত মোহানা। চল চল জল অবাধ গতি নিয়ে  
সঁগাত সঁগাত ভিজিয়ে দিল। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ ক্রমশ রনিয়ে রনিয়ে শ্বাস-  
প্রশ্বাসের প্রধান প্রবেশ ও নির্গমন পথে পাচার হচ্ছে দেহাভ্যন্তরে।

টেবিলে আমার আহাৰ্য ঢাকা। রোজ বোজ এমনি থাকে। দিনে বা রাতে  
কোনদিন আহাৰ কালে আশেপাশে একই কর্মে নিযুক্ত কাবো দর্শন লাভ আমার  
অতীত। সবাই ঘড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। আমি শুধু ছিটকে বেরিয়ে গেছি,  
সংসাবে আমার একটি মাত্র কাজ; সকাল ছুপুর রাত তিন সময়ে চূপচাপ আহাৰ  
করে যাওয়া। এখানে বৈচিত্র্য সন্ধান কোন ফলবতী দৃশ্য নয়।

খাবাব আগলে রাখা ঢাকনা হাতের সঙ্গে উঠে আসে। অতি আয়েসে এবং  
শরীরের স্নায়ু পেশী শিরাসমূহে সহস্রখণ্ডিত সেকেন্ডেও সময়ে বিক্রম বিদ্যুতের অনন্ত  
দাহ শক্তির প্রয়োগে স্তম্ভিত নিশ্চল যুঁতি। চোখ জোড়া রেডিয়াম ঘড়ির কাঁটায়  
টিক টিক জ্বলতে থাকে। দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী অতিকায় বেগবান  
ঢাকনা খোলার শব্দে সচকিত, একপলক আমাকে দেখে অতি দ্রুত পলায়ন করে  
প্রাণীটা, আশ্রয় নেয় মিটসেফের পেছনে। এতক্ষণ আমার বরাদ্দ লুটতরাজরত  
গোপন সেই তরুর তার প্রয়োজন অতিরিক্ত দ্রব্য বিনষ্ট সাধনে সিদ্ধসাধক প্রচলিত  
অর্থনীতির কূট-কৌশলে।

উদরে এবং মস্তিষ্ক কোর্টরে শ্রবল বিস্ফোরণজনিত অগ্নিকাণ্ড ঘটে একসঙ্গে দাঁউ  
দাঁউ দহন ক্রিয়ার পরিণামে রাজকীয় ভোজসভায় দন্ধ কুলুট, বক্ষদেশে রূপালীছুরি  
আয়ুল প্রোথিত। স্থির হাতের আঙ্গুলে খাবারের অক্ষম ঢাকনা ক্ষমাশ্রাণী অপরাধীর  
করজোড়বন্ধ দেহের মতো স্বল্প দৌড়ল্যমান।

আলোর অসীম ক্ষমতায় দ্রুতগামী পলায়নপর তরুরের পিছু পিছু দৃষ্টি ধাবিত  
এবং তার আশ্রয় স্থলে স্থির দৃষ্টি ছুঁড়ে তাকে চুলচেরা দর্শন করতে থাকি।

অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈলাক্ত মক্ষণ লোমাবৃত লোমশ দেহ, লম্বাটে অবয়বে চোখ কান নাক ও সজ্জার কাঁটার বিগ্নস্ততায় কিছু সংখ্যক গৌফ-আঁশ সমতল নাসারঞ্জের দুপাশে সম্ভ্রান্তারিত। তুলতুলে দেহের নিম্নাংশ থেকে বেরিয়ে এসেছে চারটে পা এবং পশ্চাৎ অংশে লোমবিহীন সত্ত্ব অস্থির হৃদৃশ্য নাতিদীর্ঘ একটি লেজ।

ইঁদুরটা হয়তো আমাকে দেখছে। মিটসেফের পেছনে সমান্তরাল দণ্ডায়মান বিছানো কাঠ পায়ের আঙ্গুলের নখে আঁকড়ে ধরে আছে। কুতকুতে বিবাক্ত অগ্নি-দৃষ্টি যেন আমার দিকে সরলরেখায় নিষ্ক্ষেপিত। তার অভিযান অসফল করে দিলাম, তন্ত্ররবৃত্তির আকস্মিক প্রতিকূল পরিণতি, ইচ্ছাবিরুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণার বাধ্যবাধকতা তাকে দুর্দমনীয় হিংসাতুর করে তুলেছে আমার প্রতি।

চিন্তা-ভাবনা ষাবতীয় বিষয়সমূহ একটি বিন্দুতে ঘূর্ণায়মান, মস্তিষ্ক কোর্টার যে জগ্ন নিয়োজিত। তথায় দাউ দাউ প্রজ্জ্বলমান দাবানল বিরতিহীন পোড়াচ্ছে। অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড ক্রমালুক্মিক গতিতে গ্রাস করছে আপাদমস্তক, সাপের মতো শেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জ্বলেছে জ্বলেছে অগ্নিশিখা এবং অভ্যন্তরভাগে ঘটছে প্রবেশ। শুধু আজ হঠাৎ ধরা পড়লো এ তন্ত্র। গতদিনগুলোতে ছিলাম কতো নিশ্চিত, আহারকাল ছিল নির্বিঘ্ন। অথচ অজ্ঞাস্তে আমাকে ঘিরে চলেছে হত্যা ষড়যন্ত্রের উদ্দাম বহুংসব অশেষ। বৃত্তের সংজ্ঞায় আবর্তিত। দেহের চকচকে ত্বক বালসানো, চতুর্দিক মমতাতে, সাথে সাথে পুড়ে ছাই উদরবৃত্তির পূর্বঘোষিত বাসনা।

সর্বময় বলসিত চামড়ায় টান টান বেদনা, অবয়বের আদল দুমড়ানো প্যাপিরাস, শরীর গঠন সর্বত্র কাদামাটির ভাস্কর্যকর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং দু হাতের বর্ধিত শাখার সব প্রথম বন্ধনী।

পূর্ণিমার প্রবল জোয়ারে ভেঙ্গে গেছে লোমকূপের সমুদয় বাঁধ। বামরি হতে ফোঁটা ফোঁটা অসংখ্য জলবিন্দুর অবিরাম বর্ষণে আমি সম্পূর্ণ সিক্ত। তাতে শীতলতা অথবা প্রশান্তির রাসায়নিক উপাদান অল্পপস্থিত, অভ্যন্তরভাগে একটা পাত্রে রক্ষিত সঞ্চিত টগবগ ফুটন্ত জলরাশির অপ্রতিরোধ্য নির্গমন।

প্রবল দোলায় জ্বলে ওঠে মিটসেফটা। ভেতরে ক্ষুদ্র ছিদ্র জালের পাহারায় তাকে তাকে সাজানো তৈজসপত্র; রংচটা টিনের কোঁটা, আচারের বয়াম, শূন্য দুধের ডেকচি ইত্যাদি; সহসা স্থানচ্যুত, নিজেদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের বিনাশ চিন্তায় শংকিত। বিভিন্ন তরঙ্গ ধ্বনির আশ্রয়ে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করে প্রতিবাদ। ততোক্ষণে আমার দুই বাহু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে লড়াকু ষাঁড়ের দুই শিংএ ঠেলে দিয়েছে মিটসেফ, মিটসেফের পশ্চাৎ অংশ, যেখানে আমার চিরন্তন শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের

শত্রু নিশ্চিত আশ্রয়ে থু-থু নিক্ষেপ করছিলো, নিকটবর্তী চুনকাম শাদা দেয়ালের শত্রু সমতল দেহে। মিটসেফ আর দেয়াল এ দুয়ের মাঝে পূর্বের সরলরেখা টানার বেলে কতিপয় ভগ্নাংশ দূরত্ব প্রায় বিলীন।

দেহের মাংসপেশী স্ফীত, স্ফীততর। শোণিতাধার শিরাসমূহ স্বকের দেয়াল ছুঁতে মুক্তি অভিলাষী। পায়ের মসৃণতল কঠিন সিমেটে দশ আঙ্গুল দশটি খুঁটি পূঁততে প্রাণপণ চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। কিন্তু তা তো মাটি নয়। শুধু, ঘর্মান্ত পায়ের তালু মেঝেয় স্থির হয় না কোনক্রমেই। অথচ এখন প্রয়োজন প্রচুর, অফুরন্ত শক্তির। শক্তি, আস্থারিক শক্তি, চির দুর্জয়ের শক্তি। ধূপ গন্ধ চন্দন যুগনাতি পুষ্প অর্চনায় বন্দিত কাল কালান্তরে, বর্তমানে আমার একক বাসনা, শুষ্ক কণ্ঠে একটি বাসনা প্রার্থনা হয়ে অল্পরণিত হয় বার বার। শংকাদোহল হৃদয়ে অন্তহীন বুধবুদের আকুলি বিফুলি।

ঈশ্বর, শক্তি দাও হে ঈশ্বর। প্রবলতর কর এ হীনদেহ কর্মক্ষমতা। বিশালাকার দানব সাইক্লোপিস আকৃতি অবয়বেও আমি কৃতজ্ঞ। এখন অতি জরুরী উপস্থিতি বীর্যবলবান দেবদূতের। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাবতীয় সন্ধিস্থল শক্তিমান জুগ বিদ্ধ, বিভিন্ন অংশে সন্নিবেশিত বিভক্ত নয় আর। স্বইচ্ছায়, যে দিকে ইচ্ছা হয়; পরিচালনা কবা যায় না। শক্তি উখিত সমস্ত চাপ একটি কার্যকর লক্ষ্যবিন্দুতে ধাবমান, যেমন নদী তার স্রোতে শুধু সমুদ্রে যায়। আরাধ্য একক বর্তমান কর্ম পথের ডানার মতো হাত ছুটো মাংসময় দেহের বিপুল ভার ঠেলে দিচ্ছে, মিটসেফটা শাদা দেয়ালে যেমন ধনুক-মুক্ত তীরে সত্ত সম্মুখপানে অগ্রসরমান। ঈষৎ কম্পমান আয়ত ক্ষেত্রাকার মিটসেফটা ফলে শ্রুতিতে আঘাত করছে পুনঃ পুনঃ ভেতরের কর্কশ জব্যবস্তুর স্থান পরিবর্তনের শব্দ।

বিবিধ ঘটনা উদ্ভূত হতে পারে যে কোন সময়ে। কিন্তু এখন এ মুহূর্তে একটি মাত্র আকাজক্ষা পূরণ আমাকে অনাবিল, নির্মল উপহার দিতে পারে। দেয়ালটা গ্রাস করে নিক, সম্পূর্ণ মিটসেফটা অদৃশ্য হয়ে যাক আমার শত্রু সমেত দেয়ালের গুরু বক্ষে কাঠ নির্মিত চতুষ্কোণাকার নানাবিধ দ্রব্য সংরক্ষণ কল্পে প্রস্তুত এ বস্তু। সকালে সবাই অবাধ, খুঁজবে বস্তুটাকে ঘরের একোণ ওকোণ। তখন আমি, একমাত্র আমিই বাগাতে পারবো প্রসন্নতায় প্রচুর হাততালি। কেননা, কেন এমন হলো তার কারণ জানা ব্যক্তি বিশ্বে মাত্র একটি এবং তা আমি। প্রাণ খুলে লাগামহীন হাসতে পারবো অনেকদিন পর। মা, বাবা, ভাই-বোন এবং সংসারের গুণ সবাইকে ভুলিয়ে। এটা তাঁদের বিচারে বেহায়াপনা, যেহেতু তাঁরা তো জানে

না কারণ এর বিন্দু বিসর্গ। ওঁদের ভ্রূ কুঞ্জন, কিছূটা কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত চেহারা ও রক্তিম কপালের সমতলভূমিতে একাধিক চেউ অথবা অন্ত্র অহুশাসন কোন ক্রমেই করতে পারবে না সংকল্প স্বভূমিচ্যুত।

স্পষ্ট শুনতে পাই ওটা দেয়াল ও কাঠের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থান হেতু দেহে প্রচণ্ড চাপ অহুভূত হওয়ায় পলায়নের বা অন্ত্র সরে যাবার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ কবে ও পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ। পরাক্রম শক্তির আবির্ভাবে যথাস্থানে থেকে উদরে অবয়বে ও শরীরাংশের সর্বত্র নিষ্পেষণ অহুভবে, যেহেতু স্থান পরিবর্তনের সমুদয় পথ রুদ্ধ পায়ের নখে ঈর্ষা, রাগ, বিদেহ, হিংস্রতায় ফুঁসে বিকট খুঁড়ছে মিটসেফের কাঠ বিচিত্র সে ধ্বনি, অকালে মৃত্যু ঘোষণায় অনিচ্ছুক একটি প্রাণীর আশ্রাণ প্রতিবাদ। তাব নাতিদীর্ঘ দেহটা এখন অথবা যে কোন সময়, যা পূর্বে সঠিক ঘোষণা করা যায় না, মুহূর্তে বিদীর্ণ হতে পারে। একবার চিংকারের পর পরই নিখর জগতে আশ্রয় নেবে নরম দেহটা। শাদা দেয়ালে সংকীর্ণ রক্তের ছাপ, তারপর আকাশের দিবে চাবটে পা অসহায় নিষ্পিপ্ত সমতল মেঝের মাঝে এলায়িত লেজ, অবয়ব সংযুক্ত যাঃ এক পার্শ্ব কাত, উদবস্থিত নাড়ি নির্গত ঈষৎ রক্ত মিশ্রিত দু-এক ফোটা ছিটিয়ে যেতে পারে আশেপাশে এবং মুখ থেকে বেরিয়ে ঝুলে আছে ছোটো খেতোভ চকচকে দাঁত।

ইহুরের মতো দাঁত এককালে আমার কাম্যবস্তু। সোহাগী তুষার শুভ্র সৌন্দর্য সম্মুখভাগে বসানো থাকে। ইহুরটা দাঁতে কাঠ কামডাচ্ছে। আক্রোশের চরম সীমানায় উপনীত। যুহু যুহু ধ্বনি-তরঙ্গ কানে এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দেহময় হিমশীতল ভয়াবহ পরিণতি।

কুট কুট শব্দে শক্রর ভাষা অতিশয় পরিষ্কার। আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস অতঃপর জঠরের ভারক রসে জীর্ণ করা স্পষ্ট শ্রবণযোগ্য ও বোধগম্য সংকেত ভাষ্য। শৈশবে ইহুর তার শেতকায় সরু দস্তরাজির রূপে রূপকথায় মোহাবিষ্ট ছিলাম। মিটসেফ ক্রমশ আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছে দেয়ালে, আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় অগ্নিকুণ্ডে নিষ্পিপ্ত বন্দ 'তার' কণ্ঠস্বর হৃদয়ের বোঁটায় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো আঘাত করে। বায়বীয় ধূসর কুয়াশা পথ খুঁজে খুঁজে স্রোতের বিপরীত দাঁড় ফেলি।

দল বেঁধে সঙ্কায়, অর্ধের আলো ডুব ডুব, হস্তে হয়ে গর্ত খুঁজছি। ছোট বয় মুখ নিয়ে অনেকগুলো গর্ত হাঁ করে থাকে। চিনে নিতে হবে আমাদের উদ্দিষ্ট প্রাণীর আবাসস্থল যদি পাই, উঠে যাওয়া আমার কদাকার দাঁতের বদলে 'ওর একটা পরিশীলিত দাঁত চাই। শুনেছি যথাসময়ে তা পাওয়াও যায়। আমাদের!

সকানী ছরু ছরু দুটি মন্থর গ্রামের পরিবেশে পথ কেটে কেটে পার হচ্ছে ঝোপ, ঝাড়, আমতলা, ঝাউতলা, গৃহস্থ বাড়ীর নিকানো উঠোন...

অসম্ভব...। সহসা নির্গত স্বচিৎকারে চেতনায় ওরা আঘাত লাগে ঘোর বেড়ে ছাগ্রত বর্তমান চতুস্পার্শ্বে। দেহের সমুদয় বিবশ ভার নিমেষে ঢেলে দিই দেয়ালের প্রতি মিটসেফের নিস্প্রাণ কাঠামোয়। কোন ধ্বনি আর নির্মিত হবে না এখন থেকে। কর্ণযুগলে তরঙ্গ গ্রহণকারী দেয়ালগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত অবিরাম বর্ষণে। শৈশব সম্মোহনের কাল। গোলাপ মহিলাদের, মহিলারা গোলাপ।

গোলাপ শৈশবে শ্রেষ্ঠত্বে একক অস্তিত্বাচক। মহিলা সমান গোলাপ সমান শৈশব। অতএব মহিলা গোলাপ ও শৈশব। স্মৃত্তরাং মহিলা গোলাপ শৈশব তিন বস্ত্র সন্মিলিত শক্তিতে এক, জন্ম দেয় অগভীর আশ্রয়ী নিসর্গমালা। সেহেতু শৈশবের অমুর্বরা ভূমি স্থান দেয় অমসৃণ বিপুলাবীজ পক্ষে।

অতীত অতীত, বর্তমান বর্তমান। মোহনীয়, মহিলা গোলাপ শৈশব। ত্রয়ীর সমষ্টি ফল সম্মোহন এবং সম্মোহনের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী ফসল ফলায় না কোনদিন।







শেষ রাত্রে খকখক করে কাশছিল লোকটা। শালার বদমায়েস। অস্তিম কাশি।—এখন কাশছো কেন বাবা চাঁদ। সারাজীবন ধরে ফুঁতি করেছে, মেয়েছেলে রেখেছ। আজকে রাতে সেই জোয়ানী কোথায় গেল?

অখচ রাহুলকে উঠতে হয়েছিল। লোকটার বিছানাব পাশে দাঁড়াতে হয়েছিল। সে রাহুলের দিকে চেয়েছিল। কিছু বলবে। না বলেনি। আর আমার জননী মুখে কাপড় দিয়ে তাকিয়েছিল সেদিকে। জোয়ান ছেলের সামনে মুখ দেখাতে শরম করছিল তার। বলিহারি সবম।—তিন বছরের শিশু পুত্রকে রেখে নাগরের সাথে বের হয়ে আসতে বাঁধেনি।—

দুপুর বেলায় ইস্কুল পালালে মাথার ওপর বিলিক মাবতো কড়া রোদ্দুর। একটুকুতেই ঘাম চুইয়ে পড়তো শরীর থেকে। এক বুক তৃষ্ণায় ছাতি যেন ফেটে যেত। রহিমা খালার ভাড়া দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াতো। পানি খেতো। বড় গরীব ছিল রহিমা খালা। বৃকে চেপে ধরে আদর কবতো। ঘরজামাই থাকতে এসে মরদটা ঝুচিবদল কবতে গেছে অনেকদিন আগে। আর ফেরেনি। আশ্চর্য হানতো রহিমা খালা। খেতে পেত না। লাউয়ের ডগার মতো হাজিডসার দেহটাতে আশ্চর্য দাঁতগুলো ঝকঝক করতো।

সেই রহিমা খালা কি হয়ে গেল। রাত্রিতে সেখানে নাকি লোকের যায়। যায় তো কি হয়। সেটা কি খারাপ কিছু? রাহুলও তো যায়।—না, রাহুল আর কখনো যাবে না সেখানে।

কেন যাবো না?

না যাবে না।

কেন যাবো না? গেলে কি হবে? সারাটা ক্ষণ মুখ ভায় করে থাকে রাহুল। দাবিটা সারাক্ষণ খিটখিট করে। বুড়ি,—তেজ কমেনি এক ফোঁটা। সারাদিন রাহুলের পেছনে লেগে থাকে। লোকের কাছে আবার বলে বেড়ায়, আহুরে নাতি। আহা রে আমার আদর। রাহুলের যা খুশি তাই সে করবে। সবলে বিছানা থেকে উঠবে না। ইস্কুলে যাবে না। দিনভর রাস্তায় ঘুরবে। ক্ষিদে পেলে শুধু এসে থাকে। পড়াশোনা লোকে করে কেন? চাকরী পেতে। রাহুলের চাকরীর কোনো দরকার নেই। দাদা অনেক ধানের জমি রেখে গেছে। গোলা ভর্তি ধান হয়।

রাহুলের পৃথিবীটা ধানে ধানময় হয়ে যায়।

লোকটা ক্রমাগত কেশেই চলছে। হাঁপাচ্ছে। বুকটা বোধ করি ঝাঁঝরা

হয়ে গেছে। অসংখ্য যন্ত্রণায় লোকটা সারাজীবন কাতরিয়েছে। অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড মমতা বোধ করে রাহুল। লোকটা তার মাকে স্বখ দিয়েছে। অসংখ্য স্বখ—লক্ষ লক্ষ স্বখের বিন্দু দিয়ে তার মায়ের প্রতি রাজির পৃথিবী সাজিয়ে দিয়েছে। সর্বদা সে স্বখ মেখে তার মা পরিতৃপ্ত হয়েছে। লোকা একটা হাত টেনে নেয় রাহুল। মাংসহীন সে হাত—চামড়া আর হাড়ি আলাদা হয়ে গেছে।

আমি কেন এলাম, সেই বিরক্তিকর ভাবনাটা রাহুলকে ভর করলো। বাপটা মরে গিয়েছিল। আর মা-টা হয়েছে কী। মা-টা মরে গিয়েছিল অনেকদিন অবধি শুনেছে। আহারে বাপ-মা কেমন। অবশি, কোবাদকে ধরে যখন তার বাপ ঠ্যাঙানি দিত, আর ব্যাটা ভেউ ভেউ কাঁদতো—তখন মনে হতো বাপটা মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। আর যখন শুনেছে এবং বুঝেছে মা'টা হয়েছে অল্প কিছু—তখন মনে হয়েছে মা'টাও মরেছে। মরে গেছে, মরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু লোকটি আমার মাকে মরতে দেয়নি। কিন্তু মা' মরে যাওয়াই ভালো ছিলো। সুখী—সুখী কথাটা মনে হতেই রাহুলের মাথাটা আঙন হয়ে গেল। ও শয়তানী আমাকে মা তুলে গাল দিল। আমি জ্বাবিতে পারলাম না। চোরের মতো হেরে গেলাম। সেখানে দাঁড়াবার আর সাহস হলো না। গলাটা শুকিয়ে গেল। মা তুই কেন এমন হতে গেলি। একে আমি বিয়ে করতাম। ও এসে তোর পা টিপতো। মা, তুই আমায় সর্বনাশ করলি। তোর স্বখের জন্ম মা হয়ে আমার স্বখ নষ্ট করলি।

তার এখন যাওয়াই উচিত—রাহুল সিদ্ধান্তে দাঁড়ি টানতে আগ্রহী হলো। লোকটি তো মরেই গেলো। লোকটির বিয়ে করা বউয়ের ছেলেমেয়েরা গেছে। আহা! ফুটি করতে এসে লোকটি সকাল বেলায়ই পাড়ি পেলে লোকগুলো চেনার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাবো। আমার কি দায় মা'টা যদি শিশুকালে আমাকে ফেলে বের হয়ে আসতে পারে, তবে কোন যুক্তি আমি তার পক্ষে থাকবো?

লোকটি এসেছিল। আসাটা অভ্যাস—অভ্যাসত্যাগিত, কিন্তু আকর্ষণহীন নয় লোকটি চোখে ঠুলি পরেছিল। বিয়ে-করা বউটা বৃদ্ধী হয়ে গেছে। এবং বৃদ্ধীট জ্বর দখলে খুশী হয় না। এবং অল্প যে সেটাও বৃদ্ধী। তবে এখনো যত্নসহকারে করে। হাত ধরে বসায়। বৃড়ো বয়সের হাড়ি—বাত্তে ধরেছে—চাবায় হাত-পা টিপে দেয়। লোকটা খুশি হয়, হাসে। সে হাসির সরল অর্থ হলে

কলমা পড়লে তুইও আরেকটির মতোই বুড়ো আন্ডুল দেখতিস। এখন বুড়ী হয়েছিল। তোর আর খন্দের নাই। আমিও আর পারি না। কলাতলা থেকে মস্ত মেয়েগুলো জল নিয়ে যায়। তাকিয়ে থাকি আর কুৎসিত স্বপ্ন দেখি। হস হস না নেড়ে দেখতে। ফুলবাহুরও সাহস হয় না বাজিয়ে নিতে। কিন্তু ধব সাহসের বাঁধ একদিন ভেঙেছিল। তুমি আসো কেন—আক্কেল নেই আর! ধানের ক্ষেতে রস লেগেছে, কিসের কারবারী তুমি। ধানের আড়ত, আর ভদ্রহাটির হাট,—মাঝে বেতবাড়ির রেল ইন্টিশান। মকিমউদ্দিনের দোকানে চা খেতে খেতে জমসের মিয়া ঘামতো। ফর্সা কাপড় গায়ে থাকে না। দুনিয়ার লুলো লেপটে যায়। রাহুলের দিদা ডাকে, আজকের রাতটা থাইকাই যাও ব্যাপারি। হাতগুলো বড় ভয়ঙ্কর। ফুলবাহু তা জানে। বাচ্চা রাহুল কাঁদে। রাহুলের মরা বাপটাই যেন জানান দিয়ে যায়,—আমি আছি। নিজে কে বিন্দু বিন্দু ছড়িয়ে দিয়েছি। ক্রমাগত বেড়েই যাবো। এই পাহারার মাঝে ফুলবাহু হাঁপাতে থাকে। —না না, এই ফাকির পাহারা আমাকে গলা টিপে মারবে।—না না, ব্যাপারী আমি ঘরে ফিরে যাবো। ঘাসে শিশির। পা জড়িয়ে যায়। গুমোট অন্ধকারে তবু লজ্জা জেগে থাকে। নির্দয় আকাশ বৃকে হনহন করে আঘাত করে। বৃকটায় ওর বড় জ্বালা, ঠাণ্ডা বাতাসে কমে না। কে যেন পেছন্দে ডাকছে।—কি জানো, রাতে হিমে মরে যাই। শন শন শন—একটানা বাতাস বিল থেকে উঠে এসে জ্যোৎস্নাহীন মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।—না না ব্যাপারী আমি ঘরে ফিরে যাবো। ঘর তো তখন শত্রুর দখলে। রাহুল কাঁদছে—মা মা মা। তার মরা বাপটাই যেন আঁকুপাকু করে খুঁজছে। সমস্ত পৃথিবীকে বিয়ে দিচ্ছে। শেষ রাত্রির আকাশ তখন আশ্চর্য সমাহিত। শব্দহীন কালয় ঘেসে এগিয়ে গেছে গঞ্জের সড়ক। ঘুমভাঙা পাখির সহসা চিৎকারে চকিত অন্ধকার। ফুলবাহু কথা বলতে পারছে না।—ব্যাপারী, আমাকে বিয়ে করবে তো! বিয়ে করবে তো? বৃকটা এখন হু হু করে শূন্সে ঠাঠাং জে। বুড়ী বয়সের উপসর্গ, ছেলেটা যদি থাকতো। শাস্তিতে থাকতে দিলি। ঘর বাঁধতে দিলি না। এত যখন—দড়িকলসী ছিল না! কখনো জার করে কথা বলতে পারিনি। রাহুল তার অতিক্রান্ত বছরগুলির দিকে ফিরে তাকায়।—আসলে ওটাই বা কার জন্মা কে জানে! নষ্ট মেয়েলোক।.....

ন করলেও গায়ের ঝাল মেটে না।

১ অপরাধ-সন্ত্রস্ত দিনগুলো ভীতিকর অবয়বে প্রতি রাত্রিতে লেহন করতো। ঐ

বয়স কেবল আমার হবে, ঘৃণিত বিবেক অহুচ্চারণে প্রশ্নটা মীমাংসা করে দিতে। আজীবন শীতে স্নান অন্ধকার অবদমনের রীতি নেই। কিন্তু নিঃসঙ্গ চারণে তার উপলক্ষ আছে। রাহুল তাই ভীষণ একাকী—ভয়ঙ্করতম নির্জনতার আজন্ম-লালিত। মা'টা পালালো, কিন্তু তাকে ছাড়লো না। লোকের মাঝে দাঁড়ালো মা'টা তাকে আক্রমণ করতে। ফিসফিসানি শুনলেই তার স্বস্তি থাকতো না। নির্জনে মা'টা আরো উলঙ্গ হতো। সমস্ত রক্তে শিরায় বিবেকে চেপে বসতো। মা' আমার কি অপরাধ। বাপটাকে দেখলাম না। মা'টাও জ্বালালো। মা'গুলো কখনো ভালো। আর আমার মা'টা? চোখখোলা রেখেও যে জঘন্য দৃশ্যগুলো ভেসে ওঠে, তাকে কিভাবে বর্ণনা করা যায়। রহিমা খালার ছেলে হয়েছিল। মরা। সাতদিন রাত্রি অসহ যন্ত্রণায় আত্মা ছেড়ে চীৎকার করছিল রহিমা খালা।

কেউ যায়নি। বেহন্দ বেজন্মার গোর খুঁড়তেও যায়নি কেউ।

কিন্তু পঞ্চায়ত বসেছিল গায়ে সকালবেলাতেই। তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বেজন্মার জাতবিচার করেনি আগুন। টকটকে লাল সূর্যটাও করে না। সে আগুন ঘরে শুয়ে শুয়ে দেখেছিল রাহুল। কেন যাবো? গেলেই তো অসংখ্য চোখ ঠারবে—বাঁকা হালিগুলো গাঁথবে। আমার মা'টা আজকে সকালেই আবার উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে সবার সামনে।—বলি বাহাদুর, এখন যে নড়ছ না বড়। আমার মা'টাকে গ্যাংটা করলে। আমারও সর্বনাশের কিছু বাকি রাখিনি। এবং সে সবে, কোনো স্মরাহা না করেই পটল তুললে। আসলে আমার মা'টা খুব খুশি হয়েছিল। বিগত সন্ধ্যাটাকে মন ফিরিয়ে পড়তে থাকে রাহুল।—মা'টা তোর এখনো বেঁচে আছে তো আমার শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে। আমাকে নবাব বানিয়ে ছেড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে ফুলবাহু।—আমার একটা ছেলে ছিল। হো হো করে হেসে উঠেছিল লোকটা। প্রচণ্ড হাসি।—এসে একেবারে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। বড়ীমার খেদ-মতে ঘাম ছুটিয়ে ছাড়বে। সে সাহস ফুলবাহুরও কি আছে? ভাবতে পারে না তবু ভাবনাটা জড়িয়ে ধরে। জীবনের কাছে তারও তো অনেক দাবি ছিল। দায়িত্বের প্রতারণায় বরং তা বেড়েছে। বাঁকে বাঁকে প্রচণ্ড প্রলোভন তাকে কুংসিত করেছে। খুশিই হয়েছিল জোয়ান মরদকে দেখে। ঐ শরীর তার প্রত্যাশার যত্ন ঘটিয়েছে। কিন্তু দাঁড়াতে পারেনি ফুলবাহু। ছেলেরা তার পরাজিত সমস্ত জীবনের ইতিহাস বয়ে এনেছে। আমি ঘুমোব—ঘুমোব মা। ঘুমোতে চাই। আমার দোষ ছিল মা। অন্ধকারে অন্ধকারে আমি জন্মে গেছি। আমি উত্তাপ চেয়েছি

শরীরে আগুন জ্বলে। আমার শরীরটাও আমার সাথে বেইমানি করলে।  
 কবল বেড়েই গেল। আর অসংখ্য কামনার ফুলকি ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু মা,  
 তুই যেমন শরীরটা কাজে লাগালি, আমি পারলাম না। তুই এসে দাঁড়ালি, সুখী  
 লিয়ে গেল। মনটা আমার আরো ছোটো হয়ে গেল। মা আমি সুখীকে বিয়ে  
 করতে চেয়েছিলাম। পীড়িত করতে বাধেনি সুখীর। ভালোবাসাটা আর বিয়ে  
 দুটো এক হলো! কথার ছিঁরি ছাখ। বিয়ের কথায় ভয় শেল সুখী। আর  
 মাদিন আসবো না রে। যার মায়ের জাত নেই বড়োজোর তার সাথে ফুঁতি  
 বা যায়, ঘর বেঁধে তার সঙ্গে বাস করা চলে না। সুখী দশজনের একজন হয়ে  
 শিচতে চায়। হা হা—সুখী লোকনিন্দার কথা ভাবে!—আর আমার মা মাগিটা  
 সজের সুখটাই দেখল কেবল। স্বার্থপর। বলি, জননী সুখটা পেয়েছে তো। আঁচলে  
 মধ্যে রাখোনি! নেড়ে-চেড়ে দেখবে এপিঠ ওপিঠ। বয়সটা ক’দিন থাকে, রক্তটা?  
 দাদীটা কল্লা ছিল, কিন্তু রাহুলকে পাহারা দিতো। বৃড়ীটা শেষ হয়ে গেলো।  
 আর রাহুল জমির ধান কাটতে পারলে না। সাত গাঁয়েব মাছুষ বসলো দরবারে।  
 মাটা বেপান্তা হয়ে গিয়েছিল। বাপটা মরলেও নামটা ছিল। আর রেখে গিয়েছিল  
 মনের জমি। সাতগাঁয়ের মোড়ল পালু শেখ, তাতে চোখ ছিল তার। বৃড়ী  
 দাদীটাকে বড়বু বলতে অজ্ঞান হয়ে যেত হারামজাদা। দরবারের মধ্যে আবার  
 স্নানটো হলো মাটা, বাপটাও। সাক্ষী আমার জননী নিজেই। স্বভাব নষ্টই ছিল,  
 সোয়ামী মরতেই বার হলো। বাপটা ছিল না, নামটা ছিল। আমার তাও গেল।  
 কুমিল্লো গাঁয়ের মসজিদ—যার মোতওয়াল্লী ওই হারামজাদা পালু শেখ। মামলা  
 করবো বেআইনী জ্বরদখলের বিরুদ্ধে, হা হা—আমার জন্ম নতুন করে আইন তৈরী  
 করতে হবে। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ওরা রাহুলকে ধরে আনছিল দরবারে। আসতে  
 গয়নি নিজে। এবং সে একবার করে ময়েছে, আবার জীবিত হয়েছে।

লোকটিকে নিয়ে যাচ্ছে এখন। বৃতদেহটা খাটলিতে তুলেছে। নিয়ে নিল।  
 মাহা, বেচারী! দুঃখ অহুভব না করে পারে না রাহুল। ভালোই ছিল লোকটি।  
 বাকে বের করে এনেছিল। কিন্তু বয়স ফুরতেই ঠেলে দেয়নি। মায়ের কথা মনে  
 হতেই প্রচণ্ড মমতা জাগে রাহুলের। লোকটি মরে গেছে, মাটা এখন আমার।  
 শুধু আমার।

ফুলবাহু ততক্ষণে কড়িকাঠে কাপড় জড়িয়ে বুলছে।

